প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনও বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়ণের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে — যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক — অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ : অক্টোবর, 2013

ভারত সরকারের দূরশিক্ষা পর্ষদের বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the
Distance Education Council, Government of India.

পরিচিতি

বিষয় : বাংলা **স্নাতকোত্তর পাঠক্রম**

পাঠক্রম ঃ PGB – 3

	রচনা	**সম্পাদনা**
একক 1, 3, 4	অধ্যাপক বিশ্বজিৎ রায়	অধ্যাপক রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
একক 2, 4	অধ্যাপিকা বাঁশরী রায়চৌধুরী	ঐ
একক 6, 7	ড. শিবানী ঘোষ	ঐ
একক 8, 9	অধ্যাপক মঞ্জুভাষ মিত্র	অধ্যাপক পিনাকেশচন্দ্র সরকার

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনোও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অধ্যাপক (ড.) দেবেশ রায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

PGB – 3

[প্রাচীন, মধ্যযুগীয়, আধুনিক কবিতা]

পর্যায় 1

একক 1	চর্যাপদ	7-25
একক 2	বৈষ্ণব পদাবলি	26-56

পর্যায় 2

একক 3	চৈতন্যচরিতামৃত	57-71
একক 4	মনসামঙ্গল—ক্ষেমানন্দ	72-85
একক 5	পদ্মাবতী	86-118

পর্যায় 3

একক 6	মেঘনাদবধকাব্য	119-132
একক 7	রবীন্দ্রনাথ	133-161
একক 8	মানকুমারী-নজরুল-মোহিতলাল-যতীন্দ্রনাথ	162-184
একক 9	জীবনানন্দ-সুধীন্দ্রনাথ-অমিয়কুমার প্রেমেন্দ্র-বুদ্ধদেব-বিষ্ণু-সুকান্ত	185-249

একক ১ ❐ চর্যাপদ

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য
১.২ প্রস্তাবনা
১.৩ চর্যাগীতি আবিষ্কারের ইতিবৃত্ত
১.৪ পুথি পরিচয়
১.৫ নাম-বিতর্ক
১.৬ রচনাকাল বিতর্ক
১.৭ চর্যার ধর্মতত্ত্ব
১.৮ চর্যার ভাষা
১.৯ চর্যার সাহিত্যমূল্য
১.১০ অনুশীলনী
১.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১.১ উদ্দেশ্য

পৃথিবীর যে-কোনো ভাষা-সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে আদিপর্বে কাব্যধারাটিই প্রাধান্য লাভ করেছিল। এর কতগুলি সম্ভাব্য কারণ নির্দেশ করা যেতে পারে। প্রথমত লিপি আবিষ্কৃত হয়নি এবং পরে লিপি আবিষ্কৃত হলেও লেখার কৃৎকৌশল কম লোকেই জানতেন। দ্বিতীয়ত মুদ্রণযন্ত্রের ব্যবহার জানা ছিল না বলে মুদ্রিত গ্রন্থ বলে কোনো বস্তু ছিল না। ফলে সাহিত্যবস্তু মুখ্যত স্মৃতি ও শ্রুতি বাহিত হয়ে বিস্তার লাভ করত। যাঁরা লিপিকৌশল জানতেন তাঁরা রচনা পুথিতে বিধৃত করতেন। তবে রচনা সম্প্রসারণে স্মৃতি ও শ্রুতিই ছিল মুখ্য মাধ্যম। স্বভাবতই সুর, তাল, লয় ও ছন্দ সমন্বিত শ্রুতিসুভগ পদ স্মৃতিধার্য হয় সহজে। ফলে যে-কোনো ভাষা-সাহিত্যের আদিপর্বে কাব্যধারাটিই প্রবল।

বাংলা ভাষা-সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও এই কথাগুলি সত্য। উনিশ শতকে ইংরেজি বিদ্যাচর্চা ও জ্ঞানচর্চার প্রভাবে বাংলা গদ্যের ব্যাপক বিস্তার ঘটে। এর আগে বাংলা সাহিত্যের মুখ্য অবলম্বন ছিল কাব্য—কবিতা।

স্বভাবতই বাংলা কাব্যধারার আদি নিদর্শন কোনটি এই প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে। এখানে অবশ্য একটা কথা মনে রাখতে হবে। দেশজ সাহিত্যধারা সংক্রান্ত এমন উৎসমুখী প্রশ্ন উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষালাভের ফলেই জাগ্রত হল। উনিশ শতকে নবজাগ্রত বাঙালি পাশ্চাত্য ইতিহাসবিদ্যার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বজাতির অতীত বৃত্তান্ত রচনায় ব্রতী হলেন। এই সূত্রে পুরোনো বাংলা সাহিত্য তাঁদের আগ্রহের অন্যতম বিষয় হল—সাহিত্যের মধ্যে ইতিহাসের অনুসন্ধান করা শুরু হল। ১৩০৫ সনের 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'-য় 'ইতিহাস রচনার প্রণালী' প্রবন্ধে রজনীকান্ত গুপ্ত লিখলেন, 'দরিদ্র মুকুন্দরামের সংগীতের সহিত তদানীন্তন বঙ্গীয় সমাজের ইতিবৃত্ত জড়িত রহিয়াছে। আদি কবি কৃত্তিবাসের গ্রন্থের বিশ্লেষণ করিলেও সেই সময়ের বাঙ্গালী চরিত্রের আভাস পাওয়া যাইতে পারে।' রজনীকান্ত গুপ্তের এই পদ্ধতি অনেকেই অনুসরণ করেছিলেন।

সাহিত্যের মধ্যে জাতির অতীত পরিচয় লাভ করা সম্ভব এই ধারণার পাশাপাশি প্রাচীন সাহিত্য পাঠে বর্তমান ভাষার পূর্বরূপসম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভ করা যায় এই প্রত্যয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৩০৫ সালের কার্তিক সংখ্যার 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল লেখকের নামবিহীন রচনা 'সাহিত্যপঞ্জী'—পুরোনো বাংলা সাহিত্যের ভাষা নিয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ সেখানে ছিল। অবশ্য শুধু ইতিহাসের উপাদান অনুসন্ধানের জন্য এবং ঐতিহাসিক/তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের উদাহরণ হিসেবে পুরোনো বাংলা সাহিত্য পড়া হত না, সাহিত্য হিসেবেও এর কদর ছিল। বিশেষ করে বৈষ্ণব পদাবলী, রামপ্রসাদের পদ, কৃত্তিবাসের 'শ্রীরাম পাঁচালী', মুকুন্দের 'চণ্ডীমঙ্গল', ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল যথার্থ সাহিত্য হিসেবেই পরিগণিত হত। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদকর্তাদের রসিক পাঠক ছিলেন। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় বৈষ্ণব পদকর্তাদের রচনার গুণাগুণ সংক্রান্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হত।

মনে রাখতে হবে উনিশ শতকে পুরোনো বাংলা সাহিত্যের নিদর্শনগুলি সহজলভ্য ছিল না। মুদ্রণপ্রযুক্তি-পূর্ববর্তী সময়ে পুথিতেই রচনার লেখরূপ বিধৃত হত। যাঁদের কাছে পুথি ছিল তাঁরা সেগুলি সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করতে পারতেন না, অথবা করতে চাইতেন না। 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত কবিওয়ালাদের জীবন ও কাব্যসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। ফলে ইতিহাসের উপাদান, ভাষাতত্ত্বের উদাহরণ কিংবা সাহিত্য-রসাস্বাদন, যে উদ্দেশ্যই পাঠক সাধন করতে চান না কেন সবার আগে সাহিত্য-নিদর্শনটিকে মুদ্রিত গ্রন্থ হিসেবে প্রস্তুত করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সংগ্রাহকরা (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র সেন, বসন্তরঞ্জন রায় প্রমুখ) বিভিন্ন স্থানে গিয়ে পুথির অনুসন্ধান করতেন। পুথি আবিষ্কৃত হলে নানা পদ্ধতিতে পুথিটিকে প্রকাশযোগ্য করে তোলা হত। তারপর গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হলে কাব্যটি সাধারণ রসিকের পর্যালোচনার বিষয় হত।

যেহেতু উনিশ শতকে আবিষ্কৃত সাহিত্যের উপাদানগুলির মধ্যে বৈষ্ণব পদকর্তাদের পদগুলিই ছিল প্রাচীনতম সেহেতু উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসেবে সেগুলিকেই চিহ্নিত করা হত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই পুথি সংগ্রহের জন্য ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয়বার নেপাল যাত্রা করেন। এই পর্বে নেপাল-দরবার গ্রন্থাগার থেকে তিনি বেশ কিছু বৌদ্ধগান ও দোহা পান। 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়', সরোজব্রজের সটীক 'দোহাকোষ', মেখলা টীকাসহ কাহ্নপাদের 'দোহাকোষ' এবং বৌদ্ধতন্ত্রের পুথি 'ডাকার্ণব' একত্রে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ প্রকাশের পর বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনা করতে হয়। নানা তর্ক-বিতর্কের পর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'The Origin and Development of the Bengali Language' গ্রন্থে তথ্য ও যুক্তিসহ 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়'-এর ভাষা যে বাংলা তা প্রতিষ্ঠা করেন।

'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়'-এর নির্বাচিত পদ পাঠ করলে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের আদি নিদর্শন সম্বন্ধে পরিচয় লাভ করা সম্ভব।

১.২ প্রস্তাবনা

'চর্য্যাচর্যবিনিশ্চয়' সংক্রান্ত আলোচনায় প্রবেশের আগে প্রাচীন ও মধ্যযুগের (পুরোনো) বাংলা কাব্যধারার সাধারণ বৈশিষ্ট্য খেয়াল করতে হবে। এই পর্বের অধিকাংশ কাব্যই ছিল ধর্মাশ্রিত। অবশ্য সমস্ত কাব্যে ধর্ম উপাদানটি সমভাবে ব্যবহৃত হয়নি—প্রকাশভঙ্গির ভিন্নতা ছিল। কোথাও কাব্যে সাধনপদ্ধতি বর্ণিত হত, কোথাও থাকত ধর্মসংক্রান্ত দার্শনিক ভাবনা, আবার কোথাও দেবতার ক্ষমতা সংক্রান্ত নানা দীর্ঘ কাহিনি রচিত হত। তবে এই ধর্মাশ্রিত সাহিত্য কখনই জীবনের উপাদানগুলিকে বাদ দিত না। আসলে ধর্মমুখী সাহিত্য,

জীবনমুখী সাহিত্য এই বিভাজন রেখাটি ইংরেজ-প্রভাব পূর্ববর্তী সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই। আদি যুগের বাংলা সাহিত্যে ধর্মের সঙ্গে জীবনরসও খানিকটা মিশে গেছে। এবং সেটা স্বাভাবিক।

চর্যাগীতিগুলি আদতে যে দেহতত্ত্বের গান সে বিষয়ে কোনো দ্বিধা নেই। তবে শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'ভারতীয় সাধনার ঐক্য' গ্রন্থে যেভাবে দেখিয়েছেন যে প্রাক্-ইংরেজ বাংলা সাহিত্যে পার্থিব ও অপার্থিব চিন্তাধারা পরস্পরলঙ্ঘী তেমনই চর্যার দেহতত্ত্বের গানে অন্য প্রবণতা মিশে থাকা সম্ভব। এই গীতিগুলি পাঠ করার সময় তাই আমরা ভাব ও প্রকরণ দুয়ের দিকেই নজর দেব। প্রকরণের আলোচনায় আসবে ভাষা-ছন্দ ইত্যাদি প্রসঙ্গ। ভাবগত আলোচনার মুখ্য উপজীব্য হবে সাধনতত্ত্ব। অর্থাৎ চর্যাকাররা যে ধর্মতত্ত্বে বিশ্বাসী সেই ধর্মতত্ত্বের অন্তিম লক্ষ্য কী ছিল এবং কেমন করেই বা তা পাওয়া সম্ভব বলে তাঁরা মনে করতেন তা ভাবগত আলোচনার বিষয় হবে। পদগুলিকে দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে বোঝাও জরুরি। পরিশেষে পাঠ্য পদগুলির সরলার্থ, আভিপ্রায়িক অর্থ ও সাহিত্যমূল সংক্রান্ত আলোচনাও থাকবে। সবার আগে অবশ্য এই পদগুলির আবিষ্কারের উদ্দেশ্য, ইতিবৃত্ত, আবিষ্কৃত বস্তুর পরিচয় এবং সম্পাদিত গ্রন্থের রূপ ইত্যাদির আলোচনা জরুরি। কারণ এই বিশশতকীয় প্রকল্পের সৌজন্যেই দশম শতাব্দীর (রচনাকাল সম্বন্ধীয় বিতর্ক পরবর্তী পর্যায়ে আলোচিত হবে) পদগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে।

১.৩ চর্যাগীতি আবিষ্কারের ইতিবৃত্ত

রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতায় বিচলিত হয়ে পাল রাজত্বের পরবর্তী সময়ে বহু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী গৌড়ভূমি সংলগ্ন দূরবর্তী অঞ্চলগুলিতে আশ্রয় নেন। নেপাল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। ফলে উনিশ-বিশ শতকের পুথি-সংগ্রাহকরা নেপাল থেকে বহু বৌদ্ধপুথি পেয়েছিলেন। হজসন (Brian Hodgson) সর্বপ্রথম নেপাল থেকে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের অনেকগুলি পুথি আবিষ্কার করেন এবং পরীক্ষার জন্য সেগুলি বিভিন্ন প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেন। বুর্নফ (Eugene Burnouf) এই পুথিগুলির ভিত্তিতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস রচনা করেন। হজসন-এর পর নেপালে গিয়েছিলেন রাইট (Daniel Wright)। তিনিও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অনেকগুলি মূল্যবান পুথি সংগ্রহ করতে চেয়েছিলেন। হজসন ও রাইট-এর পর অনেকেই নেপালে যান। বেন্ডাল (Cecil Bendall) ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে নেপালে গিয়ে 'সুভাষিত সংগ্রহ' নামে একখানি পুথি নিয়ে আসেন ও ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও এই পুথি-সংগ্রাহকদের মধ্যে অন্যতম। শাস্ত্রী মহাশয় এশিয়াটিক সোসাইটির পুথিসংগ্রহ কার্যে নিযুক্ত হয়ে তিনবার নেপালে গিয়েছিলেন। ১৮৯৭-৯৮ খ্রিস্টাব্দে দুবার ও ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে আরেকবার নেপাল যান। শাস্ত্রীর প্রথমবার নেপাল যাওয়ার আগেই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের অনুসন্ধিৎসা দেখা দিয়েছিল। বেন্ডাল, কাওয়েল ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের পুথির বিবরণ এবং তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর দ্বিতীয়বার নেপার যাওয়ার আগে বেন্ডাল-এর সুভাষিত সংগ্রহও হাতে এসেছিল। শাস্ত্রীমশাইয়ের তৃতীয়বার (১৯০৭) নেপালযাত্রা অবশ্য বিশেষ ফলপ্রসূ হয়। এইবারে তিনি 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়'-এর সন্ধান পান ও নেপালের রাজদরবার গ্রন্থাগার থেকে তিনি প্রাপ্ত পুথির নকল তৈরি করে আনেন। শাস্ত্রীমশাই অন্যান্য সংগ্রহগ্রন্থও পেয়েছিলেন। এগুলি হল যথাক্রমে—১. সরোজব্রজের সটীক 'দোহাকোষ', ২. মেখলা টীকাসহ কাহ্নপাদের 'দোহাকোষ', ৩. বৌদ্ধতন্ত্রের পুথি 'ডাকার্ণব'।

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে 'হাজার পুরাণ বছরের বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে সংগৃহীত পুঁথিগুলি প্রকাশ লাভ করে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পরেও চর্যা সংক্রান্ত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বহু তথ্য আবিষ্কৃত হয়। শাস্ত্রীমশাই এই গানগুলির তিব্বতি অনুবাদের কথা জানতেন কিন্তু সেই

অনুবাদ তিনি ব্যবহার করতে পারেননি। তিব্বতি অনুবাদটির প্রথম সন্ধান করেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। 'Indian Historical Quarterly' (Vol. III, 1972) পত্রিকায় এই তিব্বতি অনুবাদ সম্বন্ধে আলোচনা প্রকাশিত হয়। পুথিখানির তিব্বতি অনুবাদ প্রথম প্রকাশ করেন প্রবোধচন্দ্র বাগচী। পরে প্রবোধচন্দ্র বাগচী ও শান্তি ভিক্ষুর যুগ্ম সম্পাদনায় 'চর্যাগীতিকোষ' নামে প্রকাশিত হয়। তিব্বতি অনুবাদ থেকে জানা গেল মূলে একশোটি চর্যার একটি সংকলন ছিল। শাস্ত্রীমশাই-এর প্রাপ্ত পুথি যা আদতে টীকাগ্রন্থ তাতে ৫০টি পদ সংকলিত। পরবর্তী এই আবিষ্কারগুলি চর্যাসম্বন্ধীয় জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নিলেও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কার বাংলা ভাষার আদি নির্দশন প্রাপ্তি সংবাদ হিসেবে সাধারণ জনমানসে যে আন্দালন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল সেরকম কোনো আন্দোলন এই পরবর্তী আবিষ্কারগুলি সৃষ্টি করতে পারেনি।

অধ্যায় সংক্ষেপ : জাতীয়তাবাদী আদর্শে ও জ্ঞানচর্চার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তৃতীয়বার নেপাল যাত্রার (১৯০৭) সময় যে পুথিসমূহ পান তা 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' (১৯১৬) নামে প্রকাশিত হয়। শাস্ত্রীমশাই দাবি করেন এগুলি বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন। পরে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যও আবিষ্কৃত হয়।

১.৪ পুথি পরিচয়

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর আবিষ্কৃত পুথিসমূহের ভাষা আদি বাংলা বলে মনে করলেও ভাষাতাত্ত্বিকরা এই মত স্বীকার করেননি। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'The Origin and Development opf the Bengali Language' গ্রন্থে প্রমাণ করেন শাস্ত্রী আবিষ্কৃত চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' নামধেয় (নাম সম্পাদক প্রদত্ত) পুথিটিই বাংলা ভাষার প্র- নির্দশনবাহী, অন্যগুলি নয়। সুতারং এই পুথিটিই বাংলা বিদ্যাচর্চা রসিকদের বিবেচ্য। সাধারণভাবে এটিই চর্যাপদের পুথি হিসেবে পরিচিত।

নামপত্রে পুথির মাপ ১২$^{৩}/_{৪}$″ +১$^{৭}/_{৮}$″। তালপত্রের পুথি। মূলে খুব সম্ভবত ৭০টি পাতা ছিল। পুথিটি খণ্ডিত। মাঝের কয়েকটি পাতা (৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৬৬) নেই, শেষ পাতাটিও সম্ভবত পাওয়া যায়নি। পাতার উভয় পৃষ্ঠাতেই লেখা। প্রতি-পৃষ্ঠায় ৫ পঙ্‌ক্তি লিখিত, ব্যতিক্রম ৬৫ক পৃষ্ঠা। পুথির লিপি বাংলা, কদাচিৎ নেওয়ার লিপির কিছু নমুনা আছে। নাগরি লিপিতেও পরবর্তী সংশোধন প্রচেষ্টা কোথাও কোথাও চোখে পড়ে। নামপত্রের ৭৪১ সংবৎ তারিখটি থেকে অনুমান করা যায় পুথিটি প্রায় তিনশো বছরের পুরোনো।

প্রবোধচন্দ্র বাগচী ও শান্তি ভিক্ষুশাস্ত্রীর যুগ্ম সম্পাদনায় বিশ্বভারতী থেকে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'চর্যাগীতিকোষ'। এই তিব্বতি অনুবাদটি প্রকাশিত হওয়ার ফলে শাস্ত্রী আবিষ্কৃত পুথি সম্বন্ধীয় কিছু ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হয় এবং প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য জানা যায়।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ধারণাা ছিল তিনি গান ও দোহার পুথি আবিষ্কার করেছেন, টীকা আনুষঙ্গিক। কীর্তিচন্দ্রের তিব্বতি অনুবাদ থেকে নিশ্চিতভাবে জানা গেল শাস্ত্রী মূল গান ও দোহার পুথি আবিষ্কার করেননি ; টীকাগ্রন্থ আবিষ্কার করেছেন। টীকাকারের নাম মুনিদত্ত। মূলগীতি সংগ্রহের গীতি সংখ্যা ১০০, টীকাকার তার থেকে ৫০টি বাছাই করে টীকা রচনা করেন। সচরাচর টীকাগ্রন্থে মূল গীতি থাকে না, এদিক থেকে এই টীকাটি ব্যতিক্রম।

তারাপদ মুখোপাধ্যায় অবশ্য তাঁর 'চর্যাপদ' শীর্ষক পুস্তিকায় তিব্বতি অনুবাদটি সম্পর্কে নানা প্রশ্ন তুলেছেন। এমনকী শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁর আলোচনায় এমন ইঙ্গিতও দিয়েছেন যে হয়তো মুনিদত্ত তাঁর টীকায় গানগুলির উল্লেখ করেছিলেন মাত্র। গানগুলি পরবর্তী সংযোজন।

১.৫ নাম-বিতর্ক

বাংলাভাষার প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে যে গ্রন্থদুটি পরিগণিত হয় সেই 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' ও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'—দুটিকে ঘিরেই নামকরণ বিতর্ক বর্তমান। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছিলেন '১৯০৭ সালে আবার নেপালে গিয়া আমি কতকগুলি পুথি দেখিতে পাইলাম। একখানির নাম চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়। উহাতে কতকগুলি কীর্তনের গান আছে ও তাহার সংস্কৃত টীকা আছে। গানগুলি বৈষ্ণবদের কীর্তনের মতো, গানের নাম চর্য্যাপদ।' লক্ষণীয় শাস্ত্রী মহাশয় সংকলিত গীত ও সংস্কৃত টীকা দুয়ের কথাই উল্লেখ করেছেন। জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী তাঁর 'চর্যাগীতির ভূমিকা' গ্রন্থে যথার্থই লিখেছেন নাম-বিতর্কের দুটি নিরিখ। এক দল সংকলিত গীতের সূত্রে নামকরণ করতে চেয়েছেন, অন্য দলের বিবেচ্য সংস্কৃত টীকা। পণ্ডিতদের মধ্যে কে কোন্ নাম প্রয়োগ করতে চান তা প্রথমে উল্লেখ করা যাক।

নামকর্তা	**প্রদত্ত নাম**
বিধুশেখর ভট্টাচার্য	আশ্চর্যচর্যাচয়
প্রবোধচন্দ্র বাগচী	চর্যাগীতিকোষ
সুকুমার সেন	চর্যাগীতি পদাবলী

তিব্বতি অনুবাদের সাক্ষ্য মান্য করে যদি স্বীকার করে নেওয়া হয়, এটি পদসংকলন পুথি নয়, টীকা, তাহলে 'চর্যাগীতিকোষ', 'চর্য্যাপদ', 'চর্যাগীতি পদাবলী' ইত্যাদি নাম অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে। সেক্ষেত্রে 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' নামটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিধুশেখর ভট্টাচার্য টীকার বস্তুনির্দেশক শ্লোকের 'আশ্চর্যচর্যাচয়' শব্দসাপেক্ষে এর নাম তাই রাখতে চেয়েছিলেন। তবে আবিষ্কারক-সম্পাদক হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্মানার্থে 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' নাম অপরিবর্তিত রাখার পক্ষপাতী অনেকেই। যে গ্রন্থে সিদ্ধাচার্যদের চর্য (আচরণীয়) ও অচর্য (অনাচরণীয়) নিশ্চিতরূপে নির্দেশ করা হয়েছে তাই নাকি 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়'। বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'চর্যাগীতিকোষ'-এর ভূমিকায় ভিক্ষুশাস্ত্রীও এই মত প্রকাশ করেছেন। অবশ্য সুকুমার সেন মনে করেন 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' নামটি অশুদ্ধ, শুদ্ধ রূপটি হওয়া উচিত 'চর্য্যাশ্চর্য্য বিনিশ্চয়'।

১.৬ রচনাকাল বিতর্ক

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য-নিদর্শনগুলির কাল নির্ণয়ের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। তবে কৃত্তিবাস বা চণ্ডীদাসের কাল নির্ণয়ের সমস্যার চেয়ে চর্যাগীতির কাল নির্ণয়ের সমস্যাটি গোত্রগতভাবে ভিন্ন রকমের। কৃত্তিবাস বা চণ্ডীদাস একক কবি। চর্যাগীতির রচয়িতা একজন নন, বহুজন। এই সমস্ত বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তি প্রচলিত ছিল। আবার এঁদের রচিত অন্যান্য নানা সৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। এই সূত্রগুলিকে একত্রিত করে চর্যাগীতির রচনাকাল নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। তবে গবেষকবর্গ এ বিষয়ে সহমত হতে পারেননি। প্রথমে আমরা চর্যার রচনাকাল হিসেবে বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গ কে কোন সময়টিকে কী কারণে নির্দেশ করেছেন তা সারণি আকারে সাজিয়ে দিচ্ছি।

রচনাকাল নির্দেশকের নাম	**রচনাকাল**	**সিদ্ধান্তের কারণ**
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ।	হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে আদি সিদ্ধাচার্য লুইপাদ অতীশ দীপঙ্করের 'অভিসময়বিভঙ্গ' রচনায় সাহায্য করেন। অতীশ দীপঙ্কর ১০৩৮খ্রিস্টাব্দে তিব্বতে যান। চট্টোপাধ্যায় লুইকে অতীশের

		'elder contemporary' মনে করে রচনাকালের ঊর্ধ্বসীমা হিসেবে ৯৫০ খ্রিস্টাব্দকে নির্দেশ করেছেন। নিম্নসীমায় রয়েছেন কাহ্নপাদ। কাহ্নপাদের 'হেবজ্র-পঞ্জিকা-যোগর-ামালা'র অনুলিপি ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সুতরাং কাহ্নপাদের জীবৎকালের নিম্নসীমা ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দ।
রাহুল সাংকৃত্যায়ন	অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে।	তাঁর মতে আদি সিদ্ধাচার্য সরহপাদ। ইনি শান্ত রক্ষিতের সমসাময়িক। শান্ত রক্ষিত ভোট-সম্রাট 'খি-স্রোঙ-দে চন্'-এর রাজত্বকালে (৭৫৫-৭৮০) তিব্বতে যান। সাংকৃত্যায়ন মনে করেন লুইপাদ ধর্মপালের রাজত্বে শেষভাগ (৮০০) পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন।
শহীদুল্লাহ	সপ্তম শতাব্দীতে চর্যাপদের রচনা শুরু।	শহীদুল্লাহের মতে আদি সিদ্ধাচার্য শবরপাদ। শবরপাদ কমলশীলের জন্য সংস্কৃতে দুটি বই লেখেন। কমলশীলও তিব্বত-রাজ কি-স্রোং-দে-চন-এর আহ্বানে ৭৬২ খ্রিস্টাব্দে তিব্বতে যান। এছাড়াও কম্বলাম্বরপাদ রাজা ইন্দ্রভূতির দীক্ষাগুরু। ইন্দ্রভূতি পদসম্ভবের (৭২১/২২) পালকপিতা। সুতরাং কম্বলাম্বরপাদ সপ্তম শতাব্দীর লোক।

প্রশ্ন হল পণ্ডিতবর্গের এই মতভেদ কি নিরসন করা সম্ভব ? একবাক্যে সম্ভব নয়। তবে সুনীতিকুমার তাঁর বিচারে সিদ্ধাচার্যদের নিয়ে প্রচলিত কাহিনি ঐতিহ্যকে গুরুত্ব দেননি। সিলভাঁ লভি, লামা তারনাথ, বিনয়তোষ ভট্টাচার্য প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ কিংবদন্তিগুলিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কিংবদন্তি পাথুরে প্রমাণ নয়। তাই চর্যাগীতিগুলির রচনাকালের সীমা খ্রিস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে ধরা যেতে পারে।

১.৭ চর্যার ধর্মতত্ত্ব

চর্যাগীতিগুলিতে সিদ্ধাচার্যদের আচরণীয়-অনাচরণীয় কৃত্যের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এই নির্দেশ বৌদ্ধদর্শন-সাপেক্ষ। অবশ্য বৌদ্ধ ধর্মদর্শনের মধ্যে নানা ভেদ বর্তমান। চর্যার ধর্মতত্ত্ব বুঝতে গেলে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের ক্রমবিবর্তনের সূত্রটিও খেয়াল রাখতে হবে। এই ক্রমবিবর্তনের সূত্রেই আমরা চর্যাগীতিগুলিতে সাধনতত্ত্বের স্বরূপ আলোচনা করব।

সারথি ছন্দকের সঙ্গে পরিভ্রমণে গিয়ে রাজপুত্র সিদ্ধার্থ জন্ম-জরা-মযত্যুময় যে জগৎ দেখেছিলেন তা তাঁকে বিচলিত করেছিল। এতটাই বিচলিত করেছিল যে রাজপুত্র সিদ্ধার্থ পরিণত হলেন তথাগত বুদ্ধে। হিন্দু রাজবংশে জন্মগ্রহণ করলেও হিন্দুধর্মের সংস্কার অতিক্রম করে এক নতুন ধর্মমত ও পথের সন্ধান দিলেন তিনি। তাত্ত্বিকরা অবশ্য বুদ্ধদেবের প্রচারিত এই ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে হিন্দুধর্মের কোনো কোনো ধারণার মিল খুঁজে পান কিন্তু বৌদ্ধধর্ম আলাদা ধর্ম হিসেবেই গড়ে উঠেছিল। বলা যেতে পারে প্রচলিত ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধী ছিলেন বুদ্ধদেব। অনাত্মবাদী, ক্ষণত্ববাদী বৌদ্ধধর্ম যাগযজ্ঞপ্রধান কর্মফলবাদী হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের থেকে আলাদা।

বুদ্ধদেব দেবতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নীরব থেকেছেন, মূর্তিপূজার গুরুত্ব স্বীকার করেননি, দুঃখময় জগতে দুঃখের হেতু নির্ধারণ করে মধ্যপথ অবলম্বনের মাধ্যমে তার থেকে নির্বাণ লাভ করতে বলেছেন। অর্থাৎ ধ্রুপদী বৌদ্ধধর্মে পঞ্চস্কন্ধ সমবায়ের বিলোপসাধনই নির্বাণ এবং এই নির্বাণই সাধ্যবস্তু।

বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের পর নির্বাণের স্বরূপ, উপায় ও উদ্দেশ্য নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিল। নির্বাণ কি দুঃখময়, নাকি তাতে অনন্তসুখ? তা কি অভাব-স্বভাব ও অবাস্তব কিংবা ভাবস্বভাব ও বাস্তব? সে কি জন্মমৃত্যুর অতীত শাশ্বত জীবন, না কি কেবলই স্থূলদেহের নিশ্চিত বিনাশ? নির্বাণ কি শুধু অহংজ্ঞানের বিলোপ, না তা একটি অবিমিশ্র সুখবাদ? রাজগৃহের, বৈশালীর, পাটলীপুত্রের এবং কনিষ্কের সময়ে অনুষ্ঠিত মোট চারটি বৌদ্ধ মহাসংগীতির অধিবেশনে বুদ্ধদেব-প্রদত্ত ধর্মোপদেশের 'অথকথা' বা ভাষ্য নিয়ে যে সমস্ত বিতর্ক হয় তা থেকেই বৌদ্ধধর্মাচরণের বিভিন্ন পদ্ধতি বা যানের সৃষ্টি হয়।

বৌদ্ধধর্ম প্রথমে প্রধান যে জুটি যান ভেঙে গেল সে দুটি হল হীনযান ও মহাযান। হীনযানীরা মনে করতেন বুদ্ধনির্দেশিত ধ্যান এবং অন্যান্য নৈতিক আচার-আচরণের অতি নিষ্ঠাপূর্ণ সাধনার পথেই নির্বাণ লাভ করা যাবে। সাধককে সাধনা করতে হবে শূন্যতার, অস্তিত্বকে অনস্তিত্বে বিলুপ্ত করার মাধ্যমেই শূন্যতাকে পাওয়া যাবে। হীনযানীদের এই পথ নিবৃত্তিমূলক শূন্যতার পথ—একধরনের আত্মকেন্দ্রিকতাই এর পরিণতি।

মহাযানীরা নির্বাণ লাভ করার সাধনার চেয়ে বুদ্ধত্বলাভের সাধনাকেই বড়ো করে দেখলেন। তাঁদের মতে বুদ্ধদেব ছিলেন করুণাঘনমূর্তি। বিশ্বের সমস্ত করুণা ঘনীভূত হয়েই যেন তাঁর জ্যোতির্ময় দিব্য দেহখানি গড়ে তুলেছিল। তাঁর এই করুণার ক্ষেত্র শুধু বিশ্বমানবের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, নিখিল জীবকোটির ভিতর নিঃসীমভাবে পরিব্যাপ্ত ছিল। মহাযানীরা তাই নির্বাণলাভের বিরোধী ছিলেন। তাঁদের আদর্শ ছিল এই নির্বাণলাভের উপযুক্ত হয়ে নির্বাণকে উপেক্ষা করতে হবে। দুঃখ-প্রপীড়িত প্রাণীদের জন্য কল্প-কল্পান্তর দেহধারণ করে বোধিসত্ত্বকে অবস্থান করতে হবে কুশল-কর্মের জন্য।

পরবর্তীকালে মহাযান ধর্মমতের মহা (বৃহৎ) যানে সমাজের সর্বস্তরের পারগামী লোকের স্থান করতে হল। মহাযান ধর্মমতের বিভিন্ন বিভাজনের মধ্যে প্রধান হয়ে উঠল নাগার্জুনের চতুষ্কোটি-বিনির্মুক্ত শূন্যতাবাদী মাধ্যমিকবাদ। এই তত্ত্ব অনুযায়ী পরমার্থতত্ত্বকে সত্য বলা যায় না, মিথ্যাও বলা যায় না, তদুভয়ও বলা যায় না—অনুভয়ও বলা যায় না ; তা আছে বলতে পারি না—নেইও বলতে পারি না—আছেও বটে নেইও বটে বলতে পারি না, আছে এবং নেই কোনোটাই সত্য নয় তাও বলতে পারি না। পরমার্থ সত্য এইভাবে চতুষ্কোটি-বিনির্মুক্ত—এবং যে তত্ত্ব চতুষ্কোটি-বিনির্মুক্ত তাই হল শূন্য।

তন্ত্র হিন্দু না বৌদ্ধ এই নিয়ে তর্ক প্রচলিত আছে। আমরা বলব তন্ত্র হিন্দুও নয়, বৌদ্ধও নয়। তন্ত্র এক বিশেষ দেহবাদী সাধনপদ্ধতি যা হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ করেছিল। অষ্টম-নবম শতাব্দী থেকেই মহাযানী বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে তন্ত্রের মিলনে বিভিন্ন তন্ত্রাশ্রিত বৌদ্ধযানের উদ্ভব হতে থাকে। হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত নেপাল, ভুটান, তিব্বত প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বাণিজ্য সূত্রেই হোক অথবা বাংলাদশের অনার্যগোষ্ঠীর প্রভাবেই হোক বাংলাদেশে এই সময় তন্ত্র বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিল।

বজ্রযানী সাধকরা তাঁদের যানে মন্ত্র, মুদ্রা, মণ্ডল ছাড়াও নানা প্রকার দেবদেবীর পূজাঅর্চনা, ধ্যানধারণা ও অন্যান্য গুহ্য তান্ত্রিক ক্রিয়ার প্রবর্তন করলেন। নেপালে তন্ত্রাশ্রিত বৌদ্ধধর্ম কালচক্রযান নামে পরিচিত হল। কালচক্রযানীরা শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কালচক্র অতিক্রম করতে চাইলেন।

বজ্রযানীরা মনে করতেন নির্বাণের পর তিনটি অবস্থা—শূন্য, বিজ্ঞান ও মহাসুখ। শূন্যতার পরমজ্ঞানকে তাঁরা বললেন নিরাত্মা এবং নিরাত্মা দেবীরূপে কল্পিত বলে তাঁর নামকরণ হল নৈরাত্মাদেবী। সাধকের বোধিচিত্ত যখন নিরাত্মায় বিলীন হয়ে যায় তখন জন্ম নেয় মহাসুখ।

বলাই বাহুল্য এই সাধনপদ্ধতি অত্যন্ত গুহ্য ও কঠিন। গুরু কৃপা ছাড়া এই পথে এগোনো যায় না। তাই বজ্রযানী সাধনপদ্ধতির অপরিহার্য অঙ্গ ছিল গুরু। গুরুরা সাধনমার্গের কোন্ পথে শিষ্যের স্বভাবগত প্রবণতা আছে সেইটা গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে তবে স্থির সিদ্ধান্তে আসতেন। এই বিচারপদ্ধতিকে বলা হত কুলনির্ণয় পদ্ধতি।

বৌদ্ধধর্মের এই বিভিন্ন শাখায় বিভাজনের বিষয়টিকে রেখাচিত্রে প্রকাশ করা যেতে পারে।

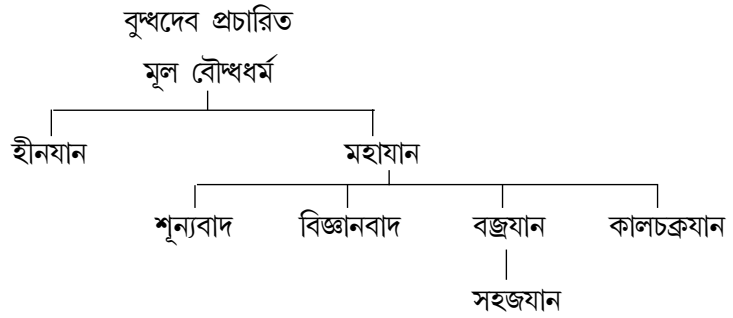

চর্যাকারগণ তাঁদের সাধ্যবস্তু বলে যে মহাসুখকে নির্দেশ করেছেন তাও কিন্তু ইতিবাচক ধারণা। এই ধারণার স্বরূপ বুঝে নেওয়ার জন্য 'সহজ' শব্দের ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

সহজ শব্দের সাধারণ অর্থ সোজা (easy)। বিশেষ অর্থ সহ জায়তে ইতি অর্থাৎ সহজাত। যে ধর্ম যে বস্তুর জন্ম থেকেই স্বত উৎপন্ন তাই তার সহ-জ। বৌদ্ধরা আত্মার অস্তিত্ব বিশ্বাস না করলেও ধর্মকায় বা তথতা থেকে উৎপন্ন বোধিচিত্তের কথা বলেছেন। ধর্মকায় নিত্য করুণাময় এবং আনন্দপূর্ণ। নিত্যত্ব, করুণা এবং আনন্দ বোধিচিত্তের সহজাত ধর্ম। বোধিচিত্তের ওই সহজাত ধর্ম অবলম্বন করে সাধনার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে বলে এ জাতীয় সাধকদের সহজ সাধক বলা হয়।

বিশেষ পারিভাষিক অর্থে সহজ বলতে বোঝায় 'স-হ-জ' অর্থাৎ 'স' আর 'হ' দুটি তত্ত্বের যুগনদ্ধ ফল। 'জ' বলতে বোঝায় যোগ বা মিলন। সরহ পাদের ক-খ দোহা অনুসারে 'স' হল প্রজ্ঞা বা শূন্যতা (স্ত্রীতত্ত্ব) এবং হ-এর অর্থ হল উপায় বা করুণা (পুরুষতত্ত্ব)। এই দুয়ের মিলনে সহজ মহাসুখ লাভ করা যায়—বোধিচিত্তের স্বরূপে স্থিত হওয়া যায়। পার্থিব সুখের মধ্যে নর-নারী মিলন সুখ যেহেতু সর্বোত্তম সেহেতু অনিঃশেষ মিলনসুখের উপমানে সহজ মহাসুখকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

অনেক চর্যাতেই সহজ মহাসুখের স্পষ্ট উল্লেখ আছে—

১) দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ (১নং)

২) বাটত মিলিল মহাসুহ সাঙ্গা (৮ নং)

৩) সহজানন্দ মহাসুহ লীলেঁ (২৭ নং)

৪) নিঅ পরিবারে মহাসুহে থাকিউ (৪৯ নং)

মহাযানীদের নির্বাণ যেমন অনির্বচনীয়, কায়বাকচিত্তের অতীত—তেমন সহজযানীদের নির্বাণজাত মহাসুখও অবাঙ্মনসোগোচর।

কাহ্নপাদ লিখেছেন 'ভণ কইসেঁ সহজ বোলবা জাঅ।/কাঅ বাক চিঅ জসুণ সমাঅ।।' কায়-বাক চিত্ত যখন এই সহজানন্দের স্তরে উপনীত হয় তখন বাক্যের দ্বারা এর স্বরূপ নির্ণয় কেমন করে সম্ভব? তাই শাস্ত্রজ্ঞান সহজ মহাসুখ লাভের অন্তরায়।

চর্যাকাররা এই সহজ মহাসুখের বিপ্রতীপে রেখেছেন ভ্রান্তিময় জগৎকে। ভুসুকু তাঁর পদে জানিয়ে দিয়েছেন 'আইএ অণুঅনা এ জগরে ভাংতিএঁ সো পড়িহাই'—আদিতে অনুৎপন্ন এ জগৎ ভ্রান্তিতে প্রতিভাত হয়। 'মরুমরীচি গন্ধনঅরী দাপণ পতিবিম্বু জইসা। / বাতাবত্তেঁ সো দিঢ় ভোইআ অপেঁ পাথর জইসা॥ / বান্ধিসুআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিধ খেলা। / বালুআ তেলেঁ সসর সিংগে আকাশ ফুলিলা॥ / রাউতু ভণই বাট ভুসুকু ভণই বাটসঅলা আইস সহাব।' মরুমরীচিকা, গন্ধর্বনগরী, দর্পণ-প্রতিবিম্ব, বায়ুর আবর্তে সুদৃঢ় হওয়া জল, বন্ধ্যাপুত্রের বহুবিধ খেলা, বালুকাতেল, শশকশৃঙ্গ, আকাশকুসুম এসবরে মতোই ভ্রান্ত ও অসম্ভব জগতের সব কিছু।

চর্যার সাধ্যবস্তুর আলোচনায় যে সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া যেতে পারে তা এবার সূত্রাকারে সাজিয়ে দেওয়া যেতে পারে :

১) চর্যাকারদের সাধ্যবস্তু সহজমহাসুখ মহাযানীদের নির্বাণের মতো অবাঙ্মনোগোচর হলেও তা ইতিবাচক ধারণা।

২) সাধারণ মানুষের পঞ্চস্কন্ধাত্মক দেহে স্থিত সংবৃত চিত্তে ভ্রান্তিবশত আদিতে অনুৎপন্ন এ জগৎ প্রতিভাত হয়। পঞ্চস্কন্ধের ধারণা আদি বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে চর্যাকারদের যোগ এবং আদিতে অনুৎপন্ন জগতের ধারণা বিজ্ঞানবাদীদের সঙ্গে চর্যাকারদের যোগ সূচিত করছে।

৩) সদ্‌গুরুর ইঙ্গিতে সাধক সংবৃত চিত্তকে সহজচিত্তে পরিণত করে স্বসংবেদ্য সহজমহাসুখ অনুভব করবেন।

কোন উপায়ে সেই সহজমহাসুখ অনুভব করা যাবে তা চর্যার সাধনতত্ত্বের অন্তর্গত। বলাই বাহুল্য চর্যার দেহবাদী সাধনতত্ত্বে তন্ত্রাচারের প্রভাব আছে। আমরা প্রথমে তত্ত্বগতভাবে সেই পদ্ধতির উল্লেখ করব।

আমরা আগেই বলেছি 'স-হ-জ' বলতে প্রজ্ঞা-উপায় বা শূন্যতা-করুণা (স্ত্রীতত্ত্ব ও পুরুষতত্ত্ব)-র মিলনকে বোঝায়। শূন্যতাকে বলা হয় 'প্রজ্ঞা' কারণ শূন্যতা জ্ঞানই তো হল প্রজ্ঞা। করুণাকে বলা হয় উপায় কারণ করুণাই বিশ্বজীবের মঙ্গালের উপায়। এই প্রজ্ঞোপায়ের মিলন হলে লাভ হয় বোধিচিত্ত। দর্শনের দিক থেকে শূন্যতাই হল গ্রাহক— principle of subjectivity; আর করুণা হল গ্রাহ্য— principle of objectivity; এই গ্রাহ্য-গ্রাহকত্বের দুটি প্রবহমানধারা নিঃশেষে বিলীন হয়ে যায় যে অদ্বয়তত্ত্বে সেই অদ্বয়তত্ত্বই হল বোধিচিত্ত—সহজস্বরূপ। যোগসাধনার দিক থেকে দেখা যাবে আমাদের দেহের মধ্যে তিনটি প্রধান নাড়ি আছে—একটি বামগা (শ্বাসবাহী নাড়ি) অপরটি হল দক্ষিণগা (প্রশ্বাসবাহী নাড়ি) এবং আরেকটি নাড়ি হল মধ্যগা। উভয় নাড়ির ক্রিয়া এবং ধারাকে অবলম্বন করে চলে সংসারগতি। এর একটি ভব (অস্তিত্ব) অপরটি নির্বাণ (অনস্তিত্ব), একটি সৃষ্টি অপরটি সংহার। একটি ইতি অপরটি নেতি। এই উভয় ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে তাদের স্বাভাবিক নিম্নগাধারাকে মদ্যগা পথে ঊর্ধ্বগা করতে পারলে অদ্বয় বোধিচিত্ত বা সহজানন্দ মহাসুখ লাভ হয়। বৌদ্ধতন্ত্রে এই নাড়িত্রয়ের নাম যথাক্রমে ললনা, রসনা ও অবধূতিকা। একটি চিত্রের সাহায্যে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে :

শূন্যতা ও করুণার মিলনে সাধক যে সহজানন্দ লাভ করেন তা হল চূড়ান্ত আনন্দ। সাধক বিভিন্ন আনন্দের স্তর অতিক্রম করে তবে সহজানন্দে উপনীত হন। এই সহজানন্দে উপনীত হওয়ার জন্য দক্ষিণা রসনা (পুরুষ স্বভাব) ও বামা ললনা (স্ত্রী স্বভাব) উভয়ের স্বাভাবিক নিম্নধারাকে নিয়ন্ত্রিত মধ্যগা অবধূতিকার মধ্যে ঊর্ধ্বগামী করলে সহজানন্দ লাভ করা যাবে।

ওপরের এই আলোচনা থেকে বোঝা গেল সহজ মহাসুখ সহজযানীদের সাধ্যবস্তু এবং তাদের সাধনপদ্ধতি তন্ত্রাশ্রিত। তাদের সাধ্যবস্তু সম্পর্কিত ধারণায় যেমন বিভিন্ন যানের ধারণা মিশে আছে তেমনই তাদের সাধন-পদ্ধতিতেও তন্ত্রাচার (শিব-শক্তি তত্ত্ব) বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল। তবু চর্যাকাররা ইঙ্গিতপ্রধান যে গীতিতে তাঁদের সাধন পদ্ধতি ও অনুভব তুলে ধরেছেন তার বিশিষ্টতা অস্বীকার করা যায় না।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'ভারতীয় সাধনার ঐক্য' গ্রন্থে চর্যাকারদের এই সাধনপন্থাকে উলটাসাধন বলেছেন। প্রাসঙ্গিক পদ উদ্ধার করে তিনি দেখিয়েছেন ভারতীয় সাধকদের মধ্যে এই উলটাসাধন—নিম্নগামী গতিকে ঊর্ধ্বগামী করা, বিরুদ্ধস্রোতে গমন—সুপ্রচলিত ছিল। চর্যাকারদের সাধনও এই ধারার অনুগামী। আবার বৈষ্ণব সহজিয়াগণ ও বাউলরাও এই উলটাসাধন করেন।

অধ্যায় সংক্ষেপ : চর্যাকারদের সাধ্যবস্তু ও সাধনতত্ত্ব সম্পর্কিত ধারণায় বিভিন্ন বৌদ্ধ যানের মতাদর্শ মিশে আছে। এই সাধনতত্ত্ব বিশেষ দেহজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। বামগা ও দক্ষিণগার নিম্নগতিকে মধ্যগায় বিভিন্ন চক্র ও পদ্মভেদে ঊর্ধ্বগা করে সহস্রারে স্থিতি দিতে পারলে সাধ্যবস্তু সহজ মহাসুখ লাভ করা যায়। তখন আস্বাদন ও আস্বাদকের ভেদ লুপ্ত হয়।

১.৮ চর্যার ভাষা

চর্যার ভাষা-সংক্রান্ত আলোচনাকে আমরা দুটি ভিন্ন শিরোনামে আলোচনা করব। প্রথমত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'The Origin and Development of the Bengali Language' গ্রন্থ অনুসারে বাংলা ভাষার প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে এর ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা সংক্ষেপে করব। পরে চর্যাগীতিতে ব্যবহৃত শব্দগুলির বাচ্যার্থ ও আভিপ্রায়িক অর্থ সংক্রান্ত আলোচনাও আমাদের বিবেচ্য হবে।

চর্যাপদের ভাষা যে বাংলা তার সপক্ষে আমরা ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক যুক্তিগুলি সংক্ষেপে তুলে ধরব। প্রথমে ধ্বনিতাত্ত্বিক যুক্তিসমূহ পেশ করা হল। এখানে মনে রাখতে হবে চর্যার ভাষা প্র--বাংলার উদাহরণ ; ফলে আধুনিক বাংলা ভাষার সঙ্গে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্যও থাকবে। ধ্বনিতাত্ত্বিক যুক্তি :

১) চর্যার অনেকস্থরে ই-কার আ-কারে পরিবর্তিত হয়েছে। দুই স্বরবর্ণের মধ্যে পরবর্তী স্বরটির য়-শ্রুতি অথবা ব-শ্রুতির আকার নেয়। অ কখনও ইঅ-এর মতো উচ্চারিত হয়। যেমন—

দুলি দুলিহ পিটা ধরণ ন জাই।

রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ॥ (২ নং চর্যা)

এখানে আকারের ই-শ্রুতি স্বাভাবিক।

২) চর্যায় হ্রস্বস্বর ও দীর্ঘস্বর নির্বিচারে ব্যবহৃত হয়েছে। চ্ছাড়ী (১৫ নং) চুম্বী (৪ নং)-র ক্ষেত্রে দীর্ঘস্বর অনাবশ্যক। আবার ঋজু>উজূ (১৫ নং) এবং উজু (৩২ নং) অর্থাৎ হ্রস্ব এবং দীর্ঘ দুটি রূপ দেখা যাচ্ছে। বর্তমান বাংলাতেও হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণের বিভিন্নতা রক্ষিত হয় না।

৩) বাঙলায় বিভিন্ন জ, ন, ব ও স-এর উচ্চারণে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। চর্যার আদর্শ পুথি লিখিত হওয়ার সময় এই উচ্চারণ-বিভিন্নতা লুপ্ত হয়ে গেছিল। যথা মণ (২০ নং) মন (৩০ নং)। ৫০ সংখ্যক চর্যাতে শবর ও সবরালী একসঙ্গে রয়েছে।

রূপতাত্ত্বিক যুক্তি :

১) বচন

ক) আধুনিক বাংলা ভাষায় কোনো কোনো কারকে একবচনে কোনো বিভক্তি ব্যবহৃত হয় না। চর্যা থেকে এরূপ উদাহরণ দাখিল করা যায়। কর্তৃকারকে—কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল (১)

খ. বহুবচন বোঝানোর জন্য আধুনিক বাংলার মতো বহুত্ববোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়। সঅল সমাহিঅ (১)

গ. সংখ্যাবাচক শব্দদ্বারা বহুবচন—পঞ্চবি ডাল (১)

ঘ. বিশেষণ পদ দু বার ব্যবহার করে বহুবচন—উঁচা উঁচা পাবত (২৮)

২) লিঙ্গ—আধুনিক বাংলায় সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী লিঙ্গ ব্যবহারের কঠোরতা না থাকলেও অপভ্রংশের প্রভাবে 'চর্যাগীতি' ও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ এই নিয়ম রক্ষিত হয়েছে। পরে লোপ পেয়েছে। চর্যায় নিসি অন্ধারী, (বিশেষণে স্ত্রী লিঙ্গাত্মক প্রত্যয়), হরিণা, শবরা (জাতিবাচক হলে পুরুষ জাতীয় অর্থে আ প্রত্যয়) ইত্যাদি রূপ দেখা যায়।

৩) সমাজ—প্রায় সবরকম সমাসের দৃষ্টান্তই চর্যায় পাওয়া যায়।

দ্বন্দ্ব : চান্দসুজ, বামদাহিন

রূপক : ভবজলধি, ভবণই

কর্মধারয় : ভাগতরঙ্গ, মহাসুহ

তৎপুরুষ : কমলরস, আসবমাতা

বহুব্রীহি : খমণভতারি, সপরবিভাগা

চর্যায় ভাষা যে বাংলা এ বিষয়ে চারটি বড়ো প্রমাণ হল :

১. ল, —ইল যোগ করে অতীতকাল গঠন। যেমন, 'চলিল কাহ্ন মহাসুহ সাঙ্গো।'

২. ব, —ইব যোগে ভবিষ্যৎ কাল গঠন। যেমন, 'জই তুম্হে লোঅ হে হইব পারগামী।'

৩. 'র' যোগে ষষ্ঠী। যেমনস, 'রুখের তেন্তুলি কুম্ভীরে খাঅ'।

৪. প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার। যেমন, 'অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।'

খ. বিশ শতকে চর্যাগীতিগুলি ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ব্যাকরণ চর্চার উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হলেও মুনিদত্ত এর টীকা রচনা করেছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। চর্যার শ্রোতা পাঠকেরা যাতে এই গীতিগুলির অর্থভেদ করতে পারেন তার জন্য মুনিদত্ত টীকা রচনা করছেন। চর্যাগীতি-ব্যবহৃত শব্দগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাচ্যার্থে ব্যবহৃত হয়নি আভিপ্রায়িক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই আভিপ্রায়িক অর্থ বুঝতে গেলে মুনিদত্তের টীকাটি অনুসরণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। বিষয়টি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

যেমন ৬ নং চর্যাটি সরলার্থে পাঠ করলে মনে হবে হরিণ শিকারের বৃত্তান্তই এখানে মুখ্য। বিবরণটিও মনোগ্রাহী। চর্যাকার কিন্তু এই সরলার্থটুকুই তুলে ধরতে চাইছেন না—হরিণ শব্দটিকে তিনি তাত্ত্বিক অর্থে প্রয়োগ করেছেন। এই ভিন্ন তাত্ত্বিক অর্থটিই আভিপ্রায়িক অর্থ। অবশ্য বিশেষ অভিপ্রায়ে ব্যবহৃত সমস্ত শব্দই সম-মর্যাদা সম্পন্ন নয়। মুনিদত্ত আভিপ্রায়িক অর্থে ব্যবহৃত শব্দগুলির কোনো কোনোটিকে সন্ধ্যাশব্দ বলেছেন। মুনিদত্তের টীকায় 'সন্ধ্যাভাষয়া প্রকটয়িতুমাহু' বা 'সন্ধ্যাভাষয়া প্রতিপাদয়তি' জাতীয় উল্লেখ পাওয়া যাবে।

'সন্ধ্যা' শব্দটির বানান, ব্যুৎপত্তি ও অর্থ নিয়ে বিতর্ক আছে। মহাযান শাস্ত্র ও ভাষ্যে সর্বত্র 'সন্ধ্যা' বানান লেখা হলেও বিধুশেখর শাস্ত্রী এটি ভুল বলে মনে করেন। তিনি সমু ধ্যৈ ধাতুর পরিবর্তে 'সম-ধা' থেকে শব্দটি নিষ্পন্ন বলে মনে করেন। তাঁর মতে শব্দটি 'সন্ধ্যা' নয় 'সন্ধা'। প্রবোধচন্দ্র বাগচীও 'সন্ধা' মতাবলম্বী। কিন্তু শব্দটির সঙ্গে 'ধ্যৈ' বা ধ্যানের যোগ আছে বলে অনেকেই মনে করেন।

'শব্দকল্পদ্রুম'-এ 'সন্ধ্যা' ও 'সন্ধা' ভিন্ন ব্যুৎপত্তিসঞ্জাত একথা স্বীকৃত হলেও একটি আরেকটির প্রতিশব্দ হিসেবে গৃহীত। 'সন্ধি' শব্দের সঙ্গে দুয়ের যোগ আছে। 'সন্ধি'র অর্থ হল শ্লেষ বা মিলন। 'সন্ধ্যা' ভাষার ভিতরেও যুগনদ্ধ তত্ত্বের মতো দুটি অর্থের শ্লেষ বর্তমান। একটি আভিধানিক, অন্যটি আভিপ্রায়িক। 'সন্ধ্যা' শব্দের বাচ্যার্থ সকলের কাছে স্পষ্ট, লক্ষণার্থ 'বিরলে বুঝই'। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একে 'আলো আঁধারি' ভাষা বলেছেন। বুর্নফ-এর মতে এ হল 'ভাষা প্রহেলী'।

মুনিদত্তের টীকা অনুসরণ করলে অবশ্য 'সন্ধ্যা' শব্দের অর্থ বোঝা সম্ভব। নীচে কয়েকটি 'সন্ধ্যা' শব্দের দুটি করে অর্থ প্রদান করা হল।

কমল কুলিশ—তন্ত্রার্থ পদ্ম-বজ্র, চর্যার্থ প্রজ্ঞা-উপায়

ধমণ চমণ—শ্বাস-প্রশ্বাস, চর্যার্থ আলি-কালি

জোইনি—যোগিনী, চর্যার্থ নৈরাত্মা বা জ্ঞানমুদ্রা

চর্যাগীতিতে আরেক রকম দ্ব্যর্থক শব্দ পাওয়া যায়। এই শব্দগুলি পরিচিত লোকজীবনের থেকে সংগৃহীত হলেও চর্যায় এগুলি ভিন্নার্থে ব্যবহৃত। আভিপ্রায়িক অর্থসমন্বিত হলেও টীকাকার এগুলিকে 'সন্ধ্যা' শব্দ হিসেবে চিহ্নিত করেননি। নীচে এরকম কয়েকটি আভিপ্রায়িক শব্দ ও তাদের দুই অর্থ প্রদান করা হল।

শুণ্ডিনি—মদ্য ব্যবসায়িনী, অবধূতিকা

কাচ্ছি—রজ্জু, অবিদ্যাসূত্র

খুণ্টি—খুঁটি, আভাষদোষ

অধ্যায় সংক্ষেপ : বিশ শতকে ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সূত্রে চর্যাগীতির শব্দাবলির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে এগুলিকে প্র- বাংলার নিদর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। চর্যার অব্যবহতি পরবর্তী সমকালে অবশ্য সাধনতত্ত্বের সূত্রেই শব্দার্থের টীকা-ব্যাখ্যা প্রদান করা হত। সাধারণ শব্দের পাশাপাশি চর্যায় বহু দ্ব্যর্থক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এই অভিপ্রায়িক শব্দসমূহের মধ্যে কোনো কোনোটিকে টীকাকার মুনিদত্ত 'সন্ধ্যা' শব্দ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

১.৯ চর্যার সাহিত্যমূল্য

চর্যার সাহিত্যমূল্য বিচার করতে গেলে প্রথমেই আমাদের কতগুলি তাত্ত্বিক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। প্রথম প্রশ্ন হল যদি মেনে নেওয়া হয় গূঢ়ার্থব্যঞ্জক ভাষায় বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের আচরণীয় ও অনাচরণীয় কৃত্যের নির্দেশ প্রদানই এই গীতিগুলির উদ্দেশ্য ছিল এবং সীমিত সমমনস্ক সাধকগোষ্ঠীর মধ্যেই এগুলি প্রচলিত ছিল তাহলে ব্যাপক অর্থে এর সাহিত্য মূল্য বিচার করা সংগত কি না ? এর উত্তরে বলা চলে চর্যাগুলি সমকালে কেমন করে আস্বাদন করা হত তার কোনা পাথুরে প্রমাণ নেই। তবে চর্যাগীতির আবিষ্কারক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বৌদ্ধধর্মের কূটতাত্ত্বিকতার বাইরে সাহিত্য হিসেবেই যে এগুলি আস্বাদন করতে চেয়েছিলেন তার চমৎকার পরোক্ষ প্রমাণ 'বেনের মেয়ে' উপন্যাস থেকে দেওয়া সম্ভব।

'বেনের মেয়ে' উপন্যাসে শাস্ত্রীমশাই রাজপৃষ্ঠপোষণায় অনুষ্ঠিত এক কবি-সভার বিবরণ দাখিল করেছেন।

সেই কবি-সভায় সংস্কৃত ও প্রাকৃত কবিতার পর চাটিলপাদ, বীণাপাদ ও সরহপাদ কবিতা পড়েছেন। উপন্যাসের কথক জানিয়েছেন, 'সেকালে একটা কথা উঠিয়াছিল যে, ছয়টা ভাষায় কবিতা লিখিতে না পারিলে, সে মহাকবি হইতেই পারে না। তাই যাহারা শুধু বাংলাতেই কবিতা লিখিত, তাহাদের কবি না বলিয়া পদকর্তা বলা হইত।' কথক এই তথ্য উল্লেখ করেছেন মাত্র। তারপরে তাঁর বাচনে যে কবি-সভার বিবরণ রয়েছে তাতে বাংলা ভাষায় কবিতা পাঠের ফলে 'জয় জয় শব্দে সভাস্থল ভরিয়া গেল।' কথকের উদ্দেশ্য এখানে স্পষ্ট। বাংলা ভাষা সাহিত্যের আত্মপ্রকাশক হিসেবে চর্যাগীতিগুলিকে তিনি তুলে ধরতে চান। গূঢ় আধ্যাত্মিক মূল্য যাই হোক না কেন এগুলির সাহিত্যমূল্য সম্বন্ধে শাস্ত্রীমশাই নির্দ্বিধ। এখানে উপন্যাসে শাস্ত্রীমশাই তাঁর কল্পনায় চর্যাকারদের রঞ্জিত করছেন। ধর্মসাধনার গূঢ়তত্ত্বের পরিবর্তে কাব্যরসাস্বাদনের আনন্দই যেন শাস্ত্রী মশাইয়ের কাছে মুখ্য।

শাস্ত্রীমশাইয়ের এই অভিপ্রায়কে আমরা তত্ত্বের অন্য কাঠামো দিয়েও সমর্থন করতে পারি। রোলান্ড বার্থ (Roland Barthes) তাঁর 'The Death of the Author' প্রবন্ধে দেখিয়েছিলেন প্রতি মুহূর্তে রচনাটি (text) কেমন করে রচয়িতার (author) কর্তৃত্বের বাইরে চলে যাচ্ছে। এক্ষেত্রেও বলা চলে চর্যাকাররা যে উদ্দেশ্যেই গীতিগুলি রচনা ও আস্বাদন করুন না কেন ক্রমশই পদগুলি তাঁদের সেই আভিপ্রায়িকতা অতিক্রম করে স্বাধীন আস্বাদনের বিষয় হয়ে উঠেছে। এই পদগুলির মধ্যে এমন উপাদান ছিল যার সাপেক্ষে আস্বাদনের ভিন্নতর এক জগৎ নির্মাণ সম্ভব। এই গীতিগুলির সাহিত্যমূল্য বিচারের সময় এই কথাগুলি স্মরণ রাখা প্রয়োজন। সাহিত্যমূল্য বিচারের জন্য আমরা কতগুলি সূত্রের উল্লেখ করব মাত্র।

ক. চর্যাগীতিগুলি পাঠ করলে দেখা যাবে চর্যারচয়িতারা তাঁদের পদগুলিতে সাধারণ জীবনের নানা তথ্য প্রয়োগ করেছেন। এই তথ্য বিবৃতিমাত্র নয়, জীবন সম্বন্ধে গভীর সমবেদনাই এর মধ্যে ধরা পড়েছে। ফলে সাধারণ পাঠক আভিপ্রায়িক অর্থ বাদ দিয়ে গীতিগুলি পাঠ করলে অন্য সাহিত্যধারার মতোই জীবনযাত্রার নানা মনোগ্রাহী চিত্র লাভ করেন। উদাহরণ দাখিল করা যেতে পারে।

২নং চর্যায় যে বউটির কথা আছে সে দিনের বেলায় ভীত অথচ রাত্রি বেলায় কামমত্ত হয়। এই অংশটির আভিপ্রায়িক অর্থ যাই হোক না কেন বধূর কপটতার বিবরণ কৌতুকবাহী।

খ. তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা' পুস্তকে চর্যাপদের মধ্যে লিরিকের (lyric) বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেয়েছেন। চর্যাগীতিগুলিকে আধুনিক অর্থে পুরোপুরি লিরিক হয়তো বলা যাবে না। অবশ্য যদি মনের আবেগের (emotion) স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ গীতিকবিতার (lyric) অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয় তাহলে কোনো কোনো চর্যাকে গীতিকবিতা বলা যেতেই পারে। কাহ্নপাদের লেখা ১০ নং চর্যায় আছে 'আলো ডোম্বি তোএ সম করবি ম সাঙ্গ / নিঘিন কাহ্ন কাপালি জোই লাগ' মনীন্দ্রমোহন বসু এর ভাবানুবাদ করেছেন : 'ডোম্বি, তোর সহ আমি করিবই সঙ্গ। / কানু যে কাপালী যোগী নির্ঘৃণ উলঙ্গ।' পঙ্‌ক্তিদুটি সরলার্থেই তীব্র আবেগপূর্ণ প্রেমের বাচন হিসেবে গৃহীত হতে পারে—আধুনিক অর্থে একে লিরিক বলতেও আপত্তি নেই।

গ. হরিণ বিষয়ক চর্যায় হরিণের ওপরে সরলার্থে মানবত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে 'অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী' এই পঙ্‌ক্তিটি গূঢ়ার্থে নয় সরলার্থেই প্রবচন হয়ে উঠেছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পাওয়া যাবে 'আপনার মাসে হরিণী জগতের বৈরী' পঙ্‌ক্তিটি। রাধা কৃষ্ণের আচরণে বিব্রত, বিচলিত। অসহায়া নারী হিসেবে পুরুষের এই আচরণ তাকে সহ্য করতে হচ্ছে এই প্রেক্ষিতে সম্প্রসারিত অর্থে চর্যার পঙ্‌ক্তিটি ব্যবহৃত। চর্যার কাব্যমূল্য যথেষ্ট বলেই এ জাতীয় সম্প্রসারণ সম্ভব।

ঘ. কোনো কোনো চর্যা প্রায় ছোটো গল্পের আদলে রচিত। নাটকীয়তার চমৎকার নির্দশন সেখানে পাওয়া যাবে। হরিণ বিষয়ক চর্যাটি নাটকীয়। ভুসুকু পাদের রচিত ২১ নং চর্যায় আছে এক ছটফটে ইঁদুরের কথা। সরলার্থে পড়লে মনে হবে ইঁদুরটি ধরা না দিয়ে কেমন করে ভুসুকুকে নাকাল করছে তারই রংদার গল্প যেন পরিবেশিত হল।

ঙ. চর্যায় সমাজজীবনের নানা ছবি আছে। কেন্দ্রীয় ও প্রান্তিক সমাজের এই ছবি জীবনবোধ জারিত। প্রকাশের ভাষাটিও প্রত্যক্ষ অথচ তার মধ্যে নিছক বিবৃতিমাত্র নেই। ঢেন্ঢণপাদের চর্যায় আছে প্রতিবেশীবিহীন টিলাবাসীর কথা। একাকীত্বের বেদনা পাঠকচিত্তকেও জারিত করে। ভাষা এখানে চিত্ররূপময়।

অধ্যায় সংক্ষেপ : চর্যা দেহতত্ত্বের গান হিসেবে রচিত ও প্রচারিত হলেও আমরা পাঠকেরা সেই মর্মে এই পদগুলিকে নাও পড়তে পারি। গীতিগুলির মধ্যে এমন উপাদান আছে যা আধ্যাত্মিক গূঢ়ার্থকে অতিক্রম করে নিছক কাব্য হিসেবে পাঠ করার জন্য পাঠককে আকর্ষণ করে। এ বিষয়ে বিশ্লেষণাত্মক উদাহরণ পেশ করা হয়েছে।

চর্যাপদের সমাজ :

উনিশ শতকে ইতিহাস বিদ্যাচর্চার জন্ম হল। এই বিদ্যাচর্চার অনুষঙ্গে জাতীয়াতাবাদী আবেগের বশবর্তী হয়ে বাঙালি তার অতীত সামাজিক ইতিহাসের অনুসন্ধানে ব্রতী হল। এই সামাজিক ইতিহাস রচনার অন্যতম উপাদান সাহিত্য। তবে মনে রাখতে হবে সাহিত্য তো আর পাথুরে প্রমাণ নয় তাই সাহিত্য-উপাদান থেকে সমাজ-ইতিহাসের নানা আনুমানিক প্রবণতাকে আমরা স্পর্শ করতে পারি মাত্র।

চর্যার পদগুলিতে যে সমাজের চেহারা আমরা পাই তা বঙ্গভাষী সমাজ—বাঙালি সমাজ বলা অনুচিত। কারণ বাঙালি ও বাঙালিয়ানা এই ভাষা-জাতি সত্তার জন্ম তখনো হয়নি। আর একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। বর্তমানে আমরা বঙ্গভূমি বলতে যে ভৌগোলিক অঞ্চলকে বুঝি চর্যাপদের সময় বঙ্গভূমি বলতে সেই ভৌগোলিক অঞ্চলটিকে বোঝাত না—আরও বিস্তৃত ভূভাগকে বোঝাত। সুতরাং চর্যাপদের বর্ণনাভূত অঞ্চলটি ঠিক এখানকার বঙ্গভূমি নয়।

সামাজিক নানা বৃত্তান্তই চর্যায় পাওয়া যায়। আমরা তার সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা প্রদান করছি মাত্র—

ক. বেশভূষা : উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসবই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী॥ (২৮)

[শবরবালা পরেছে ময়ূরের পাখ, গলায় তার গুঞ্জ মালা]

খ. বিনোদন : নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী। বুধ্ধ নাটক বিষমা হোই।

[নৃত্যগীত নাটক এসব ছিল অন্যতম বিনোদন]

গ. ব্যবহৃত দ্রব্য : পিটা (দুগ্ধ দোহনপাত্র), ঘড়ি (ঘড়া) ; ঘড়ুলি (গাড়ু)।

ঘ. ভূষণ : কাণেট (কর্ণভূষণ), ঘন্টানেউর (নূপুর)।

ঙ. দারিদ্র : হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী (৩৩)।

চ. অস্পশ্যতা : নগর বাহিরি রেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ (১০)।

জ. নৈতিকতা : চর্যায় আছে পরকীয় প্রেমমত্ত বধূর কথা। যথা
দিবসই বহুড়ী কাউই ডরে ভাঅ
রাতি ভইলেঁ কামরু জাঅ॥ (২)

এই তালিকাটি দীর্ঘতর করা সম্ভব। কিন্তু তালিকা দীর্ঘ না করে একটি তাত্ত্বিক প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া দরকার। পাঠ্যগুলির প্রেক্ষিত (context) বিচার না করে শুধু সমাজচিত্র হিসেবে সাধারণীকরণ করলে বিপদ হবে। যেমন ২ নং চর্যায় আছে দ্বিচারী বধূর কথা। এবার যদি মনে করা হয় যে সেই সমাজে দাম্পত্যজীবন

ছিল শিথিল, যেমন ছিল আভির উপজাতির সমাজে, তাহলে তা সাধারণীকরণ হবে। কারণ চর্যাকারেরা বিশেষ তাত্ত্বিক ভাবনা প্রকাশের জন্য রূপক নির্মাণার্থে এই উদাহরণটি চয়ন করেছিলেন। এর থেকে সেই সমাজে যৌন শিথিলতা ছিল সাধারণ ঘটনা একথা বলা যাবে না। অর্থাৎ ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ করতে গেলেও পাঠ্যের পরেক্ষিতটি আমাদের স্মরণে রাখতে হবে।

দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই।
রুখের তেন্তুলি কুম্ভীরে খাঅ॥
আঙ্গান ঘরপণ সুন ভো বিআতী।
কাণেট চৌরি নিল অধরাতী॥
সসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।
কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ॥
দিবসই বহুড়ী কাউই ডরে ভাঅ।
রাতি ভইরে কামরু জাঅ॥
অইসনি চর্য্যা কুক্কুরী পাএঁ গাইউ।
কৌড়ি মঝেঁ একু হিঅহি সমহিউ॥ (২)

সরলার্থ : মাদি কচ্ছপকে দোহন করে দুগ্ধপাত্রে দুধ ধরে না। গাছের তেঁতুল কুমীরে খায়। হে প্রসূতি, শোন, আঙিনাকে ঘরে প্রবেশ করাও। মধ্যরাত্রে চোর কর্ণভূষণ চুরি করল। শ্বশুরকে ঘুম পাড়িয়ে বধূটি জাগে। চোর কানেট নিল, কোথায় গিয়ে চাওয়া যায় ? দিনের বেলা বউটি ছায়া পুরুষে ভয় পায়। রাতে কামনগরে যায়। কুক্কুরীপাদ এই চর্যা গান করেন, কোটির মধ্যে গুটিকে তা বোঝে।

অন্যান্য মন্তব্য : শাস্ত্রী আবিষ্কৃত 'চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়'-এ কুক্কুরীপাদের রচিত দুটি চর্যা আছে (২, ২০)। আর একটি চর্যা (৪৮) ছিন্ন। দুটি চর্যাই গূঢ়ার্থ বোধক। আপাত অসম্ভব কিছু ভাষণ রয়েছে, নিহিতার্থে তার অন্যতর গুরুত্ব আছে। দুশ্চরিত্রা নারীর চিত্রটি মনোগ্রাহী।

গূঢ়ার্থ : দুলি 'সন্ধ্যা' শব্দ। সাধারণ অর্থ স্ত্রী কচ্ছপ, গূঢ়ার্থ নৈরাত্মাদেবী। নৈরাত্মাদেবীর সঙ্গে বজ্রচিত্তের মিলনে বোধিচিত্তের জন্ম হচ্ছে ও বোধিচিত্ত নির্মাণকায়ে নেমে বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে। এটি দুলির দুগ্ধ দোহন। এরপরে আছে গাছের তেঁতুল কুমীর খায়। কুমীর অর্থাৎ কুম্ভক সমাধি। ইন্দ্রিয় নিরোধক এই সমাধির যোগে বোধিচিত্তকে নিঃস্বভাবীকৃত করা হচ্ছে। ঘরের অর্থাৎ দেহের মধ্যেই রয়েছে সহজানন্দের উন্মুক্ত আঙিনা। বধূ অর্থাৎ পরিশুদ্ধা অবধূতিকা। তার কানের অলংকার চোরে নিল অর্থাৎ প্রকৃতি দোষ হরণ করল সহজানন্দ। অপরিশুদ্ধা অবধূতিকা কালের ছায়া দেখে ভয় পায় এবং অপরিশুদ্ধা পরিশুদ্ধা হয়ে সময়কে অতিক্রম করে সহজানন্দে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করে। শ্বশুর অর্থাৎ শ্বাসবায়ু স্তব্ধ হলে অবধূতিকা জাগে।

কাহেরে ঘিণি মেলি অচ্ছহু কীস।... ভুসুকু ভণই মূঢ়া হিঅহি ন পইসঅ। (৬)

সরলার্থ : কাকে ছেড়ে কাকে নিয়ে কেমন আছ ? চারদিকে বেড়া ডাক পড়ছে। নিজের মাংসের জন্য হরিণা নিজের বৈরী। ভুসুকু ব্যাধ তাকে মুহূর্তের জন্য ছাড়ে না। হরিণ ঘাস ছোঁয় না, জল খায় না। হরিণীর নিবাসস্থল সে জানে না। হরিণী বলল, হরিণা এ বন ত্যাগ কর। তরঙ্গাগতি হরিণের খুর দেখা যায় না। ভুসুকু বলেন মূঢ়ের হৃদয়ে প্রবেশ করে না।

অন্যান্য মন্তব্য : চিত্তাকর্ষক পশুকথার রূপকে ভুসুকু গূঢ়ার্থ পেশ করেছেন। এখানে যেন হরিণ ও হরিণাকে মানবায়িত করা হয়েছে।

নিহিতার্থ : চঞ্চল হরিণ হল সাংবৃতিক চিত্ত। হরিণী হল ভাবগ্রহ হরণকারী ধর্মমুদ্রা। হরিণরূপ সাংবৃতিক চিত্তের চতুর্দিকে কালরূপ শিকারীর মারণ-হুংকার যখন পরিব্যাপ্ত তখন সেই অবস্থায় নৈরাত্মাকে গ্রহণ করে কীভাবে সে মুক্তি পেল এই চর্যায় সেই বিবরণ বর্তমান।

অবিদ্যা প্রভাবিত চিত্তকে ভুসুকু গুরু বচনরূপ বাণদ্বারা প্রহার করেন। প্রহারে প্রবুদ্ধচিত্ত পারমার্থিক সহজরূপ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে এবং পানাহার রূপ জাগতিক ভোগ ত্যাগ করে হরিণীরূপ নৈরাত্মার কাছে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়। নৈরাত্মার আহ্বানে তীব্র গতিতে অবধূতী মার্গে চিত্তের ঊর্ধ্বায়ন হয়, তখন আর সাংবৃতিক রূপ দেখা যায় না।

সোনে ভরিতী করুণা নাবী।... বাটত মিলিল মহাসুহসঙ্গা। (৮)

সরলার্থ : সোনায় পরিপূর্ণ করুণা নৌকা। রুপো রাখার ঠাঁই নেই। শূন্য আনন্দ সমুদ্রের দিকে বয়ে চলল, যাতে ফিরে আসতে না হয়। খুঁটি উপড়ে কাছি খোলা হল। পাকা ওস্তাদের পরামর্শ নিয়ে বয়ে চল। পথ চলার সময় চারিদিক দেখে নাও। কোড়ুয়াল ছাড়া কি নৌকা বাওয়া যায় ? বাম দক্ষিণ চেপে মার্গপথে চলতে চলতেই মহাসুখের সঙ্গা মিলল।

অন্যান্য মন্তব্য : নৌ-যাত্রার চিত্রটি প্রমাণ করে যে ভূমিভাগে চর্যাকার বসবাস করতেন সেই ভূমি-ভাগটি নদীবহুল। বাংলা কবিতায় নৌ-যাত্রার চিত্র রূপকার্থে বহু ব্যবহৃত। এই চর্যাটি সেই ধারারই যেন অন্যতম আদি নিদর্শন।

নিহিতার্থ : শূন্যতার দ্বারা করুণার নৌকা পূর্ণ হয়েছে অর্থাৎ প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলন হয়েছে। ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়জ্ঞান না থাকায় মিথ্যা রূপজ্ঞানও বিলুপ্ত হল। এই অবস্থায় সর্বশূন্যরূপ গগনের দিকে যাত্রা করলে পুনর্জন্ম রহিত নির্বাণ লাভ হয়। এই নৌচালনা অর্থাৎ শূন্যতাভিমুখী যাত্রার উপায় আভাস দোষ (খুঁটি) ও শাস্ত্রজ্ঞান (কাছি) ত্যাগি। এরপর সদ্‌গুরুর উপদেশ অনুযায়ী (কোড়ুয়াল) সতর্ক হয়ে চিত্ত-নৌকা চালনা করতে হবে। গুরুবচন গ্রহণ করে বামগা ও দক্ষিণগা নাড়িদ্বয়কে একত্র করে মদ্যগা নাড়িতে মিলিত করলে বিরমানন্দের পথে মহাসুখের সঙ্গা লাভ করা যায়।

নগর বাহিরি রেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ...মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ। (১০)

সরলার্থ : নগরের বাইরে ডোমনি তোর কুড়ে। তুই বড়ু ব্রাহ্মণের ছোঁয়া এড়িয়ে যাস। ও ডোম্বি, নির্ঘৃণ লেংটা কাপালি যোগী আমি কাহ্ন তোর সঙ্গে মিলিত হব। চৌষট্টি পাঁপড়ি বিশিষ্ট পদ্মে বাউলি ডোম্বি নাচে। ও ডোমনি, তোকে ভালো কথায় শুধোই কার নৌকায় তোর আসা-যাওয়া। যোমনি তুই চাঙ্গারি বেচিস। তোর জন্য আমিও নটসজ্জা ত্যাগ করেছি। তুই ডোম্বি আমি কাপালি। তোর জন্য আমি হাড়ের মালা পরেছি। সরোবর সেঁচে ডোম্বি মৃণাল খায়, আমি ডোম্বিকে মারব তার প্রাণ নেব।

অন্যান্য মন্তব্য : পুরুষ প্রেমিকের সুতীব্র বাচন হিসেবে চর্যাটি পড়া যেতে পারে। পদ্মের ওপরে নৃত্যের অনুরূপ চিত্র আছে দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গালের বণিকখণ্ডে, কমলেকামিনী বৃত্তান্তে। গলায় হাড়-মালা অনুরূপ বৃত্তান্ত পাওয়া যাবে সহজিয়া বৈষ্ণব পুঁতি 'আনন্দভৈরব'-এ।

নিহিতার্থ : পরিশুদ্ধাবধূতী নৈরাত্মার সঙ্গে কাপালিক কাহ্নের লীলাই এই গানের মুখ্য বিষয়। দেহনগরীর

বাইরে নৈরাত্মার অধিষ্ঠান। শাস্ত্রাভিমানী যোগীদের চপলচিত্ত নৈরাত্মার আভাস পায় মাত্র কিন্তু তাকে অধিকার করতে পারে না। নৈরাত্মা ইন্দ্রিয়ের অনধিগম্য বলেই কাহ্ন ঘৃণালজ্জাদোষরহিত হয়ে নৈরাত্মার সঙ্গে মিলনে উৎসুক। কাহ্ন পরিশুদ্ধাবধূতি মার্গে আরূঢ় হওয়ায় তাঁর নির্মাণচক্রে কল্পিত নাভিকমলে বোধিচিত্তের জাগরণ ঘটেছে। নৈরাত্মার অতীন্দ্রিয় স্বরূপ উপলব্ধি করে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে সে সংবৃতিবোধিচিত্তরূপ নৌকায় যাতায়াত করে কিনা। সংসার-রূপ নটসজ্জা ত্যাগ করে কাহ্ন চিত্ত শুদ্ধ করেছেন। মৃত ব্যক্তির মতো নির্বিকার চিত্তে হাড়ের মালা পরেছেন। অপরিশুদ্ধাবধূতী কায়রূপ সরোবর ভেঙে মৃণালরূপ বোধিচিত্তকে ভক্ষণ করে। এ অবস্থায় অবিদ্যা নাশ হয় না। তাই তিনি নৈরাত্মাকে মারতে অর্থাৎ নিঃস্বভাবীকৃত করতে চান।

সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।... বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই। (১৭)

সরলার্থ : সূর্য লাউ আর তন্ত্রী হল শশী। দুইকে অবধূতীর সঙ্গে এবার করে অনাহত দাঁড়ায় লাগানো হল। হে সখি, হেরুক বীণা বাজে। করুণা শূন্যতা নাদে বিলাস করে। সারি গণনা করে বীণায় লগ্ন কড়ে আঙুলকে হাতের আংটায় চাপা হলে বত্রিশ তারের অনুরণন সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়। বজ্রধর নৃত্য করেন, গান করেন দেবী। বুদ্ধ নাটক শান্তিপ্রদ হয়ে ওঠে।

অন্যান্য মন্তব্য : চর্যাটি প্রমাণ করে নাঠ্যধারার প্রাচীনতা, সমাজে নৃত্য-গীতের পরম্পরাও ছিল। অন্যান্য ধর্মেও নাদ ও সুর বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

নিহিতার্থ : হেরুকযোগে সাধনা করলে সহজানন্দ পাওয়া যায়। কমল-কুলিশ যোগে (চন্দ্র সূর্য) প্রভাস্বর চিত্ত সহজসুখ। শূন্যতা শব্দতরঙ্গে সেই সুখের ব্যাপ্তি। এই সুখে মুদিত হয়ে বজ্রধর নৃত্য করেন গান করেন নৈরাত্মা। নির্বাণ প্রদায়ী শান্তি প্রাপ্তি হয়।

নিসিঅ অন্ধারী মুসার চারা।... ভুসুকু ভণঅ তবেঁ বান্ধন ফিটঅ। (২১)

সরলার্থ : অন্ধকার রাত্রি। ঘরে ইঁদুরের চলাফেরা। মূষিক মিষ্টদ্রব্য ভক্ষণ করে। হে যোগি চঞ্চল মূষিক পবনকে মার, যাতে তার আনাগোনা বন্ধ হয়। সে মাটি তোলে, গর্ত করে। চঞ্চল মূষিককে নাশের ব্যবস্থা কর। কালো বলে বর্ণ বোঝা যায় না, শূন্যে উধাও হয়। পাকা লোকের উপদেশে তাকে নিশ্চল কর। যখন ইঁদুরের নড়াচড়া বন্ধ হয়, ভুসুকু বলেন তখন ভববন্ধন ঘোচে।

অন্যান্য মন্তব্য : চমৎকাল কৌতুককর এই ইঁদুর ধরার বিবরণ। প্রায় যেন না-মানুষী ইঁদুরের গল্প।

নিহিতার্থ : অবিদ্যা তিমিরে আবৃত সংবৃতচিত্ত নিত্য বিচরণশীল চঞ্চল ইঁদুরের মতো রূপাদি বিষয়সমূহে বিচরণ করে বোধিচিত্তজ মহাসুখামৃত বিনষ্ট করে। যোগীরা পবনের মতো চঞ্চল চিত্তকে নিঃস্বভাবীকৃত করে। ইঁদুর যেমন মাটি তুলে গৃহ নষ্ট করে তেমনই চঞ্চলচিত্ত অবিদ্যার বশে বোধিচিত্তকে বিনষ্ট করে। সংবৃত চিত্তই সহজচিত্তে পরিণত হয়। ভুসুক বলেন চিত্তের অবিদ্যা চাঞ্চল্য দূর হলে ভববন্ধন লুপ্ত হয়।

উম্বা উঞ্চা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।... গিরিবরসিহর/সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসেঁ॥ (২৮)

সরলার্থ : পর্বত শিখলে শবরীবালার বাস। তার অলংকার ময়ূরপুচ্ছ, গলায় গুঞ্জামালা। শবরী শবরকে বলে, পাগল শবর দোহাই তোমার গোল কোরো না। আমি তোমারই গৃহিণী—সহজসুন্দরী। নানা তরু মুকুলিত হল, ডাল গগন স্পর্শ করল। ত্রিধাতুর খাট পাতা হল, শবর শয্যা-বিস্তার করল। নায়ক-নায়িকার কেলিরসে রাত্রি প্রভাত হল। নায়ক তাম্বুল-কর্পূর খায়, নৈরামণিকে কণ্ঠে নিয়ে মহাসুখে রাত্রি প্রভাত করে। গুরুবাক্যে বাণ যোজনা করে পরম নির্বাণরূপে লক্ষভেদ করে। উন্মত্ত শবর গুরুরোষে গিরিশিখর সন্ধিতে প্রবেশ করল তাকে আর কেমন করে খোঁজা যায় ?

অন্যান্য মন্তব্য : ব্রাত্য শবর জীবনের লীলাবিলাসের ছবি বস্তুনিষ্ঠতার সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। ধোয়ীর 'পবনদূত'-এ স্বৈর ক্রীড়ারসিক শবরীর কথা আছে।

নিহিতার্থ : মিলনের ফলে উদ্ভূত পরম সহজ সুখের কথা বলা হয়েছে। গুরু-উপদেশে শিষ্য সহজচক্রের দিকে যাত্রা করে—সহজে লীন হলে আর নির্গমন নেই, তখন চিত্ত পার্থিব ধরাছোঁয়ার অতীত।

ভাব না হোই অভাব ণ জাই।... জা লই অচ্ছম তাহের/উহ ণ দিস। (২৯)

সরলার্থ : ভাব হয় না অভাব হয় না এমন বস্তুতে কে প্রত্যয় করে ? বিজ্ঞান দুর্লক্ষ্য, ত্রিধাতুতে (কায়বাক্ চিত্তে) তার বিলাস তাও জানা যায় না। যার বর্ণ-চিহ্ন-রূপ নেই বেদাগম তার ব্যাখ্যা করতে পারে না। জলে প্রতিবিম্বিত চাঁদ যেমন সত্য নয়, মিথ্যাও নয় তেমনই শুদ্ধ বিজ্ঞান অনাখ্যাত কী নিয়ে ভাবনা করব ? যা আছে তারই উদ্দেশ পাওয়া যায় না।

অন্যান্য মন্তব্য : চাঁদ ও জলে চঁদের প্রতিবিম্ব অধ্যাত্মতত্ত্ববাদীদের প্রচলিত উপমা। শংকরাচার্যের ঘটাকাশের (ঘটের জলে প্রতিবিম্বিত আকাশ) কথা মনে পড়বে।

নিহিতার্থ : ভাব এবং অভাব, অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব—এর কোনোটিই সত্যও নয় মিথ্যাও নয়। পরম সত্য আসলে দুর্লক্ষ্য বিজ্ঞান। সমস্ত অস্তিত্ব-প্রবাহের মধ্যে অলক্ষিতভাবে তা বিলাস করছে। ভাষায় ব্যাখ্যা করে তা বোঝানো যায় না। লুই ভাব্য-ভাবক-ভাব তিনের ঊর্ধ্বে উঠেছেন বলে তাঁর কোনো ভাবনা নেই।

টালত ঘর মোর নাহি পড়বেষী...ঢেনঢন পা এর গীত বিরলে বুঝঅ। (৩৩)

সরলার্থ : টিলায় আমার ঘর। প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই। নিত্য প্রণয়ীর আনাগোনা। ক্ষুদ্র সংসার বৃদ্ধি পায়। দোহন করা দুগ্ধ কি বাঁটে প্রবেশ করে ? বলদ প্রসব করল গাভী বন্ধ্যা। পাত্র পূর্ণ করে তাকে তিন বেলা দোহন করা হয়। যে বুদ্ধিমান সেই নির্বোধ, যে চোর সেই সাধু, নিত্য নিত্য শৃগাল সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করে। ঢেনঢন পাদের গীত একান্তে বা অল্পজন বোঝে।

অন্যান্য মন্তব্য : শেষের প্রহেলিকাময় পঙ্‌ক্তিগুলি বাদ দিলে একাকিনী রমণীর বিবরণটি মনোগ্রাহী। হাঘরে দরিদ্র্যের কথা আছে।

নিহিতার্থ : সহজচক্রে (টালত) আছেন নৈরাত্মাদেবী তিনি নিঃসঙ্গ অর্থাৎ সর্বশূন্য। তার সঙ্গ করেন বজ্রযোগী ফলে সংবৃত চিত্তের উৎপত্তি। এই সংবৃত চিত্তই সহজ চিত্তে পরিণত হয়। প্রহেলিকায় তারই আভাস দেওয়া হল। সংবৃতচিত্ত শৃগালের মতো নোংরা ঘণাটে আবার সহজচিত্তে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য সিংহের মতো সংগ্রাম করে।

জা মণ গোএর আলাকালা...কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা। (৪০)

সরলার্থ : যা মনোগোচর তা সংকল্পবিকল্পাত্মক। কায়বাকচিত্ত যেখানে প্রবেশ করে না তাকে কেমন করে বলা যাবে ? বাক্‌পথাতীতকে প্রকাশ করা যায় না——বৃথাই গুরু শিষ্যকে উপদেশ দেন। যত বলা হয় সে সবই মিথ্যা। গুরু বোবা শিষ্য বধির। কাহ্ন বলেন রতিবিলসিত অনুত্তর সুখ (জিনর-) কেমন ? যেমন কালো বোবা দ্বারা সংবোধিত হয়।

নিহিতার্থ : সহজতত্ত্ব কায়বাক্‌চিত্তের অতীত, ইন্দ্রিয় দ্বারা দুর্বোধ্য, সহজ স্বসংবেদ্য। গুরু সংকেতে তার আভাস দিতে পারেন মাত্র।

১.১০ অনুশীলনী

অতিসংক্ষিপ্ত / সংক্ষিপ্ত :

১. চর্যাপদের আবিষ্কারক কে ?

২. মুনি দত্ত কে ?

৩. 'সন্ধ্যা' শব্দ কাকে বলে ? দুটি উদাহরণ দিন।

৪. চর্যায় ব্যবহৃত সমস্ত আভিপ্রায়িক শব্দই কি 'সন্ধ্যা' শব্দ ?

৫. চর্যার ভাষা বাংলা-এর সপক্ষে দুটি যুক্তি দিন।

নাতিদীর্ঘ প্রশ্ন :

১. চর্যাবর্ণিত সাধনতত্ত্বের পরিচয় দিন।

২. পাঠ্য চর্যাগুতিগীলির সাহিত্যমূল্য বিচার করুন।

৩. পাঠ্য চর্যাগুলিতে সামাজিক জীবনযাত্রার যে বিবরণ আছে তা লিপিবদ্ধ করুন।

১.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী—*চর্যাগীতির ভূমিকা*

২. মণীন্দ্রমোহন বসু—*চর্য্যাপদ*

৩. শশিভূষণ দাশগুপ্ত—*বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি*

৪. তারাপদ মুখোপাধ্যায়—*চর্যাগীতি*

৫. নীলরতন সেন—*চর্যাগীতিকোষ*

৬. তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়—*বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা*

৭. Sashi Bhusan Dasgupta— *Obscure Religious Cults of Bengal*

৮. সুকুমার সেন—*চর্যাগীতি-পদাবলী*

একক ২ ❐ বৈষ্ণব পদাবলী

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ গান্ধার

২.২.১ আলোচনা

২.৩ কেদার

২.৩.১ আলোচনা

২.৪ রয়নি কাজর বম

২.৪.১ আলোচনা

২.৫ কামোদ

২.৫.১ আলোচনা

২.৬ কুলবতি কঠিন কবাট

২.৬.১ আলোচনা

২.৭ শ্রীরাগ

২.৭.১ আলোচনা

২.৮ শ্রীরাগ

২.৮.১ আলোচনা

২.৯ বড়াই হেরি দেখ

২.৯.১ আলোচনা

২.১০ নটবর নব কিশোর রায়

২.১১ বৈষ্ণব পদাবলীর রসপর্যায় : আক্ষেপানুরাগ : সংজ্ঞা

২.১২ বৈষ্ণব পদাবলীর রসপর্যায় অভিসার : সংজ্ঞা

২.১৩ গোবিন্দদাসের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের রূপ

২.১৪ বৈষ্ণব পদাবলীর কলহান্তরিতা পর্যায়

২.১৫ নৌকা ও দানলীলা পর্যায়

২.১৬ গোষ্ঠলীলা

২.১৭ অনুশীলনী

১.১৮ গ্রন্থপঞ্জি

২.০ উদ্দেশ্য

বৈষ্ণব পদাবলীর ইতিহাস সুবিস্তৃত। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' থেকে বৈষ্ণব পদাবলীর শুরু। আর তা থেমেছে রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'তে। অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃযত বৈষ্ণব পদবলীর ইতিহাস।

বৈষ্ণব পদাবলীর ইতিহাসকে মূলত তিনটি স্তরে ভাগ করা যেতে পারে। চৈতন্যকে কেন্দ্র করে এই বিভাজন। প্রথম স্তর : চৈতন্য-পূর্ববর্তী বৈষ্ণব পদাবলী ; দ্বিতীয় স্তর : চৈতন্য-সমসাময়িক বৈষ্ণব পদাবলী ; তৃতীয় স্তর : চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলী। প্রথম স্তরের উল্লেখযোগ্য কবি—জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ; দ্বিতীয় স্তরের—রামানন্দ বসু, নরহরি, বাসু ঘোষ ; তৃতীয় স্তরের—জ্ঞানদাস, বলরাম দাস, গোবিন্দদাস।

প্রথম স্তরের বৈষ্ণব পদাবলী মূলত প্রেমের কবিতা। এগুলি মধ্যযুগের গীতকবিতা অর্থাৎ পদাবলী। 'পদাবলী' শব্দটি জয়দেব ব্যবহার করেছিলেন 'মধুরকোমলকান্ত' কবিতা হিসাবে। দ্বিতীয় স্তরের পদাবলীতে চৈতন্য প্রত্যক্ষ হয়ে উঠলেন। সে কবিতা হল সজীব, সরল। তৃতীয় স্তরে প্রেমের সঙ্গে ভক্তি এসে মিশল। তাই এ কবিতা হল প্রেমভক্তির কবিতা। এ যুগে কবিতায় মিশল বৈষ্ণবতত্ত্ব। বৈষ্ণব পদাবলীতে মূল বিষয় রাধাকৃষ্ণের প্রেম। তার সঙ্গে মিলল গৌরাঙ্গ চরিত ও মহিমা। মধুর রসের সঙ্গে বাৎসল্য ও সখ্যরসও এসে গেল। ভাষা—সংস্কৃত, ব্রজবুলি ও বাংলা। ভাবে ও ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলী মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হয়ে দাঁড়াল। সপ্তদশ শতাব্দীর পর বৈষ্ণব পদাবলী রচনায় ভাটা পড়ে গেল। শেষবারের মতো তার ঔজ্জ্বল্য প্রকাশিত হল রবীন্দ্রনাথের হাতে।

২.১ প্রস্তাবনা

বৈষ্ণব পদাবলীর নির্বাচিত দশটি পদের শব্দার্থ ও আলোচনা :

তথা রাগ

ধরম করম গেল গুরু-গরবিত।[১]
অবশ করিল কালা[২] কানুর পিরিত॥[৩]
ঘরে পরে কি না বলে করিব হাম কি।[৪]
কে না করয়ে প্রেম আমি কলঙ্কী॥[৫]
বাহির হইতে নারি[৬] লোক চরচাতে।
হেন মন করে[৭] বিষ খাইয়া মরিতে॥
একে নারী কুলবতী অবলা বলে লোকে।[৮]
কানু-পরিবাদ হৈল পুড়্যা মরি শোকে॥
খাইতে নারিয়ে কিছু রহিতে নারি ঘরে।[৯]
ভাবিতে ভাবিতে ব্যাধি সামাইল[১০] অন্তরে॥
জারিল সে[১১] তনু মন ব্যাপিল[১২] শরীর।
চণ্ডীদাস বলে ভাল হইবে সুস্থির॥

পাঠান্তর ঃ ১। 'দুরে গেল ধর্ম্ম কর্ম্ম গুরু-গরবিতে' ২। 'মোরে', ৩। 'পিরিতে' ৪। '(সই) ঘরে পরে কিনা বলে করিব গো কি'। ৫। 'কেবা নাঞি করে প্রেম আমরা কলঙ্কি' ৬। 'বাহিরে বেড়াতে নারি' ৭। 'এমন করয়ে মন' ৮। পরের দুটি পঙ্‌ক্তির পাঠ—'একে নারী কুলের বৌরি পুড়ি মরি শোকে। /তাহে কানুপরিবাদ দেই পোড়া লোকে'। ৯। 'খাইতে না পারি স্থির হৈতে নারি ঘরে'। ১০। 'সামাল্য' ১১। 'জারিলেক' ১২। 'ঝাপিল'।

শব্দ-টীকা ঃ ধরম...গরবিত—কৃষ্ণের প্রেমে রাধার ধর্ম-কর্ম গুরুজনের গর্ব সবই চলে গেছে। অবশ... পিরিত—কৃষ্ণপ্রেম রাধাকে অবশ করে দেয়। ঘরে...হাম কি—ঘরের মানুষরা রাধার নামে অনেক কথা বলে, পরেও অনেক কথা রাধার নামে নানা কথা বলে। এখন রাধা কী করবেন ? কে না ...কলঙ্কী—সকলেই তো প্রেম করে (কে না করয়ে প্রেম)—কিন্তু সব কলঙ্কের ভাগী হতে হয় কেবল রাধাকে। বাহির... চরচাতে—লোকের সমালোচনায় (চরচাতে) রাধা ঘরের বাইরে যেতে নারেন না। হেন...মরিতে—রাধা বলছেন 'ইচ্ছে করে বিষ খেয়ে মরি।' একে...লোকে—কুলবতী নারীকে লোকে অবলা বলে। কানু...শোকে—কৃষ্ণের সঙ্গে প্রেমে রাধার যে কলঙ্ক হয়েছে সেই শোখে তিনি পুড়ে মরতে চান। খাইতে...অন্তরে—(এই শোকে) রাধা কিছু খেতেও পারেন না, ঘরে (স্থির হয়ে) থাকতেও পারেন না। এ কথা ভাবতে ভাবতে রাধার মনের রোগ হয়ে গেল। চণ্ডীদাস...সুস্থির—পদকর্তা চণ্ডীদাস বলছেন (ভণিতায়) : '(রাধা) সুস্থির হও, রোগ সেরে যাবে।'

পদের সারাংশ ও আলোচনা ঃ পদটি আক্ষেপানুরাগ পর্যায়ের পদ। রাধা এখানে কৃষ্ণপ্রেমকেই গঞ্জনা দিয়েছেন। পরপুরুষ কৃষ্ণের সঙ্গে প্রেম করার জন্য রাধার নারীধর্ম, কুলধর্ম, গুরুজনের তাঁর জন্য যে গর্ব সে সবই চলে গেছে। ঘরে-বাইরে রাধা তাঁর এই অবৈধ প্রেমের জন্য নিন্দাবাণে জর্জরিত। প্রেম সবাই করে। কিন্তু রাধাকেই কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিতে হয়। প্রতিবেশীদের কানাকানিতে রাধা তাঁর ঘরের বাইরে বেরোতে পারেন না। রাধার কখনো কখনো বিষ খেয়ে মৃত্যুবরণ করার ইচ্ছ হয়। রাধা বিবাহিতা সে-কারণেই কুলবতী নারী। (কুলের মানসম্মানের প্রশ্নও রাধার অবৈধ প্রেমের জন্য ক্ষুণ্ণ)। তিনি (রাধা) নারী—তাই অবলা। কৃষ্ণপ্রেমের কলঙ্কে রাধা শোকে পুড়ে মরেন। সেজন্য রাধা কিছু খেতেও পারেন না। আবার বাড়িতে থাকাও তাঁর পক্ষে কষ্টকর। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে রাধা যেন ভেতরে ভেতরে ব্যাধিগ্রস্ত। সেই ব্যাধি ধীরে ধীরে তাঁর শরীর ও মনে ব্যাপ্ত হয়ে গেল। ভণিতায় পদকর্তা চণ্ডীদাস বললেন—রাধার যা হয়েছে তাঁর ভালোর জন্যই হল। এবার রাধা সুস্থ হবেন।

আক্ষেপানুরাগের এই পদটি রাধার স্বগত-কথন। সখীকে সম্বোধন করে রাধা এখানে নিজের দুঃখের কথা বলেননি। যেন নিজেকেই নিজে আক্ষেপ শুনিয়েছেন। এই স্বগত-কথনে দুটি আক্ষেপেরই প্রাধান্য। প্রথমত প্রেম করার জন্য তাঁকেই দোষী করা হবে কেন ? দ্বিতীয়ত, যেন ইঙ্গিতে রাধা বলেন, তাঁর প্রেমে সমাজের হস্তক্ষেপ তাঁর কাছে অসহনীয়। গৃহ-পরিবেশে ও গৃহ-পরিবেশের বাইরে স্বজনপরিজন, আত্মপরের সমালোচনা রাধাকে করে তোলে শোকাতুর। কানুর প্রেমজনিত নিন্দার হাত থেকে নিজেকে উদ্ধার করার কোনো চেষ্টা রাধার মধ্যে দেখা যায় না। বরং এ যেন ব্যাধির মতোই তাঁর অন্তর ও শরীরকে আচ্ছন্ন করে। ভণিতায় চণ্ডীদাস রাধার এই সার্বিক আচ্ছন্নতাকেই কৃষ্ণ-কলঙ্কের প্রতিষেধক হিসেবে ভেবেছেন। পদটিতে রাধা নিজেকে কুলবতী আর অবলা বলেছেন ঠিকই, কিন্তু নিজের কৃষ্ণপ্রেম সম্পর্কে তিনি আর ভীরু নন। রাধা বিদ্রোহিনী সমাজের বিরুদ্ধে। রাজার বক্তব্য ব্যঞ্জনায় পূর্ণ। যেন রাধা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে চেয়েছেন ঃ 'আমি তোমার প্রেমে হব সবার কলঙ্কভাগী।' চণ্ডীদাসের রাধার প্রেমিকা সত্তা আর্ত ও ব্যর্থ কান্নায় ক্রন্দসী। চিরকালের রসিক পাঠক চণ্ডীদাসের এই পদ শুনে মুগ্ধ।

২.২ গান্ধার

ধিক্ রহু জীবনে যে পরাধিনী জীয়ে।
তাহার অধিক ধিক পরবশ হয়ে॥
এ পাপ কপালে বিহি এমতি লিখিল।
সুধার সাগর মোর গরল হইল॥
অমিয়া বলিয়া যদি ডুব দিলুঁ তায়।

গরল ভরিয়া কেনে উঠিল হিয়ায়॥
শীতল বলিয়া যদি পাষাণ কৈলাম কোলে।
[২]এ দেহ অনল তাপে পাষাণ সে গলে॥
ছায়া দেখি বসি যাই তরুলতা বনে।
জ্বলিয়া উঠয়ে তরু লতাপাতা সনে॥
যমুনার [৩]জলে যাঞা যদি দিই ঝাঁপ।
পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ॥
[৪]অতএ এ ছার পরাণ যাবে কিসে।
নিচয়ে ভখিমু মুঞি এ গর বিষে॥
চণ্ডীদাস কহে দৈবগতি নাহি জান।
[৫]দারুণ পিরিতি সেই বধএ পরাণ॥

পাঠান্তর ঃ ১। 'ধিক রহু জীবনে পরাধীনী যেহ।/তাহার অধিক ধিক পরবশ নেহ'। ২। 'পিরিতি অনলতাপে পাষাণ যে গলে'। ৩। 'যমুনার জলে যদি দিয়ে হাম ঝাপ'। ৪। 'অতএ এ ছার ... বিষে'।—এই পয়ারটি কোনো কোনো পাঠে নেই। ৫। 'পিরীতি অমিয়া রসে বধএ পরাণ'।

শব্দ-টীকা ঃ ধিক ... জীয়ে—পরাধীন হয়ে জীবনে বেঁচে থাকাকে ধিক্কার জানিয়েছেন রাথা। রাধার নিজের প্রতি নিজেরই ধিক্কার জেগেছে। তাহার ... হয়ে—প্রেমে পরবশ হওয়াকে (কৃষ্ণপ্রেমের বশীভূত হয়োকে) রাধা আরও বেশি ধিক্কার জানিয়েছেন মনের ব্যথায়। এ .... হইল—রাধার পাপের কপালকে বিধাতা এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন (গঢ়ল) যে অমৃতের সাগর তাঁর কাছে বিষতুল্য—যাতে তিনি ডুব দিয়েছেন প্রেমামৃত পাবার জন্য। শীতল মনে করে রাধা পাষাণ কোলে নিলে তাঁর শরীরের অগ্ন্যুত্তাপে পাষাণও গলে যায়। ছায়া ... সনে—তরুলতার স্নিগ্ধ ছায়ায় বসতে গেলেও তলু-লতা ও পাতা জ্বলে উঠে। যমুনার ... তাপ—প্রাণ জুড়োতে যমুনার জলে রাধা ঝাঁপ দিলেও তাঁর প্রাণ জুড়োয় না। বরং তাঁর প্রাণ আরও বেশি তপ্ত হয়। অতত্র... বিষে—(রাধা ভেবে পান না)—তাঁর প্রাণ কেন বেরোয় না? তাই তাঁর সংকল্প বিষপান করে তিনি আত্মহত্যা করবেন। চণ্ডীদাস ... পরাণ—ভণিতায় পদকর্তা চণ্ডীদাস বলছেন রাধা দৈব অর্থাৎ অলৌকিক কৃষ্ণপ্রেমের কথা জানেন না, (কৃষ্ণের) দারুণ প্রেমই রাধার হৃদয়কে (পরাণ) বধ করবে।

২.২.১ আলোচনা

এ পদটিও রাধার আক্ষেপানুরাগের পদ। রাধার স্বগত কথনে পদের ভাষা জীবন্ত। এখানে রাধার আক্ষেপ উচ্চারিত হয়েছে নিজের প্রতি। রাধার প্রথম আক্ষেপ তিনি পরাধীন। দ্বিতীয় আক্ষেপ তিনি 'পরবশ' অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমে বশীভূত। অমৃতের সমুদ্রে অবগাহন করে—তিনি প্রেমের অমৃত পাননি—তাঁর ভাগ্যে জুটেছে বিষ। শীতল ভেবে পাষাণ কোলে করলে শ্রীমতীর (রাধার) দেহের তাপে পাষাণও দগ্ধ হয়। ছায়া দেখে রাধা যখন তরুলতাপূর্ণ ছায়াঘন বনে গিয়ে বসেন তখন তাঁর দেহের মধ্যে যে প্রেমদাহ আছে তার তাপে বনে দাবানল ছড়িয়ে পড়ে। প্রাণ জুড়োবার জন্য রাধা যমুনার শীতল জলে ঝাঁপ দেন কিন্তু রাধার প্রাণ জুড়োয় না—প্রাণ জুড়োনোর পরিবর্তে যমুনার জলও রাধাপ্রেমের বহ্নিতে উত্তপ্ত হয়ে যায়। রাধা নিরুপায়। রাধা জানেন না যে কৃষ্ণের সর্বগ্রাসী দারুণ প্রেমই রাধার প্রাণবধকারী।

পদটিতে রাধার আক্ষেপের বেদনা তীব্র। পদটি শ্রীচৈতন্যপূর্ব চণ্ডীদাসের রচিত কিনা ও নিয়ে বৈষ্ণবসাহিত্যের গবেষক বিমানবিহারী মজুমদারের সংশয় ছিল। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ 'রাধাবিরহ' অংশে রাধার

কণ্ঠেও এই হতাশার আক্ষেপ শোনা যায় :

'দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল
মোঞঁ নারী বড় অভাগিনী' ('শ্রীকৃষ্ণকীর্তন')

রাধার পাষাণ কোলে নিয়ে প্রেমে দগ্ধ দেহকে শীতল করার ব্যর্থ প্রয়াসও 'মনসামঙ্গাল' কাব্যের জনমদুখিনী মনসার মধ্যেও আমরা পাই ঃ 'শীতল ভাবিয়া যদি পাষাণ লই কোলে / পাষাণ আগুন হয় মোর কর্মফলে।' এ হল চিরকালের দুর্ভাগিনী নারীর অসহায় মর্মবেদনা—যা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর রাধা ও 'মনসামঙ্গাল'-এর জন্মদুখিনী মনসার মধ্যেও পাওয়া যায়। চণ্ডীদাসের রাধার দুঃখ বড়ো গভীর ও বেদনাময়। তাঁর যন্ত্রণা প্রশমিত হতে চায় না। কৃষ্ণপ্রেমের নিরাপদ আশ্রয়ই রাধার কাম্য, কিন্তু সে প্রেম চূড়ান্ত আশ্রয়হীনতার প্রতীক—প্রেমিকা রাধার কাছে। রাধা তাঁর প্রেমের জ্বালা জুড়োতে তরুলতায় পূর্ণ বনে বসে থাকেন শীতল ছায়ার জন্য। রাধার এমনই দুর্ভাগ্য যে তাঁর প্রেমের জ্বালার দহনে বনের ছায়াময় শ্যামলিমাও পুড়ে যায়। পদটিতে এই চিত্রকল্পটি সুন্দর ও রাধার মর্মবেদনার বাণীবহ। শেষ পর্যন্ত আত্মহনন অথবা কৃষ্ণপ্রেমের জ্বালায় মৃত্যুই রাধার অন্বিষ্ট। যদিও পদকর্তা চণ্ডীদাস ভণিতায় আশ্বাস দিয়ে বলেছেন কৃষ্ণের সেই নিদারুণ সর্বহরণকারী প্রেমই রাধার প্রাণ বধের একমাত্র কারণ হবে। দেহে বাঁচলেও কৃষ্ণপ্রেমে রাধার দেহমন ও প্রাণ জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে, তবুও হয়তো একদিন রাধা সেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে অন্তরে আলিঙ্গান করে সুখী হবেন, এ কথাটি নিশ্চিত।

২.৩ কেদার

নব অনুরাগিনি রাধা।
কিছু নাহি মানএ বাধা॥
একলি কএল পয়ান।
পথ বিপথ নহি মান॥
তেজল মনিময় হার।
উচকুচ মানএ ভার॥
কর সয়ঁ কঙ্কন মুদরি।
পথহি তেজল সগরি[১]॥
মনিময় মঞ্জির[২] পায়।
দূরহি[৩] তেজি চলি যায়॥
জামিনি ঘন আঁধিয়ার।
মনমথ হিয়[৪] উজিয়ার॥
বিঘিনি বিথারিত বাট।
পেমক আয়ুধে কাট॥
বিদ্যাপতি মতি জান।
ঐছে না হেরিয়ে আন॥

পাঠান্তর ঃ ১। 'সারি' ২। 'মঞ্জীর' ৩। 'দূরহি' ৪। 'হিয়ে', 'হেরি'।

শব্দ-টীকা ঃ নব... বাধা—নব অনুরাগে মগ্ন রাধার কাছে কোনো বাধাই বাধা বলে মনে হয় না। একলি কএল পয়ান—একাই যাত্রা করলেন (পয়ান)। পথ ... মান—পথ বিপধ (কোনো কিছুই) রাধা মানলেন না। উচকুচ ... ভার—নিজের উচ্চকুচযুগল-কে রাধার ভার বলে মনে হ'ল। 'তেজল ... মনিময় হার'—মনিখচিত হারকেও রাধা ভারস্বরূপ জ্ঞান করে ত্যাগ করলেন। 'কর ... সগরি'—হাতের কঙ্কণ, আংটি (মুদরি) সকলই (সগরি) রাধা

পথে ত্যাগ করলেন অর্থাৎ খুলে ফেললেন। 'মনিময় ... পায়'—রাধার পায়ে ছিল মনিময় নূপুর (মঞ্জীর)। 'দূরহি ... যায়'—সে সব রাধা ফেলে দিয়েছেন দূরে। 'জামিনি ... উজিয়ার'—রাত্রি ঘোর অন্ধকার কিন্তু কামদেব রাধার হৃদয়ে প্রোজ্জ্বল। অর্থাৎ মদনদেব (মনমথ) রাধাকে চালিত করছেন দুর্গম পথে। 'বিঘিনি... কাট'—রাধা যে পথে চলেছেন সেই পথে বহু বিঘ্ন বিস্তৃত হয়ে আছে। কিন্তু প্রেমের (প্রেমক) অস্ত্রে (আয়ুধে) রাধা কেটে ফেলেছেন সব বাধা ও বিপদ। বিদ্যাপতি ... আন॥ —বিদ্যাপতি জানেন এরকম আর কাউকে দেখা যায় না।

২.৩.১ আলোচনা

পদটি অভিসার পর্যায়ের। নবানুরাগিণী একাই বেরিয়েছেন পথে কোনো বাধা মানেন না রাধা। তিনি খুলেছেন তাঁর মণিময় হার। তিনি মানেন না পথ-বিপথের ভয়। উচ্চ স্তনযুগল তাঁর কাছে ভারস্বরূপ। পথে রাধা ত্যাগ করেছেন তাঁর অলংকার, হাতের কঙ্কণ ও আংটি। রাধা দূরে ফেলে দিয়েছেন পায়ের মণিখচিত নূপুর। রাত্রি এখন ঘোর অন্ধকার। কিন্তু প্রেমের দেবতা মন্মথ (মদনদেব) রাধার হৃদয়ে প্রোজ্জ্বল। পথে বিঘ্ন ছড়ানো। কিন্তুর প্রেমের অস্ত্রে রাধা সব বিপদকেই কাটিয়েছেন। ভনিতায় বিদ্যাপতি জানাচ্ছেন এই রকম রমণী তিনি আর কোথাও দেখতে পান না।

প্রথমেই বলা হচ্ছে রাধা 'নব অনুরাগিণী'। এতে বোঝা যায় রাধা নবীনা অভিসারিকা। নতুন প্রেমের তীব্র উন্মাদনা ও অনাস্বাদিতপূর্ব মিলনের আনন্দ লাভের জন্যই রাধার অভিসার যাত্রা। তাই কোনো বাধাই রাধার কাছে প্রকৃত বাধা নয়। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাধা তাঁর অভিসার যাত্রার আকুল প্রয়াসে বিসর্জন দিয়েছেন সকল ভূষণ। এ কবিতার ভাষাও কোনো কোনো গানের মতোই ছেড়েছে 'তার সকল অলংকার'। পদের হ্রস্ব পঙ্‌ক্তির দ্রুত চালের ছন্দও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

২.৪ রয়নি কাজর বম

রয়নি কাজর বম ভীম ভুজঙ্গাম[১]
কুলিশ পরএ[২] দুরবার।
গরজ তরজ মন রোস বরিস ঘন[৩]
সংসঅ পড়ঁ[৪] অভিসার॥
সজনী, বচন ছড়ইত[৫] মোহিলাজ।
হোএত সে হোও বরু সব হম অঙ্গিকরু
সাহস মন দেল আজ[৬]॥
[৭]অপন অহিত লেখ কহইত করতেখ
হৃদয় ন পারিঅ ওর।
চাঁদ হরিন বহ রাহু কবল সহ
প্রেম পরাভব থোর॥
চরণ বেঢ়িল ফনি হিত মানলি ধনি
নেপূর না করএ রোর।
সুমুখি পুছওঁ তোহি সকল কহসি মোহি
সিনেহক কত দূর ওর॥

ঠামহি রহিঅ ঘুমি পরস চিহ্নিঅ ভূমি
দিগমগ উপজু সন্দেহ।
হরি হরি সিব সিব ভাবে জাইহ জিব
জাবে না উপজু সিনেহ॥
[৮]ভণই বিদ্যাপতি সুনহ সুচেতনি
গমন ন করহ বিলম্ব।
রাজা সিব সিংঘ রূপনারায়ণ
সকল কলা অবলম্ব॥

পাঠান্তর ঃ ১। 'ভুজঙ্গাম' ২। 'পলএ', ৩। সমগ্র পঙ্‌ক্তিটির স্থলে—'গরজে তরস মন রোসে বরিস ঘন' ; ৪। 'পলু' ; ৫। বোলইতে ; ৬। ত্রিপদীটির স্থানে—যেহেতু হোএস সেহাএঅ ও বরু / সবে হামে অঙ্গিকরু / সাহস মন দএ আজ ; ৭। 'অপন অহিত লেখ ... 'সিনেহক কতদূর ওর' পাঠ নেপালেতে (নেপালের পুথিতে) নেই। ভণিতাস্থলে 'ভণই বিদ্যাপতিত্যাদি'।

শব্দ-টীকা ঃ রয়নি—রজনী। কাজর—কাজল। বম—বমন করছে। কুলিশ—বজ্র। 'রয়নি ... দুরবার'—রাত্রি কাজল (অর্থাৎ অন্ধকার) উদগীরণ করছে, ভীষণাকৃতি সর্ব (ভুজঙ্গাম) সঞ্চরণরত। দুর্বার বজ্র পড়ছে। গরজ তরজ মন—গর্জনে মন ত্রস্ত। রোস .... ঘন—রুষ্ট মেঘের জলধারা বর্ষণের জন্য রাধা চিন্তান্বিত। সংসঅ ... অভিসার—অভিসারে দেখা দিল সংশয়। হোএত সে হোঅ বরু—যা হয় হোক। সব হম অঙ্গিকরু—'আমি (রাধা) সব অঙ্গীকার করেছি'। অর্থাৎ রাধা তাঁর কথা রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সহস মন দেল আজ—'মনকে সাহস দিলাম' অর্থাৎ শ্রীরাধা অভিসারের শঙ্কাতুর পথে যেতে সাহসী। রাধা বলছেন ঃ (আপন ... ওর'—নিজের কপালে যে অমঙ্গালের চিহ্ন লেখা আছে—বলতে কি (কহইত) তা স্পষ্টই প্রত্যক্ষ করছি (পরতেখ)। (কিন্তু) মন যে মানে না।" চাঁদ .... থোর—চাঁদ হরিণচিহ্ন বহন করে, রাহুগ্রাসের কবলে পড়ে, কিন্তু প্রেমের পরাভব সহ্য করে না একটুও (থোর) / চরণ বেঢ়িল ফনি—সাপ চরণ বেষ্টন করল। 'হিত মানলি ধনি'—সুন্দরী (রাধা) তাকেই মঙ্গাল বলে মেনে নিয়েছে। 'নেপুর ন করএ রোর'—(এই সর্ববেষ্টনের ফলে) নূপুরও শব্দ করে না (রোর)। 'সুমুখি পুছওঁ তোহি—হে সুমুখি, তোমাকে জিজ্ঞাসা (পুছওঁ) করি। সরূপ ... মোহি—আমাকে সত্য কথা বল তো।' সিনেহক কত ..... ওর—প্রেমের সীমা কতদূর। ঠামহি ... সন্দেহ—একই স্থানে ঘুরে মরছি, শুধু স্পর্শেই ভূমিকে ভূমিরূপে চিনতে পারছি, নতুবা দিক্‌পথ (দিগমগ) সব বিষয়েই সন্দেহে দোলায়িত আমি (রাধা)। হরি .. সিনেহ—হরি হরি শিব শিব ! প্রেম যদি না জন্মায় (উপজু) তবে তার জন্যই জীবন যাবে। ভণই .... বিলম্ব। বিদ্যাপতি ভণিতায় বলছেন—হে সুচেতনি (রাধা) শোন (সুনহ)। যেতে আর দেরি করো না। রাজা ... অবলম্ব। রাজা রূপনারায়ণ শিবসিংহ সকল কলাবিদ্যার ধারক।

২.৪.১ আলোচনা

আলোচ্য পদটি বিদ্যাপতির রচনা, এটি রাধার অভিসার। এটি বর্ষাভিসার এবং তামসী (নিশা) অভিসার। বজ্রবৃষ্টিতে বিপর্যস্ত অমা রজনীতে রাধা পূর্বনির্দিষ্ট সংকেতকুঞ্জে যাত্রা করেছেন, সাথে আছেন তাঁরই এক সখী। পথে নিদারুণ বিঘ্ন দেখে রাধার মন সংশয়ে দোলায়িত। তিনি ভাবছেন তাঁর পক্ষে অভিসারে যাওয়া সম্ভব হবে কি ? কৃষ্ণের কাছে রাধা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অতএব তিনি দৃঢ়সংকল্পে স্থির। শেষ পর্যন্ত সাহসী রাধা ভেবেছেন যা ঘটার তা ঘটুক। সব কিছু মেনেই তিনি অভিসারের দুর্গম পথে যেতে আগ্রহী। নিজের অনিষ্ট হবে—এটা স্পষ্ট বুঝেও রাধার মন মানে না। চাঁদ হরিণ-চিহ্ন বহন করে, রাহুর গ্রাসে পড়ে—তবুও প্রেমের পরাজয় সহ্য করে না। এরপর পদকর্তা বিদ্যাপতি নিজেই বর্ণনা করছেন রাধার অভিসারের কথা। তিনি বলছেন—দুর্গম পথে

বেরোবার পর রাধা সর্পবেষ্টিত হয়েও ভীত হননি। চরণযুগলে সাপ জড়িয়ে থাকায় রাধার নূপুরও আর শব্দ করছে না। কবি বিস্মিত। রাধাকে প্রশ্ন করছেন—যে প্রেম মৃত্যুঞ্জয়ী তার সীমা কতদূর, রাধা একই স্থানে ঘুরে মরছেন—হারিয়েছেন পথের দিশা। অন্ধকারে ভূমি স্পর্শ করে অভিসারিকা রাধার যাত্রা। শ্রীমতী (রাধা) হরি হরি শিব শিব বলতে বলতে ভাবছেন তাঁর প্রেম যদি না জাগে, তবে সেজন্যই (রাধার) জীবন শেষ হয়ে গেলেও ক্ষতি নেই। ভণিতায় রাজা শিবসিংহের উল্লেখ থাকায়—এটি প্রমাণিত যে, শিবসিংহের রাজত্বকালেই বিদ্যাপতির এই অভিসারের পদটি রচিত।

প্রেমের তপস্যায় দুঃখ বরণ করে রাধা এক দুর্জয় সাহসী রমণী। পথ ও প্রকৃতির দুর্যোগ কবির শব্দ-চিত্ররচনার গুণে জীবন্ত। বিদ্যাপতির রাধা এখানে দেহসর্বস্ব নন, কৃচ্ছসাধনের দৃঢ়তায় ও প্রেমের গৌরবে গরবিনী। প্রেমের পরাজয় রাধার কাছে অসহনীয়। এই রাধা গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় দর্শনের তত্ত্বপ্রতিমা নন, ইনি আধুনিক কবির ভাষায় অক্লেশে বলতে পারেন ঃ

'যাবো না বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিনী,
আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী।'

('সবলা', 'মহুয়া', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।)

২.৫ কামোদ

নন্দ নন্দন চন্দ [১]চন্দন
গন্ধ নিন্দিত অঙ্গা।
জলদ সুন্দর কম্বু কন্ধর
নিন্দিত সিন্ধুর[২] ভঙ্গা॥
প্রেম আকুল[৩] গোপ গোকুল
কুলজ কামিনি কন্ত।
কুসুমরঞ্জন মঞ্জু বঞ্জুল
কুঞ্জ-মন্দির[৪] সন্ত॥
গণ্ড মণ্ডল বলিত কুণ্ডল।
উড়ে চুড়ে শিখণ্ড।
কেলি-তাণ্ডব তাল-পণ্ডিত
বাহু-দণ্ডিত দণ্ড॥
কঞ্জলোচন কলুষমোচন
শ্রবণরোচন ভাষ[৬]।
অমল কোমল[৭] চরণ কিশলয়[৮]
নিলয় গোবিন্দদাস॥

পাঠান্তর ঃ ১। 'চন্দ্র' ২। 'সুন্দর' ৩। 'প্রেমে আকুল' ৪। 'মন্দিরে' ৫। 'উড়চূড়' ৬। 'ভাস' ৭। 'কমল' ৮। 'নিলয়'।

শব্দ-টীকা ঃ নন্দ ... অঙ্গা—চন্দ্রের লাবণ্য ও চন্দনের সুগন্ধনিন্দিত নন্দ-নন্দনের (নন্দের পুত্র কৃষ্ণ) অঙ্গা। কম্বু—শঙ্খ। কন্ধর—গ্রীবা। সিন্ধুর—হস্তী। জলদ ... ভঙ্গা—তিনি (কৃষ্ণ) মেঘের মতো সুন্দর। শঙ্খের মতো তাঁর গ্রীবা হস্তীর ভঙ্গিকেও হারিয়ে দেয়। প্রেম ... কন্ত—প্রেমাকুল গোকুলের গোপাঙ্গানাদের তিনি (কৃষ্ণ) কান্ত।

মঞ্জু— সুন্দর। বঞ্জুল—বেত। কুসুম ... সন্ত—তাঁর বেতস-কুঞ্জ-মন্দির ফুলে সুশোভিত। গণ্ড ... শিখণ্ড—তাঁর (গণ্ড মণ্ডল) দুলছে কুণ্ডল আর চূড়ায় উড়ছে ময়ূরপুচ্ছ (শিখণ্ড)। কেলি ... দণ্ড—তিনি কেলিতাণ্ডবে তাল দেওয়ার ব্যাপারে পণ্ডিত। তাঁর বাহু (হাত) দণ্ডকেও (লাঠিকে) দণ্ডিত করে—এমন সুদৃঢ় কৃষ্ণের বাহু। কঞ্জ—কমল। কলুষ-পাপ, কঞ্জলোচন ... ভাষ—তাঁর নয়ন পদ্মের মতো, বাক্য কর্ণের তৃপ্তিদায়ক ও পাপনাশক। অমল ... গোবিন্দদাস—তাঁর চরণপল্লব নির্মল ও সুকোমল। সেই চরণ পদকর্তা গোবিন্দদাসের আশ্রয়স্থল (নিলয়)।

২.৫.১ আলোচনা

এটি শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনার পদ। শ্রীকৃষ্ণের শরীর এত সুগন্ধপূর্ণ যে চন্দ্র ও চন্দনের গন্ধকেও নিন্দা করতে হয়। তিনি মেঘের মতো সুন্দর। শঙ্খের মতো তাঁর গ্রীবা হস্তীয় ভঙ্গিকেও হার মানায়। প্রেমে আকুল গোপকামিনীদের তিনি প্রেমিক। তাঁর বেতসকুঞ্জ-মন্দির ফুলে ফুলে সুশোভিত। তাঁর গণ্ডমণ্ডলে দুলছে কুণ্ডল। আর মাথার চুলের চূড়ায় উড়ছে ময়ূরপুচ্ছ। তিনি কেলিতাণ্ডবে তাল দিতে বিদগ্ধ। তাঁর সুদৃঢ় বাহু পরাজিত করে দণ্ডের কাঠিন্যকে। তাঁর দুটি চোখ কমলের মতো সুন্দর। তাঁর বাক্য কর্ণের তৃপ্তিসাধক ও পাপবিনাশক। পল্লবের মতো সুন্দর ও কোমল দুটি অমল চরণ ভক্ত গোবিন্দদাসের আশ্রয়স্থল।

এ পদটিতে অনুপ্রাস অলংকারের হিল্লোলে কবি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নৈপুণ্যে বর্ণনা করেছেন শ্রীকৃষ্ণের অনুপম রূপ। রাধাকৃষ্ণের লীলাস্থলী কুঞ্জ-মন্দিরের বর্ণনায় গোবিন্দদাস অনন্য। কেলিতাণ্ডবে তাল দিতে পণ্ডিত, বিশাল সুদৃঢ় বাহুযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা পড়লে—মনের পটে ভেসে ওঠে শ্রীচৈতন্যের ভুবনমোহন রূপের কথা। জ্ঞানদাসের শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা রূপরসিকের সচেতন শিল্পনৈপুণ্যে পূর্ণ। পদকর্তা গোবিন্দদাস ভক্তের বিনম্র দৃষ্টি নিয়ে আলংকারিক পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন শ্রীকৃষেমর রূপ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে নিকুঞ্জমিলনের গুরুত্ব—ভক্তিভরে প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনায়।

গোবিন্দদাসের কৃষ্ণরূপ দর্শনের মধ্যে আছে ভক্তির লক্ষণ। সেইজন্য তিনি ভণিতায় শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্মে আশ্রয় নেওয়ার জন্য ব্যাকুল।

২.৬ কুলবতি কঠিন কবাট

কুলবতি কঠিন কবাট উদঘাটলুঁ
তাহে কী কণ্টক বাধা।
নিজ মরিযাদ সিন্ধু সঞে তারলুঁ
তাহে কি তটিনী অগাধা॥
সজনি মঝু পরিখন কর দূর।
কৈছে হৃদয়ে করি পন্থ হেরত হরি
সুঞরি সুঞরি মন ঝুর॥
কোটি কুসুমশর বরিখয়ে যছু পর
তাহে জলদজল লাগি।
প্রেম দহনদহ যাক হৃদয়ে সহ
তাহে কি বজর কি আগি॥
যছু পদতলে হাম জীবন সোপলুঁ
তাহে কি তনু অনুরোধ।

গোবিন্দদাস কহই ধনি অভিসর
সহচরি পাওল বোধ॥

পাঠান্তর ঃ এই পদটি নন্দকিশোর দাসের 'রসকলিকা'য় আছে তাই পাঠান্তর দেওয়া গেল না।

শব্দ-টীকা ঃ কুলবতি ... বাধা—কুলবতি রাধা ঘরের বউ হয়েও ঘরের দরজা (কবাট) উদঘাটন করলেন। তাহে ... বাধা —তাই অভিসার যাত্রার দুর্গম পথের কাঁটাকে ভয় পান না শ্রীরাধা। নিজ মরিযাদ .... তারলুঁ—রাধা বলছেন ঃ 'আত্মসম্মানরূপ সমুদ্র রাথা উত্তীর্ণ হয়েছি'। তাহে... অগাধা—সেজন্য সামান্য তটিনী অর্থাৎ (বৃন্দাবনের মানসগঙ্গা) নদী রাধা পেরোতে পারবেন না তা হয় না। 'সজনি ... মঝু পরিখন কর দূর—রাধা বলছেন 'সখি আমাকে আর পরীক্ষা করো না'। কেমন করে উদ্বিগ্ন হৃদয়ে হরি তাকিয়ে আছেন—'কৈছে হৃদয়ে করি ... হরি। সুঞরি সুঞরি ... ঝুর—সে কথা বার বার স্মরণ করে রাধার অন্তর কাঁদছে। কোটি ... লাগি—মদনদেবের শরে রাধা রাত্রিদিন জ্বলে পুড়ে মরছেন বাদলধারায় তার আর কি হবে? প্রেম দহন ... আগি॥ প্রেমের অন্তর্দাহ যে হৃদয়ে সহ্য করছে, বজ্রের অগ্নি আর কি তাকে দগ্ধ করতে পারবে। যছু... অনুরোধ—শ্রীরাধার কথা ঃ 'আমার জীবনই তাঁর পদতলে সমর্পণ করেছি, এখন কি দেহের মায়া করব' ? সখি একবার অন্য পদে রাখাকে অভিসার যাত্রার প্রাক্‌কালে জিজ্ঞাসা করেছেন : প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ—সে কথার উত্তর দিয়েছেন রাধা। তিনি কৃষ্ণচরণে সমর্পিতা, তাই দেহ গেল কি থাকল তা নিয়ে রাধা চিন্তিত নন। গোবিন্দদাস বলছেন সুন্দরী রাধা অভিসারে যাও। সখী তখন রাধার কথায় আশ্বস্ত। (কহই) পদকর্তা গোবিন্দদাস বলছেন, (ধনি) সুন্দরী অভিসর—অভিসারে যাও। সহচরী—সখী সান্ত্বনা পেলেন।

২.৬.১ আলোচনা

কুলবতী রাধা কুলমর্যাদার দুয়ার ভেঙে বেরিয়ে পড়েছেন প্রেমিক কৃষ্ণের সঙ্গে অনন্ত অভিসারের পথে মিলিত হতে। গৃহের অর্থাৎ সমাজের মানমর্যাদার দরজাই যখন খুলে গেছে, তখন পথের কণ্টক আর কী ক্ষতি করতে পারে শ্রীমতীর ? রাধা নিজের মর্যাদারূপী সমুদ্র যখন পেরিয়েছেন তখন সামান্য নদী তাঁর কাছে অতল ও গহন হতে পারবে না। সখী যেন রাধাকে আর পরীক্ষা না করেন। কৃষ্ণ ব্যাকুল হয়ে রাধার অভিসারের পথে তাকিয়ে আছেন মনে ভাবলেই রাধার অন্তর কেঁদে ওঠে। তুলনীয় জয়দেবের 'গীতবোগিন্দ'-এ শ্রীকৃষ্ণ রাধার জন্য :

'রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং
পশ্যতি তব পন্থানম্'

জয়দেবের কাব্যে সচকিত কৃষ্ণ বাসরসজ্জা রচনা করে তাকিয়ে আছেন অভিসারিণী রাধার পথের দিকে। অতএব জ্ঞানদাসের রাধাও অভিসারে যাবেন। কোটি মদনবাণ যাঁর পর বর্ষিত হয়েছে, সেই রাধা বৃষ্টিধারাকে ভয় পান না। প্রেমের দহনজ্বালায় মুগ্ধ রাধা। ব্রজের আগুন আর তাঁকে কীভাবে পোড়াবে ? যে কৃষ্ণের পদতলে রাধা সমর্পিতা সেখানে দৈহিক ক্ষয়-ক্ষতির কথা মনেই আসে না। পদকর্তা গোবিন্দদাস ভণিতায় বলছেন : হে সুন্দরি (রাধা) এবার অভিসারে যাও। সহচরী তোমার মর্মকথা বুঝেছে।

২.৭ শ্রীরাগ

শুনইতে কানু মুরলীরব-মাধুরী
শ্রবণ নিবারলু [২] তোর।
হেরইতে রূপ নয়ন-যুগ ঝাঁপলু
তব মোহে রোখলি ভোর॥

সুন্দরি, তৈখনে কহলম [৩] তোয়।
ভরমহি তা সঞ্চে প্রেম বাঢ়য়বি [৪]
জনম গোঙায়বি রোয়॥
বিনু গুণ পরখি পরক রূপ-লালসে
কাহে সোঁপলি নিজ দেহা।
দিনে দিনে খোয়সি [৫] ইহ [৬] রূপ-লাবণি
জীবইতে ভেল সন্দেহা॥
যো তুহুঁ হৃদয়ে প্রেম-তরু রোপলি
শ্যাম জলদ-রস আশে।
সো অব নয়ন- নীর দেই সিঞ্চহ [৭]
কহতহি গোবিন্দদাসে॥

পাঠান্তর ঃ ১। 'সুহই' ২। নিবারলোঁ ৩। কহলমো, কহলুম 'কহল মো' ৪। 'বাঢ়ায়লি' ৫। 'খোয়বি' 'খোয়ায়বি' ৬। 'হেন' ৭। 'নীর ঘন সিঞ্চহ', 'নীর দেহ সিঞ্চহ', 'নীরে ঘন সিঞ্চহ'।

শব্দ-টীকা ঃ শুনইতে ... তোর—সখী রাধাকে বলছেন কানে (রাধার) হাত চাপা দিয়েছিলাম, পাছে শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর ধ্বনি শুনে তুই উন্মত্ত না হয়ে যাস'। 'হেরইতে ... ভোর—সখীর বক্তব্য' : আমি তখনই বলেছি, ভুল করে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে কৃষ্ণের রূপ দেখে আপন-হারা হয়ে একটা যদি কাণ্ডই করে ফেলিস, তখন তুই (রাধা) কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হয়ে আমার উপর রাগ করলি।' 'সুন্দরি ... রোয়'—হে সুন্দরি তখনই তোকে বললাম, যে ভুল করে (ভামহি) তার সঙ্গে প্রেমে অগ্রসর হলে সারা জীবন কেঁদে কাটাতে (গোঙায়বি) হবে। বিনু গুণ পরখি—গুণাগুণ পরীক্ষা না করে। বিনু...কাহে সোঁপলি নিজ দেহা—(শ্যামের) গুণের পরীক্ষা না করে, পরপুরুষের রূপে মুগ্ধ হয়ে কেন নিজের দেহ সমর্পণ করলি। দিনে...সন্দেহা—সখী বলছেন : (রাধা) তুই রূপ-লাবণ্য প্রতিদিন খোয়াচ্ছিস। এখন তুই বেঁচে থাকবি কি না সেটাই সন্দেহের ব্যাপার। যো... গোবিন্দদাসে—পদকর্তা গোবিন্দদাস বলছেন—তুমি (রাধা) শ্যামরূপ জলধরের জল পাবে আশা করে, হৃদয়ে প্রেমতরু রোপণ করেছিলে। এখন চোখের জলে তা সিঞ্চন কর। হয়তো তাতে আবার প্রেমতরু হবে সঞ্জীবিত।

২.৭.১ আলোচনা

এই পদটি কলহান্তরিতা পর্যায়ের। সখী রাধাকে বলছেন : রাধা তোর কানে হাত চাপা দিয়েছিলাম পাছে শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি শ্রবণে তুই পাগল হয়ে যাস। রাধার নয়নদুটি সখী হাত দিয়ে ঢেকেছিলেন যদি শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ রূপ দেখে আপনহারা রাধা কোনো এক কাণ্ড বাধাতেও পারেন। সখীর কথা : 'আমি তখনই বলেছিল্ম অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে তাঁর সঙ্গে যদি রাধা প্রেম করিস তো সারাজীবন কান্নায় ভাসতে হবে। গুণাগুণ পরীক্ষা না করে পরপুরুষের রূপলালসায় মত্ত হয়ে কেন রাধা নিজের দেহকেও সমর্পণ করলেন। দিনে দিনে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে (খোয়সি) রাধার রূপলাবণ্য।'

পদকর্তা গোবিন্দদাস সখীভাবে বলেছেন প্রবল বাতাস যেমন মেঘকে উড়িয়ে নিয়ে যায় মানিনী রাধা মানের প্রবল বাতাসে শ্যাপরূপী জলধরকে দূরে সরিয়ে দিলেন। এখন রাধার প্রেমতরুতে কে জল ছিটিয়ে দেবে? এখন দিবারাত্র 'হা কৃষ্ণ' 'হা কৃষ্ণ' বলে রাধা অশ্রুবর্ষণ করে নয়নজলে অভিসিঞ্চিত করুন তাঁর বড়ো সাধের প্রেমতরুটিকে। এইভাবেই রাধার বড়ো সাধের প্রেমতরুটি আবার হবে সঞ্জীবিত।

পদের শেষাংশ পদকর্তার বক্তব্য—কুলবতী রমণী যেন পরপুরুষের দিকে না চায়। আর যদি বা সেই প্রেমবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের পানে চায় তো ভুলেও যেন তাঁর সঙ্গে প্রেম করতে না এগোয়। আর যদিই বা প্রেম করে তবে সে প্রেমে যেন মনের স্পর্শ না লাগে।

২.৮ শ্রীরাগ

মনের [১] মরম কথা শুন লো সজনি।
শ্যামবন্ধু পড়ে মনে দিবস রজনী॥
চিতের আগুনি কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব॥
কোন বিধি সিরজিল কুলের বালা।
কৈবা নাহি করে প্রেম কার এত জ্বালা॥
কিবা সে মোহন [২] রূপ মন মোর বাঁধে।
মুখেতে না সরে [৩] বাণী দুটি আঁখি কান্তে [৪]॥
জ্ঞানদাস কহে সখি এই সে করিব।
কানুর পিরিতি লাগি যমুনা পশিব [৫]॥

পাঠান্তর ঃ ১। মনের শব্দটি কোনো পদেই নেই ২। 'কিবা সে মোহন রূপ' স্থলে 'কিবা রূপে কিবা গুণে' ; ৩। 'মুখেতে না সরে' স্থানে 'মুখে না নিঃসরে' ৪। অতিরিক্ত দুটি পঙ্‌ক্তির পাঠ পাওয়া যায়—'ঘরে হৈতে বাহির বাহির হৈতে ঘর। /দেখিবারে করি সাধ নহি সতন্তর'॥ ৫। সমগ্র পঙ্‌ক্তিটির স্থলে 'কানুর লাগিয়া আমি অনলে পশিব'।

শব্দ-টীকা ঃ মনের মরম কথা—মনের গভীর স্তরের কথা (অনুভূতি)। মনের ... সজনি—রাধা তাঁর সখীর কাছে ব্যক্ত করেছেন মনের গভীরতম অনুভবের কথা। শ্যাম...রজনী—দিন রাত্রি তাঁর শ্যাম-বন্ধুর কথা মনে পড়ে। চিতের...নিবারিব—মনের আগুন আর কত রাধা নিজের মনে নিবরাণ করতে পারবেন। না যায়... বলিব—রাধা কাকে কী বলবেন এতেও তাঁর কঠিন প্রাণ বেরোয় না। কোন ... বালা কোন্ বিধাতা তাঁকে যে কুলবতী করে সৃষ্টি করেছেন, রাধা তা জানেন না। কেবা ...জ্বালা—প্রেম কেই-বা না করে। কিন্তু রাধার মতো কার এত জ্বালা ! কিবা...বাঁধে—কৃষ্ণের মোহন রূপের কি অপরূপ সৌন্দর্য। সেই রূপই রাধার মনকে বেঁধে রাখে। মুখেতে...কান্দে—তিনি মুখে কিছু বলতে পারেন না। কিন্তু তাঁর দুটি চোখ কান্নায় ভেসে যায়। জ্ঞানদাস ...পশিব—ভণিতায় জ্ঞানদাস যেন রাধার হয়েই সখীকে বলছেন, শেষপর্যন্ত কৃষ্ণের প্রেমের জন্য রাধা যমুনায় প্রবেশ করবেন।

২.৮.১ আলোচনা

পদটি আক্ষেপানুরাগ পর্যায়ের। এখানে বিধাতা ও কৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ উচ্চারিত। রাধা শোনাচ্ছেন সখীকে তাঁর গভীরতম অনুযোগের কথা। দিনরাত্রি রাধার শ্যামবন্ধুর কথা মনে পড়ে। কিন্তু মনের আগুন মনের মধ্যেই চেপে রাখতে হয়। তাঁর কঠিন প্রাণ এতেও বেরোয় না। কোন বিধাতা কেন যে রাধাকে কুলবতী করে সৃষ্টি করলেন তা কে জানে ? সেই বিধাতার বিরুদ্ধেই রাধার সোচ্চার আক্ষেপ। কে না প্রেম করে ? কিন্তু রাধার মতো কার এত জ্বালা। কৃষ্ণের মোহনরূপে বাঁধা পড়েছে রাধার হৃদয়। কিন্তু রাধার মতো এত দহনজ্বালা কার ? রাধার মুখে কথা নেই। কিন্তু তাঁর চোখ দুটি জলে ভরপুর। ভণিতায় পদকর্তা জ্ঞানদাস বলছেন সখীকে—শেষপর্যন্ত কানুপ্রেমের জ্বালা সইতে না পেরে রাধা ডুব দেবেন অগাধ যমুনায়।

পদটিতে বিধাতার ও কৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ উচ্চারিত হলেও এখানে ফুটেছে রাধার কৃষ্ণকে না পাওয়ার অন্তর্দাহ। রাধা দগ্ধ হন গোপন প্রেমের যন্ত্রণায়। এই সুগুপ্ত প্রেমকে অস্বীকার করতে পারেন না রাধা। কৃষ্ণের

মোহন রূপে রাধার অন্তর মোহাবিষ্ট। এই রূপের তৃষ্ণা জ্ঞানদাসের রাধারই বৈশিষ্ট্য। অনুরাগ পর্যায়েও জ্ঞানদাসের রাধা 'রূপসাগরে ডুব' দেন। কখনও কৃষ্ণরূপের মায়ায় রাধার চোখে জল ঝরে। এখানেও কৃষ্ণসান্নিধ্য পাবার জন্য ব্যাকুল রাধা। জ্ঞানদাসের বেদনাবিদ্ধ রাধা যেন চণ্ডীদাসের বিরহিণী রাধার প্রতিরূপ। জ্ঞানদাসের পদে রাধার 'পিরীতি' সর্বনাশা। চণ্ডীদাসের মতোই জ্ঞানদাসের পদের ভাবকল্পনা। সখি সম্বোধনের এই পদটিতে রাধার মর্মবেদনার দাহ রসিক শ্রোতা উপলব্ধি করে।

২.৯ বড়াই হেরি দেখ

বড়াই হেরি দেখ রূপ চেয়ে।
কোথা হতে আসি দিল দরশন
বিনোদ বরণ নেয়ে॥
ঐ কি ঘাটের নেয়ে।
রজত কাঞ্চনে নাখানি সাজান
বাজত কিঙ্কিণী জাল।
চাপিয়াছে তাতে শোভে রাঙ্গা হাতে
মণি-বাঁধা কেরোয়াল॥
রজতের ফালি শিরে ঝলমলি
কদম্ব-মঞ্জুরী কানে।
জঠর পাটেতে বাঁশীটি গজেছে
শোভে নানা আবরণে॥
হাসিয়া হাসিয়া গীত আলাপিয়া
ঘুরাইছে রাঙ্গা আঁখি।
চাপাইয়া নায় না জানি কি চায়
চঞ্চল উহারে দেখি॥
আমরা কহিও কংসের যোগানি
বুকে না হেলিও কেহ।
জ্ঞানদাস কয় শশী যোলকলা
পেলে কি ছাড়িবে রাহু॥

পাঠান্তর ঃ পদটি কেবলমাত্র 'পদামৃত মাধুরী'র ৩য় খণ্ডে পাওয়া যায় (পদসংখ্যা ৩৮১)। তাই পাঠান্তর দেওয়া গেল না।

শব্দ-টীকা ঃ বড়াই ... নেয়ে—বিস্মিতা রাধা বড়াইকে সম্বোধন করে বলেছেন—কোথা থেকে এক বিনোদবরণ নেয়ে এসে দেখা দিল—'দেখ দেখ তার রূপ চেয়ে দেখ।' ঐ কি ... নেয়ে—(শ্রীকৃষ্ণের) রূপ দেখে রাধার মনেই হচ্ছে না যে ঐ রূপবানই নেয়ে। রজত ... কিঙ্কিণীজাল—সোনা-রুপো দিয়ে তার নৌকো সাজানো। তাতে কিঙ্কিণী বাজছে। কেরোয়াল—দাঁড়। চাপিয়াছে ... কেরোয়াল-নৌকাতে বসে থাকা নাবিক, কৃষ্ণের রাঙা হাতে মণিখচিত কেরোয়াল শোভা পাচ্ছে। রজতের ... আভরণে—মাথায় তার শোভা পাচ্ছে রুপোর টুকরো কাপড়। কানে কৃষ্ণের কদমফুলের মঞ্জরী। সে কোমরের কাপড়ে (জঠর পাটেতে) নিজের বাঁশিটি গুঁজেছে। তার গায়ে শোভা পাচ্ছে নানা রকমের অলংকার। হাসিয়া ... দেখি—সে হেসে হেন গানের আলাপ করছে আর রক্তিম আঁখি ঘোরাচ্ছে চারদিকে।

নৌকায় (রাধাকে) চাপিয়ে সে যে কি চায় তা জানা যাচ্ছে না। তাকে দেখছেন রাধা যেন চঞ্চল পুরুষ। আমরা কহিও ....বুকে না হেলিও কেহ—(রাধা সখীদের সাবধান করে বলছেন, নাবিক (কৃষ্ণ) জিজ্ঞাসা করলে সখীরা যেন বলে) তারা কংসের যোগানদার। কেউ যেন ভয় (হেলিও) না পায়। জ্ঞানদাস ... রাহু—জ্ঞানদাস বলছেন রাহু কি কখনও ষোলোকলায় পূর্ণ চাঁদ পেয়ে ছেড়ে দেয়?

২.৯.১ আলোচনা

পদটি নৌকাবিলাস পর্যায়ের। বড়াইয়ের সঙ্গে নদী পেরোবার জন্য কূলে এসে দাঁড়িয়েছেন রাধা। সে ঘাটে উপস্থিত কৃষ্ণ। কৃষ্ণের রূপ দেখে বিস্মিতা রাধা বড়াইকে বলছেন, বিনোদবরণ ওই রূপবান নেয়েকে (নাবিককে) 'নেয়ে' (মাঝি) বলে মনেই হচ্ছে না। সোনা রুপো দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের নৌকা সুসজ্জিত। তাতে বাজছে কিঙ্কিণী। নৌকায় বসে আছেন নাবিক কৃষ্ণ। তাঁর রাঙা হাতে আছে মণিখচিত কেরোয়াল (দাঁড়)। তার মাথায় আছে নানাধরনের অলংকারের ছটা। হেসে গান করছেন নবীন 'নেয়ে' কৃষ্ণ আর রাঙা আঁখি চঞ্চল হয়ে ঘুরে মরছে কার দিকে। নৌকায় চাপিয়ে কৃষ্ণ যে কি চান তা রাধা ও অন্য সবার অজানা। তিনি চঞ্চল। রাধা সখীদের সাবধান করে বলছেন তাঁরা যেন ওই নবীন 'নেয়েকে' বলে, যে তারা কংসের পসারিণী। কোনো সখী যেন পরপুরুষ কৃষ্ণকে দেখে ভয় না পায়। জ্ঞানদাস কৃষ্ণের পক্ষে তাই কৌতুক করে বলছেন, রাহু কি কখনও ষোলোকলায় পূর্ণ চাঁদকে পেলে ছেড়ে দেয়? চাঁদরূপী রাধাকে রাহুরূপী কৃষ্ণ গ্রাস করবেন।

নৌকাবিলাসের এই পদটি জ্ঞানদাসের কবিপ্রতিভার উজ্জ্বল উদাহরণ। তরুণ সুন্দর নাবিক কৃষ্ণকে দেখে রাধার রোমান্টিক বিস্ময়, পদটির বিশেষ ঐশ্বর্য। কৃষ্ণরূপমুগ্ধা রাধা অবশ্য পদের শেষাংশে আত্মস্থ হয়ে সাবধান করেন সখীদের। রাধার সাবধানবাণী বুঝিয়ে দেয় যে তিনি মনে মনে কৃষ্ণের সঙ্গ পাবার আশায় অধীর। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর নৌকাখণ্ডের স্থূলতা এ পদে নেই। লোকায়ত জীবনসম্নদ্ধ জ্ঞানদাসের এই পদটি অভিনব।

২.১০ নটবর নব কিশোর রায়

নটবর নব কিশোর রায় রহিয়া রহিয়া যায় গো।
ঠমকি ঠমকি চলত রঙ্গে ধূলি ধূসর শ্যাম অঙ্গে
হৈ হৈ হৈ [১] ঘন যে বোলত [১] মধুর মুরলী বায় গো॥
নীলকমল বদন চান্দ, ভাঙর ভঙ্গিম মদন ফান্দ
কুটিল অলকা তিলক ভাল কলিত ললিত তায় গো।
চুড়ে বহিয়া গোকুল চন্দ [২] কিবা পবন বয় [২] মন্দ মন্দ
মধুকর-মন হয়ে বিভোর নিরখি নিরখি ধায় গো॥
নয়ানে সঘনে উলটি উলটি হেরি হেরি পালটি পালটি
গোরী গোরী থোরি থোরি আন নাহিক ভায় গো।
বলরামদাস [৩] করতহি [৩] আশ রাখাল সঙ্গে [৪]সদাহ [৪]বাস।
বেত্র মুরলী, লইয়ে খুরলি, সঙ্গে সঙ্গে যায় গো॥

পাঠান্তর ঃ ১। বোলত ঘন ২। পবন বহয়ে ৩। করত ৪। সতত

শব্দ-টীকা ঃ নটবর—'সাধনদীপিকা' গ্রন্থে শব্দটির অর্থ করা হয়েছে—খণ্ডিত, বিখণ্ডিত, শ্বেত, নীল, বসন্ত, ও অরুণ বর্ণ বস্ত্রাদি যথাযথ ভাবে পরিধান করে উজ্জ্বল ও প্রচুর রসভঙ্গি করে শৃঙ্গার যিনি করেন তিনি নটবর অথবা তাঁর 'নটবর বেশ'। নটবর ... যায় গো—নটবর বেশধারী নব কিশোররাজ শ্রীকৃষ্ণ মন্থর গতিতে চলেছেন। ঠমকি ... অঙ্গে—'ঠমক' শব্দের অর্থ মন্দ মন্দ পদক্ষেপ বা ধীর পদক্ষেপের গমন। ধূলিধূসর শ্যাম ধীর পায়ে

চলেছেন মজা করতে করতে। হৈ হৈ হৈ ... বায় গো—ঘন ঘন রব উঠছে হৈ হৈ শব্দে। শ্যামরায় বাজাচ্ছেন তাঁর মধুর মুরলী। নীলকমল বদন চান্দ—শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্রখানি নীলকমলের মতোই সুন্দর। ভাঙর > ভাঙ (সিদ্ধি এক ধরনের মাদক দ্রব্য)। ভাঙর ... ফান্দ—শ্রীকৃষ্ণ যেন চলেছেন মাদকসেবীর মতো উন্মত্ত ভঙ্গিতে। কিন্তু তাঁর এই ভঙ্গিমা যেন মদনদেবের ফাঁস। অলকা-তিলকা—অলক শব্দের অর্থ ভঙ্গিযুক্ত কুটিল কেশ। 'তিলক'—মৃদমদ ও চন্দনে রচিত ফোঁটা। কুটিল ... তায় গো—এই শ্যামরায়ের ভালে কুটিল ভঙ্গিতে ভরা সজ্জিত কেশগুচ্ছ। কপালে কৃষ্ণর আরও রয়েছে মৃগমদ ও চন্দনের তিলক বা ফোঁটা। চুড়ে ... চন্দ—গোকুল চন্দ্র পরিধান করেছেন মাথায় ময়ূরপুচ্ছের চূড়া। কিবা ... মন্দ—আরামদায়ক শীতল বায়ু বইছে। অনিন্দ্য মূর্তি। বলরাম দাস (পদকর্তা) এই রাখালের (কৃষ্ণ) সঙ্গো থাকতে চান তাই লাঠি, বাঁশি নিয়ে সঙ্গো যান তিনি। আর গোষ্ঠযাত্রায় এই মধুর রসের মিশেল শ্রীরূপ গোস্বামীর সৃষ্টি।

২.১১ বৈষ্ণব পদাবলীর রসপর্যায় : আক্ষেপানুরাগ : সংজ্ঞা :

রামগোপাল দাস তাঁর 'রসকল্পবল্লী'তে পাঁচ ধরনের আক্ষেপানুসাগের কথা লিখেছেন এইভাবে ঃ

কৃষ্ণকে আক্ষেপ করে আর মুরলীকে।
দূতীকে আক্ষেপ করে আর যে সখীকে॥
গুরুজনে আক্ষেপ আর কুলশীলজাতি।
আপনাকে নিন্দে কভু দৈন্যভাবগতি॥
কন্দর্পেকে মন্দ বলে করিয়া ভর্ৎসনা।
বিপক্ষাদির ব্যঞ্জিয়া কভু করয়ে বঞ্চনা।
বিধাতাকে মন্দ বলে কভু দৈব রোষে।

প্রেমবৈচিত্ত্যের অংশ আক্ষেপানুরাগ। আক্ষেপানুরাগে রাধার স্থায়ী দুঃখকাতরতা অনুভব করা যায়। আক্ষেপানুরাগের মধ্যেই মহাভাবস্বরূপিণী রাধার সমাজ সংস্কার, নিজের অদৃষ্ট, কৃষ্ণের দেওয়া দুঃখ, এমনকী নিজের কাছ থেকে পাওয়া দুঃখেরই পূর্ণ পরিচয় আছে।

আক্ষেপানুরাগের শ্রেণিবিভাগ : প্রিয়-সম্বোধনের আক্ষেপ : এর মধ্যে আছে অনুনয় ও অভিযোগ। নায়কের নির্বিকার ঔদাসীন্য ও রাধার কাছে প্রেমের প্রলোভনও অমোঘ। তাই আত্মসমালোচনায় অন্তর্জ্বালা কমে নায়িকার :

সকলি আমার দোষ হে বন্ধু
সকলি আমার দোষ।
না জানিয়া যদি করেছি পিরিতি
কাহারে করিব রোষ॥

রাধার কণ্ঠে প্রেমের চিরন্তন বেদনার বাণী ব্যক্ত ঃ 'এমন ব্যথিত নাই যাকে বন্ধু বলি।' রাধার কঠিন অভিমান 'আমার যেমনতি হয়, তেমতি হউক সে। রাধা যে জ্বালায় জ্বলছেন কৃষ্ণও ভোগ করুন সেই দাহ।

বংশীনিন্দনের আক্ষেপ : 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের দর্পিতা চন্দ্রাবলী-রাহী 'গমার রাখোয়াল'—কৃষ্ণের বাঁশি শুনেই মোহিত ও মুগ্ধ। বিশুদ্ধ বাঁশের বাঁশি প্রাণের শেকড় ছিঁড়ে দেয়—চণ্ডীদাস বলেন ঃ 'কেশে ধরি লইয়া যায় শ্যামের নিকটে। /পিয়াসে হরিণী যেন পড়য়ে সঙ্কটে।।" তরল বাঁশির সুর যেন ডাকাতি করে ছিনিয়ে নেয় রাধার মন : 'ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করয়।' বংশীনিন্দনের শ্রেষ্ঠ পদটিতে সমাজের সঙ্গো আপস করার শেষ প্রয়াস আছে :

কালার লাগিয়া আমি হব বনবাসী।
কালা নিল জাতিকুল প্রাণ নিল বাঁশী॥

কামোন্মাদ কালিদাসের নায়ক যক্ষ যেমন অচেতন মেঘকেই দূত করে পাঠিয়েছিল অলকায় তার প্রিয়তমার কাছে রাধাও সেরকম জড় বাঁশির ওপর আক্রমণাত্মক ভাব নিয়েছেন। আসরে রাধা প্রেমে আত্মবিস্মৃত তাই চেতন-অচেতনের পার্থক্য গেছে ঘুচে।

স্বগত-কথনের আক্ষেপ : অন্যের সামনে করা হলেও আক্ষেপ ব্যক্তিগত। আক্ষেপানুরাগ পর্যায়ের মধ্যে 'স্বগত কথন'-এ দুটি আক্ষেপের প্রাধান্য—১) দেশে অনেক কীর্তিময়ী যুবতীরা আছেন তাঁদের বাদ দিয়ে রাধার ওপর এত কেন দোষারোপ ? ২) সমাজ প্রেমের ওপর হস্তক্ষেপ করে কেন ? প্রথম আক্ষেপটি স্পষ্ট, দ্বিতীয়টি রাধা সংকেতে বুঝিয়েছেন।

গোকুল নাগরে কেবা কি না করে
তাহে কি নিষেধ বাধা।
সতী কুলবতী সে সব যুবতী
কানু কলঙ্কিনী রাধা॥
অথবা
এ পাপ পড়শী ডাকিনী সদৃশী
সকল দোষয়ে মোরে॥

সখী সম্বোধনের আক্ষেপ : সখী সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাবনা এরকম ঃ

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায়॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজের সখীর সঙ্গে চণ্ডীদাসের সখীর পার্থক্য আছে। চণ্ডীদাসের সখীরা রাধার অধ্যাত্মসাধনার শরিক নন ; জ্ঞানদাসের সখীরা রাধাকে উপদেশ দেন আবার সহায়তাও করেন। তাই আক্ষেপানুরাগের পদে চণ্ডীদাসের রাধার সখীদের কটাক্ষ করে বলেন ঃ

তোরা কুলবতী দেখিলুঁ যুকতি
কুল লইয়া থাক ঘরে॥

পিরিতি গঞ্জনের আক্ষেপ : পিরিতি অর্থাৎ প্রেম হল সর্বনাশা। পরকীয়া প্রেমে অনেক বাধা। তাই মাঝে মাঝে রাধার মনে হয় কেন তিনি প্রেমে পড়লেন কারণ আধুনিক কবির গানেও আছে ভালোবাসার যন্ত্রণার কথা : 'ভালবাসা কারে কয় ? / সে কি কেবলি যাতনাময়॥' বেদনার অলংকৃত আক্ষেপ আছে এই শ্রেণির পদে :

কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি
ঘষিতে সৌরভময়।
ঘষিয়া আনিয়া হিয়ায় লইতে
দহন দ্বিগুণ হয়॥

আক্ষেপানুরাগের শ্রেষ্ঠ পদকর্তাদের পাঠ্য পদের আলোচনা ঃ 'চণ্ডীদাসের সর্বস্ব আক্ষেপানুরাগ এবং আক্ষেপানুরাগের সর্বস্ব চণ্ডীদাস'। চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবি অপেক্ষা পদাবলীর চণ্ডীদাস লোকগঞ্জনা ও সামাজিক সংস্কারকে প্রাধান্য দিয়েছেন বেশি। সমাজ যে প্রেমকে স্বীকৃতি দেয় না, গুরুজনরা নিন্দা করে, ভুবনে কলঙ্ক ঘোষিত হয়, তবু প্রেম অক্ষয় আনন্দের উৎস। চৈতন্যোত্তর কবি জ্ঞানদাসের আক্ষেপানুরাগের পদে চণ্ডীদাসের প্রভাব আছে। তবে জ্ঞানদাসের এই শ্রেণির পদে সখীরাই মুখ্য। সেখানে চণ্ডীদাসের মতো সমাজের রক্ত চক্ষুর নিষেধ নেই। সর্বজয়ী প্রেমই রাধার একমাত্র আরাধ্য বস্তু। সমাজরূপী সিংহের বিরুদ্ধে ভীরু হরিণী রাধার দুঃসাহসী যুদ্ধঘোষণাই চণ্ডীদাসের আক্ষেপে মূর্ত।

জ্ঞানদাসের পদের আত্মলীন সুর গভীর। কিন্তু চণ্ডীদাসের সঙ্গে মিল আছে। 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু / অনলে পুড়িয়া গেল'—এই বিখ্যাত পদটি আক্ষেপানুরাগের এবং চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত 'পদকল্পতরুতে' ড. বিমানবিহারী মজুমদার এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈষ্ণব পদাবলীর সংস্করণের সম্পাদকমণ্ডলী পদটিকে জ্ঞানদাসের ভণিতায় রেখেছেন। চণ্ডীদাসের রাধা আক্ষেপানুরাগ পর্যায়ের পদে নিজের ইন্দ্রিয়কেও বসে রাখতে অক্ষম ঃ 'যত নিবারিয়ে চাই নিবার ন যায় রে' ধরনের ভাবনাও আছে, আবার কৃষ্ণকে গঞ্জনার একটি শ্রেষ্ঠ পদ 'ধরম করম গেল'ও আছে।

চণ্ডীদাসের রাধার আক্ষেপে তাঁর নারীধর্ম, কুলধর্ম, গুরুজনের ভালোবাসা এ সবই অন্তর্হিত কারণ তিনি পরপুরুষ কানুর প্রেমে আত্মহারা। কিন্তু স্বগত-কথনের দুঃখে রাধার অভিযোগ : কে না করয়ে প্রেম আমি কলঙ্কী। / লোকনিন্দায় রাধা ঘরের বাইরে যেতে পারেন না। বিষ খেয়ে মৃত্যুবরণ করতে চান। সে যুগের সমাজে তিনি নারী অর্থাৎ কথা বলার স্বাধীনতা তো নেই-ই উপরন্তু তিনি ঘরের বউ। কানুর প্রেমের জ্বালায় রাধা পুড়ে মরতে চান। নিন্দিত কলঙ্কিনী জীবনে রাধা বিতৃষ্ণ। ক্ষুধাতৃষ্ণা দূরে গেছে কানু প্রেমের জ্বালায়। পরপুরুষ কৃষ্ণ রাধার প্রেমিক, তাই ঘরে ও অন্য জায়গাতেও রাধার এই অবৈধ প্রেমের আলোচনা চলে। চিন্তাজ্বরে জর্জরিত রাধার হৃদয়ে সুখ নেই। রাধা দুশ্চিন্তায় ব্যধিগ্রস্ত। সমস্ত শরীরে অস্থিরতাজনিত অসুস্থতায় রাধা শ্রান্ত। চণ্ডীদাসের ভণিতা সুন্দর। পদকর্তা চণ্ডীদাসের কথা হল এই যে স্থিরভাবে যদি প্রেমের অপবাদ রাধা সহ্য করতে পারেন তো ঘুচে যাবে সব অসুস্থতা। কানুর প্রেমে রাধা সমাজের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে নিশ্চয়ই হবেন বিজয়ী। রাধার মনের ভাবনা রবীন্দ্রনাথের গানে প্রকাশিত :

আমি তোমার প্রেমে হব সবার কলঙ্কভাগী।
আমি সকল দাগে হব দাগি॥
তোমার পথের কাঁটা করব চয়ন, যেথা তোমার ধূলার শয়ন
সেথা আঁচল পাতব আমার—তোমার রাগে অনুরাগী॥

চণ্ডীদাসেরই আর একটি পদও আক্ষেপানুরাগের স্বগতকথনের পদ। এ পদটি হল 'ধীক রহু জীবনে'। 'বন্ধু' সকলি আমার দোষ' শীর্ষক পদের ভাষাতেও রাধা নিজের প্রতি প্রেমের প্রতি আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলছেন না জেনে তিনি প্রেম করেছেন তাই কাকেই বা দোষ দেওয়া যায় ? কৃষ্ণরূপ প্রেমসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে রাধা পেলেন গরল। 'ধীক রহু জীবনে' পদটির মূল কথা প্রেমামৃত সমুদ্রে স্নান করতে গিয়ে অমৃত রাধার কাছে বিষ রূপে প্রতিভাত। শীতল ভেবে রাধা পাষাণ কোলে নিলেন। কিন্তু রাধার অন্তরের প্রেমের তীব্র দহনে সেই পাষাণও গলে গেল। ছায়াময় তরুর তলায় বনে গিয়ে বসেন রাধা দুদণ্ড জুড়োবার জন্য কিন্তু রাধাপ্রেমের উত্তাপে বনে জ্বলে ওঠে দাবানল। শীতল যমুনার জল তাঁর দেহের তাপে উত্তপ্ত হয়ে যায়। শেষপর্যন্ত রাধা বিষপানে আত্মহত্যা করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ :

পরের মুখের হাসির লাগিয়া অশ্রুসাগরে ভাসা।
জীবনের সুখ খুঁজিবারে গিয়া জীবনের সুখ নাশা॥

('ওলো রেখে দে সখী রেখে দে' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রেম পর্যায়ের গানের অংশবিশেষ)

বিধাতা ও সখী-সম্বোধনের আক্ষেপ : সখীকে সম্ভাষণ করে জ্ঞানদাসের রাধা তাঁর প্রেমের নিদারুণ ব্যথার কথা ব্যক্ত করছেন। মনের আগুন মনেই চেপে রাখতে হয়। এতেও কঠিন প্রাণ যে বেরোয় না। যে বিধাতা রাধাকে কুলকামিনী করে গড়ে তুলেছেন তাঁর প্রতিও রাধার আক্ষেপ কম নয়। জগতের সব নারীই প্রেমবাসনায় অধীর। রাধার মতো দাহ আর কার

'কেবা নাহি করে প্রেম কার এত জ্বালা'॥

শ্রীকৃষ্ণের মনোলোভা রূপে রাধার মন বাঁধা পড়ে গেছে। রাধা নির্বাক। তাঁর দুটি নয়নে জল ঝরে। শেষ পর্যন্ত রাধার আক্ষেপ কৃষ্ণপ্রেমের জ্বালা ভুলতে রাধা যমুনায় প্রবেশ করবেন :

'কানুর পিরিতি লাগি যমুনা পশিব' ॥

জ্ঞানদাসের আরও একটি আক্ষেপানুরাগের পদেও পিরীতি গঞ্জনের দুঃখ বর্ণিত :

সবাই বোলয়ে পিরীতি কাহিনী
কে বলে পিরীতি ভাল।
কানুর পিরীতি ভাবিবে ভাবিতে
পাঁজর ধসিয়া গেল ॥

কৃষ্ণের সর্বগ্রাসী প্রেম রাধার পক্ষে দেহক্ষয়ের কারণ। তাই 'পিরীতি'র ভাবনাও দেহমন জুড়ে আনে গভীর ভাঙন।

২.১২ বৈষ্ণব পদাবলীর রসপর্যায় অভিসার : সংজ্ঞা

অভিসার শব্দের অর্থ হল যাত্রা। সংকেত স্থানে গমনই যাত্রা নামে অভিহিত। ক্রমশ প্রেমিক ও প্রেমিকার মিলনের উদ্দেশ্যে পরস্পরের অভিমুখে যাত্রাই অভিসার রূপে চিহ্নিত। 'রসকল্পবল্লী'তে অভিসারিকার সংজ্ঞা হল :

'কান্তার্থিনী তু যা যাতি সংকেতং অভিসারিকা।' কান্তর উদ্দেশ্যে যে নারী সংকেত স্থানে গমন করেন তিনিই অভিসারিকা। 'গীতগোবিন্দ'-এর টীকায় অভিসারিকার সংজ্ঞা হল—

দুর্বার দারুণ মনোভাববহ্নিতপ্তা
পর্য্যাকুলাকুলিত মানসমাবহন্তি।
নিঃশঙ্কিনী ব্রজতি যা প্রিয়সঙ্গমার্থং
সা নায়িকা খলু ভবেদভিসারিকেতি ॥

দুর্বার ও দারুণ মদনদহনে উত্তপ্তা ব্যাকুলা নিঃশঙ্ক যে নায়িকা প্রিয়ের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য যাত্রা করেন তিনিই অভিসারিকা।

শ্রীরূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে অভিসারিকার যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সেখানে অভিসারিকার চিত্রটি এরকম :

যাভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং বাভিসরত্যপি।
সা জ্যোৎস্নী তামসী যান যোগ্যবেশাভিসারিকা ॥
লজ্জয়া স্বাঙ্গালীনেব নিঃশব্দখিলমণ্ডনা।
কৃতাবগুণ্ঠা স্নিগ্ধৈক সখিযুক্ত প্রিয়ং ব্রজেৎ ॥

'উজ্জ্বলচন্দ্রিকা'য় এর অনুবাদ :

অভিসার করায় কান্তে, নিজে অভিসরে।
জ্যোৎস্না তমোযোগ্য বেশ অভিসারে ধরে ॥
লজ্জাতে সম্বরি অঙ্গ নিঃশব্দ ভূষণ।
অঙ্গ ঝাঁপি চলে সঙ্গে সখী একজন ॥

অভিসারের আটপ্রকার সংকেতস্থান : 'রসকল্পবল্লী'তে অভিসারিকার সংকেতস্থান হিসেবে, নিকুঞ্জকানন, উদ্যান, জলশূন্য পরিখা, বাড়ির জানলা, নদীতীরের কণ্টকপূর্ণ বাঁধ, গৃহের পেছনের অংশ, ভাঙা মঠ-মন্দিরকে অভিসারের সংকেতস্থান হিসেবে গণ্য করা যায়। পীতাম্বর দাসের 'রসমঞ্জরী'তে আট ধরনের অভিসারের কথা বলা হয়েছে—

'সেই অভিসার হয় পুন আট প্রকার। / জ্যোৎস্নী তামসী বর্ষা দিবা-অভিসার। / কুজ্ঝটিকা তীর্থযাত্রা উন্মত্তা সঞ্চরা। / গীত পদ্য রসশাস্ত্রে সর্ব্বজনোৎকরা।।' বৈষ্ণবপদাবলীতে তিমিরাভিসারের বর্ণনাই বেশি। তবে গোবিন্দদাস শুক্লাভিসার, বর্ষাভিসারের বর্ণনা দিয়েছেন কাব্যময় ভাষায়।

সংস্কৃত সাহিত্যের অভিসার পর্যায় :

কালিদাসের অভিসারের ছবি :

গচ্ছন্তীনাং রমণবসতিং যোষিতং তত্র নক্তং
রুদ্ধালোকে নরপতিপথে সূচিভেদ্যৈস্তমোভিঃ।
সৌদামন্যা কনকনিকষস্নিগ্ধয়া দর্শয়োবীং
তোয়োৎসর্গস্তনিত মুখরো মাস্ম ভূর্বিক্লবাস্তাঃ।

জয়দেবের অভিসারও ধীর ললিত ছন্দে রচিত :

ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী।....
নামসমেতং কৃতসঙ্কোতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্॥
পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিতভবদুপযাত্রম্
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্॥
মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জরীম্ রিপুমিব কেলিষু লোলম।
চল সখি কুঞ্জং সতিমরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলম॥

কালিদাস লিখেছেন : 'অভিসারিকারা নীলাম্বরে দেহ ঢেকে সংকেত-স্থানে নিঃশব্দ চরণ-সঞ্চারে প্রিয়তমের কাছে যায়। প্রিয়তমের দিকে সূচীভেদ্য অন্ধকারে প্রাণের টানে তাদের যাত্রা। সেই সময় মেঘ যেন বিদ্যুতের রেখা দেখায়। বিজুরী যেন কিছুক্ষণ জলধরের গাঢ় কৃষ্ণ কলেবরে, (কষ্টিপাথরে) সোনার রেখার ন্যায় ঝিকমিক করে তা হলে সেই স্বল্পালোকেই রমণীরা তাদের পথ দেখতে পাবে। অন্ধকারে অপথে তারা যাবে না। সে সময়ে আবার যেন বৃষ্টি না আসে। মেঘ যেন তর্জন গর্জন না করে। অভিসারিণীদের প্রাণ শঙ্কাতুর তাতে আবার মেঘ যদি প্রতিবন্ধক হয় তো রমণীদের যাত্রার বিঘ্ন বাড়বে।" (মেঘদূত—কালিদাস)

জয়দেবের ভাষা-অনুবাদ এরকম : ধীরসমীরে অর্থাৎ মন্দ মলয় পবনে যমুনাতীরের বনে প্রতীক্ষারত শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয়তমা রাধার জন্য। তিনি রাধার নাম নিয়ে সংকেত দিয়ে মৃদু বাঁশি বাজাচ্ছেন পাখি উড়ে বসছে গাছের পাতা নড়ছে, সখি বলছেন '(শ্রীমতী) তুমি আসবে বলে তিনি শয্যা রচনা করেছেন এবং সচকিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন তোমার পথপানে।' ওই তোমার চঞ্চল মুখর নূপুর পরিত্যাগ করো, কারণ রসকেলির সময় অযথা বেজে শত্রুতা করে। অমা নিশার উপযুক্ত নীলাম্বরী পরে তিমিরাবৃত কুঞ্জে গমন করো।' কালিদাস জনপদবধূদের অভিসারের কথা লিখেছেন 'মেঘদূত'-এ। জয়দেব রাধাকৃষ্ণের কেলিরসের জন্যই, অভিসারের পরিকল্পনা করেছেন, এই ধারা অনুসরণ করেও বৈষ্ণব পদাবলীর পদকর্তা অভিসারিণী রাধিকার অভিসারকে চিরকালীন মানবজীবনের চিরন্তন যাত্রার সঙ্গে নিয়েছেন মিলিয়ে, আধ্যাত্মিকতায়।

অভিসার পর্যায়ের তত্ত্বগত তাৎপর্য : বৈষ্ণবপদাবলী বিরহ-মিলনের কবিতা। এর রসপর্যায়ে আধ্যাত্মিক কৃচ্ছসাধনের কথা আছে একমাত্র অভিসারের পদে। পথের কাঁটা মাড়িয়ে ঘোর অন্ধকারে অভিসারিকা চলেছেন, দুর্গম পথে এ যেন :

ক্ষুরস্য ধারা নিশিত দূরতয়া।
দুর্গমপথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥

ঘোর নিশীথে হৃদয়প্রদীপটি জ্বালিয়ে ক্ষুরধার দুর্গম পথে সেই পরমপুরুষের দিকে সকলেরই অনন্ত অভিসারের পথে চলা। কৃষ্ণ হলেন eternal fluteplayer —অনন্তের বংশীবাদক অন্তত বৈষ্ণবদের কাছে।

বৈষ্ণব লীলাবাদী—তার 'পথ চলাতেই আনন্দ'। 'পথও তাহার পরমও তাহার'। ভক্ত চলেছেন সেই কৃষ্ণের বাঁশির রবে আপনহারা হয়ে। রবীন্দ্রনাথ তাই লিখেছেন :

'যে অভিসারিকা তারই জয়,
আনন্দে সে চলেছে কাঁটা মাড়িয়ে।
ভুল বলা হোল বুঝি।
সেও তো নেই স্থির হয়ে যে পরিপূর্ণ,
সে যে বাজায় বাঁশি, প্রতীক্ষার বাঁশি,
সুর তার এগিয়ে চলে অন্ধকার পথে।
বাঞ্ছিতের আহ্বান আর অভিসারিকার চলা
পদে পদে মিলেছে একই তালে।
তাই নদী চলেছে যাত্রার ছন্দে
সমুদ্র দুলেছে আহ্বানের সুরে।'

ভক্ত শ্রীরাধা ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এধরনের মিলনের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য হল, প্রাকৃত লোকদৃষ্টির আড়ালে অলৌকিক ভাবমিলন—কুঞ্জে পরস্পরের মানসবিহার। এই অভিসারে ভগবান ও ভক্ত উভয়েরই পরম আগ্রহ। ভক্তকে ভগবানই বার করেন পথে। যদি প্রাকৃত জীবনে সংস্কারের মোহ কাটিয়ে ভক্ত সময় মতো পথে বেরোতে পারে না ; ভগবান সংকেত পাঠান। অনিত্যের বন্ধনমুক্ত হয়ে শ্রীরাধার মতোই ভক্তকে আপন প্রেমের ক্ষেত্রে টেনে আনাই অভিসারের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য।

বিদ্যাপতির অভিসারের পদ : বিদ্যাপতি অভিসারিকা রাধাকে মেঘরুচি বসন পরিয়ে, হাতে লীলাকমল ও তাম্বুল দিয়ে অভিসারে পাঠিয়েছেন। 'কুঙ্কুম পঙ্ক পসাহহ দেহ। /নয়ন যুগল তুঅ কাজের রেহ।।'—কুঙ্কুমচন্দনে দেহপ্রসাধন সেরে, নয়নে অঞ্জন এঁকে রাধা অভিসারিকা। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাভিসারে শুভ্রবস্ত্র পরিয়ে গজমতির হার দুলিয়ে দিয়েছেন রাধার গলায়। তাঁর অঙ্গসজ্জার সৌষ্ঠবে ও সৌন্দর্যে চোখ তৃপ্তি পায়। আবার বিনা সাজেই যেতে বলেছেন অভিসারিকা শ্রীরাধাকে :

'সহজ সুন্দর লোচন সীমা কাজর অঞ্চনের ন করু ভীমা'

পদকর্তা বিদ্যাপতি বলছেন 'তোমার লোচন স্বভাবতই সুন্দর কাজল দিয়ে তাকে ভয়ংকর করো না।'

সখীর ভূমিকা : বিদ্যাপতি বৈষ্ণব কবি নন তবু তাঁর পদাবলীতে সখী এবং দূতীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। যেমন—

তরুণ তিমির নিসি তইঅও চললি জাসি
বড় সখি সাহস তোর

'সন্ধ্যায় কালো আকাশ বর্ষার মেঘে অন্ধকার তবুও তুই অভিসারে যাচ্ছিস সখি ! বড় সাহস তোর'।

১ম পদ : পাঠ্য অভিসার পর্যায় পদের আলোচনা ঃ বিদ্যাপতি জানতেন অভিসারের প্রাণশক্তি কোথায় ? কামনামদির প্রেমেও নায়িকা অভিসারিকা, আবার আধ্যাত্মিক শক্তিতেও তাঁর দুর্জয় তপস্যা। তাই নবানুরাগিণী রাধা কোনো বাধাকেই গ্রাহ্য করেন না। কুলবধূ রাধা একাই চললেন দুর্গম অন্ধকারময় রাত্রিতে অভিসারের পথে। 'তেজল মণিময় হার'—হারকে ভার বলে মনে হলে তাই খুলে ফেললেন হার। শরীরের উচ্চকুচযুগলও যেন বাধাস্বরূপ। পথ ফেলে দিলেন হাতের কাঁকন আর আংটি। ভূষণহীনা রাজবালা কামদেবের আলোয় আলোকিত। পথ-অপথ সব বাধা ভেঙে তাঁর চিরন্তন যাত্রা পরমপ্রেমিক শ্রীকৃষ্ণের কাছে। ঘন অন্ধকারে আবৃত তামসী নিশি। পথে আছে বহু সংকট ও বিপদ। প্রেমের অস্ত্রে শক্তিময়ী রাধা সমস্ত বিঘ্ন কাটিয়ে প্রেমভিক্ষু আভরণহীনা রমণীর

মতো চলেছেন অভিসারের সংকেতকুঞ্জে। অঙ্গারাগ বা অলংকার এ সব রাধার কাছে তুচ্ছ, অনুরাগই রাধার কাছে সর্বপ্রধান। শ্যামের অনুরাগে ধন্যা হতে পারলে সাজগোজ আর ভূষণের প্রয়োজনই বা কি ?

২য় পদ : দ্বিতীয় পদটি বিদ্যাপতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিসারের পদ। বর্ষাভয়ংকর রাত্রির বর্ণনায় বিদ্যাপতি অনন্য। উৎকৃষ্ট বিদ্যাপতির কবিকল্পনা। তাই অন্ধকারেরও দারুণ সৌন্দর্য : একালের কবির ভাষায় বলা যায় :

উদয়াস্ত দুই তটে অবিচ্ছিন্ন আসন তোমার,
নিগূঢ় সুন্দর অন্ধকার।

('অন্ধকার'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'পূরবী')।

পদটি পাঠ করলে পাঠকের মনে হয় কাকে সে দেখবে অন্ধকারকে না রাধাকে ? মেঘপুঞ্জে পুঞ্জিত আকাশ, বিদ্যুতের আলোও সেই গাঢ় অন্ধকারকে বিদীর্ণ করছে না। দুরন্ত সর্প আর নিশ্চল নিশাচরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত রাধার অভিসারের পথ শঙ্কাকীর্ণ। এত ভয়ংকর পথ তবু কেন এই অভিসার ? বালিকা রাধার হৃদয়ে প্রেমের দেবাতর রোষবিহ্বল ব্যাকুলতা। তাই ওই নিশ্চল নিষেধের অন্ধকারে রাধা চলেছেন যেন দুর্জয় সাহসিকা নারী। বিদ্যাপতির মনও ভয়াতুর হয় রাধার দৃঢ়সংকল্পে—'পথের শেষ কোথায়' রাধার এই ভাবনার সঙ্গে পাঠকের মনও ত্রস্ত।

তাই রাত্রি যেন কাজল উদ্‌গিরণ করছে। এ সময়ে কেউ যেন পথে না বেরোয়। সখিকে বলেন রাধা মনে জাগছে সন্দেহ। পথে যেতে কপালে অমঙ্গল লেখা থাকলে দুঃখ কেন ? যা ঘটার তা ঘটুক। চাঁদও তো রাহুগ্রাসে পড়ে। ঘন ঘন বজ্রপাত হচ্ছে কিন্তু অন্ধকারের বন্ধু বিদ্যুতের দেখা নেই, তবু রাধা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কানুর কাছে সেই বিশ্বাস ভঙ্গ করার জন্য তিনি ভীত ও লজ্জিতও হয়ে পড়ছেন ঃ

'সজনি বচন ছড়ইত মোহি লাজ'।

মেঘ ও ভয়ংকর সর্প রাধার সঙ্গি। মুখর নূপুরও শব্দ করে না। নৈঃশব্দ্যের অন্ধকার পথ শেষ হতে চায় না—বিদ্যাপতি অথবা রাধআই জিজ্ঞাসা করছেন ঃ

'সুমুখি পুছওঁ তোহি সকল কহসি মোহি
সিনেহক কত দূর ওর

বিদ্যাপতি ডাকেন তাঁর আরাধ্য হরি ও শিবকে, যেন রাধার তপস্যা সার্থক হয়। হরির প্রেম ছাড়া রাধার জীবনের কীই বা মূল্য ? সেই প্রেম লাভ না করতে পারলে এই বজ্র-সচকিত ত্রস্ত শর্বরীতে রাধার শরীর চলে যাবে অন্য লোকে।

প্রেমের সীমা সম্বন্ধে রাধার প্রশ্নের উত্তর এ পদে নেই। রাধার প্রশ্ন—কত সহ্য করবেন, কত দুঃখসাগর পেরোতে হবে—প্রেমের দাবি কতদূর ? এই মানসিক ক্লান্তি পার্থিব প্রেমের। স্বাভাবিক সংশয়ের লৌকিক জিজ্ঞাসা ফুটেছে এই পদটিতে। আধ্যাত্মিক প্রেম অনেক বেশি যন্ত্রণাবিদ্ধ। তবু বিদ্যাপতির অভিসারের পদ ব্রজবুলির সুমধুর ধ্বনিঝংকারে ও কাব্যিক পরিমণ্ডলে ঘন বর্ষার পটভূমিকায় এক অনবদ্য সৃষ্টি।

অভিসারের পদে কবি গোবিন্দদাস : অভিসার পদে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাস। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদ :

কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জির চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করু পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি॥

রাধা আঙিনায় কাঁটা পুতে, পদ্মের মতো চরণদুটিকে রক্তাক্ত করেন। দুর্গম পথে যাবার জন্য উঠোনে জল ঢেলে পিছল করে আঙুল টিপে হাঁটছেন। দুস্তর সাধনা করছেন সুন্দরী মাধবকে পাবার জন্য।

'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়'-এ এবং পরবর্তী কয়েকটি পদ-সংগ্রহ গ্রন্থেও এই ধরনের ভাবচিত্রময়ী সংস্কৃত শ্লোক পাওয়া যায় ঃ

মার্গে পঙ্কিনি তোয়দান্ধতমসে নিঃশব্দ সংচারকং
গন্তব্যা দয়িতস্য মেহদ্য বসতির্মুগ্ধেতি কৃত্বা মতিম্।
আজানুদ্ধৃতনূপুরা করতলেনাচ্ছাদ্য নেত্রে ভৃশং
কৃচ্ছ্রালব্ধপদস্থিতিঃ স্বভবনে পন্থানমভ্যস্যতি ॥

'পঙ্কিল পথে মেঘান্ধকারে নিঃশব্দ সঞ্চারণে আজ আমার দয়িতের বাসস্থানে যেতে হবে।—এই মনে করে এক মুগ্ধা রমণী নূপুর জানু পর্যন্ত তুলে, দুহাতে চোখ ঢেকে কষ্টে পা ফেলে নিজের ঘরে পথ চলার অভ্যাস করছে।' শাস্ত্রজ্ঞ কবি গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির যথার্থ উত্তরসূরি।

গোবিন্দদাসের পদে কাব্যময়তা বেশি। পাঠক-চেতনাকে সঞ্জীবিত করার শক্তি আছে গোবিন্দদাসের। তুলনায় বিদ্যাপতির পদের রাধার উন্মাদনা সীমাবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ যে মহৎ ভাবে ভাবিত হয়ে লেখেন 'পুনশ্চ'র 'শিশুতীর্থ' কবিতা। অথবা যুগ হতে যুগান্তর পানে মানবযাত্রীর যে চিরন্তন অভিসারের কথা বলেন গোবিন্দদাসের অভিসারের পদেও সেই প্রেরণাই মুখ্য। এ যেন উপনিষদের 'চরৈবেতি' মন্ত্র। 'গোবিন্দদাসের অভিসার যেন প্রতীক অভিসার'। এটি উৎকৃষ্ট ধর্মগীতি—'অভ্যাসযোগের শাস্ত্রকাব্য'। অধ্যাত্মপথে বিঘ্নলঙ্ঘনের সিদ্ধিকাব্য—বলা যেতে পারে পরমপুরুষকে পাওয়ার বা জয় করার কবিতা। গোবিন্দদাস যেন মানবাত্মার অভিসারের কবি।

গোবিন্দদাসের পাঠ্য পদের পর্যালোচনা : গোবিন্দদাসের রাধা একান্তভাবেই চৈতন্যোত্তর কালের পরকীয়া নায়িকা। রাধা তাই বলেন 'কুলব্রত (কুলধর্ম) রূপ কঠিন কবাট অর্থাৎ নিষেধের বাধা খুলতে পেরেছি, কাঠের বাধা তার তুলনায় কতটুকু। আত্মমর্যাদার সাগর পার হলাম, সে তুলনায় তটিনী আর এমনকী অগাধ।' সখী আমাকে আর পরীক্ষা করো না—'সজনি মঝু পরিখন কর দূর।'

যার ওপর কোটি কুসুমশর নিক্ষিপ্ত হয়েছে তার আর বর্ষার জলধারাতে ভয় নেই। তিনি প্রেমিকা—রাধা, তাঁর হৃদয়ে জ্বলছে প্রেমের অনির্বাণ শিখা। রাধা ভাবেন সেই 'গোপীজনবল্লভ' 'প্রেমলম্পট' শ্রীকৃষেমর আগ্রাসী প্রেমের কথা। শ্রীকৃষ্ণ পথ চেয়ে বসে আছেন তাঁর জন্য, একথা ভাবলেই রাধার সমস্ত অন্তরাত্মা কাঁদে। রাধা সহ্য করেছেন কোটি কুসুমশরের যন্ত্রণা। কাজেই মেঘ ও বারিধারাকে তিনি ভয় করবেন কেন ? প্রেমদহনে যিনি দগ্ধ ও সর্বংসহা তিনি বজ্রাগ্নির দাহকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। সেই পরমপুরুষের পদতলে কুল, শীল, মান সমস্ত ত্যাগ করে রাধা সমর্পণ করেছেন নিজেকে, দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে। তাঁর সে প্রেম মৃত্যুঞ্জয়ী। অভিসারে যেতে যেতে যদি রাধা মৃত্যুও বরণ করেন তখনও হয়তো বলবেন 'মরণ রে তুঁহুঁ মম শ্যামসমান'। রাধার তপস্যা শেষও হয়েছে—পেয়েছেন তিনি তাঁর কান্তকে। ভাবগৌরবে, শব্দচিত্রে, অধ্যাত্মভাবনায় গোবিন্দদাসের অভিসারের পদ বাংলা সাহিত্যের বিশেষ সম্পদ।

উপসংহার : অভিসার বৈষ্ণব পদাবলির অন্যতম প্রধান ও শ্রেষ্ঠ রসপর্যায়। এই প্রেমের অভিসারে কত মানুষ বাঁশি শুনে গৃহহারা ঃ

'তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে ...
তারি লাগি

রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক। মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন ...
তারি পদে মানী সঁপিয়াছে মান,
ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ,
তাহার উদ্দেশে কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গান
ছড়াইছে দেশে দেশে' (কবিতা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

সেই 'লক্ষ' গানের রচয়িতা অভিসার পর্যায়ের পদকর্তারা। অভিসার বাহ্যিক নয় এ হল মানবাত্মার অনন্ত অভিসার।

২.১৩ গোবিন্দদাসের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের রূপ

শ্রীচৈতন্যোত্তর যুগের পদকর্তা গোবিন্দদাস জয়দেব ও কবি বিদ্যাপতির সার্থক উত্তরসূরি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় দর্শনে নিষিক্ত গোবিন্দদাসের ভক্তচিত্তের ইষ্টদেবতা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা। গোবিন্দদাস মহাপ্রভুর শিক্ষায় ভাবিত। শ্রীচৈতন্যর বাণী ঃ 'ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নায়ক শিরোমণি, / নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরাণী।' গোবিন্দদাস শ্রীকৃষ্ণ ও রাধাকে এইভাবেই লক্ষ করেছেন, ভক্তিনত চিত্তে তাঁদের রূপ বর্ণনা করে কবি ধন্য। তাঁর শ্যামসুন্দরের বর্ণনা জয়দেবের 'কোমল-কান্ত-পদাবলীর' মতোই মধুর :

ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পঙ্কজকলিলতম্।
ব্রজবনিতাকুচ কুঙ্কুমললিতম্॥
বন্দে গিরিবরধরপদকোমলম্।
কমলাকর কমলাঞ্চিতমমলম্॥

জয়দেবের সুর-ঝংকার গ্রহণ করেও গোবিন্দদাসের ভঙ্গি সম্পূর্ণ নিজস্ব।

কবি গোবিন্দদাস অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদের মতো রূপবর্ণনায় সুপটু। ভালোবাসার নিয়মই এই যে প্রিয়জনকে সর্বগুণবিভূষিত ও সকল সৌন্দর্যের আধাররূপে প্রতিপন্ন করে। সেই ইষ্টদেবতার রূপ বর্ণনা করার সময় গোবিন্দদাস ধ্যানবিষ্ট, রূপতন্ময় ও সচেতন শিল্পী। জ্ঞানদাসের রূপানুরাগ স্বরূপানন্দ কিন্তু গোবিন্দদাসের রূপবর্ণনায় আছে সাধকচিত্তের তন্ময় ভাব :

নবঘন পুঞ্জ পুঞ্জ জিতি সুন্দর
অনুপম শ্যামর শোভা।
পীত বসন জনু বিজুরী বিরাজিত
তাহে চাতক মনোলোভা॥
পেখলুঁ সুন্দর নন্দকিশোর।
কালিন্দতীরে তীরে চলি আওত
রাধা-রতিরসে ভোর।

এই পদটির কবিত্ব স্বমহিমায় উজ্জ্বল। দেহের বহিরঙ্গের বর্ণনায় শব্দচিত্রময়ী ও ভাবধর্মী। রাধার প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ বিভোর তাই তার পদচারণা একটু বিহ্বল। উপমা নির্বাচনে গোবিন্দদাস অনবদ্য। বিস্ময় তাঁর গাঢ়—তাই তাঁর styleও অনন্য—যাকে বলা যায় যথার্থ শিল্পীজনোচিত। এই পর্যায়ের আরও একটি সুন্দর পদ :

অরুণিত চরণে রণিত মণিমঞ্জীর
আধ আধ পদ চলনি রসাল।

কাঞ্চন-বঞ্চন বসন মনোরঞ্জন
অলিকুল মিলিত ললিত বনমাল ॥

এসব পদের কাব্যসৌন্দর্য বর্ণনাতীত। গোবিন্দদাস অভিসার, রসোদ্গারের শ্রেষ্ঠ কবি। গোবিন্দদাসের চৈতন্যবন্দনাও ভক্তের দৃষ্টিতে দেখা এক সজীব চিত্র। আবার কলহান্তরিতার পদেও কবি অনন্য।

পাঠ্যাংশের শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা বিষয়ক পদটির পর্যালোচনা : গোবিন্দদাস বলছেন নন্দরাজার পুত্র শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের সুগন্ধ যেন চন্দনের গন্ধের মতোই পবিত্র ও সুন্দর। নবমেঘের মতো শ্যামের গায়ের রং। কিন্তু চন্দচন্দনের গন্ধকেও হার মানায় শ্রীকৃষ্ণের গায়ের সুগন্ধ। শঙ্খের মতো তাঁর গ্রীবা যার কাছে হস্তীর ভঙ্গিও তুচ্ছ। এরপরেই এসেছে বৃন্দবানের কথা ঃ

প্রেম আকুল গোপ গোকুল
কুলজ কামিনী কন্ত

গোকুলে কুলবধূদের তিনি প্রেমিক। পুষ্পের রঙও যেন তাঁরই হৃদয়ের রঙে রঞ্জিত। নিকুঞ্জ গৃহের সুন্দর বেতসকুঞ্জ ফুলে ফুলে বর্ণময়। সেই নিকুঞ্জের গুরু হলেন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর গণ্ডদেশে দুলছে কুণ্ডল। আর মাথার চূড়ায় উড়ছে ময়ূর পাখা। শ্রীকৃষ্ণের স্তোত্রেও সেই একই ছবি ঃ

বেণুবাদনশীলায় গোপালায়াহিমর্দ্দিনে।
কালিন্দীকুললোলায় লোলকুণ্ডল্বল্গবে ॥
বল্লবীনয়নাম্ভোজমালিনে নৃত্যশালিনে।
নমঃ প্রণতপালায় শ্রীকৃষ্ণায় নমোনমঃ ॥

নিকুঞ্জে রাধার সঙ্গে কেলিকলার তাণ্ডবে তিনি তাল দেওয়ার ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের বিদগ্ধ ব্যক্তি। সুদৃঢ় কৃষ্ণের বাহুযুগল দণ্ডকেও দণ্ডিত করে। কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ পাপনাশকারী। তাঁর বাণী শ্রুতিসুখকর। তাঁর নির্মল কোমল পায়ের পাতা গোবিন্দদাসের একমাত্র আশ্রয়। এখানে ভক্তের প্রার্থনার সঙ্গে মিশেছে গোবিন্দদাসের কাব্যিকতা।

পদটির কাব্যসৌন্দর্য : ছন্দনৈপুণ্যে গোবিন্দদাস অভিনব শৈলীর অধিকারী। পজ্ঝটিকা, নরেন্দ্রবৃত্তছন্দ তাঁর পদে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত। চর্চরী ছন্দের শ্রীকৃষ্ণের রূপ এই পদটিতে মূর্ত—

নন্দ : নন্দন । চন্দ : চন্দন ॥ গন্ধ : নিন্দিত। অঙ্গা।
জলদ : সুন্দর। কম্বু : কন্ধর ॥ নিন্দি : সিন্ধুর । ভঙ্গা।

অনুপ্রাসের ঐশ্বর্যে গোবিন্দদাসের পদাবলী পূর্ণ। যেমন :

নন্দ নন্দন চন্দ চন্দন গন্ধ নিন্দিত অঙ্গা।
জলদসুন্দর কম্বুকন্ধর নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গা ॥

'ন্দ' ব্যবহৃত হয়েছে পাঁচবার প্রথম পঙ্‌ক্তিতে। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে 'ন্দ' দুবার অনুরণিত। এছাড়া অঙ্গা ও ভঙ্গোর মিল আছে। বলা যায় অন্ত্যানুপ্রাস তো হয়েইছে। কন্ধর ও সিন্ধুর মিলে বৃত্ত্যানুপ্রাসের স্বাদও আছে। ধ্বনিঝংকৃত পদটির সৌন্দর্য অভিনব।

২.১৪ বৈষ্ণব পদাবলীর কলহান্তরিতা পর্যায়

উৎকণ্ঠিত নায়িকার বেদনার রূপকার গোবিন্দদাস। কুঞ্জে এসেছেন অভিসারিকা রাধা কিন্তু নাগর প্রেমিক শ্যামসুন্দর তখন অন্য নারীর আলিঙ্গানে বদ্ধ। উৎকণ্ঠিতা নায়িকার কাছে প্রভাতে রমণীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ অন্য নারীর সম্ভোগচিহ্ন বুকে নিয়ে এসেছেন। 'নখপদ হৃদয়ে তোহারি' শীর্ষক পদটিতে রাধা বলছেন কৃষ্ণের হৃদয়ে অন্য নায়িকার নখের আঘাত। পদাঘাতের চিহ্ন বুকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ রাধার প্রেমাকাঙ্ক্ষী। রাধা সারা রাত জেগে ছিলেন

প্রিয়তমের জন্য। কৃষ্ণও রাত কাটিয়েছেন অন্য রমণীর কুঞ্জে। তাঁর নয়নদ্বয় লাল। কৃষ্ণ গদগদ গলায় রাধার স্তুতিবাদ করলেও রাধার দুর্জয় মান। কৃষ্ণ নিজের দোষ ঢাকার জন্য কৌশলী—রাধা যাকে নখচিহ্ন বলে ভুল করছেন তা আসলে কুমকুমের চিহ্ন। কাজল হল কৃষ্ণের মৃগমদ। ফাগবিন্দুই রাধার কাছে সিঁদুর বলে প্রতিভাত হচ্ছে। কৃষ্ণের এই চাটুকারিতা ও মিথ্যাভাষণ ধৃষ্ট নায়কের লক্ষণ। কবি গোবিন্দদাস শ্রীরূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি'র অনুসারী। খণ্ডিতা রাধা আর ধৃষ্ট কৃষ্ণের কথোপকথন বেশ নাটকীয়।

কলহান্তরিতা নায়িকা নীরব। রাধা প্রত্যাখ্যান করছেন কৃষ্ণবল্লভকে। 'প্রেম আগুনি' শীর্ষক পদে সখীর বক্তব্য শ্রীকৃষ্ণ নিকুঞ্জে প্রেমাগ্নিতে দগ্ধ। রাধা কেন মান করছেন ? রাধাবিরহে শ্রীকৃষ্ণ চন্দনলিপ্ত দেহে পদ্মপাতার শয্যায় শুয়েও বড়ো অস্থির। পরে মানিনী রাধা শান্ত হন। কৃষ্ণকে দূর করে কৃষ্ণসঙ্গ লাভের জন্য তিনি অধীর। 'আন্ধল প্রেম' পদটিতে রাধার দুঃখ আরও চরম। আদর পেয়ে পেয়ে রাধা ভুলে গেছেন কৃষ্ণ বহুবল্লভ। শ্রীরূপ কলহান্তরিতার পদে লিখেছেন :

প্রাণমন্তঞ্চদয়িতমনুবারম্।
হস্ত সনাতনগুণমভিযান্তম্॥
কিমবধাবয় মহমুরসি ন কান্তম।

অনুবাদ : তাঁর চিরন্তন প্রাণের দয়িত ফিরে গেলেন। তাঁর সেই গুণপূর্ণ হাতখানি কেন রাধা বক্ষে ধারণ করলেন না ? রাধা অনুতপ্ত। এই পর্যায়ের একটি পদে রাধার দুঃখকে আরও বাড়িয়েছেন সখী। সেটি পাঠ্যাংশের পদ। গোবিন্দদাসের কবিভাবনায় পদটি নাটকীয় ও ব্রজবুলির মুখরতায় মধুর।

পাঠ্যাংশের পদের বৈশিষ্ট্য : সখী ও রাধার কথোপকথনে কলহান্তরিতা রাধার ভাবমূর্তিটি জীবন্ত। 'শুনইতে কানু' শীর্ষক পদটিতে সখী বলেন কৃষেমর বংশীধ্বনি যাতে রাখান কানে প্রবেশ না করে সেজন্য রাধার চোখ দুটি তিনি বন্ধ করতে উৎসুক ছিলেন। প্রেমাতুর রাধা সখীকে বাধা দিয়েছিলেন—কৃষ্ণের বাঁশির ধ্বনি শুনলে রাধার মনে হয় তিনি ঘর ছেড়ে পথে বেরোবেন।

সখী জানতেন ভুল করেও কুলনারী রাধা যদি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রেম করেন তো সারা জীবন জ্বলে পুড়ে মরতে হবে। চোখের জলে ভেসে যাবে রাধার চোখ দুটি। কৃষ্ণ ছাড়া রাধার অস্তিত্বই বিপন্ন। রাধা শ্রীকৃষ্ণের গুণাগুণ পরীক্ষা না করেই রূপমোহে নিজের দেহকে সমর্পণ করেছেন মাধবের চরণপদ্মে। কৃষ্ণের ওপর মান করে পরে অনুতপ্ত শ্রীরাধা দুঃখে জর্জরিত। তাঁর অপূর্ব রূপলাবণ্য ক্ষয়িত হচ্ছে কৃষ্ণের কথা ভেবে ভেবে। রাধার বেঁচে থাকাই দায় হয়েছে। কৃষ্ণরূপ মেঘ থেকে বারিবর্ষণের আশায় যে প্রেমবৃক্ষ রাধা হৃদয়ে রোপণ করেছিলেন—দিনে দিনে সেই প্রেমতরুটিকে রাধা বাঁচিয়ে রাখবেন নয়নাশ্রুর লবণাক্ত ধারা দিয়ে। কলহান্তরিতা রাধার প্রেমার্তি ও যন্ত্রণা ব্যক্ত হয়েছে তাঁর সখীর কাছে। সখী প্রথমে রাধাকে তিরস্কার করেছেন—পরে বুঝেছেন কৃষ্ণ ছাড়া রাধার জীবন বিপন্ন। চোখের জলেই কৃষ্ণপ্রেমের তরুটিকে সিঞ্চিত করতে হবে এখন। মানিনী হয়ে যাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন সেই কৃষ্ণকে প্রেমের মন্ত্রেই জয় করতে হবে নতুবা রাধার পরিত্রাণ নেই।

রাধার সেই মরণান্তিক দুঃখের আক্ষেপোক্তি নিদারুণ, তাই অন্য একটি পদে রাধা বলছেন :

যাকর চরণ নখর-রুচি হেরইতে
মুরছয়ে কত কোটি কাম।
সো মঝু পদতলে ধরণী লোটায়ল
পালটি না হেরল হাম।

যাঁর চরণের নখের শোভা দেখার জন্য কোটি কোটি কামনা মূর্ছা যায় অথবা কামদেবও অজ্ঞান হন। 'সেহেন সুন্দর (শ্রীকৃষ্ণ) পুরুষ আমার পায়ের তলায় ধরণীতে (ধুলায়) লুটিয়ে পড়ল। আমি ফিরেও সেই পুরুষের দিকে

চাইলাম না।" অনুতপ্তা রাধার এই আত্মসমালোচনা প্রকৃত ভালোবাসারই রূপায়ণ। কলহান্তরিতা নায়িকার অন্তর্দাহ যেন হৃদয়ের অন্তর্যামিনী। প্রেম যে বিরহের মধ্যেই স্ফূর্তি পায় সে কথা ইংরেজ কবি Shelley ও বলেছেন 'Our sweetest songs are those that tell of saddest thgouht'—কাছে কৃষ্ণ নেই, তাঁকে দূরে সরিয়ে কলহান্তরিতা রাধা গভীর বিরহবেদনায় মগ্ন।

২.১৫ নৌকা ও দানলীলা পর্যায়

শ্রীচৈতন্যোত্তর কালের পদাবলিতে দানলীলা ও নৌকালীলার পদ সমাদৃত। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ নৌকালীলা ও দানলীলার প্রসঙ্গ আছে। রাধা অনিচ্ছুক হলেও নৌকার কাণ্ডারি কৃষ্ণ তাঁর যৌবন দাবি করেছিলেন দান হিসেবে। পরবর্তী কালে রাধার মনের প্রতিবন্ধকতা কেটে গেছে নৌকালীলার সময় সন্ত্রস্ত হয়েও তিনি স্বচ্ছন্দ। প্রাচীন কবিদের রচনায় 'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ 'রাধাতন্ত্র'-এ নৌকালীলার পূর্বসূত্র মেলে। ভারখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। 'শ্রীমদ্‌ভাগবত'-এর টীকায় সনাতন গোস্বামী চণ্ডীদাসের দান ও নৌকাখণ্ডের উল্লেখ করেছেন। রূপগোস্বামীর 'দানকেলিকৌমুদী' সংকলন-গ্রন্থের 'পদ্যাবলী'-তে যথাক্রমে দানলীলার বিবরণ ও নৌকালীলার পদ আছে। কৃষ্ণ নেয়ে সেজে রাধা ও সখীদের পার করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন :

মানস গঙ্গার জল ঘন করে কল কল
দুকূল বহিয়ায যায় ঢেউ।
গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাঢ়িল বেগ
তরণি রাখিতে নাহি কেউ॥

যেদিন মানসগঙ্গা উত্তাল হয়ে ওঠে, ঘন মেঘাচ্ছন্ন সেই অকূল নদীতে কে যাবে 'তরণী বেয়ে'। নৌকাবিহারের আর একটি পদে শব্দব্যঞ্জনা ও অর্থব্যঞ্জনা দুয়ে মিলে পদটি রহস্যাবৃত ও মনোরম :

কয়ে তুলি কেরি করি ডুবিল ডুবিল তরী
ফের হাল খসি পইল জলে।
পবনে পাতিল ঝড় তরঙ্গা হইল বড়
বুঝি আজ কি আছে কপালে॥
একূল ওকূল দুকূল নিরাকুল
তরঙ্গো তরণী স্থির নয়।
আমি কি করিব বল উথলে যমুনা জল
কাণ্ডার করেতে নাহি রয়॥

তবে নৌকালীলাবিষয়ক শেষ পদে এই ধরনের পদাবলির তাৎপর্য কবি বুঝিয়ে দিয়েছেন :

ওহে নাবিক কে জানে তোমার মহিমা।
নাম নৌকায় নিরবধি পার কর ভবনদী
তার আগে কি ছার যমুনা।
চরণ তরণী যার যে করে তোমারে সার
কিবা তার পারের ভাবনা॥

শ্রীকৃষ্ণের ভক্তির মর্মগ্রহণ করা সোজা হয়ে পড়ে। বাসনার বোঝা না নামাতে পারলে তরণী ডুবে যাবেই। তাই শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে 'যৌবন পাতল' করতে বলেছেন, যৌবনেই নরনারীর বিষয়বাসনা ভোগবাসনা বাড়ে তাই বোধহয় রাধারও মনের ইচ্ছা 'এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু নামাও' ঃ

ওহে নাবিক কে জানে তোমার মহিমা।
নাম নৌকায় নিরবধি পার কর ভবনদী
তার আগে কি ছার যমুনা।
চরণ তরণী যার যে করে তোমারে সার
কিবা তার পারের ভাবনা॥

এইখানেই ভক্তিনম্র জ্ঞানদাসের পদের আসল মহিমা মূর্ত।

পাঠ্যাংশের পদটির বৈশিষ্ট্য : এ পদটি আরম্ভ হয়েছে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর বড়াই চরিত্রটিকে ঘিরে। রাধা তাঁর ও কৃষ্ণের দূতী বড়াইয়ের কাছেই খুলে বলছেন মনের কথা। কোথা থেকে যমুনার তীরে এসে দাঁড়িয়েছেন 'বিনোদবরণ নেয়ে'। কাণ্ডারি কৃষ্ণের রূপ দেখে তাঁকে মাঝি বলে কি মনে হয় ? সোনা আর রুপো দিয়ে সাজানো নৌকায় বাজছে কিঙ্কিনি। নৌকাতে বলে থাকা সুন্দর নাবিক কৃষ্ণের হাতে রয়েছে মণিখচিত হাল। হেসে হেসে কৃষ্ণ গান গাইছেন। এ কৃষ্ণ বৃন্দাবনের কৃষ্ণ নন—লোকায়ত কৃষ্ণ। কৃষ্ণের রক্তিম চোখের ঘূর্ণি দেখে রাধাও একটু চিন্তিত :

চাপাইয়া নায় না জানি কি চায়
চঞ্চল উহারে দেখি॥
আমরা কহিও কংসের যোগানি
বুকে না হেলিহ কেহ

বিস্ময়মিশ্রিত আনন্দের সঙ্গে প্রেমময়ী রাধিকার প্রাণে একটু আছে ভয়। সাবধান করে বলছেন সখীরা যেন বলে কংসের যোগানদার হিসেবেই তারা কাজ করে। এখানেই এ পদের শেষ। সখীরা ও রাধা ভয় পাবেন না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে রাধা মিলনোৎসুক। দানলীলার পদে যখন কৃষ্ণের রাধাসম্ভোগের রূপ দেখে কবি রেগে বলছেন :

'জ্ঞানদাস কংসে দিবে কইয়া'

নৌকালীলার ক্রমবন্ধ পদে রসঘন রোমান্টিকতা জ্ঞানদাসের পদে আছে। নৌকা টলমল করছে :

হেলিছে দুলিছে তুলিয়া ফেলিছে
টলমল স্রোতে লা।

তরণী যখন ডুবু ডুবু তখন কৃষ্ণের অভিযোগ কৌতুকপ্রদ।

ঘন উছলিছে জল
নৌকা করে টলমল
তরুণী তরণী ভার দুনু

এই পরিস্থিতিতে শ্যামবন্ধুর দাবিটি সংগত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। রাধা যেন দেহের বসনভার ঘুচিয়ে দেন। জ্ঞানদাস দাবি উঠিয়েই দানের কথাটি বলেননি। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখছেন : 'এই সহসা সমাপ্তিতে একদিকে গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে এবং অন্যদিকে পাঠকের দর্শনসঙ্কোচ এবং কাব্যশালীনতা উভয়েরই মর্যাদা রক্ষা পাইয়াছে।'

নৌকালীলা ও দানলীলার পদগুলি একে অপরের পরিপূরক। রাধা নৌকায় ওঠেন, কৃষ্ণ তাঁর পারাপারের নেয়ে। মাঝনদীতে তরঙ্গ ওঠে, কৃষ্ণর প্রত্যাশা মতোই যৌবনের ভার, বসন-ভূষণ এমনকী যৌবন পর্যন্ত কৃষ্ণকে সমর্পণ করতে হয়—অর্থাৎ দান করতে হয়। সংকটময় পথে পরমপুরুষকে স্মরণ করে ভক্ত তাঁর দেহ-মন-প্রাণ দান করে—তেমনই রাধাও তরঙ্গসংকুল জীবনে তাঁর যৌবন দান করে দানলীলার কেলি সমাপ্ত করেন। নৌকালীলায় বিপদের সূচনা, দানলীলায় নির্ভার হওয়ার সাধনা। তাই নৌকালীলার পদের গুরুত্ব ও প্রাধান্য বিবেচ্য বিষয়।

২.১৬ গোষ্ঠলীলা

বাৎসল্যলীলার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত গোষ্ঠলীলা। সখ্যরসকে বলা যায় প্রেয়োভক্তিরস। এই সখ্যরসে শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্যের সেবার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সখার বন্ধুত্ব। এখানে বিষয়-আলম্বন শ্রীকৃষ্ণ, আশ্রয়-আলম্বন শ্রীকৃষ্ণের সখাবৃন্দ। সখাবৃন্দ হলেন—পুরস্থ অর্জ্জুন, ব্রজস্থ সুদাম, দাম ইত্যাদি। উদ্দীপন, শ্যামের কিশোর বয়সের মোহন রূপ, পরিহাস ও শৌর্য। অনুভাব—বাহুযুদ্ধ, কন্দুকক্রীড়া, দ্যুতক্রীড়া, আসন, দোলা, জলকেলি বানর প্রভতির সঙ্গে খেলা।

শ্রীরূপগোস্বামীর সখ্যরসের সংজ্ঞা :

স্থায়ী ভাবো বিভাবাদৈঃ সখ্যমাত্মোচিতেরহি।
নীতশ্চিত্তে সতাং পুষ্টিং রস প্রেয়ানুদীর্যতে॥

অনুবাদ : স্থায়ীভাব নিজের অনুরূপ বিভাবাদি দিয়ে সৎব্যক্তির মনে সখ্যরসকে পুষ্ট করলে তা প্রেয়োরস বলে নির্ণীত হয়। শ্রী রূপ লিখেছেন অর্জুন, ভীমসেন, দ্রৌপদী এবং শ্রীদাস ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের পুরসখা। যাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে ক্ষণে ক্ষণে চক্ষে হারান তাঁরা হলেন ব্রজবাসীবৃন্দ। শ্রীরূপ সখাদের চারভাগে ভাগ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের নিরাপত্তার রক্ষী হলেন—সুভদ্র, মণ্ডলীভদ্র, ভট, যক্ষ, ইন্দ্রভট, ভদ্রাঙ্গ, বীরভদ্র, মহাগুণ, বিজয় ও বলভদ্র। বলভদ্র ও মণ্ডলীভদ্র এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সুহৃদদের মধ্যে অগ্রজ বলরামই সখ্যরসের পদে প্রাধান্য পেয়েছেন। শ্রীরূপের নির্দেশ অনুযায়ী এই বলরাম সুহৃদ।

সখা সম্পর্কে শ্রীরূপের নির্দেশ, যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে বয়সে ছোটো দাস্যগন্ধী সখ্যরসে যাঁরা ভক্তস্বরূপ তাঁরাই সখা—বিশাল, বৃষভ, ওজস্বী, দেবপ্রস্থ, বরুথপ, মকরন্দ, কুসুমপীড়, মণিবন্ধ ও করন্ধম। রাখাল বালকদের ক্রীড়াস্থলীতে এই সখাদের স্থান নেই।

ব্রজলীলায় তৃতীয় প্রকার বয়স্য বা সখা হল প্রিয়সখা। এই প্রিয়সখা সম্পর্কে শ্রীরূপ বলেছেন—যাঁরা কৃষ্ণের সমবয়সী এবং বন্ধুত্বই যাঁদের আশ্রয় তাঁরাই প্রিয় সখা। এঁরা—শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, স্তোককৃষ্ণ, কিঙ্কিণী, অংশু, ভদ্রসেন, পুণ্ডরীক, বিলাসী, গলবিঙ্ক ও বিটঙ্ক।

চতুর্থ শ্রেণি হল প্রিয় নর্মসখা। এঁরা—সুবল, অর্জুন, বসন্ত ও উজ্জ্বল। 'সুবল নর্মসখা। সুবলে করিয়া কোলে প্রেমে গদগদ বোলে / না-জানি মরম কিবা আছে।' এঁরা রাধাকৃষ্ণলীলার সম্পাদনে সহায়ক। শ্রীরূপ সখ্যরসের সঙ্গে মধুর রসের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। পরবর্তীকালের বৈষ্ণবপদকর্তারা অনায়াসেই সখ্যরসের মধ্যে মাধুর্যের সংমিশ্রণ ঘটাতে কুণ্ঠিত বোধ করেননি। জ্ঞানদাসের পদে আছে গোচারণ-রত শ্রীকৃষ্ণ সবার অগোচরে রাধার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য চলে যান। দিনের শেষে শ্রান্ত শ্যামকে সখারা তাঁর হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করেন।

বৈষ্ণব পদাবলিতে মধুর রসই রূপায়িত নানাভাবে। সখ্যরসের প্রচারক নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দ তাঁর শিষ্যদের নিয়ে গোষ্ঠলীলার অনুষ্ঠান করতেন। তাঁর শিষ্য ও পদকারগণ সখ্যরসের পদ রচনায় সিদ্ধহস্ত।

বলরাম দাস বাৎসল্য রস ও সখ্যরসের শ্রেষ্ঠ কবি। নন্দরাজার গৃহে লালিত শ্রীকৃষ্ণের বৃত্তি ছিল গো-ধন পালন ও গোচারণ।

পূর্বগোষ্ঠ : গোচারণে যাবেন কৃষ্ণ সেখানকার মাঠে থাকার কষ্ট ও আপদ বিপদের কথা স্মরণ করে মা যশোদা কাল্পনিক ভয়ের আশঙ্কায় কাতর। কিন্তু গোষ্ঠে যেতে গোপালের প্রাণ উদগ্রীব :

গোঠে আমি যাব মাগো গোঠে আমি যাব।
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে বাছুরি চরাব॥

বংশীবটের তলায় গোপালের খেলা। পূর্বগোষ্ঠের এই সব পদে মাতৃহৃদয়ের বাৎসল্য রস নিঃসৃত। পদকর্তা বললাম দাস রাখালের ভাবে ভাবিত। তিনি বলেছেন গোপালের সঙ্গে তিনি গোষ্ঠে যাবেন। তাঁর চরণের বাধা

খড়ম জোগাবেন। এবং প্রাণ কানাইকে 'নয়ন গোচর' করতে প্রয়োগ করবেন সর্বশক্তি। গোপালকে আর কি ধরে রাখা যায় ? 'নটবর নবকিশোর রায় রহিয়া রহিয়া যায় গো'

উত্তর-গোষ্ঠা : গোচারণ শেষে রাখালবালকের সঙ্গে গোপালকৃষ্ণের ঘরে ফেরার পালা 'সখাগণ আগে পাছে গোপাল করিয়া মাঝে' করে গোচারণে এসেছেন গোপালের সখারা :

শ্বেতকান্তি অনুপাম আগে ধায় বলরাম
আর শিশু চলে ডাহিন বাম
শ্রীদাম সুদাম পাছে ভাল শোভা করিয়াছে
তার মাঝে নব ঘনশ্যাম

কৃষ্ণ-বলরামকে পেয়ে আনন্দসাগরে ভাসলেন মা-যশোদা। বামে শ্যাম ও ডাইনে বলরামকে বসিয়ে ক্ষীর ননি ছানা সর দিয়ে তৃপ্ত মা যশোমতী।

পাঠ্যাংশের পদের বিশ্লেষণ : বলরাম দাসের 'নটবর নব কিশোর রায়' পদটি সখ্যরসের হলেও এতে মধুর রসের মিশ্রণ আছে। চৈতন্যপরবর্তী পদকর্তারা অবিমিশ্র সখ্যরসে অনুপ্রাণিত। কিন্তু জ্ঞানদাসের পদেও সখ্যরসের আনন্দের মধ্যে রাধাকে পাবার প্রয়াসে কৃষ্ণ দলছুট হয়ে পড়েন—'গোপাল যাবে কি না যাবে আজি গোষ্ঠে'। এই পদের শেষ দিকে খুব প্রচ্ছন্নভাবে রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের মিলনের কথা আছে ঃ

সদাই অন্তরে টান
তিল আধ না দেখিলে মরি॥
মাঝেতে ছিঁদল দড়ি
হাতেতে কনক লড়ি
বার হইলা বিহারের বেশে। (জ্ঞানদাস—গোষ্ঠযাত্রার পদ)

পাঠ্যাংশের পদে শ্রীকৃষ্ণ নটবর বেশে সখাদের সঙ্গে 'হৈ হৈ' রবে চলেছেন গোচারণের মাঠে। ধূলিধূসর গোপালের শ্রীঅঙ্গ। তাঁর মোহ বাঁশির রবে আকাশ বাতাস উচ্চকিত। রাধাকে পথে দেখবার জন্য কৃষ্ণের চোখ চারদিকে দৃষ্টিপাত করছে। বরলাম দাসের সখ্যরসের পদে মধুর রসের যোগ দেখা যায় না। পথে চলতে চলতে পথের মাঝে দাঁড়িয়ে ছিলেন গৌরবরণী রাধা। সেই গৌরাঙ্গী রাধা ছাড়া আর কাউকেই মনে ধরে না শ্রীকৃষ্ণের। অল্প সময়ের জন্য রাধাকে দেখেও কৃষ্ণের মন চঞ্চল হয়। কিন্তু যত প্রিয়ই হন নবীন কিশোরী রাধা তবু শ্রীকৃষ্ণ সখাদের ফেলে যেতে পারেননি। শ্রীকৃষ্ণ বেত আর বাঁশি নিয়ে বাঁশিতে অভ্যস্ত গানটি বাজাচ্ছেন। ভণিতায় কৃষ্ণসখা বলরাম দাসেরও আশা কৃষমসহ রাখালদের সঙ্গে বাস করতে পারলে তিনিও নিতেন কৃষ্ণের বেত্র, যষ্ঠি ও বাঁশি। পদে শ্রীরূপগোস্বামীর গ্রন্থানুযায়ী মধুর রসের মিশ্রণ অভিনব। রাধাকে অল্পক্ষণের ('থোরি থোরি') জন্য দেখতে পেয়েও খুশি গোপালকিশোর নন্দসুত—যাঁর মোহন শ্রীকৃষ্ণ-রূপে জগজন মোহিত।

এই পদের ভণিতা অংশের পাঠান্তর পাওয়া যায় :

অরুণ অধরে ঈষত হাস, মধুর মধুর অমিয়াভাষ
খঞ্জনবর গঞ্জন গতি বঙ্ক নয়নে চায় গো
রসের আবেশে অবশ দেহ, মন্থর গতি চলহি সেহ
দাস লোচন দেখয়ে অমনি, হাসিয়া হাসিয়া চায় গো।

পদটির ভাব ও বলার ভঙ্গি দেখে মনে হয় পদটি বলরাম দাসের নয়। লোচনদাস শ্রীকৃষ্ণের নটবর বেশের চঞ্চল রূপের বর্ণনার কবি। তাই শ্রীকৃষ্ণ পথে পেয়ে যান 'নবীনা কিশোরী' গৌরী শ্রীমতীকে। বিশুদ্ধ সখ্যরসের মধ্যেই সর্বরসের রসায়ন মধুর রসের ছবিটি অভিনব।

২.১৭ অনুশীলনী

(১) চণ্ডীদাসের পদে আছে

খাইতে নারিয়ে কিছু রহিতে নাহি ঘরে।
ভাবিতে ভাবিতে ব্যাধি সামাইল অন্তরে॥
জারিল সে তনু মন ব্যাপিল শরীর।
চণ্ডীদাস বলে ভাল হইবে সুস্থির॥

পদটিতে কার সম্বন্ধে এসব কথা বলা হয়েছে, ব্যাধি তনুমনকে জর্জর করলে কীভাবে রাধা সুস্থির হবেন কবির এই উক্তির তাৎপর্য বিচার করুণ।

প্রসঙ্গ নির্দেশপূর্বক ব্যাখ্যা লিখুন।

(২) এঁ দেহ-অনল-তাপে পাষাণ সে গলে॥
ছায়া দেখি বসি যাই তরুলতা বনে।
জ্বলিয়া উঠয়ে তরুলতা পাতা সনে॥
যমুনার জলে যাঞা যদি দিই ঝাঁপ।
পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ॥

অথবা

চিতের আগুনি কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব॥
কোন বিধি সিরজিল কুলের বালা।
কেবা নাহি করে প্রেম কার এত জ্বালা॥

প্রসঙ্গ নির্দেশপূর্বক ব্যাখ্যা লিখুন।

(৩) রজত কাঞ্চনে নাখানি সাজান
বাজত কিঙ্কিণী জাল।
চাপিয়াছে তাতে শোভে রাঙ্গা হাতে
মণি বাঁধা কেরোয়াল॥
রজতের ফালি শিরে ঝলমলি
কদম্ব মঞ্জুরী কানে
জঠর পাটেতে বাঁশীটি গজেছে
শোভে নানা আভরণে॥

পদটি কোন্ পর্যায়ের? কেরোয়াল শব্দটির অর্থ কী? অংশটির বর্ণনা স্বীয় ভাষায় দিন।

(৪) নয়ানে সঘনে উলটি উলটি হেরি হেরি/পালাটি পালটি গোরী গোরী /থোরি থোরি আন নাহিক ভায় গো। পদটি কোন্ পর্যায়ের? পদটির পদকর্তা কে? 'গোরি গোরি' বলতে কাকে বোঝাচ্ছে? 'থোরি থোরি' শব্দদ্বয়ের অর্থ কী? সমস্ত পদটির অর্থ বুঝিয়ে লিখুন।

(৫) কঞ্জলোচন কলুষমোচন
শ্রবণরোচন ভাষ।
অমল কোমল চরণ কিশলয়
নিলয় গোবিন্দদাস

পদটি কোন্ পর্যায়ের? পদকর্তা কে? 'কঞ্জলোচন' শব্দটির অর্থ কী? 'শ্রবণরোচন ভাষ' বলতে কী

বোঝায় ? 'নিলয় গোবিন্দদাস'—অংশটির তাৎপর্য লিখুন। সমস্ত পদটির কাব্য-সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করুন।

(৬) রয়নি কাজর বম ভীম ভুজঙ্গাম
কুলিশ পরএ দুরবার।
গরজ তরজ মন রোস বরিস ঘন
সংসঅ পড় অভিসার॥

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন।

অথবা

জামিনি ঘন আঁধিয়ার।
মনমথ হিয় উজিয়ার॥
বিঘিনি বিথারিত বাট।
পেমক আয়ুধে কাট॥

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন।

(৭) 'শুনাইতে কানু মুরলি রব মাধুরী'—পদটি কোন্ পর্যায়ের ? পদকর্তা কে ? পদে নায়িকার বৈশিষ্ট্য কী। সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

বিস্তৃত প্রশ্ন ঃ

১। অভিসারের সংজ্ঞা লিখুন। এই পর্যায়ের পদরচনায় বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। অভিসারের তত্ত্বগত তাৎপর্য আলোচনা করুন।

৩। 'আক্ষেপানুরাগের সর্বস্ব চণ্ডীদাস, চণ্ডীদাসের সর্বস্ব আক্ষেপানুরাগ'—আক্ষেপানুরাগ-পর্যায়ের পদে চণ্ডীদাসের কৃতিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪। শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনায় গোবিন্দদাসের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করে নিকুঞ্জলীলায় শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন। পদটির কাব্যসৌন্দর্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

৫। কলহান্তরিতা নায়িকা বলতে কী বোঝায় ? পাঠ্য পদ থেকে কলহান্তরিতার পদটি বিশদভাবে আলোচনা করুন।

৬। গোষ্ঠযাত্রার দুটি ভাগের পরিচয় দিয়ে ওই পর্যায়ের পদে বলরামদাসের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

৭। পাঠ্য আক্ষেপানুরাগের পদটি ব্যাখ্যা করে জ্ঞানদাসের আক্ষেপানুরাগের পদে কী বৈচিত্র্য পাওয়া যায় তা পর্যালোচনা করুন।

২.১৮ গ্রন্থপঞ্জি

১। শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু—*মধ্যযুগের কবি ও কাব্য*
২। শ্রীশঙ্করীপ্রদাস বসু—*চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি*
৩। শ্রীনীলরতন সেন—*বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় ঃ নবপর্যায়*
৪। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—*পদাবলী পরিচয়*
৫। সম্পাদক শ্রী দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—*বৈষ্ণব কবি প্রসঙ্গো*
৬। ক্ষুদিরাম দাস—*বৈষ্ণব রস প্রকাশ*
৭। সুকুমার সেন—*বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড*

একক ৩ ❐ চৈতন্যচরিতামৃত

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ চৈতন্যচরিতামৃত-এর গঠন

৩.২.১ আদিলীলা (৪র্থ) ও মধ্যলীলা (৮ম) পরিচ্ছেদের অংশ

৩.৩ মধ্যলীলা (৮ম পরিচ্ছেদ)

৩.৪ সাধ্যসাধন তত্ত্ব

৩.৫ সারাংশ

৩.৬ অনুশীলনী

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৩.০ উদ্দেশ্য

সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের 'চৈতন্যাবদান' শীর্ষক আলোচনায় লিখেছিলেন, 'তবুও একথা জোর করিয়া বলিতে পারি যে চৈতন্যাবদান রচনার পূর্বে সমসাময়িক ইতিহাসের কথা দূরে থাক, অতীত ইতিহাসেরও কোনো উপাদান মুখ্যভাবে সাহিত্য সৃষ্টির কাজে লাগানো হয় নাই। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে এই এক জীবিত ব্যক্তির চরিত্র সাহিত্যের বিষয়ীভূত হইল।[১] শ্রীসেনের এই উক্তি প্রণিধানযোগ্য। ইংরেজ প্রভাব পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যে জীবনীকাব্যগুলির বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। তবে এ কথাও খেয়াল রাখতে হবে এইসব জীবনীকাব্যের রচয়িতারা কেউই প্রামাণিক ইতিহাস রচনা করতে চাননি, ভক্তদের জন্য অবতারজীবনের নানা বৃত্তান্ত রচনা করেছিলেন। অবশ্য চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩) যেহেতু ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব সেহেতু কাব্যে তাঁর অবতারত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেও ঐতিহাসিক স্বরূপ সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি। পরে মঙ্গালকাব্যে ও অনুবাদকাব্যে যে ইতিহাস চেতনার অভাব লক্ষ করা যায় জীবনীকাব্যে তার তুলনায় স্থান-কাল-পাত্রের অধিকতর পার্থিব পরিচয় পাওয়া সম্ভব। যেহেতু ইংরেজ প্রভাব পূর্ববর্তী পর্বে আমাদের দেশে ইতিহাসের উপাদান সুপ্রচুর নয় সেহেতু চৈতন্য জীবনীকাব্যগুলির মধ্যে ইতিহাসের নানা উপাদান খুঁজে পাওয়া সম্ভব। আবার একথাও সত্য এই জীবনীকাব্যগুলি বিশেষ ভক্তিতত্ত্বের প্রকাশক। সুতরাং সেই ভক্তিতত্ত্বের পরিমণ্ডলটিও কাব্যপাঠ করলে জানা সম্ভব। সুতরাং চৈতন্য জীবনীকাব্য পাঠের উদ্দেশ্য হল ঐতিহাসিক উপাদানের অনুসন্ধান ও ভক্তিতত্ত্বের দার্শনিক বোঝাপড়া। অবশ্য এই দুই উদ্দেশ্যই পরিপূরক।

৩.১ প্রস্তাবনা

চৈতন্য জীবনীসাহিত্য পাঠের আগে চৈতন্য জীবনকথা খুব সংক্ষেপে জেনে নেওয়া প্রয়োজন। চৈতন্যদেব

১. *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, সুকুমার সেন, আনন্দ সংস্করণ।*

১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র ও মাতা শচীদেবী। চৈতন্যদেব শৈশবে আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের কাছে দেহকান্তির জন্য গৌরাঙ্গ নামে পরিচিত ছিলেন। অদ্বৈত আচার্যের পত্নী সীতাদেবী নাম রেখেছিলেন নিমাই। পরে দাদা বিশ্বরূপের নামের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে নাম দেওয়া হয় বিশ্বম্ভর।

চৈতন্যদেবের জীবনকে আমরা দুই পর্বে ভাগ করতে পারি। প্রথমটি নবদ্বীপ পর্ব অন্যটি নীলাচল পর্ব। নবদ্বীপ পর্বে চৈতন্য দুরন্ত ব্রাহ্মণ বালক। ব্যাকরণ ও অলংকারশাস্ত্রে তিনি বিশেষ পণ্ডিত। অগ্রজ বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। পিতা জগন্নাথ মিশ্রের দেহাবসান হয়। পনেরো বছর বয়সে চৈতন্যদেব স্বনির্বাচিত পাত্রী লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করেন। বিবাহের কিছুকাল পরে তিনি পূর্ববঙ্গে যান। তাঁর অনুপস্থিতি-পর্বে সর্পদংশনে লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু হয়। ফিরে এসে পত্নীশোকাহত চৈতন্যদেব ভক্তিঅনুশীলনে রত হন। এই পর্বে রাজপণ্ডিত সনাতনের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। অবশ্য এই দ্বিতীয় বিবাহের পর ভক্তিমার্গ থেকে তাঁর মন গার্হস্থ্যমার্গে ফিরে আসেনি। সংকীর্তনাচার নিয়মিত চলত। এই পর্বেই কাজির সঙ্গে নামসংকীর্তনকারীদের দ্বন্দ্ব হয়। চৈতন্যদেবকে ঘিরে অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, গদাধর প্রমুখরা নবদ্বীপেই এক বৈষ্ণবভক্তির বাতাবরণ তৈরি করেন।

এর কিছুদিন পরে চৈতন্য সহচরদের নিয়ে গয়ায় পিতৃকৃত্য করতে যান। গয়ায় মাধবেন্দ্র পুরীর অন্যতম শিষ্য ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তিনি মিলিত হন। পরে ঈশ্বরপুরীর কাছে দশাক্ষর গোপালমন্ত্রে তিনি দীক্ষা নেন। আনুমানিক ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে তিনি কাটোয়ায় কেশবভারতীর কাছে সন্ন্যাসদীক্ষা নেন। গৃহত্যাগ করে এরপর তিনি পুরীতে বসবাস করেন। নীলাচলে চৈতন্যদেবকে ঘিরে আর এক ভক্ত পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে। নীলাচল পর্বে তিনি দীর্ঘ তীর্থপথ ভ্রমণ করেন। বিশেষ করে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণকালে তিনি সেখানকার ভক্তিমার্গের সংস্পর্শে আসেন। জীবনের শেষ কয়েকটি বছর তিনি ভাববিহ্বল দশায় কাটান। ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর তিরোভাব ঘটে।

অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় [২] চৈতন্যদেবের জীবনের মুখ্য কালক্রমে নির্দিষ্ট করেছেন। নীচে উদ্ধার করা হল।

জন্ম : ফেব্রুয়ারি ১৮, ১৪৮৬
প্রথম বিবাহ : ১৫০১-১৫০২
দ্বিতীয় বিবাহ : ১৫০৭
বৈষ্ণবীয় ভাবের উন্মেষ : ১৫০৯
সন্ন্যাস : ২৫-২৬ জানুয়ারি, ১৫১০
দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ : এপ্রিল ১৫১০-এ শুরু
পুরীতে প্রত্যাগমন : ১৫১২
বৃন্দাবনে গমন : ১৫১৫
এলাহাবাদে আগমন : জানুয়ারি, ১৫১৬
বারাণসীতে আগমন : ১৫১৬
পুরীতে প্রত্যাগমন : মে, ১৫১৬
তিরোধান : ২৯ জুন, ১৫৩৩

চৈতন্যদেবকে ঘিরে নানা তত্ত্ব গড়ে উঠলেও চৈতন্যদেব যে আদতে সহজ ভক্তিমার্গের সাধক ছিলেন তা তাঁর নামে প্রচলিত 'অষ্ট শিক্ষা শ্লোক' (শিক্ষাষ্টক) পাঠ করলে বোঝা যায়। তাঁর ভক্তিধর্মের স্বরূপ বিশ্লেষণের জন্য আমরা তিনটি শ্লোক উদ্ধার করব।

---

২. *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তথ্য ও কালক্রম, সুখময় মুখোপাধ্যায়,* জি. ভট্টাচার্য এ্যান্ড কোং।

১. তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদাহরিঃ ।।

(এই শ্লোকটিতে প্রকৃত বৈষ্ণবের গুণাবলী বিধৃত হয়েছে। তৃণ থেকে নীচু অর্থাৎ বিনত হয়ে, বিনত হয়ে, বৃক্ষের চেয়েও সহিষ্ণু চিত্ত হয়ে, সকল ব্যক্তিকে সম্মান করে সর্বদা কৃষ্ণনাম করতে হয়। প্রচলিত বৈষ্ণববিনয় শব্দবন্ধটি এই শ্লোক সাপেক্ষেই গড়ে উঠেছে।)

২. ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।।

(এই শ্লোকটিতে নিষ্কারণ ভক্তির কথা বলা হয়েছে। হে জগদীশ, আমি ধন, জন, সুন্দরীসান্নিধ্য, কবিতা—এ সব চাই না। জন্মে জন্মে আমার ঈশ্বরে নিষ্কারণ ভক্তি হোক। চৈতন্যদেবের পূর্বে বঙ্গভূমে দেবপূজা ছিল উদ্দেশ্যমূলক। ভক্ত কাম্য কিছুর জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করত। চৈতন্যদেব তাঁর প্রেমভক্তিধর্মে হেতুহীন ভক্তির কথা প্রচার করেন।)

৩. নয়নং গলদশ্রুধারয়া
বদনং গদ্‌গদ রুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ
কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি।।

(এই শ্লোকটিও নিষ্কারণ ভক্তিধর্মের প্রকাশক। ভক্ত ও ভগবানের ব্যক্তি সম্পর্ক এখানে তুলে ধরা হচ্ছে। আপনার নামগ্রহণ কালে কবে আমার দুই নয়ন অশ্রুবর্ষণ করবে, বদন গদগদস্বরে রুদ্ধ হবে, পুলকিত শরীর রোমাঞ্চিত হবে ?)

এই শ্লোক তিনটি পড়লে চৈতন্যদেবের প্রচারিত ভক্তিধর্মের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে।

ক. চৈতন্যদেব কোনো আচার-অনুষ্ঠানকে মান্য করেননি। মানুষের সাধারণ আবেগকে উপাসনা বা ধর্মাচরণবৃত্তির অবলম্বন করে তুলেছিলেন।

খ. আবেগের সহজ প্রকাশ ধর্ম এবং ভক্ত-ভগবানের সম্পর্ক হেতুহীন। ফলে প্রচলিত ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধিতা করা সম্ভব হয়েছিল। প্রচলিত ধর্মে দেবতা বা দেবীর কাছে কিছু কামনা করা হয়, এবং কামনামাফিক ভক্ত বিপুল পুজোর আয়োজন করেন। এই দেওয়া-নেওয়ার চক্র থেকে চৈতন্যদেব তাঁর ভক্তিধর্মকে আলাদা করতে চেয়েছিলেন।

অবশ্য চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পরে বিষয়টি এত সহজ ছিল না। তাঁর অনুগামীবৃন্দ বিভিন্ন শাখা ও উপশাখায় বিভক্ত হয়ে গেলেন। বিভিন্ন জীবনী গ্রন্থ আসলে অনেক ক্ষেত্রেই বৈষ্ণবীয় দল-উপদলের মতাদর্শ বহন করছে। যে গোষ্ঠী চৈতন্যদেবকে যেভাবে দেখছেন জীবনীতে সেভাবেই তুলে ধরা হচ্ছে। যেমন লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গাল' গৌরনাগরবাদের প্রচারক, এই নাগরবাদ চৈতন্যচরিতামৃত' নেই। সুতরাং একথা স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে জীবনীগুলিতে প্রকাশিত অবতার মূর্তির পার্থক্য আছে। আবার এই অবতারীকরণ হয়েছে বলে ইতিহাসের কোনো উপাদানই সেখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না তা ঠিক নয়। যেমন চৈতন্যদেব পূর্ববর্তী ও চৈতন্যদেব সমকালীন নবদ্বীপের আর্থসামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা কেমন ছিল তার অনেকটাই চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলি থেকে জানা যায়।

চৈতন্যদেবকে নিয়ে লেখা জীবনীসাহিত্যকে ভাষার বিচারে আমরা দুশ্রেণিতে ভাগ করতে পারি। ক. সংস্কৃত জীবনীসাহিত্য খ. বাংলা জীবনীসাহিত্য। প্রধান প্রধান রচনার তালিকা প্রদান করা হল। প্রথম বন্ধনীর মধ্যে আনুমানিক রচনাকাল দেওয়া আছে।

সংস্কৃত জীবনীসাহিত্য	বাংলা জীবনীসাহিত্য
মুরারি গুপ্তের কড়চা	বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' (১৫৪০-১৫৫০খ্রি.)
কবি কর্ণপুরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক (১৫৭৭ খ্রি.)	লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গাল' (১৫৫০-১৫৬৬ খ্রি.)
কবি কর্ণপুরের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' মহাকাব্য (১৫৪২-১৫৪৩ খ্রি.)	জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গাল' (১৫৬০ খ্রি.)
স্বরূপ দামোদরের কড়চা	চূড়ামণিদাসের 'গৌরাঙ্গা বিজয়' (১৫৫০-১৫৬০ খ্রি.)
	কৃষ্ণদাসের 'চৈতন্যচরিতামৃত' (১৬১২-১৬১৫ খ্রি.)

কৃষ্ণদাসের 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর অংশ বিশেষই বর্তমানে পাঠ্য। কবির নাম কৃষ্ণদাস ; কৃষ্ণদাস কবিরাজ নয়। 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের ভণিতায় কবির নাম পাচ্ছি কৃষ্ণদাস।

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।।

এখানে 'কবিরাজ' নেই। কোনো ভণিতাতেই নেই। নাম-বিচারে ভণিতার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। এই ভণিতা বিচারেই চণ্ডীমঙ্গালের কবির নাম মুকুন্দ চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম নয়। 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনার পরে কৃষ্ণদাসের নামের সঙ্গো হয়তো 'কবিরাজ' (কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) যুক্ত হতে পারে। কিন্তু গ্রন্থ-রচনাকালে তিনি কৃষ্ণদাসই ছিলেন। তাই 'চৈতন্য-চরিতামৃত'-এর রচনাকারকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ না বলাই ভালো।

৩.৩ চৈতন্যচরিতামৃত-এর গঠন

সুকুমার সেন তাঁর সম্পাদিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের প্রস্তাবনায় 'চৈতন্যচরিতামৃত মঙ্গাল-পাঞ্চালিকা নয়। এটি গেয় রচনা মোটেই নয়—পাঠ্য বই, স্থানে স্থানে দুষ্পাঠ্য। পড়ে বোঝাবার জন্য, ভাববার জন্য আনন্দ পাবার জন্য লেখা।' শ্রীসেনের এই মত যথার্থ। গঠন ও রচনা কৌশলে 'চৈতন্যচরিতামৃত' কেমন করে বিশিষ্ট হয়ে উঠল তা ব্যাখ্যা করার আগে এই জীবনীকাব্যের গঠন সম্পর্কে সাধারণ কয়েকটি তথ্য স্মরণে রাখা দরকার।

'চৈতন্যচরিতামৃত' তিনখণ্ডে বিভক্ত—আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড ও অন্ত্যখণ্ড। আদিখণ্ডে ১৭টি, মধ্যখণ্ডে ২৫টি, এবং অন্ত্যখণ্ডে ২০টি পরিচ্ছেদ আছে। জীবনীকাব্যটি মুখ্যত পয়ার বন্ধে লেখা হলেও ত্রিপদী ব্যবহার করা হয়েছে। প্রয়োজনে রচনার মধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে সংস্কৃত শ্লোক। এই শ্লোকগুলি প্রধানত বিভিন্ন বৈষ্ণব শাস্ত্রখণ্ড থেকে গৃহীত।

'চৈতন্যচরিতামৃত'কার আদিখণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে চৈতন্যজীবনকাহিনির বিবরণে তাঁর গ্রন্থ শুরু করেননি। কতগুলি শ্লোক উদ্ধার করেছেন। লোচন বা জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গাল' কাব্যের থেকে তাঁর জীবনীগ্রন্থটি যে গোত্রে আলাদা এই শ্লোকবিন্যাসে যেন তা বুঝিয়ে দেওয়া হল। এই শ্লোকগুলির অন্তর্গত ভাবসমূহকে পরবর্তী

অধ্যায়ে ঘটনার মাধ্যমে বিস্তার দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ কৃষ্ণদাসের কাছে ঘটনা মুখ্য নয়। ঘটনা যে ভাবের প্রতিপাদক সেই ভাবই মুখ্য।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। প্রথম পরিচ্ছেদের পঞ্চম শ্লোকে কৃষ্ণদাস লিখেছেন :

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তিরস্মা
দেবাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যাং প্রকটমধুনাং তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

শ্লোকটি কৃষ্ণদাসের নিজস্ব রচনা নয়—স্বরূপদামোদরের কড়চা থেকে গৃহীত। অর্থাৎ বহু ক্ষেত্রেই অগ্রজ বৈষ্ণবদের শ্লোক গ্রহণ করে 'চৈতন্যচরিতামৃত'কার তাঁর গ্রন্থকে যেন এক ঐতিহ্যের কেন্দ্রে স্থাপন করছেন। তাহলে তাঁর স্বকীয়তা কোথায় ? স্বকীয়তা বিন্যাসে। 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত' কৃষ্ণস্বরূপের কথা প্রথম পরিচ্ছেদেই বলা হল। ভক্তপাঠক এরপর যখন গ্রন্থপাঠ করবেন তখন খেয়াল করবেন চৈতন্য রায় রামানন্দকে রসরাজ-মহাভাব মূর্তি দেখাচ্ছেন। তাঁর বুঝতে অসুবিধে হবে না প্রথম পরিচ্ছেদে যে শ্লোক উচ্চারণ করা হল এই ঘটনার বিবরণে তার প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এভাবেই তত্ত্ব ও তথ্যের পরিপূরক বিন্যাসে গোটা 'চৈতন্যচরিতামৃত' নির্মিত। এই নির্মাণেই তাঁর কৃতিত্ব। পাঠ্য অধ্যায়দুটি ও প্রথম পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত নানা শ্লোকের ঘটনাগত বা ভাবগত প্রমাণ বহন করছে। এদিক থেকে গ্রন্থটির মধ্যে নিপুণ সংলগ্নতা রয়েছে। কোনো ঘটনাকেই আমরা স্খলিত অপ্রয়োজনীয় বলতে পারব না। আবার শ্লোকের সিদ্ধান্ত যখন ঘটনা সহায়ে প্রমাণ করা হচ্ছে তখন কিন্তু ঘটনার পরিবেশের ক্রিয়ার চমৎকার নাটকীয় বর্ণনা করেন 'চৈতন্যচরিতামৃত' কার। এদিক থেকে তিনি যথার্থ শিল্পী—কাব্যরসিক।

৩.২.১ আদিলীলা (৪র্থ) ও মধ্যলীলার (৮ম) পরিচ্ছেদের অংশ

আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে কৃষ্ণদাস মুখ্যত তিনটি বিষয় বর্ণনা করেছেন :

ক. চৈতন্যদেবের স্বরূপ

খ. চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কারণ

গ. শক্তিতত্ত্ব বা রাধাতত্ত্ব

বিষয়গুলির পরস্পর পরিপূরক। আমরা একে একে বর্ণনা করব।

ক. চৈতন্যদেবের স্বরূপ

'চৈতন্যচরিতামৃত'কার তাঁর গ্রন্থের আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের পঞ্চম শ্লোকে স্বরূপ দামোদরের কড়চা অনুযায়ী চৈতন্যদেবের স্বরূপ নির্ণয় করেছেন। শ্লোকটির সরল বঙ্গার্থ হল ঃ শ্রীরাধা হলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের বিকার স্বরূপা, অর্থাৎ শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। এজন্য (শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ কারণে) তাঁর একাত্মা, কিন্তু একাত্মা হয়েও অনাদিকাল থেকে তাঁরা গোলাকে পৃথক দেহ ধারণ করে আছেন। কলিযুগে সেই দুই দেহ একত্বপ্রাপ্ত হয়ে চৈতন্যনামে প্রকটিত। এই রাধাভাবকান্তি যুক্ত কৃষ্ণস্বরূপ চৈতন্যকে নমস্কার করি। কৃষ্ণদাসের ভাষায়—'রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি/অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি॥/সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি/ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই॥' কোন ভাব আস্বাদন করতে চৈতন্যের মধ্যে রাধাকৃষ্ণ এক রূপ ধারণ করলেন ? কবিরাজ গোস্বামী আবার স্বরূপ দামোদরকে স্মরণ করে জানাচ্ছেন তিনটি সাধ পূরণের জন্য শ্রীকৃষ্ণই শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকৃত করে চৈতন্যরূপে জন্ম নিয়েছেন। রাধাপ্রেমের মহিমা কেমন, এই প্রেমের আলোকে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যের চমৎকারিত্বই বা কতখানি এবং সেই চমৎকারিতা অনুভবে রাধার আনন্দ কতখানি এই তিনটি বিষয় জানার জন্যই রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণ চৈতন্য-শরীরে আবির্ভূত।

এই তত্ত্বকে ঘটনাগতভাবে কৃষ্ণদাস সমর্থন ও ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর গ্রন্থের মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে। সেখানে রায় রামানন্দকে চৈতন্যদেব তাঁর স্বরূপ দেখিয়েছেন।

তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইলা স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ।।

কৃষ্ণদাসের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী চৈতন্যদেব রায় রামানন্দকে একথা গোপন রাখতে বলেছিলেন। রায় রামানন্দ একথা গোপন রেখেছিলেন কিনা বোঝা যাচ্ছে না তবে স্বরূপ দামোদর একথা জানতেন। তাঁর কড়চার সূত্রে কৃষ্ণদাস একথা জানতে পেরে ভক্ত বৈষ্ণবদের জানাচ্ছেন।

লক্ষণীয় যে অষ্টম পরিচ্ছেদেই সাধ্য-সাধন তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে। রায় রামানন্দ রাধা-প্রেমকে সাধ্য-শিরোমণি বলেছেন। সাধ্য বলতে বোঝায় কোনো সাধনপন্থায় প্রাপ্য পরম ঈপ্সিত বস্তু। এই সাধ্যবস্তুর আলোচনার সূত্রে রায় রামানন্দ রাধাকৃষ্ণের বিলাস-মাহাত্ম্য ও প্রেমবিলাস-বিবর্তের কথা বলেছেন। প্রেম-বিলাস-বিবর্ত (পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে) বলতে বোঝায় প্রেমের পরমদশা—এই মিলন স্বতঃস্ফূর্তভাবে পুরুষ নারীর ও নারী পুরুষের সাধ্য ক্রিয়া করে। অর্থাৎ উভয়ের রমণ-রমণীত্ব জ্ঞান লুপ্ত হয়।

প্রশ্ন হল 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যে প্রেমবিলাস-বিবর্ত ও চৈতন্যস্বরূপের মধ্যে কি কোনো সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে? দেখা যাচ্ছে প্রেমবিলাসবিবর্তের ইঙ্গিতবাহী গান 'পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল' শেষ না হতেই 'প্রেমে প্রভু (চৈতন্যদেব) স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল।' রায় রামানন্দের মুখ আচ্ছাদনের কারণ কী? কবি কর্ণপূব তাঁর 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকে লিখেছেন এই মুখ আচ্ছাদনের সম্ভাব্য কারণ দুটি। রাধাভাবরূপী চৈতন্যদেব 'আনন্দবৈবশ্যবশতঃ' রায় রামানন্দের মুখ আচ্ছাদন করতে পারেন।

কবি কর্ণপূর দ্বিতীয় যে কারণটি উল্লেখ করেছেন তা বেশ বিচিত্র। কর্ণপূর জানাচ্ছেন রায় রামানন্দ যে তত্ত্বের কথা বলেছেন তা অত্যন্ত রহস্যময় এবং তা প্রকাশের সময় তখনও হয়নি বলে চৈতন্যদেব রামানন্দের বাক্‌রোধ করছেন।

কর্ণপূরের এই দ্বিতীয় হেতু থেকে রাধাগোবিন্দ নাথের মতো কোনে কোনো বৈষ্ণবতাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত করেছেন 'প্রেমবিলাসবিবর্ত্তের মূর্তরূপই শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গাসুন্দর।[৩] তাঁদের মতে রায় রামানন্দের এই গীত ব্যাখ্যা করলে আমরা চৈতন্যদেবের যথার্থ স্বরূপ জানতে পারব। রায় গীতটি ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছিলেন—তাতে অসময়ে চৈতন্যতত্ত্ব প্রকাশিত হয়ে পড়ত। তাই চৈতন্য রামানন্দের বাক্‌রোধ করলেন।

আমরা রাধাগোবিন্দ নাথের এই ধারণাকে মান্য করি বা না করি একটি বিষয় কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে কৃষ্ণদাস বঙ্গভূমি ও বৃন্দাবনেরর ভাবনার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে চাইছিলেন। বঙ্গদেশের বৈষ্ণবরা গৌরপারম্যবাদী—গোরা অর্থাৎ চৈতন্যই তাঁদের পরম আরাধ্য। বৃন্দাবনবাসীর কিন্তু রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বের আলোচনায় মগ্ন। কৃষ্ণদাসের কাব্যে তাই চৈতন্যদেবের মধ্যেই রাধাকৃষ্ণের কল্পনা করা হল।

বঙ্গভূমিতে চৈতন্যদেবকে মূলত কৃষ্ণের সঙ্গে সমীকৃত করা হয়েছে। 'চৈতন্যভাগবত'-এ চৈতন্যদেব শুধু কৃষ্ণ নন, তিনি ঐশ্বর্যময় বিষ্ণু যিনি প্রয়োজনে বরাহমূর্তি ধারণ করতে পারেন। 'চৈতন্যভাগবত'-এর এই ঐশ্বর্যময় মূর্তি শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের গৌরনাগর তত্ত্বে মধুরাখ্য হয়ে উঠেছে। গৌর নাগর তত্ত্ব অনুযায়ী গৌরাঙ্গ নাগর কৃষ্ণের মতো বিলাসপটু। রূপ গোস্বামী ও জীব গোস্বামী চৈতন্যের ঐশ্বরত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। বারাণসীর প্রবোধানন্দ সরস্বতী চৈতন্যকে কৃষ্ণের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। অজ্ঞাতনামা কবি বিরচিত 'বিরুদ স্তোত্র'-তে চৈতন্যকে পরমেশ্বর রূপে এবং ব্রহ্মা ও শিবের অভিশ্রাবকরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই অবতার

---

৩. *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা, রাধাগোবিন্দ নাথ, ভক্তিগ্রন্থ প্রচার ভাণ্ডার।*

গড়ে তোলার প্রক্রিয়াটির মধ্যে বিভিন্ন প্রবণতা কাজ করে যায়। এই প্রবণতা কারণ নিরপেক্ষ নয়। ভারতবর্ষের সমকালীন ভক্তি আন্দোলনের বৃত্তান্ত খেয়াল করলে দেখা যাবে নায়িকাভাবে সাধনার ধারা নতুন কিছু নয়। নীলাচলে থাকাকালীন চৈতন্যদেব যেভাবে ভক্তিতন্ময় চিত্তে দিন যাপন করতেন তাতে তাঁকে রাধাভাবে ভাবিতা মনে হতেই পারে। বঙ্গভূমির চৈতন্যমূর্তি কিন্তু এমন কৃষ্ণ-তন্ময় নয়। নবদ্বীপে চৈতন্য শিক্ষাদান করেছেন, সংকীর্তন প্রচার করেছেন, কাজি দলন করেছেন। নরহরি সরকার এই হিংসাত্মক চৈতন্যমূর্তির মধ্যে নাগরমূর্তির ভাবনা যোগ করলেন। ইতিহাসের দিক থেকে বঙ্গভূমি ও নবদ্বীপের চৈতন্যমূতি যেন খানিকটা পৃথক।

বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীর অনুগ্রহ-পুষ্ট কৃষ্ণদাস এই পৃথকতত্বকেই সামঞ্জস্য প্রদান করলেন। চৈতন্যই রাধাকৃষ্ণ একথা প্রচারিত হলে চৈতন্যের গুরুত্ব, নাগরভাব, প্রণয়তন্ময়তা, রাধাকৃষ্ণের সর্বভারতীয়ত্বের আধারে চৈতন্যের সর্বভারতীয়তা—সব দিকই রক্ষা হয়।

অবশ্য রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি কল্পনার পেছনে তন্ত্রের শিবশক্তির যুগনদ্ধমূর্তির প্রভাব আছে। অর্ধনারীশ্বর মূর্তির প্রভাব থাকাও অসম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে archetype আর archetypal image এক নয়। যুগনদ্ধমূর্তি archetype আর রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত চৈতন্যমূর্তি বিশেষ তত্ত্ব ব্যাখ্যাত archetypal image অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বে বিশ্বাসী গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই যুগনদ্ধতার archetype নির্বাচনের প্রবণতা দেখা গিয়েছিল।

রাধাকৃষ্ণ এই যুগলের পৌরাণিক ও সাহিত্যিক বাস্তবতাকে (mythical and literary reality) ঐতিহাসিক বাস্তবতা (historical reality) প্রদান করার জন্যই চৈতন্যদেবের মধ্যে রাধাকৃষ্ণ যুগলকে স্থাপন করা হল। অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ প্রণয়লীলা শুধু ভাব বৃন্দাবনেই ঘটেনি ইতিহাস-পুরুষ চৈতন্যদেবের জীবনেও ঘটেছিল। আবার রাধাকৃষ্ণলীলাকে ঐতিহাসিক মাত্রা দিতে গিয়ে ইতিহাস-পুরুষ চৈতন্যকে 'mythical figure' করে তোলা হল। অর্থাৎ ইতিহাস ও পুরাণের এক বিচিত্র প্রতিন্যাস কৃষ্ণদাসের চৈতন্যস্বরূপের মধ্যে বর্তমান।

খ. চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কারণ :

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কারণ বিষয়টি চৈতন্যস্বরূপ ভাবনার পরিপূরক। সাধারণভাবে কোনো বিশেষ দেশকালে কোনো প্রতিভাবান পুরুষের জন্ম হলে সেই ব্যক্তিটি শুধু সেই দেশ-কালের দ্বারা প্রভাবিত হন না, সেই দেশকালকেও প্রভাবিত করেন। যেমন চৈতন্যদেবের জন্মের আগেই অদ্বৈতাচার্যের নেতৃত্বে নবদ্বীপে বৈষ্ণবপরিমণ্ডল তৈরি হয়েছিল। চৈতন্যদেব এই বৈষ্ণব পরিমণ্ডলের মানুষজনকে তীব্র এক ভক্তি আন্দোলনে যুক্ত করলেন। এখানে দেশকালের ভক্তি দ্বারা চৈতন্য এবং চৈতন্যের ভক্তির দ্বারা দেশকাল প্রভাবিত। ভক্তেরা অবশ্য পারস্পরিক সম্পর্ক স্বীকার করেন না। তাঁদের দৃষ্টিতে অবতারের আবির্ভাবের কারণ পূর্বনির্দিষ্ট। চৈতন্যদেব কেন আবির্ভূত হলেন 'চৈতন্যভাগবত' কার বৃন্দাবন দাস তার কারণ নির্দেশ করেছেন। তাঁর জীবনীকাব্যে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কারণ হিসেবে তিনটি সূত্র নির্দেশিত।

১) বৃন্দাবন দাস লিখেছেন—

ধর্মপরাভয় হয় যখনে যখনে।
অধর্মের প্রবলতা বাড়ে দিনে দিনে।।
সাধুজন রক্ষা দুষ্ট বিনাশ কারণে
ব্রহ্মাদি প্রভুর পায়ে করে বিজ্ঞাপনে।।
তবে প্রভু যুগধর্ম স্থাপন করিতে।
সাঙ্গোপাঙ্গ অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীতে।।
কলিযুগে ধর্ম হয় হরি সঙ্কীর্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দ।। (১/২)

২) বৃন্দাবন দাস অন্যত্র লিখেছেন—

সেই নবদ্বীপে বৈসে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।
অদ্বৈত আচার্য নাম সর্বলোক ধন্য।।...
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ আবেশের তেজে।
যে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠেতে বাজে।।
যে প্রেমের হুঙ্কার শুনিয়া কৃষ্ণনাথ।
ভক্তিবেশে আপনেই হইলা সাক্ষাৎ।।
অতএব অদ্বৈত বৈষ্ণবাগ্রগণ্য
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যার ভক্তিযোগ ধন্য।। (১/২)

এখানে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কারণ হিসেবে গীতার 'যদা যদাহি ধর্মস্য' শ্লোকটির বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে। অস্যার্থ হল নবদ্বীপে দুর্বিনীত অভক্তের সংখ্যা বেশি হয়ে গেছিল—এই সব দুষ্টের বিনাশ কারণে চৈতন্য আবির্ভূত হলেন। তিনি একা আসেননি—'সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদম্' এসেছেন। তিনি শুধু বিধর্মীদের বিনাশ করবেন না—বিনাশের পদ্ধতিটিও অভিনব। নামসংকীর্তনের মাধ্যমে তিনি সকলকে প্লাবিত করবেন। এই দুষ্টের বিনাশ ও নামসংকীর্তন প্রচারের সঙ্গে ভক্তিযোগের ভাবনাও যোগ করে দেওয়া হল। ভক্তিযোগ অনুসারে ভক্তের ডাক ভগবান উপেক্ষা করতে পারেন না। অগ্রগণ্য ভক্ত অদ্বৈতের ডাকেই চৈতন্যের আবির্ভাব ঘটেছে।

'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ এই আবির্ভাবের কারণটি অন্যভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। সেখানে আবির্ভাবের কারণ দুটি গৌণ ও মুখ্য। গৌণ কারণটি 'চৈতন্যভাগবত'-এর অনুরূপ। 'চৈতন্যচরিতামৃত'কার লিখেছেন :

১) আমারে যে যে ভক্ত ভজে যে যে ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজোঁ এ মোর স্বভাবে।।...
মাতা মোরে পুত্র ভাবে করএ বন্ধন।
অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন।।
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন বড় লোক তুমি আমি সম।।
প্রিয়া যদি মান করি করএ ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে সেই হরে মোর মন।। (১/৪)

'চৈতন্যভাগবত'-এ অদ্বৈত প্রসঙ্গে যে ভক্তিযোগের কথা ছিল এখানে তা সম্প্রসারিত হল। 'ভাগবত'-এর দশম স্কন্ধ অনুসরণে এই ভক্তিতত্ত্ববাচন রচিত। এই ভক্তিতত্ত্ববাচনের সঙ্গে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের মুখ্য কারণটি যোগ করে দেওয়া হচ্ছে। আবির্ভাবের মুখ্য কারণ আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের ষষ্ঠ শ্লোকে বর্ণিত :

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশঃ বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দু।।

শ্রীকৃষ্ণ তিনটি জিনিস জানার জন্য রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণমূর্তি ধারণ করলেন—

(i) শ্রীরাধার প্রণয়ের মহত্ত্ব কেমন

(ii) রাধার আস্বাদ্য কৃষ্ণমাধুর্যের স্বরূপ কেমন

(iii) কৃষ্ণ-অনুভবে রাধা কেমন আনন্দ পান

'চৈতন্যচরিতামৃত'কার আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে কৃষ্ণের বাচন উদ্ধার করেছেন—

এই তিন কৃষ্ণা মোর নলি পূরণ।
বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন।।
রাধিকার ভাবদ্যুতি অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে।।
রাধাভাব অঙ্গীকরি ধরি তার বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ।। (১/৪)

লক্ষণীয় চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের মুখ্য কারণের মধ্যে রাগমার্গের সাধনাই বড়ো হয়ে উঠেছে। বলা যেতে পারে আবির্ভাবের এই তাত্ত্বিক কারণটি বৃন্দাবনের ভক্তিভাবনার সংযোজন।

বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এ যে অদ্বৈতচার্যের প্রসঙ্গ ছিল 'চৈতন্যচরিতামৃত'ও তার উল্লেখ আছে তবে মুখ্য হয়ে উঠল কৃষ্ণের রস-আস্বাদন ইচ্ছা। 'চৈতন্যচরিতামৃত'কার কৃষ্ণবাচনে লিখেছেন 'রস আস্বাদিতে আমি (কৃষ্ণ) কৈল অবতার।'

অবশ্য রস-আস্বাদন আবির্ভাবের মুখ্য কারণ হলেও গৌণ কারণ নাম-সংকীর্তন প্রচার। 'অনপির্তচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কালৌ/সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।' বহুযুগ ধরে অপ্রচারিত যে ভক্তিরস তার প্রবর্তনের জন্যই তো চৈতন্যের আবির্ভাব। আর ভক্তিরস প্রচারের অন্যতম উপায় তো নাম-সংকীর্তন।

অর্থাৎ 'চৈতন্যভাগবত'-এ উদ্ধৃত কারণসমূহকে কৃষ্ণদাস অস্বীকার করলেন না। তবে সেগুলিকে গৌণ কারণ বলে নির্দেশ করে মুখ্য কারণ হিসেবে বৃন্দাবনে ভক্তিভাবনাকেই প্রতিষ্ঠা করলেন।

গ. শক্তিতত্ত্ব বা রাধাতত্ত্ব :

'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর নানা অংশে শক্তিতত্ত্ব বা রাধাতত্ত্ব সংক্রান্ত বাচন ও সিদ্ধান্ত ছড়িয়ে আছে। আসলে রাধাকৃষ্ণের যুগনদ্ধমূর্তি কল্পনা করতে গেলে রাধাতত্ত্ব না শক্তিতত্ত্বের বিষয়টি উল্লেখের প্রয়োজন। আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদ ও মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদ অনুসারে শক্তিতত্ত্ব আলোচনা করা হল। এই আলোচনা প্রসঙ্গে স্বভাবতই গোপীতত্ত্বের কথা আসবে।

আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার এই রস চারটির মধ্যে শৃঙ্গারকে রসশ্রেষ্ঠ বলা হল। কারণ :

পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
এক দুই গণনে পঞ্চ পর্যন্ত বাঢ়য়।।
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাঢ়ে প্রতি রসে।
শান্ত দাস্য সখ্যাদির গুণ মধুরেতে বৈসে।।
আকাশাদির গুণ যেন পর পরভূক্তে।
এক দুই গণনে হয় পঞ্চ পৃথিবীতে।।
পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে।।

মধুর রসের মধ্যে শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য এই চারের গুণ বর্তমান। এই রসের রসিকই কৃষ্ণপ্রাপ্ত হন। রসের ভাগ দ্বিবিধ—পরকীয়া এবং স্বকীয়া। স্বকীয়ার থেকে পরকীয়া শ্রেষ্ঠ কারণ 'পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস পরকীয়া প্রেমে প্রতিকূলতা থাকে বলে রসাধিক্য ঘটে। অবশ্য 'ব্রজ বিনু ইহার অন্যত্র নাহি বাস' এই ব্রজ বা নিত্যধামের বধূ পরকীয়াভাবের আলম্বন—'তার মধ্যে শ্রীরাধিকা ভাবের অবধি।' এভাবে শ্রীরাধিকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন 'চৈতন্যচরিতামৃত'কার। এই প্রমাণ বিষয়টি মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে বিস্তৃত হয়েছে। সেখানে কাম ও প্রেম দুয়ের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। আ-ন্দ্রিয় প্রীতি হল কাম এবং কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি হল প্রেম। সুতরাং যাঁর মধ্যে কৃষ্ণেন্দ্রিয় তৃপ্তিলাভ করে তিনিই শ্রেষ্ঠা। প্রশ্ন হল কার রূপেগুণে কৃষ্ণেন্দ্রিয় পরম প্রীতি লাভ করে?

মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে 'চৈতন্যচরিতামৃত' প্রণেতা একটি ঘটনার উল্লেখ করে রাধার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন।

শতকোটি গোপী সঙ্গে রাস বিলাস।
তার মধ্যে এক মূর্তে রহে রাধা পাশ।।
সাধারণ প্রেম দেখি সর্বত্র সমতা।
রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা।।
ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি।
তাঁরে না দেখি ইহাঁ ব্যাকুল হৈলা হরি।।...
ইতস্ততঃ ভ্রমি কাঁহো রাধা না পাইঞা।
বিষাদ করেন কামবাণে খিন্ন হৈঞা।।
শতকোটি গোপীতে নহে কাম নির্বাহণ।
ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ।। (২/৮)

শতকোটি গোপীর সঙ্গে রাসলীলা করেও কৃষ্ণ তৃপ্ত হননি। রাধা রাসমণ্ডলী পরিত্যাগ করে চলে যাওয়া মাত্রেই কৃষ্ণ রাধা অন্বেষণে গেলেন।

অবশ্য শুধু ঘটনার বিবৃতিতেই তো রাধার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করলে চলবে না তত্ত্বগতভাবেও প্রমাণ করতে হবে। এই তত্ত্বকাঠামো নির্মাণের জন্যই শক্তিতত্ত্বের অবতারণা।

কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি নাম।।
অন্তরঙ্গা বহিরিঙ্গা তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি সভার উপরে।।...
সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিন রূপ।।
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদবংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিত যারে জ্ঞান করি মানি।।...
কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তি দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি।।
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ।।
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময়রস প্রেমের আখ্যান।। (২/৮)

এই অংশটি লক্ষ করলে বোঝা যার রাধা হ্লাদিনী শক্তি। সূত্রাকারে এই শক্তিতত্ত্বের ক্রমান্বয়িক/থাকবন্দি বিন্যাসটি তুলে ধরা সম্ভব।

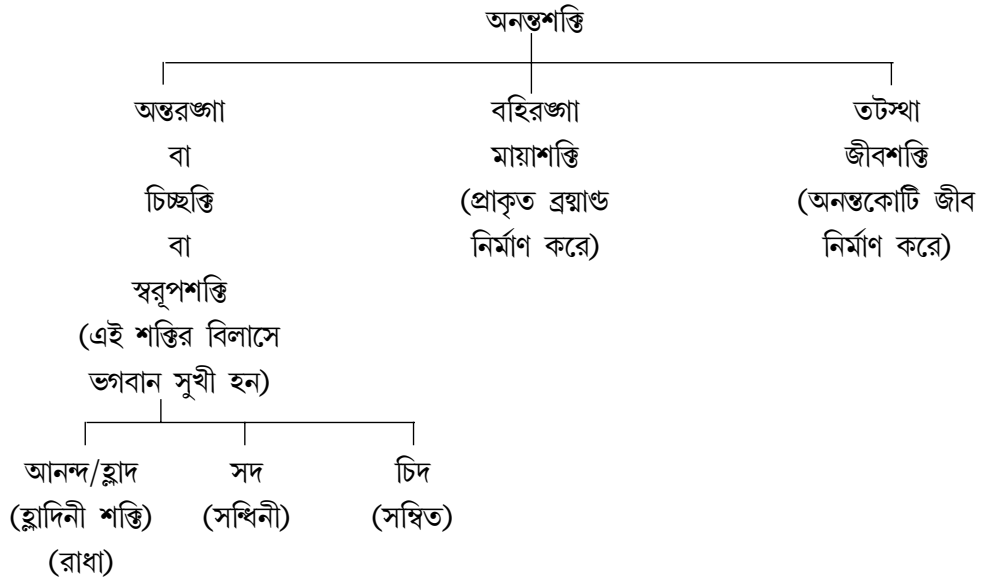

শক্তিতত্ত্বের এই ছকটি লক্ষ করলে দেখা যাবে আসলে এটি সৃষ্টিতত্ত্ব। ব্রহ্মাণ্ড ও জীবজগৎ কী কারণে সৃষ্টি হয় তারই যেন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হচ্ছে। এই সৃষ্টিতত্ত্বের পর ঈশ্বরস্বরূপের বর্ণনা করতে গিয়ে স্বরূপশক্তির কথা বলা হল। এই স্বরূপশক্তির সার হ্লাদিনীশক্তি রাধা। রাসনৃত্যের ঘটনায় আগেই রাধার প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছিল এবার শক্তিতত্ত্বের সাহায্যে রাধার প্রাধান্য স্বীকৃত হল।

এখানে অবশ্য গোপীতত্ত্বের বিষয়টিও খেয়াল করতে হবে। কারণ রাধা প্রধানা গোপী।

গোপী শব্দটি এসেছে গুপ্ ধাতু থেকে। অর্থ রক্ষণ করা। যে সমস্ত রমণী শ্রীকৃষ্ণবশীকরণ যোগ্য প্রেম (মহাভাব) রক্ষা করেন তাঁরাই গোপী। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমবশ্য। এই প্রেমে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি সম্পাদিত হয়। অর্থাৎ গোপীদের প্রেমক্রীড়া আত্মার্তে নয় কৃষ্ণার্থে। গোপীগণের মধ্যে রাধাপ্রেম শ্রেষ্ঠ কারণ তাতেই কৃষ্ণেন্দ্রিয় যথার্থ তৃপ্ত হয়। এজন্য রাধা গোপীশ্রেষ্ঠ। অন্য গোপীরা শ্রীরাধার কায়ব্যূহ স্বরূপ। কৃষ্ণপ্রেম রাধায় নির্বাপিত হয় সুতরাং অন্য গোপীরা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিকারিণী রাধাকে রক্ষা করে পরোক্ষে কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিস্বরূপ প্রেমসাধনা করেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত'কার তাই লিখেছেন :

রাধার স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেম কল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা।।

৩.৩ মধ্যলীলা (৮ম পরিচ্ছেদ)

'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই অংশে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাধ্যবস্তু হল কোনো ধর্মপন্থার পরম ঈপ্সিত বস্তু আর সাধনপন্থা হল সেই বস্তুলাভের উপায়। সাধ্য-সাধন তত্ত্ব আলোচনা পাশাপাশি এই অংশের ভাষা-ব্যবহার নিয়েও আমরা আলোচনা করব। কারণ বাংলা

ভাষায় 'চরিতামৃত'কার কেমন করে তত্ত্বরূপ প্রকট করছেন তার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বস্তুতপক্ষে ইংরেজপ্রভাব-পূর্ব বাংলা সাহিত্যে 'চৈতন্যচরিতামৃত'ই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ যাতে দার্শনিক চিন্তন প্রকাশিত হয়েছে 'চৈতন্যচরিতামৃত'কার বিভিন্ন স্থান থেকে তাঁর উপাদানসমূহ সংগ্রহ করেছেন। গ্রন্থমধ্যে তার স্বীকৃতিও আছে। যথা 'চৈতন্যচরিতামৃত'কার বিভিন্ন স্থান থেকে তাঁর উপাদানসমূহ সংগ্রহ করেছেন। গ্রন্থমধ্যে তার স্বীকৃতিও আছে। যথা :

১) আদিলীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত।
সূত্ররূপে **মুরারিগুপ্ত** করিলা গ্রথিত।।
প্রভুর যে শেষলীলা **স্বরূপ দামোদর**।
সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর।।
এই দুইজনার সূত্র দেখিয়া শুনিয়া।
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া।। (১/১৩)

২) **বৃন্দাবন দাস** প্রথম যে লীলা বর্ণিল।
সেই সব লীলার আমি সূত্রমাত্র কৈল।। (৩/২০)

এখানেই 'চৈতন্যচরিতামৃত'কারের কৃতিত্ব। অনেন্য সূত্রকে আত্তীকৃত করে সুললিত বাংলায় তিনি চৈতন্যজীবনের তথ্য ও তত্ত্ব পরিবেশন করতে চেয়েছেন।

৩.৪ সাধ্যসাধন তত্ত্ব

চৈতন্যদেবের শিক্ষাষ্টক স্মরণে রাখলে আমরা খেয়াল করব চৈতন্যদেবকে নিয়ে যে বিশাল তত্ত্ব মঞ্জরী বিস্তার লাভ করেছিল তার সঙ্গে আবেগদীপ্ত সকল শিক্ষাশ্লোকগুলির যেন কোনো যোগ নেই। নামভক্তিবাদী চৈতন্যদেব ঈশ্বরের সঙ্গে যেন এক সহজ ব্যক্তিগত সম্পর্কই স্থাপন করতে চান। বস্তুত পক্ষে আমরা সর্বভারতীয় ভক্তিধর্মান্দোলন যদি স্মরণে রাখি তাহলে দেখব দক্ষিণের আলোয়ার, নয়নসার থেকে শুরু করে উত্তরে মীরা, দাদু, লালদেও—সবাই ভক্তির কেন্দ্রে এক সহজ আবেগকেই স্থাপন করেছেন। চৈতন্যদেবও এর ব্যতিক্রম নন। বিশেষ করে তাঁর দক্ষিণভারত ভ্রমণ, ভক্তিগ্রন্থের উদ্ধার, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ইত্যাদি প্রমাণ করে সর্বভারতীয় ভক্তিধর্মের প্রেক্ষাপট তিনি স্মরণে রাখছেন। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা এই ভক্তিধর্মকে তাত্ত্বিক কাঠামো প্রদান করলেন। তাঁদের আলোচনার কেন্দ্রে বার বার উঠে এল রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব। কৃষ্ণদাস এই রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বের সঙ্গে চৈতন্যতত্ত্বের সামঞ্জস্য বিধান করে তাঁর মহাগ্রন্থের মধ্য লীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে সাধ্যসাধন তত্ত্ব বিবৃত করলেন। কৃষ্ণদাস অবশ্য জানাচ্ছেন এই তত্ত্ব তিনি স্বরূপ দামোদরের কড়চার সূত্রে পেয়েছেন। স্বরূপ দামোদরের কড়চায় রামানন্দ-চৈতন্য মিলন বিবৃত হয়েছিল। সেই মিলনে রায় রামানন্দ সাধ্যসাধন তত্ত্ব বিবৃত করেছিলেন, শ্রবণ করেছিলেন চৈতন্যদেব। অবশ্য রামানন্দ জানিয়েছেন তিনি যন্ত্র, চৈতন্যদেব যন্ত্রী। তবে সে যাই হোক স্বরূপ দামোদরের না দেখা কড়চা (এটি পাওয়া যায়নি) নিয়ে তর্ক না তুলে, রায় রামানন্দের ঐতিহাসিকতা ও পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন না করে আমরা প্রথম কৃষ্ণদাস গোস্বামীর রচনা অনুসারে সাধ্যসাধনতত্ত্ব বিবৃত করব। পরে অবশ্য সেই তত্ত্বের যৌক্তিকতা আমাদের বিচার্য হবে।

'চৈতন্যচরিতামৃত'কার জানাচ্ছেন দক্ষিণ ভারত ভ্রমণকালে 'গোদাবরী তীরে প্রভু আইলা কথোদিনে' এবং প্রভুর 'গোদাবরী দেখি হৈলা যমুনা স্মরণ।/ তীরে বন দেখি স্মৃতি হৈল বৃন্দাবন।।' এই গোদাবরী তীরেই রামানন্দ রায় 'স্নান করিবারে আইলা বাজনা বাজায়।।" রামানন্দের সঙ্গে চৈতন্য মিলিত হলেন এবং রামানন্দের কাছে তিনি সাধ্যতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব শ্রবণ করলেন। 'প্রভু কহে পঢ় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।' রায় চৈতন্যদেবের কাছে বিবিধ শ্লোক

প্রমাণ সহযোগে স্তর-পরম্পরায় সাধ্যসাধনতত্ত্ব বিবৃত করলেন। চৈতন্যদেব ক্রমে প্রশ্ন করে রামানন্দকে মূলে উপনীত সাহায্য করেছেন।

রায় রামানন্দ প্রথমে যথাক্রমে স্বধর্মাচরণ, কৃষ্ণে কর্ম অর্পণ, স্বধর্মত্যাগ, জ্ঞানমিশ্রাভক্তি ও জ্ঞানরহিত ভক্তিকে সর্বসাধ্যসার বলেছেন। প্রতিক্ষেত্রেই চৈতন্যদেব জানিয়েছেন 'এহো বাহ্য আগে কহ আর'। স্বধর্মাচরণ, কৃষ্ণে কর্ম অর্পণ, স্বধর্মত্যাগ ও জ্ঞানমিশ্রাভক্তি—প্রতিটিই সেব্য-সেবকত্ব ভাবের অন্তরায় তাই চৈতন্যদেব এগুলিকে 'এহো বাহ্য' বলেছেন। বর্ণাশ্রমধর্মে দেহাবেশ থাকে, কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই কৃষ্ণে কর্ম অর্পণ করা হয়। শ্রীকৃষ্ণে সর্বধর্মত্যাগের মধ্যেও স্বতঃস্ফূর্তি থাকে না। আর জ্ঞানমিশ্রাভক্তি বিচারশীল জ্ঞানের প্রভাবে সম্বন্ধভাবের প্রতিকূল। ফলে সার্ষ্টি, সারূপ্য, সার্লোক্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য পরিত্যাগী বৈষ্ণবের কাছে এগুলির কোনোটিই সর্বসাধ্যসার হতে পারে না।

রায় রামানন্দ এরপর একে একে জ্ঞানশূন্যাভক্তি, প্রেমশক্তি ও দাস্যপ্রেমকে সর্বসাধ্যসার বলেছেন। প্রতি ক্ষেত্রেই চৈতন্যদেব বলেছেন 'এহো হয় আগে কহ আর।' লক্ষণীয় চৈতন্যদেব পূর্ববর্তী পর্যায়ে রামানন্দ কল্পিত সাধ্য বিষয়গুলিকে বাহ্যজ্ঞানে অস্বীকার করেছিলেন। দ্বিতীয় স্তরে তিনি বললেন, 'এহো হয়' অর্থাৎ এগুলিকে তিনি অস্বীকার করছেন না। সর্বোত্তম সাধ্যবস্তুতে উপনীত হওয়ার প্রাথমিক স্তর বলে স্বীকার করে নিচ্ছেন। জ্ঞানশূন্যাভক্তিতে ঐশ্বর্যজ্ঞান থাকে না, প্রেমভক্তিতে সম্বন্ধজ্ঞানের বিকাশ হয় আর দাস্যভক্তিতে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তাই চৈতন্যদেব বলেছেন 'এহো হয়'। আসলে প্রেমই পরম পুরুষার্থ, এগুলি সেই পরমপুরুষার্থে উপনীত হওয়ার নিম্নস্তর।

এরপর রামানন্দ একে একে সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তাপ্রেমের কথা বললেন। সখ্যপ্রেম ও বাৎসল্যপ্রেমের ক্ষেত্রে চৈতন্য বললেন, 'এহোত্তম আগে কহ আর।' দাস্যভাবে ভক্তহৃদয়ে সামান্য সংকোচ থাকতেও পারে কিন্তু সখ্য ও বাৎসল্যে সেই সংকোচ দূরীভূত হয়। ঐশ্বর্যজ্ঞানের লুপ্তিতে সম্বন্ধজ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ ঘটে এবং কান্তাপ্রেমে সম্বন্ধ প্রেমের স্ফূর্তি হয়। রামানন্দ জানিয়েছেন 'গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাঢ়ে প্রতি রসে/ শান্ত দাস্য সখ্যাদির গুণ মধুরেতে বসে।' তাই মধুররসাশ্রিত 'কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার।' 'ভাগবত' এই কথার স্বীকৃতি রয়েছে—'যদ্যপি কৃষ্ণ সৌন্দর্য মাধুর্যের ধূর্য।/ ব্রজদেবী সঙ্গে তার বাঢ়য়ে মাধুর্য।। ' চৈতন্যদেব রামানন্দের এই বিচার শ্রবণ করে বললেন, '...এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।/ কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়।।'

অর্থাৎ কান্তাপ্রেমকে আরও বিশেষিত করার অনুরোধ জানালেন চৈতন্যদেব। রায় রামানন্দ জানালেন 'ইহার মধ্যে' রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।' রায় রাধাপ্রেমকে সাধ্য শিরোমণি বললেন কেন ? নিজের সমর্থনে প্রমাণ হিসেবে রায় রামানন্দ এরপর যথাক্রমে 'গীতগোবিন্দ', 'ভাগবত' ও 'বিষ্ণুপুরাণ'কে ব্যবহার করেছেন। রাধাপ্রেম অন্যাপেক্ষা নয়, কৃষ্ণ রাধার জন্য গোপীদের রাসমণ্ডল পরিত্যাগ করেন। রাধাকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। 'হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।/... প্রেমে সার মহাভাব জানি।/ সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী।' অর্থাৎ কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার এবং মহাভাবস্বরূপিনী রাধাপ্রেম সাধ্যশিরোমণি। স্বভাবতই চৈতন্যদেব এরপর রামানন্দের কাছে 'দোঁহার বিলাস মহত্ত্ব' শুনতে চেয়েছেন। রায় 'প্রেমবিলাসবিবর্ত'-এর কথা বলেছেন। তখন 'প্রভু কহে সাধ্যবস্তু অবধি এই হয়/ তোমার প্রসাদে ইহা জানিলুঁ নিশ্চয়।।'

অর্থাৎ রাধার কান্তাপ্রেমকেই সাধ্যশিরোমণি বলে স্বীকার করতে হবে। রায় রামানন্দ চৈতন্যদেবকে রাধা-কৃষ্ণের বিলাসলীলা শোনাতে গিয়ে 'না সো রমণ না হাম রমণী' পদটি শোনান। এই পদে প্রেমবিলাসবিবর্তের ইঙ্গিত আছে। 'বিবত' শব্দের দুটি অথ ; পরিপক্ব অবস্থা (জীব গোস্বামী) এবং বিপরীত (চক্রবর্তী)। এই দুটি অর্থকেই গ্রহণ করা যায়। প্রেমের পরিপক্ব অবস্থায় বার বার মিলনে ও মিলন-বাসনার অতৃপ্তির ফলে উৎকণ্ঠা জন্মায়। বাস্তব মিলনেও স্বপ্নবৎ উপলব্ধি হয়। এইভাবে প্রেমলীলায় রমণ ও রমণী এই ভেদজ্ঞান শূন্যতায় যে 'বিলাসমাত্রৈবাতন্ময়তা' তাই প্রেমক্রীড়ার পরমাবস্থা।

চৈতন্যদেব এরপর রামানন্দের কাছে সাধনতত্ত্ব বিষয়ে জানতে চেয়েছেন। 'সাধ্যবস্তু সাধন বিনু কেহ নাই পায়।/কৃপা করি কহ ইহা পাবার উপায়।।' মনে রাখতে হবে চৈতন্যদেব যে সাধনের প্রসঙ্গ তুললেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব অনুযায়ী সেই সাধন জীবের। রাধাপ্রেমকে 'সাধ্য বস্তুর অবধি' বলা হয়েছে। রাধাপ্রেম নিত্যসিদ্ধ তা কোনো সাধনের ফল নয়। 'রাধাপ্রেম সাধ্য শিরোমণি' হলেও তাই রাধাপ্রেমের আনুগত্যময়ী সেবাই জীবের সাধ্য—'রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়।' এই সাধ্যবস্তু লাভের জন্য সখীভাবে রাগানুগা মার্গের সাধন করতে হবে। 'রাগানুগামার্গে তাঁরে ভজে যেই জন।/সেই জন পায় ব্রজের নন্দ।।' অর্থাৎ জীবের সাধ্য রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা এবং সখীভাব অঙ্গীকৃত করে এই সাধ্যবস্তু লাভ করতে হবে।

এবার দেখা যাক রায় রামানন্দের এই সাধ্যসাধনতত্ত্বের যৌক্তিক ঘাতসহত্ব কতটা। প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হবে সাহিত্যিক ঐতিহ্যকে কৃষ্ণদাস তাঁর রচনায় অঙ্গীকৃত করেছেন। 'ভাগবত' প্রধানা গোপীর কথা থাকলেও রাধার কথা নেই। তাই রাসমণ্ডল পরিত্যাগ করে রাধার খোঁজে কৃষ্ণের গমনের সমর্থনে কৃষ্ণদাস জয়দেবে 'গীতগোবিন্দ' ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ সাহিত্য এখানে প্রমাণ।

প্রেমবিলাস-বিবর্তের ইঙ্গিতবাহী রায় রামানন্দের 'না সো রমণ না হাম রমণী' অনিবার্যভাবে বিদ্যাপতির 'মাধব মাধব সোঙারিতে সুন্দরী ভেলি মাধাই' পঙ্‌ক্তিটিকে স্মরণ করায়। এমনকী মনে পড়ে যায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনর রাধাবিরহ অংশের রাধার রমণ অভিজ্ঞতার কথা। 'যুড়ী রসনে রসনে। কৈল মুখ মধু পানে/রাধা না জাণিল আপণ পর তখনে।' রাধার আপন-পর জ্ঞানলুপ্তির স্বাভাবিক মানবিক অভিজ্ঞতাই প্রেমবিলাসবিবর্তে তত্ত্বরূপ লাভ করেছে। অর্থাৎ 'রাধা প্রেম সাধ্য শিরোমণি' বলে যে প্রেমবিলাসবিবর্তের কথা বলা হল তা অলৌকিক নয়। বস্তুতপক্ষে ভক্তিধর্ম আন্দোলনের ঐতিহ্যে মানব সম্বন্ধকে ভগবান সম্বন্ধে উপমান হিসেবে ব্যবহার করা নতুন কিছু নয়। তবে এখানে এই রাধাপ্রেম জীবের অসাধ্য বলে তর-তম নির্দেশ করা হল। আশ্চর্য কৌতুক এই যে নামধর্ম-প্রচারক চৈতন্যদেব বৈষ্ণবদের মধ্যে অধিকারভেদ করেননি অথচ পরবর্তী তত্ত্বে অধিকার ভেদ করা হল।

আরেকটি বিষয় এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 'গীতা'র 'মোক্ষ-সন্ন্যাসযোগ' অধ্যায়ের ৬৬নং শ্লোক 'সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' শ্লোকটি চৈতন্য স্বীকার করেননি, 'এহো বাহ্য' বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আসলে 'গীতা'র ভক্তিবাদ নবম-দশম শতাব্দী নাগাদ দক্ষিণ ভারতে ভাগবতীয় ভক্তিবাদের দ্বারা নতুন রূপ পরিগ্রহ করছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাছে 'গীতা'র ঐশ্বর্যময় কৃষ্ণ নয়, 'ভাগবত'-এর মাধুর্যময় কৃষ্ণই আদৃত। 'গীতা'র পরিবর্তে 'ভাগবত'-এর প্রাধান্য লাভ ভক্তিধর্মের ইতিহাসের অন্যতম ঐতিহাসিক সূত্র। রায় রামানন্দ ও চৈতন্যদেবের বাচনে এই ঐতিহাসিক সূত্রই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। মধ্যখণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদটি পরোক্ষে ভারতে ভক্তিধর্ম আন্দোলনের ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে। তাই এই অংশটি শুধু ভক্তবৈষ্ণবের অবশ্য পাঠ্য নয়, ইতিহাসি-জিজ্ঞাসুরও অবশ্য পাঠ্য।

'চৈতন্যচরিতামৃত'কারের ভাষা ব্যবহারের মুনশিয়ানাও এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে। 'চৈতন্যচরিতামৃত'কার বাংলাভাষী শ্রোতা-পাঠকদের কাছে তাঁর কাব্য তুলে ধরছেন। কাব্যটির মূলভাব সংস্কৃতি শাস্ত্র-ভাষ্য ও টীকাগ্রন্থের মধ্যে বিধৃত। এই মূল গ্রন্থগুলি যাঁদের কাছে অধরা তাঁদের জন্যই কৃষ্ণদাস কাব্য লিখেছেন। তাঁর কাব্যের জনপ্রিয়তার নিরিখে বলা যায় এ ব্যাপারে তিনি সার্থক। তা ছাড়া তাঁর কাব্যের বহু অংশ শ্রোতাপাঠক স্মৃতিতে স্থায়ী হয়েছে। কালিদাস রায় তাঁর 'কৃষ্ণদাস কবিরাজ' শীর্ষক কবিতাটিতে যথার্থই লিখেছেন ঃ 'ব্রজে মাধুকরী করি বিন্দু বিন্দু মধু হরি মধুচক্র করেছ গঠন,/আনন্দে করিছে পান তোমার স্বর্গীয় দান, গৌরপ্রাণ যত গৌড়জন।'/

৩.৭ সারাংশ

কৃষ্ণদাসের 'চৈতন্যচরিতামৃত'র এই আলোচনা থেকে শেষপর্যন্ত আমরা কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি :

১) 'চৈতন্যচরিতামৃত' প্রচলিত বাংলা জীবনীকাব্যগুলির থেকে গঠনে পৃথক। মঙ্গালকাব্যের গেয় বা পরিবেশনযোগ্য ভঙ্গি এখানে নেই, আছে যথার্থ দার্শনিক গ্রন্থের গাম্ভীর্য।

২) কৃষ্ণদাস ব্রজমণ্ডল ও বঙ্গাভূমি—এই দুই দেশের কৃষ্ণভাবনার বা চৈতন্যভাবনার মধ্যে এক সামঞ্জস্য বিধান করতে চেয়েছিলেন। তবে ব্রজমণ্ডলের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল।

৩) কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনের গোস্বামীতত্ত্বকে অনুসরণ করে চৈতন্যদেবকে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বকে কেন্দ্র করেই 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত' কৃষ্ণমূর্তির পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

৪) এই কাব্যে ঘটনার বিন্যাস ভাবাদর্শের অনুসারী। এদিক থেকে এটিকে চৈতন্যজীবনের অন্তরঙ্গাভাষ্যে বলা যায়। অবশ্য এই অন্তরঙ্গা-জীবন গোস্বামীদের কল্প-বিশ্বাস প্রসূত।

৩.৬ অনুশীলনী

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিনঃ

১. বাংলা চৈতন্য জীবনীসাহিত্যের প্রচলিত গোত্রের থেকে কৃষ্ণদাসের গ্রন্থটি গোত্রে আলাদা।—আলোচনা করুন।

২. সাধ্য ও সাধন বলতে কী বোঝায়? 'চৈতন্যচরিতামৃত' অনুসারে সাধ্যসাধনতত্ত্ব আলোচনা করুন।

৩. 'চৈতন্যচরিতামৃত' অনুসারে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কারণ নির্দেশ করুন।

৪. শক্তিতত্ত্ব ও রাধাতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৫. চৈতন্যের জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন এবং সে-জীবন কীভাবে 'জীবনী' হয়ে উঠেছিল তা দেখান।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১. চৈতন্যদেবের জন্ম ও মৃত্যু সাল কত?

২. দুটি সংস্কৃত চৈতন্য-জীবনীগ্রন্থের নাম লিখুন।

৩. 'চৈতন্যচরিতামৃত' বাদে দুটি বাংলা চৈতন্য-জীবনীগ্রন্থের নাম লিখুন।

৪. রায় রামানন্দ কে?

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১. বিমানবিহারী মজুমদার—*চৈতন্যচরিতের উপাদান*

২. রমাকান্ত চক্রবর্তী—*বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম*

৩. S. K. De—*Vaisnava Faith and Movement in Bengal*

৪. রাধাগোবিন্দ নাথ—*শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা*

৫. সুকুমার সেন, তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত—*কৃষ্ণদাস বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*

৬. হিতেশরঞ্জন সান্যাল—*বাঙ্গালা কীর্তনের ইতিহাস*

একক ৪ ❐ মনসামঙ্গাল

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য

৪.১ প্রস্তাবনা

৪.২ কেতকাদাসের মঙ্গালকাব্য

৪.২.১ মনসামঙ্গাল কাব্যের সংক্ষিপ্ত কাহিনি-কাঠামো

৪.৩ চাঁদ বৃত্তান্ত

৪.৩.১ চাঁদ কাহিনির সংক্ষিপ্ত কাঠামো

৪.৪ কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের বেহুলা

৪.৪.১ বেহুলা কাহিনির সংক্ষিপ্ত কাঠামো

৪.৫ কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যমূল্য

৪.৫.১ মনসামঙ্গাল কাব্যের সাহিত্যমূল্য

৪.৬ ইতিহাসের উপাদান

৪.৬.১ মনসামঙ্গাল কাব্যে সামাজিক ইতিহাসের উপাদান

৪.৭ অনুশীলনী

৪.৮ গ্রন্থপঞ্জি

৪.০ উদ্দেশ্য

মঙ্গালকাব্য পাঠের উদ্দেশ্য নির্দেশ করতে গেলে আমাদের প্রথমেই মঙ্গালকাব্যের সংজ্ঞা প্রদান করতে হবে। সাধারণভাবে মঙ্গালকাব্য বলতে আমরা গার্হস্থ্য মঙ্গালের জন্য শ্রুত বা পঠিত আখ্যানকাব্যকে বুঝি। বস্তুতপক্ষে অনেক সময়েই এক মঙ্গালবারে এই কাব্যগুলির পাঠ শুরু হয়ে আরেক মঙ্গালবার পর্যন্ত চলত, মঙ্গালাসুর বধের কাহিনিও কোনো কোনো কাব্যে দেখা যেত। তবে মঙ্গালকাব্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গেলে এর ভাবগত ও গঠনগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে হবে—এই দুই বৈশিষ্ট্য অবশ্য পরিপূরক।

ভাবগত দিক দিয়ে মনসামঙ্গাল বা যে-কোনো মঙ্গালকাব্যই কোনো দেবতা বা দেবীর পূজা প্রচার অর্থাৎ বিজয় কাহিনিমূলক। আসলে এই কাহিনির মাধ্যমে ওই দেবতা বা দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করা হচ্ছে। আবার মঙ্গালকাব্যের মধ্যে একাধিক কাহিনি মিশে থাকে। এদিক থেকে মনে হতে পারে যে অনেক ব্রতকথার সমন্বয়ে যেন মঙ্গালকাব্য গঠিত। তবে মঙ্গাকাব্য গঠনগত দিক দিয়ে ব্রতকথার থেকে ভিন্ন—ব্রতকথার থেকে বিস্তৃতকর এই কাহিনিগুলি গড়ে তোলা হয় অনেকটাই সংস্কৃত পুরাণের আদলে। সেজন্য অনেকেই মঙ্গালকাব্যকে বাংলার পুরাণ বলেছেন। এই মঙ্গালকাব্যের কাহিনি-বিন্যাস রীতিকে আমরা নিম্নলিখিত ভাবে সাজাতে পারি :

সৃষ্টিপালা ——→ দেবতার জন্ম ——→ দেব অভিশাপে স্বর্গবাসীর পৃথিবীতে আগমন ——→ স্বর্গভ্রষ্ট-ব্যক্তির আনুকূল্যে কিংবা প্রাথমিক-প্রতিকূলতা পরবর্তী আনুকূল্যে দেবতা বা দেবীর পূজা প্রচার ——→ স্বর্গভ্রষ্ট ব্যক্তিদের

পূজা প্রচারান্তে স্বর্গলাভ' এই কাহিনি-কাঠামোই প্রতিটি মঙ্গালকাব্যে প্রয়োগ করা হয়েছে। তবে এর সঙ্গে আরও কতগুলি বিষয় যুক্ত থাকে। যেমন সৃষ্টিপালার পরেই সচরাচর মঙ্গালকাব্যের কবি তাঁর আত্মপরিচয় দেন এবং তিনি দেবতা বা দেবীর স্বপ্নাদেশে কাব্যরচনা করছেন একথা জানাতে ভোলেন না। এই অংশটিকে গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বলা চলে। এছাড়া প্রতিটি মঙ্গালকাব্যেই প্রায় বারোমাস্যা, সতীগণের পতিনিন্দা, তীর্থভ্রমণ ইত্যাদি অংশ থাকে। মঙ্গালকাব্যটির যে অংশ স্বর্গভূমিতে আধারিত সেই অংশটিকে আমরা দেবখণ্ড বলি আর যে অংশের ঘটনা পৃথিবীতে ঘটেছে তাকে আমরা নরখণ্ড বলি।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আখ্যানকাব্যের ধারায় মঙ্গালকাব্যই ছিল অন্যতম প্রধান কাব্যরূপ। জনপ্রিয়তা ও প্রচারের নিরিখে আমরা মঙ্গালকাব্যগুলিকে মুখ্য ও গৌণ—দুভাগে ভাগ করতে পারি।

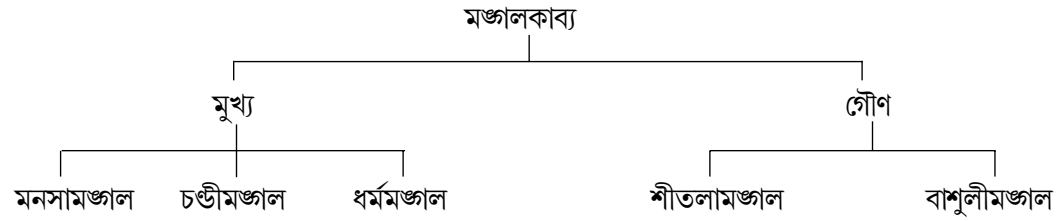

ইচ্ছে করেই আমরা এই তালিকায় রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গালকে রাখলাম না। ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গালে নানাভাবে মঙ্গালকাব্যের কাহিনিগত অভিপ্রায়কে ভাঙতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাতায়নিকের পত্র' প্রবন্ধে লিখেছিলেন 'বাংলার মঙ্গালকাব্যগুলির বিষয়টা হচ্ছে, এক দেবতাকে তার সিংহাসন থেকে খেদিয়ে দিয়ে আর এক দেবতার অভ্যুদয়।' রবীন্দ্রনাথ দেবতা বা দেবীর পূজা প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে এইভাবেই বিশ্লেষণ করেছিলেন। আমরা বলব মঙ্গালকাব্যগুলি আসলে বিজিত বঙ্গভাষীদের ইচ্ছাপূরণের কাব্য। সামাজিক দিক দিয়ে তাঁরা যখন ক্ষুধা-ভয়-পরিশ্রমে জর্জরিত তখন সামূহিক অভিপ্রায় থেকে (সচেতন বা অবচেতন অভিপ্রায়) শক্তিদেবী বা দেবতার কাহিনি কাব্যাকারে বিন্যস্ত করা হচ্ছে। ভাবা হচ্ছে কাহিনির শক্তিদেবী যেন সমস্যার মোচন করবে।

সুতরাং মঙ্গালকাব্যের এই গঠনগত বৈশিষ্ট্য স্মরণে রাখলে, বঙ্গভাষীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনবৃত্তান্ত বোঝার জন্য এবং নানা চরিত্রের মধ্যে বঙ্গভাষীর মনোভঙ্গির কোন্ রূপ ধরা পড়েছে তা দেখার জন্যই মঙ্গালকাব্য পাঠ করা উচিত। তবে মনে রাখতে হবে মঙ্গালকাব্যগুলি যেহেতু নানা মৌখিক কাহিনির ধারক সেহেতু এর মধ্যে লোকসাহিত্যের নানা উপাদানও মিশে আছে।

৪.১ প্রস্তাবনা

দীনেশচন্দ্র সেনের 'রামায়ণী কথা' বইটির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ মহাকাব্যের লক্ষণ নির্ণয় করতে গিয়ে যে কথাগুলি লিখেছিলেন মঙ্গালকাব্যের স্বরূপ বোঝার জন্য সেই কথাগুলি জরুরি। সূত্রাকারে রবীন্দ্র-লিখন সাজিয়ে দেওয়া যেতে পারে—

ক. 'একটি সমগ্র দেশ, সমগ্রযুগ আপনার হৃদয়কে, আপনার অভিজ্ঞতাকে' মহাকাব্যের মধ্যে প্রকাশ করতে চায়।

খ. মনে হয় মহাকাব্যটি 'যেন...বৃহৎ বনস্পতির মতো দেশের ভূতল জঠর হইতে উদ্ভূত হইয়া সেই দেশকেই আশ্রয়চ্ছায়া দান করিয়াছে।'

মহাকাব্যের এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এক উভমুখী প্রতিন্যাস কাজ করে যাচ্ছে। মহাকাব্য একটি সমগ্র দেশের সমগ্র যুগের অভিজ্ঞতাকে যেমন প্রকাশ করে তেমনই মহাকাব্যের মধ্য থেকেই সেই দেশ পরবর্তী পর্যায়ে প্রাণরস সংগ্রহ করে। অর্থাৎ এক জাতিগোষ্ঠীর চেতনাকে অবলম্বন করে যার সৃষ্টি সেই মহাকাব্যই সেই জাতিগোষ্ঠীর পরবর্তী চেতনার নির্ণায়ক বা মূল্যায়ক।

মনসামঙ্গাল কাহিনির মধ্যেও এই বিষয়টি লক্ষ করা যায়। মনে রাখতে হবে বাঙালি মিশ্রসত্ত্ব জাতি। সুতরাং বঙ্গাভাষীর জীবন-চেতনার বৃত্তান্ত কোনো রচনার মধ্যে বিধৃত থাকলে সেই রচনার আদত উপাদানের মধ্যেও এক রকমের মিশ্রতা বর্তমান থাকবে। উপাদানগুলির মধ্যে থাকবে মিল ও অমিলের দ্বিধা। অবশ্য সেই দ্বিধা এতটা প্রকট হবে না যাতে সমস্ত রূপটি অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। মঙ্গালকাব্যের কাহিনি লক্ষ করলে দেখা যাবে এর মধ্যে কাহিনিবৃত্ত গড়ে ওঠার কাল, কাহিনি বিস্তারের কাল ও কাহিনি পুনর্কথনের কাল নানাভাবে মিশে আছে। কাহিনি রচনার সময় এই নানা কাল তার মধ্যে সমাহৃত। আবার রচয়িতা ও অঞ্চলভেদে মনসামঙ্গালের কাহিনির নানা ভেদ আছে। নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত, জগৎজীবন ঘোষাল, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, বিষ্ণু পাল, দ্বিজ বংশীদাস প্রমুখের রচনায় নানা ভেদবিভেদ লক্ষ করা যায়। কোনো আদর্শ পাঠক এই ভেদের মধ্যে একটা সামগ্রিকতা খোঁজার চেষ্টা করবেন। বিষয়টি একটি রেখাচিত্রে মাধ্যমে বোঝানো যেতে পারে।

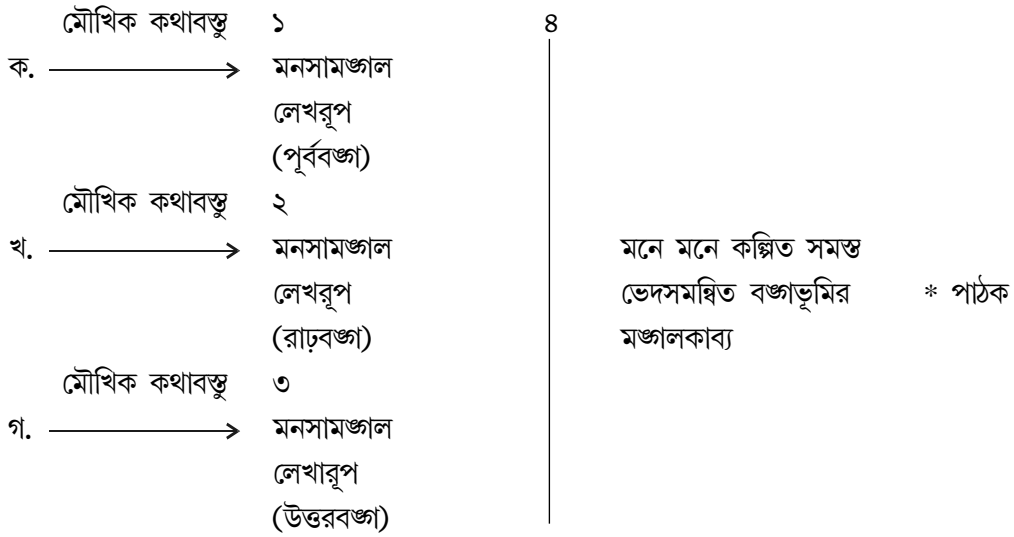

চিত্রটিতে ক, খ, গ হচ্ছে মৌখিক কথাবস্তু। এই কথাবস্তুগুলি যথাক্রমে ১, ২ ও ৩ এই মনসামঙ্গাল কাহিনিধারার মধ্যে লেখরূপ লাভ করছে। আমরা ধরে নিলাম, ১, ২, ৩ হল যথাক্রমে পূর্ববঙ্গ, রাঢ়বঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গাল। এই তিনধারার মনসামঙ্গালের মধ্যে সাধারণ উপাদান যেমন আছে তেমন আছে বিশিষ্ট উপাদান। এই বিশিষ্ট পৃথক উপাদানগুলি প্রমাণ করছে মনসামঙ্গালের মধ্যে বিভিন্ন সমাজবাস্তব-জাত কাহিনিধারা মিশেছে। পাঠক এই বিভিন্ন উপাদানগুলিকে পাশাপাশি রেখে মনে মনে গড়ে নিতে পারেন নিজস্ব এক মঙ্গালকাব্য। ৪ হল সেই স্বনির্মিত মঙ্গালকাব্য।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আশুতোষ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল 'বাইশ কবির মনসামঙ্গাল বা বাইশা।' এই বইটির ভূমিকায় আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছিলেন, 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মনসামঙ্গালের পদসঙ্কলনকে 'বাইশা' বা 'বাইশ কবির মনসামঙ্গাল' বলিত। বর্তমান সঙ্কলনখানিও প্রধানত

এই আদর্শেই সঙ্কলিত হইয়াছে বলিয়া ইহাও কবির মনসামঙ্গাল বা বাইশা বলিয়া উল্লেখ করা গেল। তবে ইহার সঙ্গে মধ্যযুগের বাইশাগুলির একটু পার্থক্য লক্ষিত হইবে—মধ্যযুগের বাইশাগুলি আঞ্চলিক সঙ্কলিত হইত, সমগ্র বাংলাদেশের ভিত্তিতে সঙ্কলিত হইত না—বর্তমান সংগ্রহখানি সমগ্র বাংলাদেশের ভিত্তিতে সঙ্কলিত হইয়াছে।' অর্থাৎ আশুতোষ ভট্টাচার্যও সমস্ত মঙ্গালকাব্যের নানা ভেদ থেকে বঙ্গাভাষীর প্রবণতার সামগ্রিক একটি দিক অনুধাবনের চেষ্টা করছিলেন।

মধ্যযুগে শুধু মনসামঙ্গাল নয় অন্যান্য অজস্ব মঙ্গালকাব্য লেখা হয়েছিল। সেই আখ্যানকাব্যগুলির মধ্যেও বঙ্গাভাষীদের নানা চিন্তা চেতনা মিশে থাকা সম্ভব। তবে মনসামঙ্গালকাররা যতটা অনায়াসে অন্যান্য আখ্যানের উপাদান ও প্রকাশভঙ্গি গ্রহণ করেছেন অন্যরা তা করেননি। দীনেশচন্দ্র সেন মনে করেছিলেন মনসামঙ্গাল ধারায় প্রথম শ্রেণির বিষয়বস্তু নিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণির কবিরা কাব্য রচনা করেছেন। মুকুন্দের কাব্যের কথা স্মরণে রেখেই এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন দীনেশচন্দ্র। অবশ্য এই মন্তব্যের অন্য তাৎপর্যও আছে। মনসামঙ্গালকারাদের একক প্রতিভার দ্যুতি ততটা ছিল না বলেই তার মধ্যে বিভিন্ন উপাদান সহজে মিশে যেতে পেরেছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের বাইশা থেকে কয়েকটি অংশ নিয়ে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে।

বেহুলার অষ্টমাসী (ষষ্ঠীবর)
মনসার বারমাসী (ষষ্ঠীবর) } সপ্তদশ শতক

অষ্টমাসী ও বারামাসী এই উপাদান দুটি মঙ্গালকাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলেও আমরা বিশিষ্টার্থে ফুল্লরার বারোমাস্যা (মুকুন্দ) স্মরণে রাখি। মনসামঙ্গাল রচয়িতাদের মধ্যে ষষ্ঠীবর বারোমাসী ও অষ্টমাসী ব্যবহার করেছেন। মুকুন্দের মতো বিশিষ্ট্য তিনি নন আবার উপাদানটিকে রচনাতে সমাহৃত করতে পারেন। এই উপাদানের সমীকৃতির সূত্রেই আরও কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যায়—

১) বিজয় গুপ্তের মনসার বনবাস—বিজয়গুপ্ত লিখেছেন, 'কান্দে দেব মহেশ্বর / তুমি কন্যা একেশ্বর / কিরূপে বঞ্চিব বনবাস।' আমাদের রামায়ণ কাহিনির কথা মনে পড়বে। সেখানে রামের বনবাসের ক্ষেত্রে কৈকেয়ীর ভূমিকা ছিল, এখানে বিমাতা চণ্ডীর ভূমিকা রয়েছে।

২) নারায়ণ দেবের বেহুলার সতীত্ব পরীক্ষা—নারায়ণ দেব রামায়ণের সীতাকাহিনির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। স্বর্গ থেকে ফিরে আসায় বেহুলাকে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হয়েছে। সীতাকেও রাবণ রাজার কাছ থেকে মুক্তির পর অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়।

৩) নারায়ণ দেবের কাব্যে বেহুলা লখীন্দরের যোগীবেশ ধারণ—নারায়ণ দেব তাঁর কাব্যে লিখেছেন : 'গোর্ঘ বলি দুই যোগী মারিল হুঙ্কার।/কপাট হুড়কা চাবি ভাঙ্গিলেক দুয়ার॥ / দুই যোগী প্রবেশিল বাড়ির ভিতরে।/সত্য গোরক্ষ বোলি যোগী শৃঙ্গানাদ করে।।/ব্রহ্মজ্ঞান সুমরিয়া যে বসিল ভূমিত/যোগী বোলে সুখে থাক চন্দ্রআদিত।' এখানে নারায়ণ দেব নাথ সাহিত্যের যোগীমাহাত্ম্যকে তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেছেন। এভাবেই মনসামঙ্গাল কাব্য ধারায় বঙ্গাভূমির সাহিত্যধারার নানা অংশ মিশে যায়। চণ্ডীমঙ্গালের মতো ব্যক্তিকবির প্রাধান্য নেই বলে ব্যক্তিগত বিন্যাসের কারুকৃতির বদলে বিষয়ের বৈচিত্র্যই মুখ্য হয়ে ওঠে।

বঙ্গাভূমিতে এক দীর্ঘ কালপর্ব ধরে মনসামঙ্গাল কাহিনি লেখা হয়েছে। কানা হরিদত্তের পুঁথি না পাওয়া গেলেও ধরে নেওয়া যেতে পারে কানা হরিদত্তই মনসামঙ্গালের প্রথম রচয়িতা। কানা হরিদত্তই প্রথম মনাসমঙ্গালের মৌখিক কাহিনিকে লিখিত রূপ দিয়েছিলেন। পরে এই মনসামঙ্গাল কাহিনি নানাভাবে সম্প্রসারিত হয়েছিল। তুর্কি আক্রমণ-পূর্ব বঙ্গাভূমিতে যে কাহিনি রচার সূত্রপাত (যদি কানা হরিদত্তের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়। প্রাপ্ত মঙ্গালকাব্যগুলি অবশ্য তুর্কি আক্রমণ পরবর্তী) অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সেই ধারার সজীব

বিস্তার লক্ষ করা যায়। তবে মনে রাখতে হবে এই লিখিতরূপ কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে জনমানসে গড়ে ওঠা কাহিনির রূপায়ণ। সুতরাং লিখিতরূপের সাহায্যে লেখা পূর্ববর্তী সময়ের বৃত্তান্তও স্পর্শ করা যায়। আবার এই কাহিনির মধ্যে তুলনায় অর্বাচীন রাজনৈতিক ইতিহাসের সূত্রও যে নিহিত আছে তা একটু লক্ষ্য করলেই ধরা যাবে।

মনসামঙ্গাল কাহিনির তিনটি প্রধান ধারা। একটি পূর্ববঙ্গের কাহিনি (বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব এই ধারার অন্যতম কবি) ধারা, একটি রাঢ়বঙ্গের কাহিনি ধারা (বিপ্রদাস এই ধারার অন্যতম কবি, পাঠ্য কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মঙ্গালও এই ধারার) এবং একটি উত্তরবঙ্গের (জগৎজীবন ঘোষাল এই ধারার অন্যতম কবি) ধারা। এই ত্রি-ধারার কাহিনির মধ্যে সমাজ ইতিহাসের সাধারণ উপাদান যেমন আছে, তেমনই আছে বিশিষ্ট উপাদান। আমরা কতগুলি চিহ্নের সাহায্যে সমাজ ইতিহাসের উপাদানগুলিকে বুঝে নিতে পারি।

বোঝাপড়ার সুবিধার জন্য মনসামঙ্গালের সুপরিচিত সাধারণ কাহিনিকে একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে উপস্থিত করা যেতে পারে—

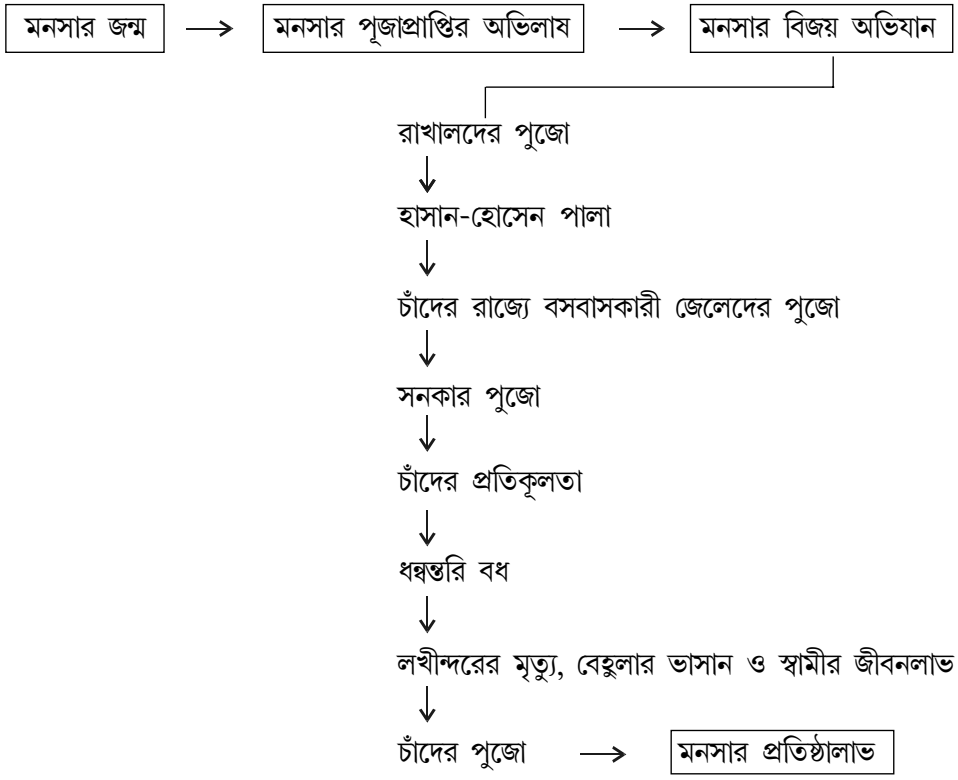

মনসামঙ্গাল কাহিনি আদলে দেবী মনসার প্রতিষ্ঠা কাহিনি। দেবী মনসা ক্রমান্বয়ে সমাজের অবতলবর্তী সম্প্রদায়ের কাছে (জেলে, রাখাল, কৃষক) ; ধনী বণিক ও মুসলমান শাসক-সম্প্রদায়ের কাছে (চাঁদ ও হাসান-হোসেন) প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। উচ্চ শ্রেণির হিন্দুসমাজে তাঁকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন মূলত নারীরাই (সনকা ও বেহুলা)। মনসা মৃতকে প্রাণ দিতে পারেন (লখীন্দর), সম্পদ দিতে পারেন অথবা হৃতসম্পদ ফিরিয়ে দিতে পারেন (রাখাল ও জেলেদের সম্পদ দিচ্ছেন, চাঁদের হৃতসম্পদ ফিরিয়ে দিচ্ছেন)। এবং প্রয়োজনে প্রতিস্পর্ধী শক্তিকে বধ করতে পারেন (ধন্বন্তরি বধ)। সুতরাং দেবতার জন্মের পেছনে প্রাথমিক ভাবে যে ভীতি ও ভোগেচ্ছা ক্রিয়াশীল থাকে তা এখানে স্পষ্ট। মঙ্গালকাব্য-রচয়িতারা এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের

মনসামঙ্গালে 'পূজা প্রচারে নেতর পরমার্শ' অংশে নেত মনসাকে বলেছে 'বিড়ম্বনা বিনে/এ তিন ভুবনে / না পূজিব কোন জনা।' আবার একথাও বলতে ভোলেনি '... তবে মাতা / হবে বরদাতা / যে জন পূজন করে।'

চাঁদের পালার সঙ্গে মিশে আছে বেহুলা লখীন্দর পালা। লক্ষ করলে বোঝা যাবে এই পালাটি চাঁদের পালার থেকে পৃথক। প্রাচীন ধরিত্রী দেবীর হাতে শস্যদেবতার মৃত্যু ও পুনর্জীবনলাভের গল্প প্রচলিত ছিল কৃষিভিত্তিক মাতৃতান্ত্রিক সমাজে। বাংলা দেশে কৃষিকাজের সময় বেহুলার ভাসানগীত হত। এর থেকে অনুমান করা যায় বেহুলা লখীন্দর পালার মূলে আছে শস্যদেবতা ও ধরিত্রী দেবীর গল্প। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে কোনো পুরুষকে হত্যা করে শস্যকেন্দ্রিক এই রক্তপ্রথাটি (blood wright) পালন করা হত। সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষঘাতিনী রমণী হয়ে উঠল পতিব্রতী সতী। আমাদের মনে পড়ে যাবে চাঁদ বেহুলাকে লোহার কলাই সেদ্ধ করতে বলেছিল। বেহুলা লোহার কলাই সেদ্ধ করে প্রমাণ করেছিল তার সামর্থ্য। আদতে লোহার কলাই সেদ্ধ করা মানে তো না-অঙ্কুরিত বীজকে অঙ্কুরিত করা। বেহুলা তা পারে। কৃষিব্যবস্থার সঙ্গে বেহুলার যোগোযোগ নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে এই কাহিনি।

মনসামঙ্গালের হাসান-হোসেন পালাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এর মধ্যে রাজনৈতিক ইতিহাস এবং সমাজ ইতিহাসের বিশেষ প্রবণতা ক্রিয়াশীল। ইয়ুং (Jung) স্বপ্নের দুটি কারণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন তাঁর রচনায়। এই কারণদুটি হল অবদমন ও ইচ্ছাপূরণ। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের আখ্যনকাব্যগুলিতে ইচ্ছাপূরণের কাল্পনিক বিবরণ একটি সাধারণ ঘটনা। হাসান-হোসেন পালায় বিজিত হিন্দুর দেবী মুসলমান শাসকদের যেভাবে আলকুশি ও ভীমরুলের সাহায্যে নাস্তানাবুদ করেন তাতে বিজিত হিন্দুর স্বপ্নপূরণ হয়। বিজয় গুপ্তের কাব্যে হোসেনের মায়ের পরিচয়বাহী পয়ারপঙ্‌ক্তি দুটি হল ঃ

'সেই ছিল হিন্দুর কন্যা তার কর্ম্মফলে / বিবাহ করিল কাজি ধরি আনি বলে।।'

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। হাসান-হোসেন পালা যে সমাজ ইতিহাসকে স্পর্শ করে আছে তা বোঝা যায়।

এই কাহিনির মধ্যে ক্রমে সমন্বয়-এষণা যুক্ত হয়। দ্বিজ-বংশীদাসের কাব্য থেকে একটি অংশ উদ্ধার করা যাক :

'তার মাঝে একজন জাতি মুসলমান।
সে বলে উচিত নয় রাখ হিন্দুয়ান॥
একই ঈশ্বর দেখ হিন্দু মুসলমানে।
যার তার কর্ম্ম সেই করে ধর্মজ্ঞানে॥
সকলের কুলাচার সৃজিলা গোঁসাই।
পাষণ্ড হইয়া তাতে কোনো কার্য নাই।।'

এডোয়ার্ড সি-ডিমক তাঁর 'The Sound of Silent Guns and Other Essays' গ্রন্থে একটি ছিন্ন মনসামঙ্গাল পুথিতে প্রাপ্ত হাসান-হোসেনের বিচিত্র রূপান্তর কাহিনি উল্লেখ করেছেন। এই পুথিতে আছে শিব মুসলমান যুবা হয়ে দুর্গাকে ধর্ষণ করার ফলে হাসান-হোসেনের জন্ম হল। বোঝা যায় হাসন-হোসেন পালায় হিন্দু মুসলমানের বিরোধ ও মিলনের এক দ্বান্দ্বিক ইতিহাস আভাসিত।

মনে রাখতে হবে মনসামঙ্গালের কাহিনিবৃত্তগুলির মধ্যেই শুধু নয় টুকরো উল্লেখের মধ্যেও রয়েছে বিভিন্ন সামাজিক রীতি-নীতির ইতিহাসগত বিন্যাস।

৪.২ কেতকাদাসের মঙ্গালকাব্য

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের পাঠ্যাংশের আলোচনার আগে আমরা এই মঙ্গালকাব্যটির ঘটনাগুলিকে কাব্যটির গঠনানুসারে বিন্যস্ত করতে চাই। বোঝার সুবিধের জন্য একটি ছক দেওয়া হল।

গঠনগত সারণি

কেতকাদাসের মঙ্গাল-কাব্য

দেবখণ্ড

১. বন্দনা (মনসা, গণেশ, সরস্বতী, চৈতন্য, পঞ্চদেবতা, দেবদেবী বন্দনা)
২. শকবর্ণনা
৩. সৃষ্টিপালা
৪. মনসার জন্ম
৫. মনসার সঙ্গো চণ্ডীর দ্বন্দ্ব
৬. মনসার বিবাহ
৭. সর্পভয়ে মনসার পতির পলায়ন
৮. আস্তিকের জন্ম
৯. মনসার পূজা প্রচারের বাসনা

নরখণ্ড

১. রাখালদের মধ্যে পূজা প্রচার
২. হাসান-হোসেন পালা
৩. চাঁদের পালা
   - চাঁদের প্রজা জালু-মালুর কাছে পূজা প্রচার
   - চাঁদের বন্ধু ধন্বন্তরি বধ
   - বেহুলা লখীন্দর বৃত্তান্ত
৪. চাঁদের মনসা পূজা (পাঠ্য)
   - ক. লখীন্দর বিবাহ প্রস্তাব
   - খ. বেহুলার যোগ্যতা বিচার
   - গ. বেহুলার-লখীন্দরের বিবাহ
   - ঘ. লখীন্দরের বাসরে মৃত্যু
   - ঙ. লখীন্দরকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য বেহুলার প্রয়াস
   - চ. লখীন্দরের পুনর্জীবন লাভ
   - ছ. চাঁদের মনসা পূজা (৪)

এই গঠন-চিত্রটি লক্ষ করলে কেতাকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গালের কতগুলি বৈশিষ্ট্য আমাদের আলাদা করে চোখে পড়বে। সেই বৈশিষ্ট্যগুলি সূত্রাকারে উল্লেখ করা যাক।

i) লক্ষণীয় বন্দনা অংশে 'চৈতন্যবন্দনা' রয়েছে। এর থেকে প্রমাণিত হয় এই মঙ্গালকাব্যটির চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩) পরবর্তী-কালের। অক্ষয় কয়াল ও চিত্রা দেব সম্পাদিত 'কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গাল' কাব্যে রচনাকাল জ্ঞাপক একটি শ্লোক পাওয়া যাচ্ছে। 'শূন্য রস বাণ শশী / শিয়রে মনসা আসি / আদেশিলা রচিতে মঙ্গাল।' এই শ্লোক অনুসারে ১৫৬০ শব্দে অর্থাৎ ১৬৩৮-৩৯ খ্রিস্টাব্দে কেতকাদাস কাব্য রচনার আদেশ পান। অর্থাৎ কেতকাদাসের কাব্য সপ্তদশ শতকের রচনা।

ii) কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যের শকবর্ণন অংশটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই অংশ সমকালীন ইতিহাসের নানা সূত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব। সুখময় মুখোপাধ্যায় তাঁর মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম' বইতে অনুমান করেছেন কবি কেতকাদাসের কাব্যরচনাকালের সঙ্গো বিষ্ণুদাস ও জরামল্লের সময়ের সমাপতন ঘটেছে। এঁরা সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

iii) কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে মনসা চরিত্রটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মনসা চরিত্রে মানবায়ন ঘটেছে যেন। বিমাতা চণ্ডীর দুর্ব্যবহার থেকে শুরু করে সর্পভয়ে স্বামীর পলায়ন পর্যন্ত অংশ পাঠ করলে

একটি মেয়ের দুর্ভাগ্যের কাহিনি মুখ্য হয়ে ওঠে। তবে মনসা পূজা প্রচারের পদ্ধতিগত কোনো রূপান্তর এই মানবায়নের ফলে সম্ভব হয়নি। মনসার সহচরী নেত মনসাকে পুজো প্রচারের জন্য যে দুটি পরামর্শ দিয়েছে তাতে মঙ্গালকাব্যের দেবীরূপে স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ক. না পূজে যে জন কহিবে সপন বসিয়া তার শিয়রে॥
নর দুরাশয় এ মতি না লয় দেখাইব বিড়ম্বনা।
বিড়ম্বনা বিনে এ তিন ভুবনে না পূজিব কোন জনা॥

খ. তবে বিশ্বমাতা হবে বরদাতা যে জন স্মরণ করে॥
ধনপুত্র বর দিবে গো বিস্তর যে জন তোমারে সেবে

কেতকাদাসের কাব্য চৈতন্য-পরবর্তী। তবু কেতকাদাসের কাব্যে কিন্তু চৈতন্য-প্রবর্তিত অহৈতুকী ভক্তির কোনো প্রভাব নেই। ভীতিপ্রদর্শন এবং সম্পদপ্রদানের মাধ্যমে দেবী পূজা আদায় করে। এই ভীতিধর্মের সমালোচনা রয়েছে 'চৈতন্যভাগব'ত-এ। 'চৈতন্যভাগবত'কার চৈতন্যপূর্ববর্তী নবদ্বীপধামের ধর্মীয় অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে মদ্যমাংস লয়ে শক্তিপূজা করার কথা তির্যকভাবে উল্লেখ করেছেন। এই ভীতিধর্ম বা হেতুধর্মের বিপরীতে দাঁড়িয়ে চৈতন্যদেব তাঁর অহৈতুকী প্রেমধর্ম ও নামভক্তিবাদ প্রচার করেন। ভীতিধর্মের দাপট যে এতে কমেনি কেতকাদাসের কাব্য পড়লে তা টের পাওয়া যায়। বরং মনসার পূজাপ্রচারে এই ভীতিপ্রদর্শন ও সম্পদপ্রদানের সূত্রই মুখ্য হয়ে উঠেছে। পূজাপ্রচার ঘটনাগুলি লক্ষ করলেই তা টের পাওয়া যাবে। একটি সারণি প্রদান করা হল :

পূজক সম্প্রদায়	পূজার কারণ
রাখালদের মধ্যে পূজা প্রচার	মনসা রাখালদের গোসম্পদ পূরণ করে ও পরে ধনসম্পদ প্রদান করে।
হাসান-হোসেন (মুসলমান)	মনসার দমননীতিতে হাসান-হোসেন ভয় পেয়ে পুজো করে।
জেলে (জালু - মালু)	সম্পদ প্রদানের মাধ্যমে পূজা প্রচার
চাঁদ সদাগর	চাঁদের পুত্রদের মনসা হত্যা করে ও পরে বেহুলার প্রার্থনায় লখীন্দরসহ মৃত পুত্রদের ফিরিয়ে দেয়। সম্পদপ্রদান করে।

৪.২.১ মনসামঙ্গালকাব্যের কাহিনি-কাঠামো

মনসামঙ্গালকাব্যের সংক্ষিপ্ত কাহিনি-কাঠামো ভৌগোলিক দিক থেকে দেবখণ্ড ও নরখণ্ড এই দুই ভাগে বিভক্ত। অবশ্য নরখণ্ডের মধ্যে দেবখণ্ড মিশে যায়। কাহিনি উপকাহিনি সমন্বিত। একটির সঙ্গে অন্যের যোগ শিথিল। শুধু মনসার বিজয়কাঙ্ক্ষাই কাহিনিগুলির যোগসূত্র।

৪.৩ চাঁদ বৃত্তান্ত

আমাদের প্রচলিত পাঠে চাঁদ সদাগরকে আমরা দেবদ্রোহী বলে জানি। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে কালিদাস রায় তাঁর 'বৈকালী' কাব্যগ্রন্থে 'চাঁদসদাগর' নামক কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। 'এ বঙ্গের সমতলে তৃণলতা গুল্মদলে বজ্রজয়ী বনস্পতি' যে চন্দ্রধর বীর কবিতাটিতে তার বন্দনা আছে। কবির প্রান্তিক সিদ্ধান্ত : মানুষের কৃপার পরে দেবমহিমা নির্ভর করে। এই বিশ্লেষণ তাৎপর্যপূর্ণ। মানবতাবোধের (humanism) ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই কালিদাস রায় এই কবিতাটি লিখেছিলেন। মনসা অন্যায়ভাবে চাঁদকে দমন করার চেষ্টা করছেন ও চাঁদ মনসার দমননীতি অগ্রাহ্য করছেন এই বৃত্তান্ত খেয়াল রাখলে চাঁদ কাহিনিকে দেবতার অন্যায়ের প্রতি মানুষের চিরন্তন

লড়াই হিসেবে পড়তে ইচ্ছে করে। আশুতোষ ভট্টাচার্যও তাঁর 'বাংলা মঙ্গালকাব্যের ইতিহাস' বইতে লিখেছেন 'নারায়ণদেবের কাব্যের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁহার কাব্যের পরিসমাপ্তির পরিকল্পনা চাঁদ সদাগরের চরিত্রের আনুপূর্ব্বিক সামঞ্জস্য রক্ষায় সার্থক হইয়াছে। তিনিই চাঁদ সদাগরকে দিয়া বামহস্তে মুখ না ফিরাইয়া একটি ফুল দিয়া পূজা করাইয়াছেন, কিন্তু অন্যান্য কোনো কোনো কবি, এমনকী বিজয় গুপ্তও তাঁহাকে দিয়া ঘটা করিয়া মনসার পূজা করাইয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন।'

কালিদাস রায় ও আশুতোষ ভট্টাচার্যের এই সিদ্ধান্ত থেকে চাঁদ চরিত্র সম্পর্কে আমাদের মনে কতগুলি ধারণা দানা বাঁধে।

i) চাঁদ আসলে দেশদ্রোহী, মানবতাবাদী। বাঁ হাতে ফুল দিয়ে শেষ পর্যন্ত পুত্রস্নেহ-পরবশ চাঁদ মনসার পুজো করেছে। মনসাও চাঁদের ওই বাঁ হাতের ফুলেই তুষ্ট।

ii) মনসামঙ্গাল কাব্যের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত যেন চাঁদের প্রাধান্যই সূচিত হল।

এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ অবশ্য এত সহজ নয়। আমাদের পাঠ্য কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গাল' কাব্যেরই চাঁদ ঘটা করে মনসার পুজো করেছে। এই বিষয়টিকে আমরা কেমন করে বিশ্লেষণ করব ? বস্তুতপক্ষে নারায়ণ দেব ছাড়া আর কারো মনসামঙ্গালকাব্যেই বাঁ হাতে পুষ্পপ্রদানের ঘটনাটি নেই। আবার চাঁদ নারায়ণ দেবের কাব্যেও বাঁ হাতে ফুল দিয়ে শেষ পর্যন্ত ঘটা করে মনসা পুজো করেছে। নারায়ণ দেবের কাবেই আছে—'পূজে সাধু এক মনচিত্তে। / শুন রে মৃদঙ্গোর ধ্বনি / শঙ্খ ঘণ্টা রাসবেণী / বিবাদী খণ্ডিল আজি হোন্তে।' সুতরাং এই পুজো করার বৃত্তান্তটিকে ব্যাখ্যা না করে চাঁদকে দেবদ্রোহী মানবতাবাদী নায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।

আসলে মনসামঙ্গাল কাহিনির মধ্যে শৈব ও শাক্ত সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব নিহিত আছে। বঙ্গাভূমিতে রচিত 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ', 'পদ্মাপুরাণ' ও 'দেবী ভাগবত' মনসার উল্লেখ পাওয়া যাবে। বঙ্গাভূমিতে রচিত পুরাণগুলিতে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার বিস্তারের প্রক্রিয়া স্পষ্ট। অব্রাহ্মণ্য দেবদেবীকে পুরাণ রচনার কৌশলে ব্রাহ্মণ্য দেবপরিমণ্ডলে স্থান দেওয়া হচ্ছে। এতে ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের দাপট ছড়িয়ে পড়ছে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে। সাঙ্গীকৃত দেবতার মধ্যে ব্রাহ্মণ্য ও ব্রাহ্মণেতর দেবভাবনার বৈশিষ্ট্য মিশে যাচ্ছে। এই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে শিবদেবতার প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল মঙ্গালকাব্যের দেবদেবীর আগেই।

বেদগ্রাহ্য এবং বেদবাহ্য শিবের এই দুই রূপের কথা বলেন তাত্ত্বিকরা। এই দুই মূর্তির মধ্যে সাঙ্গীকরণ ঘটেছিল। বৈদিক রুদ্রদেবতাই কালক্রমে শিবে পরিণত হচ্ছে বেদপন্থীরা একথা বিশ্বাস করেন। রুদ্র দেবতার ক্রিয়াক্ষেত্রটি সুবিস্তৃত। যাস্কের 'নিরুক্ত' অনুযায়ী 'রুদ্র' শব্দ রু ধাতু থেকে নিষ্পন্ন—শব্দ করে বলে রুদ্র। রু এবং দ্রু (গতি) ধাতু থেকে নিষ্পন্ন—শব্দ করতে করতে গমন করে এই অর্থে রুদ্র। ক্রন্দনরত রুদ্রের ক্রন্দনের হেতু হিসেবে নানা পৌরাণিক (দ্র. 'বিষ্ণুপুরাণ', সৌরপুরাণ) কাহিনি প্রচলিত থাকলেও আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না রুদ্র আদতে ঝড় বা ঝড়ের দেবতা। এই বৈদিক ঝড়ের দেবতাটি অগ্নি ও সূর্যের সঙ্গো সমাপতিত হয়েছিল। এছাড়া ক্ষেত্রপতি রুদ্র ('বাজসনে'য় সংহিতা') তস্কর-অধিপতি রুদ্র ('যজুর্বেদ', ১৬/২০ ১৬/২১) দেবতাটির বিচিত্র অধিকারক্ষেত্রের প্রমাণ দেয়। বৈদিক যুগেই রুদ্র শিব নামে অভিহিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গো স্মরণীয় ঃ 'নমঃ শংভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শংকরায় চ/ ময়স্করায় চ মনঃ শিবায় চ শিবতরায় চ' (বাজসনেয়ি সংহিতা, ১৬/৪১)

বেদবাহ্য শিবের কথা যাঁরা বলেন তাঁরা প্রাগার্য সিন্ধুসভ্যতার সঙ্গো শিবের সম্পর্ক স্থাপন করেন। তাঁদের মতে সিন্ধুসভ্যতায় মাতৃকাপুজোর সঙ্গো শিবের পুজোও প্রচলিত ছিল। সেখানে যোগাসনে উপবিষ্ট ঊর্ধ্বশিশ্ন শৃঙ্গাবিশিষ্ট দেবমূর্তির চারপাশে বাঘ, হাতি, গণ্ডার, মেষ এবং অধোদেশে হরিণ খোদাই করা আছে। এটি পশুপতি মূর্তি। এছাড়া শিব শিবিজনের দেবতা (tribal god) একথাও অনেকে অনুমান করেন। শিবের বেদবাহ্য রূপের ইঙ্গিত আছে মহাভারতের দক্ষযজ্ঞের কাহিনিতে। বঙ্গাভূমিতে শিবটিকেও এই দুই ধারায় মিলিয়ে নেওয়া যায়। তা ছাড়াও দেবতাটির মধ্যে স্থানীয় কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল।

বঙ্গভূমির শিবের মধ্যে যে বেদগ্রাহ্য ও বেদবাহ্য দুই রূপ মিশে আছে একটি সারণির মাধ্যমে তা দেখানো যেতে পারে। এখানে লেখরূপগুলির উল্লেখ করা হল। এই লেখরূপগুলি সুপ্রচলিত মৌখিক রূপ প্রসূত।

ক্ষেত্রপতি রুদ্র বাজসনেয়ি সংহিতা (১৬/১৮)	শিবায়ন কাব্যে শিব কৃষিকার্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত।
দক্ষযজ্ঞ (মহাভারত)	দক্ষযজ্ঞের কাহিনি আছে চণ্ডীমঙ্গালে (কবিকঙ্কণ মুকুন্দ) শিবায়ন (রামেশ্বর ভট্টাচার্য) ও অন্নদামঙ্গাল (ভারতচন্দ্র) কাব্যে।
পাশুপত সূত্রম্ (৫/৩, ৫/৭) অনুসারে সাধক প্রেতের মতো আচরণ করবেন	বাংলা সাহিত্যের শিব ভস্মময়, শ্মশানচারী

শিবের এই মিশ্রসত্ত্বরূপটি মঙ্গালকাব্যের দেবীদের প্রতিষ্ঠালাভের পূর্বেই সুগঠিত। ফলে মঙ্গালকাব্যগুলিতে শিব অন্যান্য দেবদেবীর প্রতিষ্ঠার উপায় হিসেবে ব্যবহৃত।

মনসামঙ্গালে নীলকণ্ঠ শিবের প্র-প্রতিমা ভেঙে পড়েছে। শিব সেখানে নীলকণ্ঠ নয়। মন্থনজাত বিষপান করে মনসামঙ্গালের শিব মারা গেছে। সেই শিবকে বাঁচিয়েছে মনসা। অর্থাৎ মনসা শিবের থেকেও শক্তিশালী। শিব যদি পৌরাণিক পরিমণ্ডলে স্থান পায় তাহলে অধিকতর ক্ষমতার অধিকারিণী মনসা পাবে না কেন?

শৈব-শাক্ত সম্প্রদায়ের এই কৌশলী দ্বন্দ্ব মিলনের ইতিহাসই চাঁদ-মনসার সম্পর্কের বিন্যাসে নিহিত আছে। শৈব চাঁদ মনসার পূজা করলে মনসার ক্ষমতার স্বীকৃতি জুটবে, কাজেই অন্যদের আর মনসাপূজায় আপত্তি থাকার কথা নয়। চাঁদের কিস্যায় এই দৈবপ্রকল্পনা খুব স্পষ্ট।

চাঁদ সদাগরের ঐতিহাসিকতা নিয়ে নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতো কেউ কেউ মাথা ঘামিয়েছেন। চাঁদের বাসভূমি চম্পকনগরীকে চিহ্নিত করার চেষ্টা অনেকেই করেছেন। মনসামঙ্গালকাররা চাঁদের ঐতিহাসিকতা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন না। লোকশ্রুতিতে বণিকজাতির সমৃদ্ধির সময়ে চাঁদের কাহিনি গড়ে ওঠা সম্ভব। মনসামঙ্গালকাহিনি রচনার সময় চাঁদ দৈবশক্তিসম্পন্ন পুরুষ হয়ে উঠেছে। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে সমুদ্রমন্থনের ফলে অন্যান্য দেবতার সঙ্গে চাঁদ উঠে এসেছে। দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে চাঁদ আদতে পশুসখা ঋষি। সর্পদংশনে তার পোষা পাখির মৃত্যু হয়েছে বলে সে মনসাবিরোধী। এছাড়াও মনে রাখতে হবে চন্দ্র নামটি গূঢ়ার্থব্যঞ্জক। বিপ্রদাসের কাব্যে আছে 'মহেশের চন্দ্রে জন্ম হইল ইহার। / নাম মনসা নিরঞ্জন অবতার।।' নাম সাহিত্যেও চন্দ্রশব্দটি গূঢ়ার্থব্যঞ্জক। শিবের চন্দ্র অর্থাৎ শিবের বীর্য, নিহিতার্থে সৃষ্টির অমৃত। চাঁদও শিবশিষ্য। বোঝা যায় মনসামঙ্গালের কবিরা চাঁদকে দেবদ্রোহী চরিত্র হিসেবে নির্মাণ করেননি। চাঁদ-মনসা দ্বন্দ্বের দৈব কারণ নির্দেশ করতে চেয়েছেন। এই চাঁদ প্রবল প্রতিকূলতার পর ঘটা করে মনসাপুজো করল। প্রতিকূলতার সূত্রে আমাদের শিশুপাল ও রাবণের কথা মনে পড়বে। 'ভাগবত' শিশুপালের দেববিরোধিতাকে বৈররস (প্রতিকূলতার মাধ্যমে ভজনা, শত্রুভাবে ভজনা) দিয়ে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। এই সূত্রেই কৃত্তিবাসের রাবণ রামভক্ত। প্রবল প্রতিকূলতার পর চাঁদ যখন মনসাপূজা করে তখন পরোক্ষে দেবী মাহাত্ম্যই সূচিত হয়। প্রবল প্রতিকূল শৈবও দেবীর পূজা করতে বাধ্য হয়েছে। সুতরাং সাধারণ মানুষও পূজা করবে।

৪.৩.১ চাঁদ কাহিনির সংক্ষিপ্ত কাঠামো

চাঁদের কাহিনির মধ্যে নানাস্তর নিহিত আছে। এই কাহিনিটি মধ্যযুগে যেভাবে আস্বাদন করা হত আধুনিককালে সেভাবে আস্বাদন করা হয় না। শৈব-শাক্ত দ্বন্দ্বের ইতিবৃত্ত আধুনিক পাঠে দেবদ্রোহী নায়কের কাহিনি হয়ে উঠেছে।

৪.৪ কেতাকাদাস ক্ষেমানন্দের বেহুলা

পাতিব্রত্যের মূল্যবোধ ও নারীর অসহায়ত্ব বেহুলা কাহিনির মধ্যে মিশে গেছে। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যের নানা অংশ উদ্ধার করে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে।

i) ঘটকের বেহুলা চরিত্র বর্ণনা : 'গজেন্দ্র-গামিনী রামা : রূপে যিনি তিলোত্তমা : বেহুলা নাচনী তার নাম
বার মাসে বার ব্রত : পুণ্য তিথি করে যত : দেবকার্য্যে করে অবিশ্রাম।।'

বেহুলার এই বিবরণে বেহুলা ব্রতপরায়ণা রমণী। সমাজসংসার ও পরিবারের প্রতি আনুগত্যের কোনো ত্রুটি তার নেই যেন। এই বেহুলার পারঙ্গামতার নানা পরীক্ষা নেয় চাঁদ।

ii) চাঁদ কর্তৃক বেহুলার পরীক্ষাগ্রহণ—বেহুলার বিবাহলগ্ন স্থির করার প্রসঙ্গে কেতকাদাস লিখেছেন :

'চতুর ঘটক ছিল জনার্দ্দন সাথে। তুলসী আনিঞা দিল দুজনার হাথে।।
তুলসী বদল কৈল বিভার নির্ণয়। লখীন্দরে কন্যা দিব সায় বান্যা কয়।।
হেনকালে চাঁদ বান্যা কবে আর কথা। যদি সে তোমার কন্যা হয় পতিব্রতা।
লোহার কলাই দিবে করিয়া রন্ধন। সেই কন্যা বিভা করে আমার নন্দন।।'

লক্ষণীয় বেহুলাকে পাতিব্রত্যের পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। লখীন্দরের কোনো পরীক্ষা অবশ্য বেহুলার পিতা সায় বান্যা নেয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সীতাকেও সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। কোনো কোনো মঙ্গালকাব্যে লখীন্দরের প্রাণ নিয়ে স্বর্গ থেকে ফিরে আসার পর সীতার মতো বেহুলাকেও সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হয়।

iii) বেহুলা ও ময়না—নাথ সাহিত্যধারার অন্তর্গত মানিকচন্দ্র রাজা ও রানি ময়নার বৃত্তান্তের সঙ্গে বেহুলা বৃত্তান্তের নানা মিল আছে। দুটি চরিত্রই নারীর অসহায়ত্ব তুলে ধরেছে।

বেহুলা কাহিনীতে বাসরঘরে কাল সর্পেরা একে একে প্রবিষ্ট হয়েছে। কৌশলে সেই সাপেদের হাত থেকে বেহুলা তার স্বামী লখীন্দরকে বাঁচিয়েছে। সেসব কৌশল বড়ো মজার। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্য অনুসরণ করা যাক।

a) বঙ্করাজ ফণীর প্রবেশ—মধুর বাচনে ও দুধ দিয়ে বেহুলা তাকে নিবৃত্ত করেছে।

b) কালদণ্ড ফণীর প্রবেশ—বেহুলা সর্পটিকে তার আত্মীয় বলে সম্বোধন করেছে।

c) উদয়কাল সর্পের প্রবেশ—বেহুলা সর্পটিকে দাদা বলে সম্বোধন করেছে।

এই সমস্ত সাপেদের ভুলিয়ে শেষ পর্যন্ত সুবর্ণ সাঁড়াশি দিয়ে বেহুলা হড়পি বন্দী করেছে। অবশ্য এরপর লখীন্দর ক্ষুধার্ত হয়েছে। বাসরে স্বামীর জন্য রান্না করে ক্লান্ত বেহুলা ঘুমিয়ে পড়েছে। সেই অবসরে সর্প দংশনে লখীন্দরের মৃত্যু হয়েছে।

মানিকচন্দ্র রাজা ও ময়নার কাহিনিতেও নানা কৌশলে ময়না যমদূতের তার স্বামীর কাছে আসতে দেয়নি। কখনও ভালো কথা বলে কখনও অর্থপ্রদান করে ফিরিয়ে দিয়েছে। শেষপর্যন্ত মানিকচন্দ্র রাজার প্রবল তৃষ্ণা পেয়েছে। এই তৃষ্ণা নিবারণার্থে ময়না জল আনতে গেছে। সেই অবসরে যমদূত এসে মানিকচন্দ্রের প্রাণ হরণ করেছে।

iv) লখীন্দরের মৃত্যু ও বেহুলার প্রতি দোষারোপ—লখীন্দরের মৃত্যুর পরেই লখীন্দরের পরিজনেরা বেহুলাকে দোষারোপ করেছে। কেতকাদাসের কাব্যে আছে—'চিরণ চিরণ দাঁতী / বিভার মঙ্গার রাতি / বাসরে খাইলে প্রাণনাথ' জাতীয় পঙ্‌ক্তি। বেহুলাকে দোষারোপ করা হচ্ছে, 'খণ্ডকপালিনী' বলে গালিও দেওয়া হচ্ছে। স্বামীর মৃত্যুর জন্য যেন বেহুলাই দায়ী। নারীজীবনের অসহায়ত্ব এখানে প্রকাশিত।

v) বেহুলার প্রতিজ্ঞা—বেহুলা তার জীবনের এই পরিণতিকে মেনে নেয়নি। লখীন্দরের জীবন ফিরিয়ে আনার জন্য জলে তার মান্দাস ভাসিয়েছে। বেহুলা তার দাদাকে বলেছে—

'...আমি হই কড়হা রাঁড়ী। কত না পেলাব আর নিরামিষ্য হাঁড়ি।।
মা বাপের বাড়ী মোরে আর নাহি সাজে।/ সকল ভাউজ সঙ্গো নিত্য দ্বন্দ্ব বাজে।।
নারিব সহিতে আমি দুরাক্ষর বাণী।'

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের বেহুলা এখানে ভাগ্যের বিরোধিতা করার সাহস দেখিয়েছে।

vi) বেহুলার যাত্রা ও লখীন্দরের জীবনলাভ—বেহুলা এরপর নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে স্বর্গে গিয়ে দেবতাদের তুষ্ট করে স্বামীর জীবন ফিরিয়ে এনেছে। পথের প্রতিকূলতা কম নয়। কখনও কামুক দুর্জন পুরুষ তাকে পথভ্রষ্ট করতে চেয়েছে। কখনও বা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্য দিয়ে তাকে অগ্রসর হতে হয়েছে। পরিশেষে যখন সে গৃহে ফিরল তখন কেতকাদাসের কাব্যে চাঁদ বান্যা বলেছে :

'যাহা সনে করি আমি বাদ বিসম্বাদ। তার শরণ লব এ বড় প্রমাদ॥
চেঙ্গামুড়ি কানি বলি যারে দিলু গালি। কোন্ লাজে তাহারে হইব পুটাঞ্জলি॥
মরণ অধিক লজ্জা মস্তক-মুন্ডন। মনসা পূজিতে মোর নাহি লয় মন॥
যেই হাথে পজিনু সোনার গন্ধেশ্বরী। কেমনে পূজিব তায় জয় বিষহরি॥
সাবিত্রী সমান হৈল পুত্রবধূ মোর। ঘরেচে পাইলুঁ বস্যা চৌদ্দ মধুকর॥
হেন মনসার পূজা নাঞি করি যদি। বিপাকে হারাই পাছে পায়্যা পঞ্চনিধি॥

সুতরাং, 'এতেক ভাবিয়া সাধু হৈল সুমতি।। বিবাদ ঘুচিল...'

এই অংশটিতে বেহুলার ওপর সাবিত্রীর মাহাত্ম্য আরোপ করা হয়েছে। চাঁদের স্বীকৃতিতে মনসাও দেবী হিসেবে জাতে উঠেছে।

৪.৪.১ বেহুলা কাহিনির সংক্ষিপ্ত কাঠামো

বেহুলা কাহিনি প্র- অতীতে মাতৃতান্ত্রিক সমাজে গড়ে উঠেছিল। পরে এরমধ্যে নানা উপাদান প্রবিষ্ট হয়েছে। এখন আমরা এটিকে পতিব্রতা রমণীর কাহিনি হিসেবে পাঠ করি।

৪.৫ কেতাকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যমূল্য

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গালের কাব্যমূল্যের বিষয়টি আমরা দুভাবে আলোচনা করতে পারি। কোনো কোনো পঙ্‌ক্তি কবি হিসেবে কেতাদাসের কৃতিত্বের পরিচায়ক। আশুতোষ ভট্টাচার্য মঙ্গালকাব্যের কবিদের পুচ্ছানুসারী বলেছিলেন। অর্থাৎ চেনাকাহিনির পুনরাবৃত্তি করা ছাড়া তাঁদের গত্যন্তর নেই। একই কাহিনি লিখলেও কিন্তু কেতকাদাসের কাব্যের কোনো কোনো পঙ্‌ক্তির চিরন্তন কাব্য-মূল্য আছে। পাঠ্যাংশ থেকে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

ক. 'মড়ামাস জলে ভাসে বিপরীত ঘ্রাণ। কদাচ চঞ্চল নহে বেহুলার প্রাণ॥ দাহনে দ্বিগুণ প্রেম বেহুলার বাড়ে॥"

'দাহনে দ্বিগুণ প্রেম বেহুলার বাড়ে' পঙ্‌ক্তিটি epigram-এর উদাহরণ। এই সংহত পঙ্‌ক্তিটিতে কেতকাদাস প্রেমের গভীরতা প্রকাশ করেছেন।

খ. 'গহন কানন বনে গমাগম নেই। নিশ্চল গম্ভীর জলে কোলেতে লখাই॥"

এই কাব্য-পঙ্‌ক্তি দুটির মধ্যে অনুপ্রাস অলংকারের ব্যবহার দেখার মতো। গ-ম-ন-ল ধ্বনির অনুপ্রাস এখানে তারল্য আনেনি। জলপথের ও জলপথ-সংলগ্ন বনভূমির নৈঃশব্দ্য এই অনুপ্রাসের ব্যবহারে ধরা পড়েছে।

গ. ফুলিল শরীর তার বিপরীত গন্ধ। বেহুলা কহিল মোর সুধা মকরন্দ॥

এই পঙ্‌ক্তি দুটিতেও বেহুলার প্রেমের গভীরতা প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজপ্রভাব-পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যের বৈষ্ণব পদাবলী ও মৈমনসিংহ গীতিকা প্রণয়গীতিকা হিসেবে পাঠ করা হয়। কেতকাদাসের এই কাব্যপঙ্‌ক্তিগুলিও কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেতকাদাস এই পঙ্‌ক্তিগুলির মধ্য দিয়ে বেহুলা চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য তুলে ধরেছেন।

কাব্যমূল্য প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য। কেতকাদাসের কাব্য পাঠ করলে আমাদের অন্যান্য সাহিত্য-নিদর্শনের কথাও মনে পড়বে।

ক. 'বিষহরি বিনোদিনী মায় কৈল তায়। গাঙ্গাপুরে বেহুলার মান্দাস আল্যায়॥
বাঁশের গজাল যত সব গেল ছাড়্যা। খানি খানি হয়্যা ভাসে যত কলা গড়্যা॥'

এইভাবে বাঁশের গজাল খুলে ভেলা ভেঙে যাওয়ার বৃত্তান্ত 'আরব্যরজনী'র কথা মনে করিয়ে দেয়। সেখানেও চুম্বক পাহাড়েরর টানে লোহার গজাল খুলে জাহাজ ভেঙে যাওয়ার বৃত্তান্ত আছে।

খ. 'বেহুলা কহিল দাদা ন কান্দিহ আর। চাঁপাতলা পুত্যা রাখ মেলানির ভার॥'

'বেহুলা জলযাত্রায় যাওয়ার আগে চাঁপাতলায় খাদ্যদ্রব্য পুঁতে রেখে যাচ্ছে। এই একই মোটিফ (motif) রূপকথার ডালিমকুমারের কাহিনিতে পাওয়া যাবে।

৪.৬ মনসামঙ্গলকাব্যের সাহিত্যমূল্য

মনসামঙ্গাল বা যে-কোনো মঙ্গালকাব্যের সাহিতমূল্য বিচার করতে গেলে কাহিনি ঐতিহ্য ও ব্যক্তিগত—দুয়ের বিচারই করতে হবে। আশুতোষ ভট্টাচার্য মঙ্গালকাব্যের কবিদের পুচ্ছানুসারী বললেও সেই সিদ্ধান্ত মান্য করা যায় না।

৪.৬ ইতিহাসের উপাদান

মনসামঙ্গাল অন্তর্গত কাহিনিগুলিতে ইতিহাসের বিভিন্ন কালপর্ব গড়ে উঠেছে। সে বিষয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এবার আমরা পাঠ্যাংশের নানা পঙ্‌ক্তিতে যে সামাজিক রীতিনীতি সংস্কার নিহিত আছে তার খোঁজ দেব। এই উপাদানগুলি সামাজিক ও লোক-ইতিহাস রচনার কাজে লাগতে পারে।

১) 'বেহুলা নাচনী'—বেহুলার নৃত্যে অনুরক্তি দ্রাবিড় প্রভাবে ফল বলে কেউ কেউ অনুমান করেন। এদিক থেকে মনসামঙ্গালকাব্য বঙ্গাভাষীদের মিশ্রসত্ত্ব চরিত্রের নানা দিক তুলে ধরেছে যেন।

২) 'কন্যাতি বর্য্যাতি হৈল পথে হুটাহুটি'—বেহুলা লখীন্দরের বাড়ির পরিজনেরা পথে কলহ (হুটাহুটি) করছে। কোনো কোনো কৌমে বল প্রয়োগ করে কন্যাহরণের দৃষ্টান্ত ছিল। পরবর্তীকালে এই রীতিটিই কৃত্রিম বাধাদানে (Mock fight) পর্যবসিত হয়েছে। এখানে তারই ইঙ্গিত রয়েছে।

৩) 'গমনে গোধিকা ডাকে মস্তক-উপর'—চাঁদ লখীন্দরের জন্য পাত্রী দেখতে যাচ্ছে। যাত্রাপথে গোধিকা ডাকল। এখানে গোধিকার ডাক অমঙ্গাল সূচক। এখানে চাঁদ যে কৌমের মানুষ গোধিকা সেই কৌমের কাছে নিষেধাত্মক প্রতীক (taboo)।

৪) শ্বেতকাককে বেহুলার অনুরোধ—বেহুলা লখীন্দরকে নিয়ে জলে ভেসে যাওয়ার আগে শ্বেতকাককে তার দুর্দশার খবর জানাচ্ছে। শ্বেতকাককে অনুরোধ করেছে তার বাড়িতে খবর দিতে। হিন্দু লোকশ্রুতি অনুযায়ী কাক যমদূত, এখানে অবস্য সংবাদবাহী। পদাবলিতেও কাক সংবাদবাহী। সেখানে আছে—'প্রভাত সময়ে কাক কলকলি / আহার খাটিয়া খায় / প্রিয় আসিবার / নাম শুধাইতে / উড়িয়া বসিল তায়।

'বেহুলা ডোমেনী আমি'—বেহুলা ও লখীন্দর স্বর্গ থেকে ফিরে আসার পর নিজেদের ডোম বলে পরিচয় দিয়েছে। মঙ্গালকাব্যগুলির মধ্যে যে ব্রাহ্মণ্য ও অব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির নানা উপাদান পাশাপাশি রয়েছে এটি তার অন্যতম প্রমাণ। কারণ এর পরেই মনসার পূজার যে পদ্ধতিগত বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা উচ্চবর্গীয় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ইঙ্গিতবাহী।

৬) মেঘে হব অল্প জল : বৃক্ষ হরিবেক ফল : ব্রাহ্মণ শূদ্রেতে হবে ঘর

কেতকাদাসের কাব্যের শেষে রয়েছে কলিযুগ-বর্ণন। কলিযুগ-বর্ণন সংস্কৃত পুরাণেও থাকত। এই কলিযুগে 'ব্রাহ্মণ শূদ্রেতে হবে ঘর' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের মিলনকে অনাচার বলে মনে করা হচ্ছে। অথচ আমরা আগেই দেখেছি মঙ্গালকাব্যে ব্রাহ্মণ্য ও অব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মিলন ঘটেছে। তাহলে কলিযুগ বর্ণনে বিপরীত কথা কেন বলা হচ্ছে? বিষয়টি গভীর তাৎপর্যবাহী। আসলে তুর্কি আক্রমণের পর ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে গভীর সংকট দেখা দিয়েছিল। এই সংস্কৃতিকে বাঁচানোর জন্যই কোনো কোনো অব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও দেবদেবরী সংস্কৃতায়ন ঘটানো হল। এর অর্থ এই নয় যে ব্রাহ্মণ্য ও অব্রাহ্মণ্য দুয়ের পার্থক্য মুছে গেল। মঙ্গালকাব্য অপৌরাণিক দেবদেবীর পৌরাণিকীকরণ ঘটছে এবং পরিশেষে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের পার্থক্য নির্দিষ্ট করা হচ্ছে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতি তার দাপট বজায় রাখার জন্যই খানিকটা হলেও অব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটায় কিন্তু তাকে পুরোটা স্বীকার করে না।

৪.৬.১ মনসামঙ্গালকাব্যে সামাজিক ইতিহাসের উপাদান

মনসামঙ্গাল কাব্যে সামাজিক ইতিহাসের নানা উপাদান খুঁজে পাওয়া সম্ভব। এই উপাদানগুলি বিভিন্ন কৌমের সংস্কৃতির মিল, বেমিল ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে।

৪.৭ অনুশীলনী

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

(i) দুজন মনসামঙ্গাল রচয়িতা কবির নাম লিখুন।

(ii) কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্য কোন্ সময়ে রচিত?

(iii) বেহুলার পিতার নাম কী?

প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন ঃ

১. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ অনুসরণে বেহুলা চরিত্রটি বিচার করুন।

২. মনসামঙ্গালকাব্যে ইতিহাসের নানা উপাদান খুঁজে পাওয়া সম্ভব। আলোচনা করুন।

৩. কেতকাদাসের কাব্যের সাহিত্যমূল্য বিচার করুন।

৪. মনসামঙ্গাল কাব্যধারায় কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গালের স্থান নির্ণয় করুন।

৫. মনসামঙ্গাল কাব্যের কাহিনি-নির্মাণ ও গঠন-কৌশলের পরিচয় দিন।

৪.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১. অক্ষয়কুমার কয়াল চিত্রা দেব সম্পাদিত—*কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গাল*

২. আশুতোষ ভট্টাচার্য—*বাংলা মঙ্গালকাব্যের ইতিহাস*

৩. William L. Smith—*the One-eyed Goddess : A Study of the Manasa-Mangal*

৪. সুকুমার সেন সম্পাদিত—*বিপ্রদাসের মনসাবিজয়*

৫. P.K. Maity–*Historical Studies in the Cult of the Goddess Manasa*

৬. Edward C. Dimock–*The Sound of Silent Guns and Other Essays.*

৭. সুকুমার সেন—*বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড*

একক ৫ ❐ পদ্মাবতী

গঠন

৫.০ উদ্দেশ্য
৫.১ প্রস্তাবনা
৫.২ সারাংশ
৫.৩ র-সেন ও পদ্মাবতীর বিবাহ অংশে সমাজচিত্র
৫.৪ আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যের (র-সেন-পদ্মাবতী বিবাহখণ্ড—র-সেনের দেশে প্রত্যাবর্তন) অংশ প্রেম ও সৌন্দর্যের বর্ণনা
৫.৫ র-সেনের বিবাহখণ্ড—চিতোর আগমন খণ্ড অংশের কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বিষয়ের আলোচনা
৫.৫.১ সধুবা প্রবন্ধসঙ্গীত
৫.৫.১ পদ্মা—সমুদ্র খণ্ড অংশটির বৈশিষ্ট্য
৫.৫.১ পদ্মাবতী—র-সেন বিবাহখণ্ড চিতোর আগমন খণ্ড পর্যায়ে আলাওলের সুফি ভাবনার প্রকাশ
৫.৬ টীকা (নাগমতির বারমাস্যা, শুকপাখি)
৫.৭ "চিতোর আগমন খণ্ডে" পদ্মাবতীর খণ্ডিতা রূপের পরিচয়
৫.৮ আলাওলের কাব্যের রোমান্স রস পাঠ্যাংশ
৫.৯ সাথী খণ্ডের সংক্ষিপ্ত আলোচনা
৫.১০ অনুশীলনী
৫.১১ গ্রন্থপঞ্জি

৫.০ উদ্দেশ্য

সপ্তদশ শতাব্দীর রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান রচয়িতা রূপে দৌলত কাজি ও সৈয়দ আলাওল মধ্যযুগের দুজন প্রখ্যাত কবি। এঁদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আরাকান ও রোসাঙের রাজা ও অমাত্যবৃন্দ। ইসলামি প্রেম-কাব্যগুলি মুখ্যত আরবি-ফারসি ও হিন্দি কাহিনি অবলম্বনে রচিত। আগেই চট্টগ্রামে বাংলা সাহিত্যচর্চার ঐস্লামিক আবহ গড়ে ওঠে। চট্টগ্রামের সীমা পেরিয়ে রোসাঙের মগ ও বৌদ্ধ রাজাদের নির্দেশেই প্রকাশিত হয় ইসলামি রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানমূলক কাব্যগুলি। মুখ্যত সুফি ধর্মের রূপকে এই আখ্যানকাব্যগুলি রচিত হলেও, এই সাহিত্য মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ। বৈষ্ণব পদাবলির বাইরে রোমান্টিক প্রণয়গাথা রচনাই কবিদের উদ্দেশ্য।

৫.১ প্রস্তাবনা

রোসাঙ রাজসভার কবি দৌলত কাজি : দৌলত কাজি রোসাঙ রাজের পৃষ্ঠপোষকতায় রচনা করেন 'লোর চন্দ্রাণী' নামে একটি রোমান্টিক প্রণয়কাব্য। আকস্মিক মৃত্যুতে কবি তাঁর কাব্য শেষ করে যেতে পারেনি। পরবর্তী শ্রেষ্ঠ কবি আলাওল দৌলত কাজির অসমাপ্ত 'লোর চন্দ্রাণী' কাব্যটি সমাপ্ত করেন।

'পদ্মাবতী' কাব্যের লেখক আলাওলের জীবনকথা : কবির জীবন প্রথম থেকেই সংঘাতময়। কবির আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় ফতেহাবাদ পরগণার (বর্তমান ফরিদপুর জেলা) জালালপুরে কবির জন্ম। মজলিস কুতুব তখন ফতেহাবাদের শাসনকর্তা। আলাওলের পিতা ছিলেন তাঁর অমাত্য। কোনো কাজে কবি পিতার সঙ্গে স্থানান্তরে যাত্রা করেন জলপথে। পথে পোর্তুগিজ জলদস্যুদের কবলে পড়ে কবির পিতা নির্ভীকভাবে যুদ্ধ করে মারা যান। বহু ভাগ্যবিপর্যয়ের পর রোসাঙে আসেন আলাওল। এখানে কবি প্রথমে রোসাঙরাজের 'রাজ-আসোয়ার' অর্থাৎ দেহরক্ষী রূপে নিযুক্ত হন। রোসাঙের রাজ-অমাত্য মাগন ঠাকুরের নির্দেশে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'পদ্মাবতী' কাব্যটি রচিত হয়। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল'। মাগন ঠাকুরের মৃত্যু হওয়ায় কবি শিশু রাজা শ্রীচন্দ্র সুধর্মার প্রধান অমাত্য সোলায়মানের নির্দেশে দৌলত কাজির 'লোর চন্দ্রাণী' কাব্যটি শেষ করেন ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে। আলাওলের পরবর্তী কাব্য 'তোহফা' রচিত হয় ১৬৬৪ সালে। শ্রীচন্দ্র সুধর্মার (রাজত্বকাল ১৬৫২-৮৪ খ্রিঃ) 'সৈন্যমন্ত্রী' সৈয়দ মহম্মদের আদেশে আলাওল 'সপ্ত পয়কর' কাব্যটি রচনা করেন আনুমানিক ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে। এটি নিজামী পঞ্জভীর ফারসি কাব্য হফত পয়করের অনুবাদ। ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে রোসাঙের রাজ-অমাত্য সৈয়দ মুসার নির্দেশে। তখন আলাওল বৃদ্ধ। এর আগেও কবির জীবনে নেমে এসেছিল দুঃখের ছায়া। শাহ সুজা এসময়ে ঔরংজেবের ভয়ে পালিয়ে এসে রোসাঙ রাজসভায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। শাহ সুজা রোসাঙ-রাজের বিরাগভাজন হয়ে সপরিবারে বিড়ম্বিত ন। কবির সঙ্গেও ছিল তাঁর হৃদ্যতা। আলাওল শাহ-সুজাকে সাহায্য করেছেন—মির্জা নামে এক দুষ্টমতি ও কূটবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের অভিযোগে রাজনির্দেশে কবি পঞ্চাশ দিন ভোগ করেন কারাগারের দুঃসহ যন্ত্রণা। কবি ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবন ধারণ করেন দেখে রোসাঙের নতুন রাজসচিব মজলিস নবরাজের অনুগ্রহে রচনা করেন 'সেকান্দার নামা' কাব্য। এটিও নিজামির ফারসি কাব্যের অনুবাদ। দীর্ঘজীবী কবি এই কাব্যটি রচনার পর প্রয়াত হন।

আলাওলের জীবনের সৃষ্টিশীল পর্ব—(১) আলাওল রাজসভার কবি। অভিজাত শ্রেণির লোকেরাই তাঁর কাব্যের রসগ্রাহী পাঠক।

(২) আলাওল বহু ভাষাবিদ কবি। বাংলা ছাড়া ব্রজবুলি, সংস্কৃত, হিন্দি, ফারসি ও আরবি ভাষায় পারঙ্গম। কবি জানতেন আরাকানের মঘী ভাষা।

(৩) মুখ্যত তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলি ফারসি কাব্যের অনুবাদ। একমাত্র 'পদ্মাবতী' জায়সীর হিন্দি কাব্য 'পদুমাবতে'র অনুবাদ। পদ্মাবতীতে সংস্কৃত শ্লোক হয়তো কবির স্বরচিত এমন প্রকাশ করেছেন ওয়াকিল আহমদ। পদাবলিসাহিত্য ও ব্রজবুলিও ছিল কবির আয়ত্তে। 'পদ্মাবতী'তে আরবি পদবন্ধের অনুবাদ আছে। জ্ঞান, বুদ্ধি, চিন্তার জগতে কবির বিচরণ ছিল স্বচ্ছন্দ। বিষয় বৈচিত্র্যেও তাঁর জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত। রসকাব্য, তত্ত্বকাব্য, সঙ্গীতশাস্ত্র, যুদ্ধবিদ্যা রাজকীয় ক্রীড়ায় পারদর্শী কবি আলাওল।

(৪) আলাওলের রচনায় আবেগের অংশ কম চিৎপ্রকর্ষ বেশি। তাঁর যৌবনের গ্রন্থ রাগ-তালনামা, পদাবলি ও পদ্মাবতী। 'পদ্মবতী' কাব্যে সরল কল্পনা ও আবেগের বিস্তার সংযত।

(৫) বুদ্ধির জগতে নাগরিক অভিজ্ঞতা কবিকে সচেতন করে দেয়। আরাকান রাজসভায় থাকার সময় আলাওল পেয়েছিলেন বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শ। 'পদ্মাবতী'-তে রোসাঙ রাজসভায় আরবি, মিসরি, তুর্কি, হাবসি, রুমি, মোগল, পাঠান, বর্মা, শ্যাম, আরমানী, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ, ফরাসিস, হিসপানি, পোর্তুগিজ প্রভৃতি বিচিত্র মানুষের সমাবেশ বর্ণনা করেছেন আলাওল। রাজসভার সাথে জড়িত কবি বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ। আলাওলের কবিমানস নির্মাণে এই অভিজ্ঞতার মূল্য ছিল অপরিসীম।

৫.২ সারাংশ

'পদ্মাবতী'র সমগ্র কাহিনি : শেখ মালিক মহম্মদ জায়সীর হিন্দিকাব্য পদুমাবতের রচনাকাল ৯২৭ মতান্তরে ৯৪৭ হিজরি। পদ্মবতী অনূদিত কাব্য হলেও স্থান বিশেষে নিজস্ব চিন্তাভাবনাও প্রকাশ করেছেন সৈয়দ আলাওল। দু'একটি অভিনব বিষয় সংযোজনের মধ্যে আছে কাকনুছ পক্ষীর বর্ণনা। মূল বক্তব্যের পাশে দু-চার চরণে যুক্ত হয়েছে কবির মনের কথা—এই পক্ষীবর্ণন অংশে।

সমৃদ্ধ সিংহল দ্বীপের রাজা গন্ধর্ব সেন। তাঁর প্রিয়তমা মহিষী চম্পাবতী। পদ্মাবতী তাঁদের একমাত্র কন্যা। সে বত্রিশ লক্ষণযুক্তা সুন্দরী কুমারী। সুরম্য প্রাসাদে সখীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে রঙ্গারসে ও বিলাস-ব্যসনে পদ্মাবতীর দিন কাটে তার পিতৃগৃহে। রাজকুমারী পদ্মাবতী ও হীরামণি 'নানা রঙ্গে শুক সঙ্গে পড়ে শাস্ত্রবেদ'। ক্রমে পদ্মাবতী হয়ে উঠলেন সুন্দরী যুবতী। হীরামণির সাথে এ ব্যাপারে পদ্মাবতীর রসালাপ হত। রাজা গন্ধর্ব সেনের কাছে শুক ও পদ্মাবতীর সৌহার্দ্য একেবারেই পছন্দ হল না। হীরামণি এক 'মহান পণ্ডিত' শুকপাখি। পদ্মাবতীর নিত্য সহচর সে। এদিকে সিংহল—'নৃপতির আজ্ঞা হল শুক মারিবারে।' পদ্মাবতীর চেষ্টায় শুকের প্রাণ বাঁচল কিন্তু রাজার অন্তঃপুরে নিরাপত্তা না থাকায় শুক সুযোগ বুঝে পিঞ্জর থেকে পালিয়ে গেল দূর বনে। পদ্মাবতী শুকপাখির বিচ্ছেদে দুঃখ পেলেন। শুক ধরা পড়ল ব্যাধের জালে। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বণিকের কাছে ব্যাধ তাকে বেচে দিল। বণিক চিতোরের লোক। চিতোরের রাজা চিত্রসেনের মৃত্যুর পর রাজসিংহাসনে বসলেন পুত্র র-সেন। লোকমুখে শুকপাখির মাহাত্ম্যের কথা শুনে শুকের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ র-সেন ; তাকে কিনে নিলেন এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রায়। র-সেনের রানি নাগমতী শুককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সংসারে কি আছে রূপ মোহর সমান।' শুক পদ্মাবতীর রূপের প্রশংসা করায় রূপগর্বিনী রানি নাগমতী হলেন ক্ষিপ্ত। আশঙ্কিত নাগমতী ভাবলেন পদ্মাবতীর রূপের কথা শুনে দেশত্যাগী হবেন তার স্বামী র-সেন। এজন্য তিনি "ধাঞি দামিনীরে ডাকি কহিল সত্বর। / তুরিতে মারহ গিয়া দুষ্ট শুকবর।।" বুদ্ধিমতী ধাত্রী হীরামণিকে না মেরে, তাকে লুকিয়ে রাখল। ধাত্রীর সাহায্যে শুককে ফিরে পেলেন র-সেন। রাজা শুককে বললেন, 'পদ্মাবতী বিবরণ কহ শুনি সার।' শুকের বর্ণনায় ফুটে উঠল পদ্মাবতীর অতুল রূপৈশ্বর্য ও যৌবনপ্রাচুর্যের বিবরণ। রাজা পদ্মাবতীর রূপের বর্ণনা শুনে প্রেমবিদ্ধ। 'ভূমিতে পড়িল নৃপ চেতন রহিত'। রাজবৈদ্য জানালেন রাজা সুস্থ—'কোন রোগ নহে এই বিরহ বিকার।' র-সেন রাজ্য ত্যাগ করে যোগী বেশে শুকের সঙ্গে যাত্রা করলেন সিংহলের দিকে। নাগমতী তখন পতিবিচ্ছেদে বিরহবিধুর। ষোলোশত রাজকুমার র-সেনের যাত্রাপথের সঙ্গী। সাত সমুদ্রের নানা বিপত্তি অতিক্রম করে উড়িষ্যা হয়ে রাজা 'পঞ্চমাসে হৈল গিয়া সিংহল নিকট।' রাজার চিত্ত তখন আনন্দে ভরপুর। মাঘমাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে পদ্মাবতী এলেন মন্দিরে পুজো দিতে। শুক অন্দরমহলে গিয়ে পদ্মাবতীর কাছে র-সেনের পরিচয় ও সিংহল আগমনের উদ্দেশ্য জানিয়ে গেল গোপনে। ঐ শ্রীপঞ্চমীর দিনই যোগীবেশী র-সেন পদ্মাবতীকে দেখেই মূর্ছিত—সুগন্ধি জলে পদ্মাবতী সেবা করলেন র-সেনকে। চন্দন দিয়ে রাজার অঙ্গে লিখলেন—'তোমা দরশনে আইলুঁ পূজা করি ছল।' নিজ অঙ্গের চন্দন লিখন পড়ে শত শিখায় জ্বলে উঠল রাজার প্রেমার্ত হৃদয়। প্রেমের দহনে দগ্ধ র-সেন অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিতে যাওয়ার সময়, শিবপার্বতী তাঁকে নিরস্ত করে জানালেন রাজার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। র-সেন সঙ্গীদের সঙ্গে সিংহল-রাজের সাক্ষাৎপ্রার্থী—ইতিমধ্যে সিংহলরাজ গন্ধর্বসেন জানতে পারলেন যোগীর এই প্রেমাকাঙ্ক্ষার কথা। র-সেন দূতকে জানালেন 'পদ্মাবতী দান, মাগি নৃপস্থান পাইলে যাইব দেশ।' গন্ধর্ব সেন ক্ষিপ্ত, তিনি বললেন, 'শীঘ্র মার দুষ্ট যোগী না কর।' মন্ত্রীর পরামর্শে যুদ্ধ ত্যাগ করে সিংহলের দুর্গদ্বার রুদ্ধ করা হল।

দুর্গের বাইরে থেকে র-সেন চিঠি লিখলেন পদ্মাবতীকে। হীরামণি (শুক) সেই প্রেমপত্র নিয়ে এল পদ্মাবতীর কাছে। প্রেমবাসনায় ব্যাকুল পদ্মাবতী লিখলেন, 'দুয়ার না পাও যবে, সিন্ধ দিয়া আইস তবে, ব্যর্থ

না হইব হর বর।' রাজা পত্র পেয়ে নিশ্চিন্ত মনে রাতে সিঁধ কেটে সঙ্গীসহ প্রবেশ করলেন সিংহলের দুর্গে। প্রভাতে ধরা পড়লেন প্রেমিকযুগল পদ্মাবতী ও র-সেন। গন্ধর্ব সেনের আদেশে যুদ্ধ করতে এল রাজসৈন্য। র-সেন যুদ্ধ না করে ধ্যানস্থ অবস্থায় বন্দি হলেন। সিংহলরাজ্যের সামনে বন্দি র-সেন বললেন 'তিনি যোগীমাত্র, তাঁর গুরু পদ্মাবতী। গুরুকে পাওয়ার জন্যই তিনি এসেছেন সিংহলে। ক্রুদ্ধ রাজা তাঁকে শূলে চড়াবার নির্দেশ দেওয়াতে পদ্মাবতী কাতর হলেন। ঘাতকরা তাঁকে নিয়ে চলেছে মৃত্যুদণ্ড দেবার জন্য। এ দৃশ্য পদ্মাবতীর কাছে অসহনীয়, তিনি হতজ্ঞান হলেন তাঁর প্রেমিক রাজা র-সেনের জন্য। মহাদেব ভাটের ছদ্মবেশে এসে সিংহলরাজকে যোগীর পরিচয় দিলেন। হীরামণিকে জিজ্ঞাসা করে সিংহলে রাজা গন্ধর্বসেনের বিশ্বাস হল যে যোগী প্রকৃতপক্ষে চিতোরের রাজা র-সেন। র-সেনের সঙ্গীসাথিরাও মুক্তি পেলেন বন্দিদশা থেকে। ক্ষমাপ্রার্থী হলেন গন্ধর্বসেন র-সেনের কাছে। র-সেন অশ্বচালনা, চৌগান (এক ধরনের পোলো খেলা) খেলা দেখিয়ে পুরবাসীদের প্রশংসা অর্জন করলেন। রাজা র-সেন কাব্যতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, রাগতত্ত্ব, পিঙ্গালশাস্ত্র ও অষ্টনায়িকার ভেদতত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেন সর্বসমক্ষে। গন্ধর্ব সেন সুপাত্রের হাতে কন্যা সমর্পণের আয়োজন করলেন। সামাজিক আচার অনুষ্ঠান মেনে র-সেন ও পদ্মাবতীর বিবাহ হল রাজকীয় কায়দায়। স্বজন পরিজন তাঁদের গ্রহণ করলেন রঙ্গাকৌতুকে। বাসরসজ্জায় রতিরসে সম্পন্ন হল তাদের গোপন মিলন। সিংহল ভেসে গেল আনন্দোৎসবে। র-সেন ভুলে গেলেন চিতোরের কথা।

অপরিমিত আনন্দে নবদম্পতি উপভোগ করলেন ছটি ঋতু। হীরামণি শুক বিদায় নিলেন। সাশ্রুনেত্রে র-সেন-পদ্মাবতী, রাজা রানি ও সহচরীরা বিদায় জানালেন তাঁকে। এটিই হল কাহিনির প্রথমাংশ। চিতোরে ফেরার পথে র-সেনকে পরীক্ষা করবার জন্য সমুদ্রকন্যা পদ্মাবতীকে লুকিয়ে রাখলেন। বহু প্রচেষ্টার পর রাজা ফিরে পেলেন পদ্মাবতীকে। এর আগেই রাজার কাছে পৌঁছেছে প্রথম প-ী নাগমতীর বিরহবেদনার কথা। দুই প-ীসহ র-সেনের দিন সুখেই কাটছিল কিন্তু রাঘবচেতন রাজপণ্ডিত হলেও রাজা তাঁকে বহিষ্কৃত করায় তিনি দিল্লিশ্বর আলাউদ্দিনকে জানালেন পদ্মাবতীর অপরূপ বৃত্তান্ত। আলাউদ্দিন দূত পাঠালেন পদ্মাবতীকে বাদশাহর হারেমে আনার জন্য। র-সেন ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন সে প্রস্তাব। র-সেন বন্দি হয়ে দিল্লিতে নীত হন। রাজার দুই সহচর গোরা ও বাদল কৌশলে তাকে মুক্ত করেন। দেবপাল রাজার অনুপস্থিতিতে চেষ্টা করেন পদ্মাবতীকে করতলগত করার। র-সেন তাঁর রাজ্য আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করেন। নিজ ফিরে এলেন রাজ্যে গুরুতর আহত হয়ে। সাতদিন পর রাজার মৃত্যু হল। সহমরণে গেলেন পদ্মাবতী ও প্রথমা পত্নী নাগমতী। আলাউদ্দিন সসৈন্যে পুনর্বার চিতোরে এসে চিতাভস্ম দেখলেন—পদ্মাবতীকে পাননি। চিতোর দখল করে আলাউদ্দিন বিমর্ষহৃদয়ে ফিলে এলেন দিল্লিতে। এইখানেই গল্পের প্রায় শেষ। তবে কিছু অসাম্প্রদায়িক অভিনব ভাবনা ছিল লেখকের। তাই সুলতান আলাউদ্দিন মুসলমান হয়েও হিন্দু রাজা র-সেনের দুই অনাথ পুত্রের লালন পালনের ভার গ্রহণ করেন।

৫.৩ র-সেন ও পদ্মাবতীর বিবাহ অংশে সমাজচিত্র

র-সেন ও পদ্মাবতীর বিবাহ অংশে সমাজচিত্র ঃ আলাওল চট্টগ্রাম—রোসাঙে বসে লিখেছেন তাঁর অনুবাদকাব্য। জায়সীর হিন্দি মূল কাব্যটি রচিত হয়েছে উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে। কাজেই দুজনের সমাজ ও সংস্কৃতি বর্ণনার ক্ষেত্রে দেশগত পার্থক্য আছে। আলাওল মূলত বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সমাজের অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ। অপরদিকে জায়সী উত্তর ভারতের বিবাহ রীতিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন—মালাবদল, সপ্তপদী গমন, বেদপাঠ ইত্যাদি হিন্দুর আচার অনুষ্ঠানের কিছু কিছু চিত্র থাকলেও তার বিস্তারিত বিবরণ নেই জায়সীর 'পদুমাবৎ' কাব্যে। উত্তর ভারতের লোকসংঙ্গীত মনোরা, ঝুমক-ও চাচরীর উপর জোর দিয়েছেন জায়সী বিবাহসঙ্গীত রূপে এগুলিই সেকালে ব্যবহৃত হত। কিন্তু সঙ্গীতজ্ঞ কবি আলাওল বিবাহসভায় নৃত্য-গীতের ক্ষেত্রে বঙ্গীয় আদর্শের অনুসারী।

সেকালে বাঙালি সমাজে বিয়ের অনুষ্ঠান আচারকেন্দ্রিক। আচারসমূহ ছিল উৎসবকেন্দ্রিক। বৈবাহিক আচার পালন শুরু হত বিয়ের আগে থেকে—বিয়ের পরেও তা চলত। এইসব আচার অনুষ্ঠানের পশ্চাতে নবদম্পতির জীবনের মাঙ্গালিক দিকের চেয়ে বৈবাহিক অনুষ্ঠানকে উৎসবমুখর করে তোলাই ছিল বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। বরকনে উভয়পক্ষ বিয়েতে সম্মতি দান করলে এই অনুষ্ঠানের সূচনা হত। এই অনুষ্ঠানের বরপক্ষের লোকেরা ভাবীবধূর জন্য উপকরণসামগ্রী নিয়ে, পেশাজীবী গায়ক-গায়িকাদের সঙ্গে নিয়ে বিয়ের গান গাইতে গাইতে কনেপক্ষের বাড়িতে উপস্থিত হত। পুরোহিত বর-কনের কল্যাণকর জীবনের উদ্দেশ্যে 'প্রজাপত্যাদি গ্রহযষ্ঠী'র পুজো দিয়ে তাদের ভালে বিশটি দ্রব্য স্পর্শ করিয়ে দিত।

বিয়ের কাজ সম্পন্ন হত সাধারণত কন্যার পিত্রালয়ে। এজন্য কনের পিতা বিয়ের আঙ্গিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রোপণ করতেন কদলীবৃক্ষ বরানুগমের পথের দুদিকে। থাকত আম্রশাখা ও জলপূর্ণ ঘট।

বিবাহকালে নাটমন্দিরে চলত নৃত্যগীতের মহাধূম। নৃত্যগীতে অংশ নিত পেশাজীবী নর্তক-নর্তকী। এমনকি উচ্চবিত্ত সমাজের বৈবাহিক উৎসবে বেশ্যারাও হত আমন্ত্রিত। পদ্মাবতী-র-সেনের বিবাহে ঃ 'নাচে বেশ্যা নৃত্য কালে মনোহর বেশ'॥ সমাজে এই সময় বিদূষকরাও রঙ্গ-ব্যঙ্গার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে অভিনয় করতে নানাধরনের : 'নানা কাচে নানা ঢঙ করে বিদূষক'॥ সেকালে কিম্বা একালেও বিবাহের মতো সামাজিক শুভ অনুষ্ঠানের সুবেশা সধবা রমণীদেরই প্রাধান্য। 'মুকুলিনী সধবা সুবেশা নারীরা বর-কনের স্নানের সময় উপস্থিত থাকতেন সেযুগে। প্রাক বৈবাহিক এই উৎসবের নাম অধিবাস।

অধিবাসের পর নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ হয় পিতৃপুরুষকে তুষ্ট করার জন্য। এছাড়া ব্রাহ্মণ বরের হাতে মঙ্গালসূত্র বেঁধে দিতেন। ষোড়শমাতৃকার বন্দনাও হত। ষোড়শ মাতৃকা হলেন—গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি আত্মদেবতা, কুলদেবতা। কন্যার পিতা গন্ধর্ব সেন সিঁদুর দিয়ে স্বস্তিকা চিহ্ন আঁকার পর গৃহের ভিত্তিতে 'বসুধারা' অর্থাৎ পাঁচবার বা সাতবার ঘৃত ঢেলে দিলেন :

প্রভাত সময় নৃপ করিলেক স্নান।
ষোড়শ মাতৃকা পূজা বসুধারা দান॥
নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ সাঙ্গ করিল রাজন।

গায়ে হলুদ ছিল স্ত্রীআচার প্রধান অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে আত্মীয় অনাত্মীয় প্রতিবেশী মেয়েরা অংশগ্রহণ করতেন। কলাতলায় স্নানও ছিল প্রাক-বৈবাহিক আনন্দের উৎসব। 'পদ্মাবতী' কাব্যে র-সেনের গাত্রহরিদ্রার কথা আছে।

সুগন্ধি হরিদ্রা শরীর মাজিল।
রম্ভাতলে পুস্কর্ণীতে স্নান করাইল॥
রাজযোগ্য পরাইল বস্ত্র অলঙ্কার।

বিবাহকালের আগে থেকেই নাটমন্দিরে চলত নৃত্যগীতের ধূম।

এধরনের আনন্দমুখর সামাজিক অনুষ্ঠানে নৃত্য গীত বাদ্যের ঝঙ্কারে মুখরিত হত বিবাহসভা। র-সেন ও পদ্মাবতীর বিবাহে নানা ধরনের বাজনা বেজেছে—

গুরু মাদর মধুবাণী মৃদঙ্গা উপাঙ্গা ধ্বনি
আরগুজা সুষির রাশি রাশি
মুদ্রাকাঁসি করতাল আওয়াজ কর্ণাল ভাল
বিতত বাজায় বহুতর।

সুষির বাঁশি জাতীয় বাজনা। বিতত বিনা তারের তালবাদ্য। ৩৩ (তেত্রিশ) তারের বাজনা।

মুরজ দুন্দুভি জোড়া নাগরা পিনাক কাড়া
ঢাক ঢোল ঘন মনোহর ॥
রবার দোতারা বীণ কপিনাম রুদ্রবীণ
সমণ্ডল বাহে সুললিত।

ঢাক ঢোলকে বলা হয় আনদ্ধ বাদ্য।

'বরণ' অনুষ্ঠানটি বিয়ের আর একটি উৎসবমুখর মুহূর্ত। 'পদ্মাবতী' কাব্যে কন্যার পিতাই বরণ করলেন বর র-সেনকে :

আসিয়া কন্যার বাপে বরণ করিল ॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন বস্ত্র অলঙ্কার।
একে একে দিয়া নৃপ কৈল পুরস্কার ॥

বিবাহে নানাধরনের আতসবাজি পোড়ানোর প্রথা ছিল :

নানাবর্ণ বাজি পোড়ে অনেক হাউই উড়ে
গাছ বাজী আর উড়ে ঘন ॥
দীপ্তি অতি মনোহর অগ্নিবৃষ্টি শূন্য পর
যেন স্বর্গ ভ্রষ্ট তারাগণ ॥
মহাতাপ ফুলঝুরি দীপক অনেক হেরি
দিয়টী (প্রদীপ) ফন্দিল বহুতর

আলাওল নানাধরনের চরকি, ছুঁচোবাজি, ব্যাঙবাজি, গাছবাজির বর্ণনা দিয়েছেন।

পদ্মাবতীকে বিবাহের সময় মাও সখীরা আনলেন সালঙ্করা সুবেশা কনেকে। পদ্মাবতী : 'করেতে লইল রামা নির্মল দর্পণ ॥ / নিজ আঁকি নিজ রূপ দেখি সুশোভন।' এরপর সপ্তপদীর পালা :—

র-ময় পাটে করি ভব্য চারিজনে ধরি
কন্যা আনি বরের নিকট।
অন্তস্পট (আড়াল) মাঝে দিয়া সপ্ত পাক ফিরাইয়া
তুলি ধরি করিলা প্রকট।।

মালাবদলও হিন্দুসমাজের স্ত্রীআচার মেনেই বর্ণিত :

গ্রীবা হোন্তে পুষ্পমালা দুই করে লৈয়া বালা
পতিগীমে (গলায়) করিলা স্থাপন ॥

শুভদৃষ্টির সময় বর-কনের কামশরাহত লজ্জিত মুখভঙ্গি বাঙালি সমাজের ছবিই মনে করিয়ে দেয় :

হইতে সমান দৃষ্টি কামে কৈল শরবৃষ্টি
দোহান কটাক্ষ করি লক্ষ্য।
লজ্জায় মধ্যস্থ হৈল কামশর নিবারিল
দম্পতি মহত্ত্ব কৈল রক্ষ ॥

কন্যা সম্প্রদানের সময় সজল নয়নে গন্ধর্বসেনের অনুনয়ভঙ্গি বিশেষভাবে বঙ্গীয় হয়ে দেখা দিয়েছে :—

সজল নয়নে রাজা কন্যা সমর্পিল
বোলে মোর প্রাণ আজি তোমা হস্তে দিল ॥

সম্প্রদানের সময় ব্রাহ্মণ্য সংস্কার অনুযায়ী কুশ, তিল, তুলসী ও পঞ্চহরিতকীও দেওয়া হয়েছে। ষোড়শ শতকে গৌরাঙ্গদেবের বিবাহে প্রথম প-ী লক্ষ্মীপ্রিয়ার পিতা বল্লভ আচার্য দরিদ্র ব্রাহ্মণ বলে মাত্র পঞ্চ-হরিতকী দিয়েই কন্যার বিবাহ দেন। এছাড়া বর-কনের আঁচলে গ্রন্থিবন্ধনে রীতিও ছিল।

'প্রেমগাঁঠি বান্ধিলেক অঞ্চলে আঞ্চলে' ॥

লাজ-হোম জয়-হোম করার পর :

'সপ্তপদী গমন করিলে কন্যা বরে।।'

এই সামাজিক বঙ্গীয় বিবাহের পর সব অনুষ্ঠানই 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'—অর্থাৎ বিবাহের ভোজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে র-সেন-পদ্মাবতী বিবাহ খণ্ডটি সম্পূর্ণ।

উপসংহার—পরিশেষে বলা যায় জায়সীর মূল 'পদুমাবৎ' কাব্যে আছে রাজকীয় আড়ম্বরের বিবাহ বর্ণনা। আলাওল বঙ্গীয় সমাজে বিবাহরীতির প্রাদেশিক বর্ণনা দিয়েছেন। জায়সী সমাজবাস্তবতার চেয়ে নায়ক-নায়িকার হৃদয়-গহনে প্রবেশ করেছেন রোমান্টিক তত্ত্বভাবনা প্রকাশের কারণে। আলাওলের অনুবাদ কাব্য 'পদ্মাবতী'-তে সমাজের প্রসঙ্গটি তুচ্ছ নয়। তাই তাঁর বর্ণনায় হিন্দুসমাজের বিবাহের খুঁটিনাটির যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে কবির হিন্দুসমাজের অনুষ্ঠান সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। জায়সী চন্দ্র সূর্যের প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করেছেন নায়ক-নায়িকার কাব্যময় বিবাহ। কিন্তু আলাওলের অনুবাদে মধ্যযুগের প্রেক্ষাপটে হিন্দুদের সামাজিক বিবাহ চিত্রিত। আলাওল কবিই শুধু নন সমাজমনস্ক লেখকও।

৫.৪ আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যের (র-সেন-পদ্মাবতী বিবাহখণ্ড—র-সেনের দেশে প্রত্যাবর্তন) অংশে প্রেম ও সৌন্দর্যের বর্ণনা

(ক) **প্রেম :** কাব্যে প্রেম ও সৌন্দর্যের বর্ণনা থেকে রোমান্টিকতা কবিদের কাব্যে। আলাওল মধ্যযুগের কবি হলেও জায়সীর মতো পুরোপুরি mystic ও অধ্যাত্মরসপূর্ণ কাব্য লেখেননি। মানবিক প্রেমবর্ণন ও পার্থিব সৌন্দর্যের প্রতি আলাওলের লক্ষ্য ছিল। কাহিনি পরিকল্পনা বা চরিত্রনির্বাচনে আলাওলের মৌলিকত্ব নেই। এটি অনুবাদ-কাব্য। জায়সীকে আশ্রয় করলেও আলাওলের অনূদিত 'পদ্মাবতী' কাব্য ক্লাসিক ও রোমান্টিক ভাবনার সমন্বয়ে রচিত।

পদ্মাবতী রাজকুমারী। তার পিতা সিংহলরাজ বীর্যশালী ও ঐশ্বর্যবান। চিতোরাধিপতি র-সেনও ধনে-জনে, মানে, জ্ঞানে ও রূপে অতুলনীয়। পদ্মাবতী ও র-সেনের প্রেমে দরবারি ও সামন্ত প্রেমের ছবি ফুটে ওটা স্বাভাবিক। আলাওল রাজসভার কবি তাই র-সেনের পদ্মাবতীর প্রতি রূপজ প্রেম, পদ্মাবতীর যৌবনের প্রেমাসক্তি, প্রতিকূল অবস্থা পেরিয়ে র-সেনের পদ্মাবতীকে পাওয়ার ঘটনা কাব্যের মুখ্য বিষয়। সিংহল-দুর্গে সিঁধ কেটে র-সেনের পদ্মাবতীর কক্ষে যাওয়ার ব্যাপারটা অনেকটা বিদ্যাসুন্দরের অনুরূপ।

র-সেন যোগীবেশ ধারণ করলেও সঙ্গে নিয়েছিলেন ষোলোশত যোগী—এরা রণে পণ্ডিত। মধ্যযুগের ইউরোপে ফিউডাল প্রেমে শিভালরির স্থান ছিল। বীর নায়ক দুঃখবরণ করে, দুঃসাহসী হয়েই প্রেমে প্রতিষ্ঠা পেত। 'সপ্ত পয়করে'র বাহরাম পূর এই শ্রেণির নায়ক।

র-সেনের পরিচয় পেলেও প্রেমাভিলাষিণী পদ্মাবতী আত্মহারা নন, বরং স্থিরত্ব ও সংযমে তাঁর চরিত্র সমৃদ্ধ। পদ্মাবতী পুজোর ছলে মন্দিরে গিয়ে র-সেনের মুখোমুখি হলেও সতীত্ব বজায় রেখেছে। লোর-চন্দ্রাণী উপভোগ করেছেন প্রণয়-পিপাসা। বিদ্যা ও সুন্দর শালীনতা বিসর্জন দিয়ে দেহমিলনের সুখে মগ্ন ছিলেন। প্রেম সম্পর্কে শুকের সাথে কথোপকথনের সময় পদ্মাবতীর শুচিতা, ধৈর্য ও বৈষয়িক জ্ঞানের বিষয়টি একজন

অভিজাত রাজকুমারীর বৈশিষ্ট্য। পদ্মাবতী বাঙালি মেয়ের মতোই মূর্ছিত র-সেনের গায়ে এঁকে দিয়েছেন চন্দনের পত্রলেখা। প্রণয়াভিব্যক্তির পরে শেষে তিনি লিখেছেন :

ব্যাজ অনুচিত লোকচর্চার কারণে।
তে কারণে যাই আমি আপনা ভবনে॥

গড়ে সিঁধ কাটার অপরাধে র-সেনের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার নির্দেশ তৎকালীন দণ্ডনীতির অন্তর্গত। বাসরঘরে পদ্মাবতীর সখীদের সাথে র-সেনের রসালাপ বুদ্ধিদীপ্ত ঃ

ভস্ম কুরকূট সিদ্ধি শরীর মাঝার।
মলিন হৈব চন্দ্র পরশে তোমার॥
পদ্মাবতী নারী জান নির্মল সে গঙ্গা। (পদ্মাবতী-র-সেন ভেঁট খণ্ড)
তার যোগ্য হৈবে নাকি যোগী ভিক্ষামাঙ্গা॥

পদ্মাবতী র-সেনের বাসরমিলনের চিত্রে আছে রক্তমাংসের স্থূল দেহবাদ। র-সেন ও পদ্মাবতীর মিলন ও রতিক্রিয়ায় জীবনের দাবিই প্রধান। তাদের প্রথম আলাপে আছে রঙ্গোচ্ছল হাস্যমুখরতা। পদ্মাবতীকে নীরব দেখে র-সেন বলছেন : 'প্রিয় বাক্য বুলি না আইসে যবে। / কঠিন বচনে এক গালি দাও তবে॥' পদ্মাবতীর ব্যঙ্গাত্মক রসিক মত : 'স্বপ্নে নাহি হেরে যোগী রমণী বদন।' রুচিবিকৃতি থাকলেও জীবনের চরম সত্য ধরা পড়েছে উভয়ের দেহমিলনে। দরবারি প্রেমের পূর্ণতা আসে সম্ভোগে। অন্যান্য রোমান্টিক আখ্যানকাব্যেও এই দৃশ্য দেখানো হয়েছে। পদ্মাবতী ও র-সেনের রূপজ প্রেম বিবাহবন্ধনে একনিষ্ঠ প্রেমে রূপান্তরিত। যদিও পদ্মাবতী বলে :

ছলযোগে ঠগে যোগী টলে বিজ্ঞ মন।
এই রূপে সীতাদেবী হরিল রাবণ॥

এই প্রেম বাস্তব হলেও সুফি-ভাবনার মণিমুক্তো কোনো কোনো জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে যেমন পদ্মাবতী-র-সেন ভেঁটখণ্ড-এ পদ্মাবতীর গভীর তত্ত্বকথায় সুফি-ভাবের প্রেম প্রকাশিত :

দূর হোন্তে অলি আইসে কমল সম্পাস।
ভ্রমর নিছনি যায় পদ্ম দেয় বাস॥
তোমার আমার প্রেম আজিকার নয়।
মনেত স্মরণ কর পূর্ব পরিচয়॥
গোপনে একাঙ্গা ছিল বেকত দুই অঙ্গা।
মনের ভরমে মানে হয় রঙ্গা ভঙ্গা॥

শিব ও শিবের শক্তি একাত্ম লীলার কারণে তাঁদের দুই রূপ। এ হল অদ্বৈতসিদ্ধি। বৈষ্ণবদের দ্বৈতাদ্বৈতবাদে বলা হয় রাধা ও কৃষ্ণের একই অঙ্গা। লীলার কারণেই তাঁরা প্রেমিক ও প্রেমিকা এ হল দ্বৈতাদ্বৈতবাদের কথা।

মিলনের চিত্রটিতে অবশ্য নববর ও বধূর ও রতিরণের বিষয়টিই বর্ণিত :

দূর কৈল অঙ্গা হৈতে লজ্জার বসন॥
জয় পাই ধরি মাল্য গ্রীবাত বিনান।
* * * * *
অত্যন্ত হরিষে নৃপ জুড়িল নাচন।
চৌরাশী প্রকার বন্ধ নৃপ জানে ভালে। (র-সেন-পদ্মাবতী ভেঁট খণ্ড)

র-সেন চুরাশি ধরনের রতিক্রিয়ায় পারদর্শী। প্রলয়ের রূপকে যে বিপরীত বর্ণনা আছে তা বিদ্যাপতির পদের সম্ভোগচিত্রের অনুরূপ ঃ

একত্রে হইল দুই মদন মুরতি।
লাজসৈন্য ভঙ্গা করি রসে কৈল মতি॥
বিপরীত রমণ সহজে মহারস।
রতিরসে কৈল সতী পতি অতি বশ॥ (র-সেন-পদ্মাবতী ভেঁট খণ্ড)

আবার বিপরীত রতিবর্ণনার শেষে পুরুষায়িত রতিপ্রচেষ্টার জন্য পদ্মাবতীর লজ্জাবশত নায়কের বুকে মুখ লুকোবার চিত্রটি আলাওলের নারীর প্রেমমনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের এক চমৎকার ইঙ্গিত :

চারিচক্ষু সমযুক্ত হইতে দম্পতি।
লজ্জায় পতির উরে লুকায় যুবতী॥ (ঐ)

সম্ভবত পৃষ্ঠপোষক অমাত্যর ইচ্ছানুযায়ী এধরনের প্রেমচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বিদ্যাপতি বা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরেও রতিযুদ্ধের যে বর্ণনা আছে তাও রাজসভার মনোরঞ্জনের জন্যই রচিত।

(খ) সৌন্দর্য : রোমান্টিক কবি হিসেবে আলাওল সুন্দরের পূজারি। প্রকৃতি জগৎ ও প্রাণীজগতের সৌন্দর্য তাঁর কাব্যে অভিব্যক্ত। গাছপালা, ফুলফল, পাখি ও সরোবরের বর্ণনা কবির সৌন্দর্যপিয়াসী মনের পরিচায়ক। বিবাহবাসরে যখন যাচ্ছেন পদ্মাবতী তখন তাঁর রূপের বর্ণনা অনেকটাই বৈষ্ণব পদাবলীর নায়িকার রূপের বর্ণনার মতো :

চলিল কামিনী গজেন্দ্র গামিনী
খঞ্জন গঞ্জন শোভিতা।
কিঙ্কিণী ঘুঁঘর বাজায় ঝাঁঝর
ঝনাঝন নেপুর মধুর গীতা॥
ভুরু বিভঙ্গা মন্মথ-মন-মোহিতা॥ (র-সেন-পদ্মাবতী বিবাহ খণ্ড)

গজেন্দ্র গমনে পদ্মাবতী চলেছেন বিবাহবাসরে। পায়ে কিঙ্কিণী ও ঘুঙুর বাজছে মৃদুমন্দ ছন্দে। নূপুরের মধুর সুর আর ভুরুর কটাক্ষে মদনদেবের মনও বিমোহিত হয়।

ষট্-ঋতু বর্ণন খণ্ডের সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য : র-সেন কৃষ্ণের ন্যায় পদ্মাবতী ও সখীদের সঙ্গে রাসলীলায় মত্ত এ ঘটনাটি আলাওলের নবসংযোজন। এছাড়া বসন্ত ঋতুর বর্ণনায় আলাওল জয়দেবের অনুসারী।

প্রথমে নবীন ঋতু বসন্ত দুর্লভ।
দুই পক্ষ আগে পাছে মধ্যে সুমাধব॥
মলয়া সমীর হৈলা কামের পদাতি।
মুকুলিত কৈল লতা বৃক্ষ বনস্পতি॥ (ষট্-ঋতু বর্ণন খণ্ড)

তুলনীয় জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-তে বর্ণিত বসন্ত রাস :

ললিতলবঙ্গালতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে।
মধুকর নিকর করম্বিত কোকিলকূজিত কুঞ্জকুটীরে॥
বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে।
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে॥

মলয়পবনে মন্দমধুর বাতাসে, মধুকর ও কোকিলকূজিত কৃষ্ণগৃহে শ্রীহরি এই সরসবসন্তে বিহার করছেন। বিরহীদের পক্ষে দুঃখদায়ক এই বসন্তে শ্রীকৃষ্ণ যুবতী সখীদের সঙ্গে নৃত্যরত।'

আবার গ্রীষ্মেও প্রখর সূর্যের তাপে উত্তপ্ত বসুন্ধরা। কিন্তু নবদম্পতির সুখ প্রতি ঋতুতেই নবীন :

অধিক আনন্দযুক্তা রানি পদ্মাবতী।
বসতি নায়র পুরে সুস্বামী সঙ্গাতি॥
সুখভোগে দীর্ঘ অহ তিলে চলি যায়।
চক্ষের মটকে ক্ষীণ রজনী পোহায়॥

বর্ষা বিরহী ও বিরহিনীদের ঋতু।

(বর্ষার) পাহুখ সময় ঘন ঘন গরজিত।
নির্ভয়ে বরিষে জল চৌদিগে পূরিত।
* * * * *
অবিরত দম্পতি থাকন্ত একসঙ্গে।
দিবস রজনী সম কেলিকলারঙ্গে॥
ঘোর শব্দে রেওয়াজে মল্লার রাগ গায়।
দাদুরী শিখিনী রব অতি মনোহর॥ (ষট্‌ঋতুবর্ণন খণ্ড পৃ: ২০৮)

বিদ্যাপতির মাথুরের পদ মনে পড়ে যায় এই বর্ণনা থেকে :

মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥

বর্ষার পর শরতের সোনালি আলোর দিন আসে :

আইল শরৎ ঋতু নির্মল আকাশ
দোলায় চামর কাশ কুসুম বিকাশ॥
নবীন খঞ্জন দেখি বড়ই কৌতুক।
উজরিহ যামিনী দম্পতি মনে সুখ॥

কাশফুলের চামনের মতো দোল ও কুসুমের মাসে রাত্রিটা নবদম্পতির (র-সেন ও পদ্মাবতীর) সুখেই কাটে।

শরতের পর শিশিরসিক্ত হেমন্ত ঋতুর আগমন :

প্রবেশ হেমন্ত ঋতু শীত অতিশয়।
পুষ্পতুল্য তাম্বুল অধিক সুখ হয়॥
শীতের তরাসে রবি তুরিতে (দ্রুত) লুকায়।
অতিদীর্ঘ সুখনিশি পলকে পোহায়॥ (ষট্‌ঋতুবর্ণন খণ্ড পৃ: ২০৯)

এই সময় স্বামী ও স্ত্রী অগুরু, চন্দন, চুয়া ও কস্তুরীর প্রলেপ দেয় শরীরে। আলাওলের ভাষায় এই চারটি সুগন্ধীর নাম 'চতুঃসম'। আর শীতের সময় : 'বক্ষে বক্ষে এক হৈলে শীত নিবারণ।' সিংহলের ঘরে ঘরে সবাই শীতের উষ্ণতা উপভোগ করে। কোথাও বিচ্ছেদ বেদনার চিহ্ন থাকে না।

'র-সেন ও পদ্মাবতীর ভেঁট খণ্ডে' স্ত্রীভেদ বর্ণনা—পদ্মাবতী-র-সেন ভেঁটখণ্ডে জায়সীর 'পদুমাবৎ' কাব্যে বর্ণিত ষোড়শ সিঙ্গারের বর্ণনা আছে। আলাওল জায়সীর অনুসরণে পদ্মাবতীর দ্বাদশ আভরণের বর্ণনা করে

পৃথক একটি স্তবকে পদ্মাবতীর দ্বাদশ অঙ্গ সংস্থানের বিবরণ দিয়েছেন। বিবাহের পর পদ্মাবতীর বার আভরণ ছিল যথাক্রমে—বসন, চন্দন, সিঁদুর, তিলক, কানের কুণ্ডল, অঞ্জন, তাম্বুল, হার, বলয়, বেসর, কঙ্কণ, নূপুর, শৃঙ্গার বা বেশসজ্জার সঙ্গে পদ্মাবতীর পায়ে আছে পায়জোড়। 'সিংহকটি, গজগতি, চিকুর চামরী।/কুরঙ্গ নয়ানী বালা কহিলু বিচারি।।' পদ্মাবতীর কটিদেশ সিংহের ন্যায় সরু, তিনি গজেন্দ্রগামিনী, আর চুল চমরী গাভীর পুচ্ছের মতো, হরিণনয়না সুন্দরী পদ্মাবতী। তার 'গৃধিনী নিন্দিত কর্ণ'—শকুনীকেও হার মানায় এমন কান। শুকপাখির মতো নাক পদ্মাবতীর। কোলিককণ্ঠী রানি পদ্মাবতী। বিম্বফলের মতো অধর, ডালিমের দানার মতো সুন্দর দন্তপংক্তিতে সুশোভিত পদ্মাবতীর মুখশ্রী। জায়সী নারীদেহের অঙ্গসংস্থানকে লঘু গুরু ভেদে ভাগ করেছেন। চারটি দীর্ঘ অংশ—কেশ, করাঙ্গুলি, নয়ন এবং কণ্ঠরেখা। চারটি লঘু অংশ—দন্ত, স্তন, ললাট ও নাভি। চারটি স্থূল ভাগ—কপোল, নিতম্ব, জংঘা ও হস্ত। চারটি ক্ষীণ বিভাগ—নাসিকা, কটি, উদর, অধর। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রানুযায়ী আলাওল পদ্মাবতীর স্তনকে গুরুশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আলাওলও জায়সীর মতোই যোগশাস্ত্র, অলঙ্কারশাস্ত্র ও কামশাস্ত্রে পণ্ডিত কাজেই অনুবাদে মূলের 'স্ত্রীভেদবর্ণন' অংশটিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন কবি। জায়সীর মতে বসন, চন্দন, সিঁদুর, তিলক, অঞ্জন, কুণ্ডল, বেসর, তাম্বুল, কণ্ঠহার কঙ্কণ, ক্ষুদ্রাবলী ও নূপুর।

অষ্ট নায়িকাভেদ—সংস্কৃত সাহিত্যে প্রেমবিদ্ধা নায়িকার আট অবস্থার বর্ণনা আছে। এক এক অবস্থায় তার এক এক নাম যেমন—অন্য রমণী-সম্ভোগ চিহ্নিত প্রিয়তমের প্রতি ঈর্ষাকাতর নায়িকা খণ্ডিতা, প্রেমিকের মিলনকামনায় সংকেতস্থলে উপনীতা নায়িকা অভিসারিকা। বাসরে প্রিয়মিলনের অভিলাষী নায়িকা বাসকসজ্জিকা। অভিসারের রজনীতে প্রেমিকমিলনবঞ্চিতা নায়িকা বিপ্রলব্ধা, প্রিয়বিহনে বিরহকাতর নায়িকা উৎকণ্ঠিতা। প্রবাসী প্রণয়ীর কাছে সংবাদপ্রেরক নায়িকা প্রোষিতভর্তৃকা বা স্বয়ংদূতিকা, বিচিত্র সঙ্গমে মত্তা নায়িকা স্বাধীনভর্তৃকা। আলাওলের ভাষায় অভিসারিকা কন্যার বর্ণনা :

সঙ্কেত নির্জনে প্রিয় থাকে রতি আশে।
রমণী চলিয়া আসে পুরুষের পাশে॥
সেই সে রমণী অভিসারিকা নিশ্চয়।
কেলিকলা রঙ্গারসে রজনী বঞ্চয়॥

কলহান্তারিতা নায়িকার পরিচয় :

মনে গর্ব ধরিয়া হইয়া মানমতী।
না চাহে নয়ান তুলে না দেয় সম্মতি॥
সখিগণ বচনে না হয় মন শান্ত।
বহুল প্রার্থনে যদি মানাইলে কান্ত॥
তবে তার হয় পুনি রসের সম্মতি।
এহারে বলয় কলহান্তরিতা যুবতী॥

ভরতচন্দ্র রসমঞ্জরী কাব্যে অনুরূপ নায়িকার পরিচয় দিয়েছেন। ভারতচন্দ্র সংস্কৃতে রচিত রতিমঞ্জরীর অনুসারী কবি। বৈষ্ণবপদাবলীতে অভিজ্ঞ আলাওল প্রণয়ী (র-সেনের) 'দশমী দশা'র কথা বলেছেন। প্রেম চিত্তে সঞ্চারিত হওয়ার পর নায়ক-নায়িকার পর্যায়ক্রমে দশ প্রকার অবস্থা হয়। অভিলাষ, চিন্তা, স্মরণ, গুণকীর্তি, উদ্বেগ, বিলাপ, উন্মাদ, ব্যাধিতাপ, জরা ও মৃত্যুবৎ এই দশ দশা নায়ক-নায়িকার হয়। দশমী দশা বিরহীর শেষ ও চূড়ান্ত অবস্থা, নায়িকার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়। র-সেনের ক্ষেত্রে এই 'দশমী দশা'য় উপনীত হন চিতোররাজ প্রণয়িনী পদ্মাবতীকে দেখে।

সঙ্গীত : পদ্মাবতীর বিবাহ খণ্ড থেকে চিতোর আগমন পর্যন্ত প্রথম খণ্ডে কয়েকটি গান দিয়েছেন আলাওল। গানগুলি মৌলিক। পরিচ্ছেদশীর্ষে গানের তাল ও রাগের কথা আছে। সমস্ত কাব্যের ভাষাই গানের ভাষা। চন্দ্রাবলী, কেদার, ধানসী, তুরি, বসন্ত, শ্রীগান্ধার, কর্ণাট, পরিতাল, দক্ষিণান্ত শ্রীরাগ প্রভৃতির নাম আছে। জায়সীর শিষ্যরা তাঁর মূল হিন্দি কাব্যটি গান গেয়ে প্রচার করতেন। আলাওলের কাব্যে গীতিধর্ম আছে। পূর্ণাঙ্গ গীতের বৈশিষ্ট্য আরোপ করে যে গানগুলি রচনা করেছেন সেগুলি আবেগপূর্ণ, সুরমুগ্ধ ও ভাববিহ্বল। কাব্যকাহিনির সঙ্গে রেখে গানগুলি রচিত।

ষট্‌ঋতুবর্ণনা খণ্ডে বসন্ত রাগের গান আছে—এটি তাঁর নিজস্ব বসন্তগীতি :

বসন্তে নাগর বরনাগরী বিলাসে।
বরমালা মুখ ইন্দু স্রবে সুধা বিন্দু বিন্দু
মৃদুমন্দ ললিত অধর মৃদুহাসে॥
প্রফুল্লিত কুসুম মধুব্রত ঝঙ্কৃত
হুঙ্কৃত পরভিত কূজিত রাবে।
মলয়া সমীর সুসৌরভে সুশীতল
বিলুলিত পতি অতি রসভারে॥
পল্লবিত বনস্পতি কুটজ তমালদ্রুম
মুকুলিত চূতলতা কোরক জানে।
যুবজনহৃদয় আনন্দ পরিপুঞ্জিত
লবঙ্গা মল্লিকা মালতীমালে॥

পদটির ভাষাভঙ্গিতে জয়দেবের প্রভাব লক্ষণীয়।

বাসর শয্যায় র-সেনের কাছে পদ্মাবতীকে নিয়ে যাওয়ার সময় তার সখীরা এ গানটি গেয়েছিল :

তুয়া পদ হেরাইতে রাতুল নয়ান যুগে
কামিনী মোহন কটাক্ষ হীন ভেল।
প্রেমমদে বিহ্বল সতত বহত্র লোর
অবয়ব পরিহারি শুদ্ধি বুদ্ধি হরি গেল॥
চল চল প্রভুর সে তলপে আরতি॥
পতি গতি অতি অল্পে। ধুয়া
চন্দন চন্দ্রশীতল মলয়ানিল ছল
সৌরভ বিশিখ খতর লাগে।
ভ্রমর কোকিল রব শুনত পরাভব
মণ্মথ বাণ আনল উপর জাগে॥

গানটি ব্রজবুলি ভাষায় বৈষ্ণবীয় ঢঙে রচিত। 'দক্ষিণান্ত শ্রীরাগে'র সুর। গানের বিষয়বস্তু প্রেম। ভাব-ভাষা-সুরের সমন্বয়ে এটি রূপে-রসে-স্বাদে-বর্ণে-গন্ধে অপূর্ব হয়ে উঠেছে। রাপের দীপ্তি, চিত্রের উজ্জ্বলতা, গতির স্পন্দন এবং ধ্বনির মাধুর্যে শ্রোতার চিত্ত আপ্লুত হয়। 'রাগ কর্ণাট পরিতাল ছন্দে' নিম্নের গানটিও মনোজ্ঞ :

চলিল কামিনী গজেন্দ্রগামিনী খঞ্জনগমন শোভিতা।
কিঙ্কিণী ঘাঁঘর রাজত্র ঝাঁঝর নেপুর মধুর বাজে॥

তরু বিভঙ্গা অপাঙ্গা তরঙ্গা মণ্মথ মন মোহিতা॥ ধুয়া
গুম্থিলেক কেশ কুঙ্কুম সুবেশ সিন্দুর চন্দন তিলে।
সখন রাতি তারকা পাঁতি বান্ধুলী র- বিরাজিতা॥
সিন্দুর ভাল মৃগাঙ্ক লাল দশন অধর জ্যোতি।
রসনা সুলাল বচন রসাল বিরহ বেদনা মোহিতা॥
উরোজ জোড় হেম কটোর এহি সে পয়োধর রঞ্জিতা॥

র-সেনের প্রাণেশ্বরী পদ্মাবতী সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছেন শুনে রাজার যে গান তার মধ্যে বিদ্যাপতির প্রার্থনা পর্যায়ের পদের প্রভাব আছে। ভাটিয়াল রাগে দীর্ঘ ছন্দে রচিত এই পদটিতে রাজার ঈশ্বরের প্রতি যে স্তুতি আছে তাতে বিদ্যাপতির—তাতল সৈকতে বারি বিন্দু সম সুতমিত রমণী সমাজে।/তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পিলুঁ অব মঝু হব কোন কাজে॥ পদটির যথেষ্ট প্রভাব আছে :

তোমার কৃপার বলে আপনার পাপ ফলে
মত্ত গর্বে পাছে না চিন্তিলুঁ।
অখনে সঙ্কট হৈল শমন নিকটে আইল
উদ্ধারহ কাতর হইলুঁ॥
প্রভুর দয়া না হরে দিয়া রস অনাথেরে
তুমি প্রভু পরম কারণ। (ধুয়া)
ভুলিয়া সংসার পাশে বন্দী হৈল মায়া ফাঁসে
না ভজিলু তোমার চরণে॥
এবে ত্রিজগত সাঞি তুমি বিনে গতি নাই
তরাও আপনা নাম গুণে।

বিদ্যাপতির মাধবের প্রতি সেই আকুতি 'তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি' বা 'জগতারণভার তোহারা'-র অনুষঙ্গ ওপরের গানটির শেষ দু' পংক্তিতে অনুভূত হয়।

চিতোর আগমন খণ্ডে নাগমতির বিরহবেদনার অবসানে বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবোল্লাস পর্যায়ের ঢঙে যে গানটি আছে তাতে বিদ্যাপতির পদটির প্রভাব লক্ষণীয়।

কি কহব রে সখী আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥

আলাওলের গানটির ভাষা এরকম :

আজি সুখের নাহি ওর
আনন্দে মন বিভোর।
চির পতি আশে চিত্তের মানসে
নাগর সদনে মোর॥ ধুয়া।
সুধা রসময় নিধি
আনি মিলাইল বিধি।
বহুল যতনে দেব আরাধনে
ভেল মনোরথ সিধি॥

সঙ্গীতজ্ঞ কবি আলাওল বৈষ্ণবপদাবলি অনুযায়ী গান লিখলেও গানে ধ্রুবপদ ছাড়াও দিয়েছেন পঞ্চবিভাগ। বিদ্যাপতির পদাবলির ও জয়দেবের গীতগোবিন্দম্-এর ভাব ও সুর মুসলমান কবির প্রিয় ছিল তা পদ্মাবতীর মৌলিক গানগুলি দেখলেই বোঝা যায়। পদ্মাবতীর কাব্যের অনেকগুলি গীতই সধ্রুবা প্রবন্ধ সঙ্গীত। ধ্রুবপদ নিয়ে গানগুলিতে চারটি অথবা পাঁচটি করে স্তবক আছে। প্রথমে একটি উদগ্রাহ স্তবক, অতঃপর মেলাপক, পরে ধ্রুবপদ, অবশেষে আভোগ অথবা অন্তরার পরে আভোগ। আভোগের শেষে ভণিতা। কখনো কখনো ধ্রুবপদ দিয়েই গানের শুরু।

কাব্যসৌন্দর্য—'পদ্মাবতী'র মূল কাব্য পদুমাবতের ভাষা অবধি হিন্দি। অনুবাদেও হিন্দি শব্দের কিছু কিছু ব্যবহার পাওয়া যায়। আলাওল পণ্ডিত কবি তাই তৎসম শব্দ ব্যবহারেও নিপুণ। পদ্মাবতী কাব্যের যাবতীয় পুথি ঢাকা, রাজসাহী ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের, সেজন্য পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণ পদ্ধতির প্রভাব আছে পদ্মাবতীর ভাষায়। কাহিনি কথনে আলাওল পয়ার ছন্দই গ্রহণ করেছেন মঙ্গালকাব্যের ধাঁচে। তানপ্রধান ছন্দের ত্রিপদী ব্যবহার করেছেন কাব্যে। গুরু ত্রিপদী ও লঘু ত্রিপদী ছন্দে সমৃদ্ধ 'পদ্মাবতী'।

'পদ্মাবতী' কাব্যের পদগীতের ছন্দ বৈচিত্র্যপূর্ণ। সংস্কৃত ছন্দের মধ্যে ভূজঙ্গাপ্রয়াতের ব্যবহার লক্ষণীয়। মালিনী ছন্দে নাগমতির বিলাপ রচিত হয়েছে ভাটিয়ালি রাগে। ধ্বনিপ্রধান ছন্দের মধ্যে গুরুত্ব পেয়েছে ছয় মাত্রার চাল। বাংলা ও ব্রজবুলি দু'জাতীয় পদেই ছয়মাত্রার ধ্বনিপ্রধান ছন্দের বিন্যাস বৈষ্ণবপদাবলি প্রভাবিত।

আলাওলের শব্দভাণ্ডারে জায়সীর হিন্দি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে যথেচ্ছভাবে যেমন—আনট (পদাঙ্গুরীয়), আরগুজা (গন্ধদ্রব্য), উতারিয়া (খোলা), কিলকিলা (সমুদ্রের নাম), খুম্ভী (কর্ণাভরণ), খোটিলা (কর্ণালঙ্কার), গারুড়ী (ওঝা), ঘোঁঘট (ওড়না, ঘোমটা), পাওরি (খড়ম), মাঙ্গা, ধৌরাহর (রাজাপ্রসাদ), বহির (বধির), বসিঠ (দূত), মনোরা ঝুমকা (হোলিগীত)।

আরবি-ফারসির ব্যবহার পাঠ্যাংশে কম। সমগ্র পদ্মাবতীতেই আরবি-ফারসি শব্দের সীমিত প্রয়োগ আছে। তৎসম শব্দের প্রাচুর্য দেখে মনে হয় আলাওল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। তৎসম শব্দপূর্ণ বাক্য—

(১) বিচিত্র কোমল শয্যা অতি সুনির্মল।

(২) নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ সাঙ্গা করিল রাজন।

(৩) পাদ্য অর্ঘ্য আচমন বস্ত্র অলঙ্কার।

(৪) নৃপ নিমন্ত্রণ ভক্ষি হৈল জন্ম সুখী।

(৫) গলিত কুন্তলভার স্খলিত বসন।

(৬) বিচিত্র বসন অঙ্গে চন্দন চর্চিত।

(৭) মৃদুমন্দ ললিত অধর মধুহাসে।

আরবি-ফারসি শব্দ—আর্জি, কেচ্ছা, ইনাম, ছালাম, উমরা।

সেকালে প্রচলিত বাগ্‌ধারা শব্দগুচ্ছ ঃ অনুশোচে, অন্তস্পট, যুয়ায়, টুঙ্গী, তেকারণে, তেনমতে, মোহশ্চিত, হাঙ্কারিলা।

ভারতচন্দ্রের যেমন কতকগুলি বাগধারা নৈতিক প্রবচন রূপে পরিগণিত, আলাওলেরও নীতিউপদেশমূলক সুভাষিত বাক্য আছে পাঠ্যাংশে :

(১) স্বামী কৃপা হোন্তে নারী দুই জগ তরে।

(২) পতি বিনে সতীর জীবনে কোন কাজ।

(৩) সর্বমত দোষের ভাজন স্ত্রীয়া জাতি।

(৪) গুরুবারে সিদ্ধি নাই গমন দক্ষিণ।

(৫) স্বামী সে সংসার সুখ ধন্দ আর সব।

(৬) দান না থাকিলে সত্যে কিবা ফল পায়।

(৭) নির্ধনীরে পুত্র দারা না করে আদর।

(৮) সৎকর্ম না করি সঞ্চিত অতি পাপ।

এইসব বাগ্‌ধারার মধ্যে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও নীতিকথার ছাপ আছে। রামায়ণের অনুষঙ্গ পাঠ্যাংশে আছে :

(ক) ভাই হোন্তে শত্রু আর নাহি ত্রিভুবন।
ঘর ভেদে লঙ্কা নষ্ট মৈল রাবণ॥ (র-সেন বিদায় খণ্ড পৃ: ২২৪)

আঞ্চলিক উপভাষার লক্ষণ :

(১) **অপিনিহিত** সত্য > সৈত্য, ততক্ষণ > তৈতক্ষণ।

(২) যোগী > জুগী (ওকারের উ-কার প্রবণতা)। পবন > পোবন (অকারের ও-কার প্রবণতা)।

(৩) মহাপ্রাণ ধ্বনির অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে রূপান্তর : ভিখারি > ভিকারি, পন্থ > পন্ত।

(৪) পাঠ্যাংশে সর্বনামের একবচনের ক্ষেত্রে মোকে, মোরে, মোহক, মোহকের প্রয়োগ দেখা যায়।

(৫) অনুসর্গের ক্ষেত্রে 'হন্তে' বা 'হোন্তে' হতে বা থেকে অর্থে প্রায়ই ব্যবহৃত।

(৬) সাধারণ বর্তমানকালের ক্ষেত্রে অয় বিভক্তির প্রয়োগ—আছয়, পুছয়।

(৭) ক্রিয়াপদের সংস্কৃতের অনুরূপ সি বিভক্তির ব্যবহার মধ্যবাংলার সাধারণ বৈশিষ্ট্য : বুঝসি, শুনাওসি।

(৮) ভবিষ্যৎকালের অনুজ্ঞায় মধ্যমপুরুষের ক্ষেত্রে—করহ, মরহ, ধরহ।

(৯) ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়াপদে বঙ্গালী ভাষার গুরুত্ব—দিমু, জামু, কহিমু।

(১০) পাঠ্যাংশে ক্রিয়াবিশেষ্যর প্রয়োগ—পিন্ধন, মাগন। নামধাতুর ব্যবহার : আরোপিল, করাইল, বাখানিল।

ছন্দ : আলাওলের 'পদ্মাবতী' পাঁচালি জাতীয় রচনা। আলাওলের মতে তিনি 'সরস পয়ার'-এর রচয়িতা :

পূর্ণঘট কদলী স্থাপিলা দ্বারে দ্বারে। ৮ + ৬
নৃত্য গীত আনন্দ বাজায় পুণ্য দেশ॥ ৮ + ৬

(র-সেন-পদ্মাবতী বিবাহ খণ্ড পৃ: ১৬৭)

পদগীতে তানপ্রধান, ধ্বনিপ্রধান, ছন্দের ব্যবহার চোখে পড়ে ছন্দশাস্ত্রে আলাওলের বুৎপত্তি ছিল। প্রাকৃতপৈঙ্গালের কবির পরিচয় ছিল নিবিড়। একটি পদগীতে রয়েছে সংস্কৃত ভুজঙ্গাপ্রয়াত ছন্দ :

সতী সত্য ছাড়ে অতি পাপ বাড়ে
পতি প্রতি ঠারে গতি লঙ্কাগারে।

বাংলা ও ব্রজবুলি দু'জাতীয় পদেই ছয়মাত্রার ধ্বনিপ্রধান ছন্দের বিন্যাস লক্ষণীয় :

সুধা রসময় নিধি
আনি মিলাইল বিধি।
বহুল যতনে দেব আরাধনে
ভেল মনোরথ সিধি। (চিতোর আগমন খণ্ড পৃ: ২৬০)

চার + চার + আট মাত্রার ধ্বনিপ্রধান ছন্দের নিদর্শন :

তুয়া পদ হেরইতে রাতুল নয়নযুগ
কামিনীমোহন কটাখহীন ভেল।
প্রেমামোদে বিহ্বল সতত বহয় লোর
অবয়ব পরিহরি শুদ্ধি বুদ্ধি গেল॥ (পদ্মাবতী-র-সেন ভেঁটখণ্ড পৃ: ১৯২)

তানপ্রধান ছন্দের মধ্যে লঘুচালের লঘু ত্রিপদী ছন্দটি আলাওলের একাধিক পদগানে পাওয়া যায়। র-সেন পদ্মাবতী বিবাহ খণ্ডের অন্তর্গত বসন্তরাগের পদটি :

কেশ কুরাইয়া কুসুমে রচিয়া
গুন্থিল ত্রিগুণ বেণী।
পাটের থোপন কনক বন্ধন
বিরাজিত র-মণি॥ (র-সেন-পদ্মাবতী বিবাহ খণ্ড)

আলাওলের পদ্মাবতীতে বর্ণনাত্মক পয়ার, গীতাত্মক লাচাড়ি এবং সঙ্গীতময় পদরীতির প্রয়োগে আলাওলের ছন্দ বৈচিত্র্যময়।

অলঙ্কার : উৎপ্রেক্ষা ও উপমা অলঙ্কারে কখনো বা অনুপ্রাসের ছটায় 'পদ্মাবতী' পূর্ণ। পদ্মাবতী-র-সেন ভেঁট খণ্ডে র-সেন যখন বাসরশয্যায় আসীন তখন তাঁর সৌন্দর্য ঃ

অতি সুনির্মল যেন দর্পণের কায়া।
একদিগে মূর্তি দেখি আর দিগে ছায়া॥
তাতে শশী অপ্সরা বেষ্টিত সখীগণ।
যোগ-সিদ্ধি ফলে পাইল অমরা ভবন॥
* * * * *
সেই শয্যা উপরে বসিলা র-সেন।
অপ্সরা বেষ্টিত ইন্দ্র স্বর্গরাজ যেন॥

সখী বেষ্টিত র-সেনকে যেন অপ্সরা সুশোভিত ইন্দ্রের মতোই দেখাচ্ছে। বাচ্যোৎপ্রেক্ষার এই উদাহরণটি গতানুগতিক হলেও পরিবেশসম্মত।

বিবাহের বাসরসজ্জার শেষে পদ্মাবতীর রূপটির উপমা সংস্কৃত সাহিত্যের মতো হলেও নায়িকার মনস্তত্ত্বের বর্ণনায় সুন্দর :

পতি-রতি-শ্রমে সতী গতি অতি মন্দ।
বিধুন্তুদ দলনে নীরস যেন চান্দ॥ (র-সেন-পদ্মাবতী ভেঁটখণ্ড)

রতিশ্রান্ত পদ্মাবতী যেন গ্রহণগ্রস্ত চাঁদ। উপমাটি জায়সী থেকে গৃহীত। আলাওল বাংলাদেশের কবি তাই তাঁর অলঙ্কারে শ্রীকৃষ্ণের অনুষঙ্গ এসে যায় :

সুচরিতা সখীগণ পরম সুন্দরী।
সতত করন্ত সেবা নানা বেশ ধরি॥
* * * *
যেন রাসমণ্ডলে গোপিনী পীতবাসে।
ষট্ঋতু নানাসুখে ভুঞ্জে নানারসে॥

সখীরা মণ্ডলী আকারে র-সেনের সঙ্গে বসন্ত নৃত্যগীতে মশগুল দেখে মনে হয় যেন কৃষ্ণ গোপিনীদের সঙ্গে নৃত্য উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের এই বাঙালিয়ানা পাঠকদের কাছে মনোজ্ঞ।

র-সেন যখন তাঁর শ্বশুরগৃহ থেকে বিদায় নিচ্ছেন তখন তাঁর সংলাপে আছে অনুপ্রাসের ধ্বনিঝঙ্কার :

ভিখারী যোগীকে তুমি করিলা নৃপতি ॥
তোমা পদে জন্মে জন্মে রহুক ভকতি।

৩ অক্ষরের অত্যানুপ্রাস, ন্ম-এর দুবার অনুরণন সব মিলিয়ে বৃত্ত্যানুপ্রসারে সৌন্দর্য ভারতচন্দ্রের মতো না হলেও যথাযথ বলেই মনে হয় অন্তত মধ্যযুগের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত কবি হিসেবে অলঙ্কার প্রয়োগে আলাওল সফল।

চিত্রকল্প ঃ চিত্রকল্প সম্পর্কে এজরা পাউণ্ড মন্তব্য করেছে : 'An image is that which presents and intellectual and emotoinal complex in an instant of time'— 'পদ্মাবতী'র পাঠ্যাংশের চিত্রকল্পে মনন, ভাবাবেগ ও মুহূর্তের মেলবন্ধন ঘটেছে—যা এক কথায় মধ্যযুগের বৈষ্ণবপদাবলিকাররা ছাড়া অন্য কবিদের কাব্যে ফুটেছে কম। পদ্মাবতী-র-সেন ভেঁটখণ্ডের একটি চিত্রকল্প :

(১) হীরার ইটাল সব কর্পূর যতন।
চন্দনের স্তম্ভ সব জড়িত রতন ॥
গজমুক্তা দহিলা লাগাইলা তার চুন।
বিশ্বকর্মা সহিতে না পারে কার্যগুণ ॥

দ্বিতীয় চিত্রকল্পটি ত্রিপদী ছন্দে লেখা র-সেনের বরবেশের ছবি :

(২) মস্তকে কিরিট শোভে দেখি সুরপতি লোভে
জলদ উপরে যেন ভানু ॥
চন্দন শোভএ ভালে মুক্তালোর তাহে দোলে
তারকা বেষ্টিত শশধর
রতনকুণ্ডল কানে তরুণ অরুণ জিনে
বালক অরুণ নেত্রাধর ॥
বয়ানে ললাটে ফোঁটা জিনিয়া চন্দ্রিমা ছটা
কুণ্ডল অধর সুনয়ন।
চন্দ্রার্ক মণ্ডলী দেখি রাহু বলহীন লখি
রহে সুর মুকুট শরণ ॥

এই চিত্রকল্পে বর্ণ, মনন, ভাষাচাতুর্য সবকিছুই আলাওলের পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক।

উপসংহার—আলাওল স্বভাবকবিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। রাজসভায় কবি হিসেবে তিনি পরিশ্রমসিদ্ধ কবিত্বে আস্থাশীল। মুসলমান কবিদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বড়ো scholar poet. এ সম্পর্কে ডঃ শহীদুল্লাহ তাঁর পদ্মাবতী কাব্যের ভূমিকায় লিখেছেন, 'বাস্তবিক তাঁহার সমান পণ্ডিত কবি সে যুগে আর কেহই ছিলেন না।'

র-সেন বিদায় খণ্ডের তাৎপর্য : বাংলাদেশের বিবাহের পর কন্যা-বিদায়ের দিনটি সর্বাপেক্ষা বেদনাবিধুর। কন্যাসন্তান পরের ঘরে যাবার জন্যই সৃষ্ট—এই ঐতিহ্যবাহী ধারণা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। পিতৃগৃহ থেকে শ্বশুরালয়ে যাবার সময় নববিবাহিতা তরুণী কন্যার মনে থাকে শঙ্কা। পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী পরিবেশে যেতে হয় নববধূকে কাজেই কন্যাও বিলাপ করে বাবা মায়ের কাছে। বাবা জামাতাকে পুত্রসম জ্ঞান করে উপদেশ দেন—যাতে বধূর দাম্পত্যজীবন সুখের হয়।

কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে 'শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা'-র দৃশ্যটিতে কণ্বমুনি শকুন্তলাকে যে বিদায় উপদেশ দিয়েছিলেন তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায় র-সেন বিদায়খণ্ডে। আশীর্বাদ করে গন্ধর্বসেন জানিয়েছেন :

তুমি হেন জামাতা পাইল ভাগ্যবলে।
নয়নের জ্যোতি মোর হইল বৃদ্ধকালে॥ (র-সেন বিদায়খণ্ড)

র-সেন যথোচিত উত্তর দিলেন :

কাঁচ হোন্তে হেম মোরে কৈলা মহামতি।
তরে র- হৈল যদি তুমি দিলা জ্যোতি॥

বিবাহের রীতি অনুযায়ী, দেশাচার মেনে যৌতুকের দ্রব্য দিয়েছেন গন্ধর্বসেন :

'হস্তি ঘোড়া হেম র- বিচিত্র বসন।
কুমকুম কস্তুরী আদি আগর চন্দন॥
সুচারু চামর জরকসি (জরির) নানা বস্ত্র।
খণ্ডা শেল ধনুর্বাণ আদি নানা অস্ত্র॥
সখী দুই সহস্র সুন্দরী কলাবতী।
শিশুকাল হোন্তে যার সঙ্গে প্রেম অতি॥ (র-সেন বিদায়খণ্ড পৃ: ২২৪)

পদ্মাবতীর যাত্রার দিনে সখিদের গলা ধরে অশ্রুপাত করে বললেন :

সকল ছাড়িয়া আমি যাইমু একেলা॥
ছাড়িল মা বাপ ঘর বান্ধব সমাজ।
একেশ্বরী হইয়া চলিল ভিন্ন রাজ॥
তোমরা সবেরে কোন মতে পাশরিমু।
স্মরণ হইলে মাত্র জ্বলিয়া মরিমু॥

মা, বাবা, বন্ধু ও স্বজনবর্গের স্মরণ করলেই স্বামীগৃহে পদ্মাবতীর হৃদয় তাদের জন্য ব্যাকুল হয়ে দুঃখে দগ্ধ হবে। যাবার আগে উদার পদ্মাবতী সবাইকে ক্ষমা করে যেতে চান, কারণ তখনকার দিনে স্বামীগৃহে দূর দেশে গেলে মেয়েরা আর সহজে পিতৃগৃহে ফিরতে পারত না। মা বাবার সঙ্গে কথা বলার জন্য পদ্মাবতী এলেন তাঁদের ঘরে :

বিনয় করিয়া কান্দে অতি উচ্চৈঃস্বরে॥
মুঞি অনাথিনীরে কি লাগি হেন কৈলা।
প্রথমে পালন করি পশ্চাতে মারিলা॥

মূলের চেয়ে অনুবাদে পদ্মাবতীর—'র-সেন বিদায়' খণ্ডটি অনেক বেশি পারিবারিক। সেকাল কেন একালেও মেয়েরা শাশুড়ী ও ননদের সঙ্গে সম্পর্কের কথা চিন্তা করে ভীত হয় কারণ বিবাহিতা রমণী পরের অধীন। সেকালে সতীন সমস্যাও ছিল তীব্র তাই পদ্মাবতী 'দুর্জন সতিনী'-র সঙ্গে কীভাবে বাস করবেন নির্বান্ধব হয়ে একাকিনী :

দুঃখের সমুদ্রে মাগো পেলিলা আমারে।
মনোদুঃখ কহি হেন নাহি সংসারে॥

স্বামীর দেশযাত্রার প্রাক্কালে যুগপৎ আশা ও আশঙ্কায় পদ্মাবতীর মন কেঁপে উঠছে—যা বাংলাদেশের আবহমান কালের চিত্র।

স্বামীর সঙ্গে পদ্মাবতীর সম্পর্ক পদ্মাবতীর মা অনেক হিতকর বাক্যই বলেছেন তার মধ্যে দুটি উদ্ধৃতি তুলে ধরা হল :

(১) স্বামী দয়া করে হেন গর্ব না করিও।
অহর্নিশি ভক্তিভাবে স্বামীকে সেবিও॥

(২) পিরিতি গৌরবে পরিজন সম্ভাসিও॥
স্বামীর আদেশে যদি হইল চলিতে।
য- করি কেহ তারে না পারে রাখিতে। ('র-সেন বিদায়খণ্ড' পৃ: ২৩০)

নরপতি গন্ধর্বসেন র-সেনকে বলছেন চিরকালীন পিতার দুঃখের কথা :

(১) সোঁপিল পরাণী আমি হস্তেত তোমার॥
চক্ষের পোতলি মোর এই কন্যাখানি।
ধনপ্রাণগৃহবাস তাহার নিছনি॥

(২) কেহ নাহি দোসর নিকটে বাপ ভাই।
মনোদুঃখ পাইলে কহিতে তার ঠাঁই॥

(৩) ক্ষুধাতুর হৈলে অন্ন কাহাতে মাগিব।
মা বাপ বলিয়া আর কাহাকে ডাকিব॥

ঐরাবতে চড়ে নৃপতি র-সেন ও চতুর্দোলায় আরোহণ করে পদ্মাবতী তার উদ্যানবৃক্ষ, ক্রীড়াস্থলী, সরোবর ও নৃত্যশালা পরিক্রম করে সখীদের ও দাসদাসীদের নিয়ে ধনর-সহ নৌকাযাত্রা। এ যেন গ্রামপরিক্রমার শেষে পল্লীর কন্যার পতিগৃহে যাত্রা। মেয়ে চলে যাচ্ছে দূর দেশে স্বামীর ঘরে :

একে একে সঙ্গে চলে বিশ ত্রিশ সখি।
নানান বাহনে যায় অশ্রুপূর্ণ আঁখি॥
আর দাসীগণ যত পদগতি চলে।
দেশ পরিপূর্ণ হৈল কান্দনার রোলে॥ (র-সেন বিদায়খণ্ড পৃ: ২৩২)

অন্তঃপুরেও কান্নার রোল উঠল। শাক্তসাহিত্য প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে একান্নবর্তী পরিবারে সকলকেই য- রক্ষা করি আমরা। শুধুমাত্র 'কন্যাকেই ফেলিয়া দিতে হয়।' বিবাহ ও শ্বশুরগৃহযাত্রার দৃশ্যটি আলাওলের কাব্যে মর্মস্পর্শী ও বাঙালিসমাজেরই চিরন্তন প্রতিচ্ছবি। আলাওল কাব্য রচনা করলেও সমাজ, সংসার ও পরিবারধর্ম বিস্মৃত হননি। সেজন্য র-সেন বিদায়খণ্ড অংশটি পদ্মাবতী কাব্যের তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়।

জায়সীর 'পদুমাবতে'র মূল গ্রন্থের সঙ্গে 'র-সেনের বিবাহ' খণ্ড—'র-সেনে'র দেশে প্রত্যাবর্তন (চিতোর আগমন অংশ) পর্যন্ত অংশের অনুবাদের তুলনামূলক আলোচনা :

মূল কাব্য 'পদুমাবত্' আর অনূদিত কাব্য 'পদ্মাবতী'র মধ্যে মিল ও অমিল দুইই আছে। মূলের ভাব ও রস সবসময় অনুবাদে পাওয়া যায় না। মূলানুগ অনুবাদ যথাযথ হলেও পাঠক ভিন্নদেশ ও সমাজের কাহিনি সম্পর্কে সব সময় গ্রহিষ্ণু নয়। জায়সীর 'পদুমাবত্' উত্তরপ্রদেশের হিন্দি কাব্য। বঙ্গীয় কবি আলাওল ভাবানুবাদ করেছেন খানিকটা কৃত্তিবাসের রামায়ণের মতো করে। বাল্মীকির রামায়ণের মহাকাব্যিক শৌর্য কৃত্তিবাসের রামায়ণের নেই। কৃত্তিবাসের রামপাঞ্চালি একান্তভাবেই বাঙালির ঘরের কথায় পূর্ণ। আলাওলের কাব্যেও অনুবাদ উত্তরপ্রদেশের কবি জায়সীর মূলানুসারী নয় তবে মূল ঘটনা প্রায় একই ধরনের আলাওল বঙ্গীয়

দেশাচারকে প্রাধান্য দিয়েছেন আর জায়সীর 'পদুমাবত' অনেকটাই সুফিসাধনার কাব্যরসে পূর্ণ। এজন্যই বোধ হয় একটা প্রচলিত কথা : 'A translator is a traitor'। তবু অনুবাদের মধ্য দিয়েই মধ্যযুগে ভাগবত, রামায়ণ ও মহাভারত পৌঁছেছে বাঙালির গৃহে। রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের স্বাদ পেয়েছে বাঙালি হিন্দি ও ফার্সি প্রণয়োপাখ্যানের অনুবাদের মাধ্যমে। সেদিক দিয়ে আলাওলের পদুমাবতের অনুবাদ বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিক মঙ্গালকাব্যধারার মধ্যে একটি ব্যতিক্রমী সংযোজন।

জায়সীর কাব্যের মূলানুগ অনুবাদ করেননি আলাওল। তাঁর অনুবাদ কখনো আক্ষরিক কখনো ভাবানুবাদ কখনো বা স্বাধীন। কোনো কোনো প্রসঙ্গ আলাওল ছেঁটে ছোটো করেছেন বা কোনো কোনো প্রসঙ্গ টেনে বাড়িয়েছেন। কাহিনির উপক্রমেই আলাওল লিখেছেন : 'স্থানে স্থানে প্রকাশিমু নিজ মন-উক্তি।'

জায়সীর গভীর তত্ত্ব আলাওল এড়িয়ে গেছেন কোনো কোনো অংশে। বিবাহের পর পদ্মাবতীকে লুকিয়ে রেখে সখীরা র-সেনের সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা করছেন—সেই বর্ণনায় সুফিসাধক জায়সী সখীদের সংলাপে দিয়েছেন নতুন দার্শনিক ভাষা :

পুঁছহিঁ গুরু কহঁ, রে চলা।
বিনু সসিয়র কস সুর একেলা॥
ধাতু কমাই সিখেসি রে যোগী।
অব কম অস নিরধাতু বিয়োগী॥

অনুবাদ : '(শ্রী অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়) "হে শিষ্য তোমার গুরু কোথায় ? শশী বিনা সূর্য কি করে একা থাকে ? হে যোগি, তুমি রসায়নবিদ্যা শিখিয়াছ তাই নির্ধাতু হইয়া তুমি কী করিয়া আছ ?"

এই গূঢ় অর্থবহ শ্লোকের অনুবাদ আলাওল দু'কথায় সেরেছেন :

সখীগণ নৃপতিকে দেখি হেন রীত।
জিজ্ঞাসিল মৃদু বাক্যে হাসিয়া কিঞ্চিৎ॥
কহ শিষ্যবর তোর গুরু গেল কোথা।
চন্দ্র বিনে সূর একেশ্বর কেন হেথা॥
কেবা কোথা লুকাইল চন্দ্রিকা তোমার।
যেই বিনে রমণী জগৎ অন্ধকার॥

পদ্মাবতীকে বিবাহ করে শ্বশুরালয়ে কিছুকাল কাটিয়ে র-সেন সস্ত্রীক চিতোর প্রত্যাবর্তন করবেন, যাত্রার পূর্বে সখীগণের কাছে পদ্মাবতী বিদায় নিচ্ছেন। জায়সী পদ্মাবতীর এই বিদায়পালা সাঙ্গ করেছেন সংক্ষেপে—তাতে বিয়োগব্যাথার বেদনার স্পন্দন নেই :

হম তুম মিলি একৈ সংগ খেলা
অন্ত বিচ্ছাহ আনি গিউ মেলা।
তুম্হ অস হিত সংযতী পিয়ারী
জিয়ত জীউ নহি কঁরো নিনারী
কন্ত চলাঈ কা করৌ আয়সু, জাই ন মেটি
পুনিহম মিলাহঁ কি না মিলাইঁ লেহু সহেলী ভোঁটি॥

আলাওলের বর্ণনা এখানে অনেক বেশি বাস্তব ও আন্তরিক :

একে একে গলে ধরি কান্দে বরবালা
সকল ছাড়িয়া আমি যাইব একেলা।

ছাড়িয়া নাইয়ব ঘর বান্ধবসমাজ
একসরী হইয়া চলিলোঁ ভিন্ন রাজ
তোমরা সবেরে কোনমতে পাসরিব
স্মরণ হইলে মনে জ্বলিয়া মরিব।
শুন প্রাণসখী আমি চলি যাব যথা
তথা গেলে পুনি ফিরি না আসিব এথা। (র-সেন বিদায়খণ্ড)

মূল কাব্য 'পদুমাবতে'র বর্ণনায় জায়সী ভাবাশ্রয়ী ও বিশ্লেষণমুখী। আলাওলের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত ও বস্তুনিষ্ঠ। র-সেনের হাতে কন্যা সমর্পণ করে গন্ধর্ব সেন বলেন :

মানুষ চিত আনু কিছু কোঈ।
করৈ গোসাঞি সোই পৈ হোই॥
অব তুমহ সিংহল দ্বীপ গোসাই।
হম সেবক অহহী সেবকাঈ॥

অর্থাৎ "মানুষের মনে অন্য কিছু ইচ্ছা হয়ত জাগে কিন্তু ভগবান আপন ইচ্ছামতই সবকিছু করেন। আপনি এখন সিংহল দ্বীপের রাজা এবং আমরা সবাই আপনার আজ্ঞাবহ সেবক।" (অনুবাদ : ওয়াকিল আহমদ)

সজল নয়ানে রাজা কন্যা সমর্পিল।
বলে মোর প্রাণ আজু তোমা হস্তে দিল॥
আর জানাইল কিছু কহিতে উচিত।
ক্ষমাশীল জানে তুমি আপনে পণ্ডিত॥
কহিতে অনেক কথা কি কহিব তারে।
স্বামী কৃপা হোন্তে নারী দুই জগ তরে॥

জায়সীর মাসপরিমণ্ডলে ধ্যান ও সাধনা ছিল। তিনি আধ্যা-িক অনুপ্রেরণার বাণীসহ। জায়সীর কাব্যের রূপকতত্ত্ব ভালোই বুঝতেন কিন্তু অনুবাদে সেই তত্ত্ব রক্ষা করতে সক্ষম হননি। হয়তো রাজসভার বিলাসী, ধনাঢ্য রঙ্গপ্রিয় পাঠকেরা গল্পের আনন্দ চেয়েছিলেন, তত্ত্বের গরিমায় তারা মুগ্ধ হননি। আলাওল তাই গ্রহণ ও বর্জনের মাধ্যমে পাঠকের মানসিক সে-চাহিদা পূরণ করেছেন।

জায়সীর 'পদুমাবত' কাব্যে খণ্ডবিভাগ নেই। জায়সীর কাব্যের ৫৮টি খণ্ডের মধ্যে অন্তত ৫৩টি খণ্ড আলাওলের কাব্যে আছে। র-সেনের বিবাহ বর্ণনায় জায়সীর তুলনায় আলাওল অনেক বিস্তৃত করেছেন আলোচনা। জায়সী চন্দ্র সূর্যের প্রতীকে আধ্যাত্মিক মনোমিলনের রূপক করে তুলেছেন। কিন্তু আলাওল মূলের এই রূপকার্থ গ্রহণ করেননি। সমস্ত অধ্যায়টি আলাওলের কাব্যে যথাসম্ভব লৌকিক বাস্তব এবং হিন্দুবিবাহের সামাজিক আলেখ্য। বঙ্গীয় বিবাহরীতির বিস্তৃত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সহ আলাওলের বিবাহখণ্ডটি সম্পূর্ণ নতুন সংস্করণ। জায়সীর কাব্যে র-সেনের মুখে ভাবাবেগপূর্ণ তত্ত্বধর্মী সংলাপ বর্জন করেছেন আলাওল।

পদ্মাবতী-র-সেন ভেঁট খণ্ডে জায়সী দ্ব্যর্থবোধক শব্দশ্লেষের সাহায্যে বরবধূর শারীরিক মিলনের রূপকে যে সুফি-সাধনার কথা বলেছেন আলাওলের কাব্যে তা কামশাস্ত্রে রূপান্তরিত। র-সেন-সাথী খণ্ডে র-সেনের অনুচরদের সঙ্গে পদ্মাবতীর বিবাহ প্রসঙ্গে মূলে কৌলীন্য বিচার হয়নি। অনুবাদে কুলমর্যাদা রক্ষা করেই বিবাহ হয়েছে। জায়সীর তুলনায় আলাওল বাস্তব ও সাংসারিক।

ষট্ ঋতু বর্ণনায় আলাওল অনুসরণ করেছেন জায়সীকে। তবে জায়সী হেমন্ত ঋতুর পর শীত ঋতুর বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আলাওল আগে শিশির ঋতুর বর্ণনা করে বাংলার ঋতুচক্রকেই অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন। আলাওল সঙ্গীতশাস্ত্রে পারঙ্গম। বসন্ত বর্ণনার শেষে বসন্তরাগে নায়ক-নায়িকার বসন্তবিলাসের পদ গাওয়ার ব্যাপারটি আলাওলের মৌলিক সংযোজন। শুক পাখি হীরামণির যোগমৃত্যু আলাওলের রূপকথাধর্মী রোমান্টিক মনের পরিচায়ক। জায়সী কিন্তু গন্ধর্বসেনের কাছে র-সেনের পরিচয় উদ্‌ঘাটন করিয়েই শুককে জানিয়েছেন বিদায়। মূলে হীরামন রূপক চরিত্র, অনুবাদে তা হয়েছে রূপকথার বিহঙ্গ।

নাগমতির বারামাসী বর্ণনায় আলাওল মঙ্গালকাব্যের রীতির অনুসারী। জায়সীর কাব্যের এই অংশে প্রকৃতি ও মানবমনের বেদনা হয়েছে একাত্ম। আলাওলের অনুবাদে সেই তুলনায় নিষ্প্রভ।

'নাগমতি সন্দেশ' খণ্ডে মূলের রোমান্টিকতা অনুবাদে নেই। জায়সীর ভাষায় মূর্ত বিরহিনীর বেদনা। ঘটনাবৃত্তের মধ্যেও মূল ও অনুবাদের পার্থক্য অপরিসীম। জায়সীর নাগমতি একটি পাখিকে নিযুক্ত করেছেন র-সেনকে তার বিরহবেদনা নিবেদনের জন্য। জায়সী র-সেনের অনুপস্থিতিতে চিতোরের দুরবস্থা, র-সেনের মাতার করুণ শোকাবহ পরিণতি ও নাগমতির রোমান্টিক বিষাদ বেদনার ছবিকে ফুটিয়েছেন কাব্যকৌশলে। অনুবাদে এই বর্ণনা সংক্ষিপ্ত। আলাওলের কাব্যে এক রাতজাগা পাখি র-সেনকে অনুযোগ করেছেন। শ্বশুরঘরে ঘরজামাই হয়ে থাকার লজ্জার কথাও বলা হয়েছে। জায়সী রোমান্টিক, আলাওল সামাজিক। র-সেন বিদায়খণ্ডে আলাওল জায়সীর পদুমাবতের অনুসরণে পদ্মাবতীর সিংহল বিদায় দৃশ্যের বর্ণনা করলেও আলাওলের কাব্যে পদ্মাবতীর পতিগৃহযাত্রা বঙ্গীয় বিবাহসংস্কৃতিরই অঙ্গ। অনুবাদে বিদায়কালে পদ্মাবতীর উদ্দেশ্যে রাজমাতার বিস্তারিত উপদেশবাণী নৈতিক কিন্তু কাব্যময় নয়। র-সেনের কাছে কন্যাকে অর্পণ করার পর রাজার সাংসারিক উপদেশও মূলে নেই।

দেশযাত্রা খণ্ডের ঘটনাবলি উভয়ক্ষেত্রেই মোটামুটি এক। জায়সীর কাব্যে র-সেনের কাছে সমুদ্রদেব এসেছেন দানীর ছদ্মবেশে। আলাওলের কাব্যে সমুদ্র আবির্ভূত হয়েছেন ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকের সজ্জায় সজ্জিত হয়ে। মূলে রাজার কার্পণ্যদোষ ও তার জন্য নৌকানিমজ্জন প্রসঙ্গে ঐশ্বর্য ও সঞ্চয়ের নিষ্ফলতা সম্পর্কে প্রচুর দার্শনিক কথা আছে। অনুবাদে দার্শনিক তত্ত্ব অপেক্ষা ঘটনাধর্মী বিবরণই মুখ্য। জায়সীর কাব্যের দোহার সৌন্দর্য আলাওলের ক্ষেত্রে বিবৃতিধর্মী অনুবাদ।

পদ্মা-সমুদ্র খণ্ডটি মূলে ছিল লক্ষ্মী-সমুদ্র খণ্ড। জায়সীর কাব্যে সমুদ্র কন্যার নাম লক্ষ্মী। কিন্তু আলাওলের কাব্যে তাঁরও নাম পদ্মাবতী। পদ্মাবতীর ছদ্মবেশ ধারণ করে তাঁর নামটিও নিয়েছেন সমুদ্রদুহিতা। এব্যাপারে অবশ্য আলাওলের রোমান্টিক চমক সৃষ্টির প্রয়াস প্রশংসনীয়। জায়সী কাব্যে র-সেন সমুদ্রপরীক্ষার পর দেশে ফিরেছেন কতকগুলি রহস্যময় উপহার নিয়ে। এই উপহারগুলি—অমৃত, রাজহংস, স্বর্ণপক্ষ, পাখি, ব্যাঘ্রশাবক ও স্পর্শমণি। পাঁচটি প্রদীপশিখার মতো র- পেয়েছেন র-সেন একথাই বলেছেন সংক্ষেপে আলাওল। জায়সীর মতো বর্ণনা বিস্তৃত নয়।

চিতোর আগমন অংশে দুই কবির বর্ণনায় কিছুটা পার্থক্য আছে। দেশে ফিরে পদ্মাবতীকে নিয়ে র-সেনের বিস্তারিত মাতৃসম্ভাষণ মূল গ্রন্থে নেই। জায়সীর কাব্যে রামচন্দ্র-কৌশল্যা মিলনের অনুষঙ্গ এসেছে। র-সেনের আগমনের কথা শুনে বিরহিনি প্রথমা পত্নী নাগমতীর আনন্দোল্লাস আলাওলের কাব্যে সংক্ষিপ্ত। আলাওলের নাগমতী বিদ্যাপতির ভাবোল্লাসের অনুসারী পদাবলী গেয়েই ব্যক্ত করেছে আনন্দ।

'পদুমাবত্' কাব্যে এর পরবর্তী খণ্ডটি হল নাগমতী-পদ্মাবতী বিবাদখণ্ড। জায়সীর কাব্যে দুই সতীনের বিবাদের বিস্তৃত বিবরণ বাহুল্যবোধে সঙ্গত কারণেই বর্জন করেছেন আলাওল। চিতোর আগমন খণ্ডের শেষে নাগমতী ও পদ্মাবতীর মানভঞ্জন জয়দেবের কাব্যানুসারী। কবি এ অংশে বৈষ্ণবপদাবলির দ্বারাও প্রভাবিত। শেষপর্যন্ত দুই সতীনের সখিত্ব পারিবারিক নৈতিক আদর্শেরই নিদর্শন।

অনুবাদে পরিবর্ধন ও পরিবর্জন থাকলেও জায়সী ও আলাওল সুফি-সাধক। জায়সী অমরপ্রেম ও সৌন্দর্যের রূপকার। আলাওলও লিখতে চেয়েছেন 'প্রেমপুঁথি'। দুজন ভিন্ন পরিবেশে, ভিন্ন দেশে বসে লিখেছেন, সেজন্য দেশগত ও কালগত পরিবেশগত ব্যবধান আছেই। শেষপর্যন্ত স্বীকার করতেই হয় মধ্যযুগের আর কোনো অনুবাদক কবি আলাওলের মতো জায়সীর খণ্ডগুলির প্রত্যেকটি স্তবক অনুবাদে এতখানি প্রয়াস দেখাননি। অনুবাদক হিসেবে আলাওল সার্থক। ভাবানুবাদ ও আদর্শগত পার্থক্য থাকলেও সৈয়দ আলাওলের 'পদ্মাবতী' অন্যতম সার্থক অনুবাদ গ্রন্থ।

৫.৫ র-সেনের বিবাহখণ্ড—চিতোর আগমনখণ্ড অংশের কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বিষয়ের আলোচনা

৫.৫.১ সধুবা প্রবন্ধসঙ্গীত

নরোত্তমের 'ভক্তির-াকরে' সধুবা প্রবন্ধসঙ্গীতের বিবরণ পাওয়া যায় ঃ

প্রবন্ধের ধাতু পঞ্চ শাস্ত্রে এ নির্দ্ধার।
ষড়ঙ্গ প্রবন্ধগীত সর্বত্র প্রচার॥
স্বর বিরুদ্ধ পদ তেন পাঠক তাল।
এই ছয় অঙ্গে গীত পরম রসাল॥ (ভক্তির-াকর—নরহরি চক্রবর্তী)

নরহরির নিজস্ব গানে উদগ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব, অন্তরা, আভোগ—এই পাঁচটি ধাতুযুক্ত প্রবন্ধসঙ্গীত পাওয়া যায়। চৈতন্যসমকালে ও চৈতন্যোত্তর কালেও এই ধরনের গানে আখ্যানকাব্যগুলির পূর্ণ।

আলাওলের রচিত সঙ্গীত—আলাওল ছিলেন সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞ। তাঁর গানে উৎকৃষ্টভাবে বদ্ধ প্রবন্ধসঙ্গীতের উদাহরণ আছে বেশ কয়েকটি বৈষ্ণব পদাবলির ঢঙে রচিত পদে 'পদ্মাবতী' সমৃদ্ধ। কয়েকটি নির্দশ :

(১) **বসন্তরাগ**—বসন্তে নাগর বরনাগরী বিলাসে। (ষট্ঋতুবর্ণন খণ্ড)

(২) **রাগভাটিয়াল দীর্ঘ ছন্দ—**

তোমার কৃপার বলে আপনার পাপ ফলে
মত্ত গর্বে পাছে না চিন্তিলুঁ। (পদ্মা সমুদ্র খণ্ড পৃ: ২৪৮)

(৩) **রাগ-সুহি**—আজি সুখের নাহি ওর (চিতোর-আগমন খণ্ড পৃ: ২৬০)

(৪) **রাগ সমক ছন্দ** 'আছিলা সমস্ত নিশি নাগমতিসঙ্গে' (ঐ পৃ: ২৬১)

(৫) **রাগ চন্দ্রাবলী ছন্দ তুরি বসন্ত—**

কেশ কুরাইয়াকুসুম রচিয়া
গুন্থিলা ত্রিগুণ বেণী॥

(৬) **রাগ কর্ণাট পরিতাল ছন্দ—**

চলিল কামিনী গজেন্দ্র গামিনী
খঞ্জন খঞ্জন শোভিতা।

পাঠ্যাংশের একটি ধ্রুবকপদযুক্ত প্রবন্ধসঙ্গীতের উদাহরণ :

(৭) চলিল কামিনী গজেন্দ্র গামিনী
খঞ্জন গঞ্জন শোভিতা।

কিঙ্কনী ঘুঁঘর বাজয় ঝাঁঝর
ঝনাঝন নেপুর মধুর গীতা॥
ভুরু বিভঙ্গা মণ্মথ-মন-মোহিতা॥ (ধুয়া) **স্থায়ী**
কুটিল কেশ কুসুম সুবেশ
সিন্দুর চন্দন তিলক তথা।
সঘন রাতি তারকা পাঁতি
বান্ধুলি র- বিরাজিতা॥ **অন্তরা**
সুন্দর ভালে ময়ঙ্ক বাল
অধর দশনজ্যোতি প্রভান্বিতা।
রসনা সুলাল বচন রসাল
বিরহ-বেদনা মোহিতা॥ **সঞ্চারি**
উরজ-জোড় হেম কটোর
এহি সে পয়োধর রঞ্জিতা।
মাগন নায়ক গুণক গাহক
জগজন সুখ সুশোভিতা।
আলাওল ভন রমণী গমন
অপ্সরা নট গঞ্জিতা॥ **আভোগ**

এ প্রসঙ্গে বলা যায় পাঁচালি জাতীয় গানে একজন মূল গায়েন ও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকে পালি ও বাদক। মূল গায়েন দাঁড়িয়ে গান করেন।

পদাবলির খণ্ডিতা পর্যায়ের মতো আর একটি গানে সঙ্গীতের পাঁচটি অঙ্গই বর্তমান—

(৮) প্রভাত সময়ে আইলা যথা পদ্মাবতী।
মুখ ফিরাইল কন্যা দেখিয়া নৃপতি॥
সমস্ত রজনী কোথা ছিলা সুখরসে।
প্রাণ বান্ধা থুই এথা আইলা দিবসে॥ **উদগ্রাহ**
স্খালিত পিন্দনবাস গলিত চিকুর।
দেখহ সুন্দর মুখ আনিয়া মুকুর॥
আজি কেনে বিপরীত তোমার বদন।
অধরে আঞ্জন আঁখি খাইয়াছে পান॥ **মেলাপক**
রজনী জাগিয়া দুঃখ পাই অতিশয়।
ঘুমিয়া ঘুমিয়া পড় প্রভাত সময়॥
আপনার পীতবস্ত্র হারাই কোথায়।
কোন রমণীর নীল বাস দিছ গায়॥ **ধ্রুবপদ**
পৃষ্ঠেত কঙ্কণদাগ হারচিহ্ন উরে।
মাজিছ বয়ানচন্দ্র সুরঙ্গা সিন্দুরে॥

চরণে পড়িয়া মানাইতে অতিশয়।
নূপুর আনট চিহ্ন ললাটে উদয়॥ **অন্তরা**
মন শান্ত নাহি হয় প্রাণ থুই তথা।
বেশর উচ্ছিষ্ট অঙ্গা লৈয়া আইলা এথা॥
তথা গিয়া শুতি থাক এথাতে কী কাজ।
সখীগণে এ বেশে দেখিলে পাইবা লাজ॥ **সঞ্চারী**
যথা ইচ্ছা তথা গিয়া থাক সুখরঙ্গে।
আমার পরাণ কেনে লইয়া যাও সঙ্গে॥
এত বুলি নয়ানে গলয়ে জলধার।
মধুর বচনে নৃপে বোলে পরিহার॥ **আভোগ**

(৭নং গান) (৭) প্রথম গানটিতে বর্তমান কালের চারটি মুখ্য দেখানো হয়েছে—স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ।

(৮নং গান) (৮) দ্বিতীয় গানটিতে পঞ্চাঙ্গের প্রবন্ধসঙ্গীত যা মধ্যযুগে গাওয়া হত তার রূপ প্রদর্শিত—উদগ্রাহ, মেলাপক, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ।

ছন্দশাস্ত্রে ও সঙ্গীতশাস্ত্রে বিচক্ষণ কবি আলাওলের মৌলিক সঙ্গীত সংযোজন বিশিষ্টতার পরিচায়ক। আর জায়সীর অনুবাদ করতে গিয়েও পাঁচ অঙ্গের যে প্রবন্ধসঙ্গীত লিখেছেন তাও প্রশংসনীয়।

৫.৫.২ পদ্মা—সমুদ্র খণ্ড অংশটির বৈশিষ্ট্য

আলাওলের রোসাঙ তথা চট্টগ্রাম সমুদ্রবেষ্টিত অঞ্চল। এছাড়া ভারতবর্ষের বণিকরা মধ্যযুগে বাণিজ্য করতেন দূর দেশে। চাঁদ সদাগর, ধনপতি সওদাগর বিশেষ করে শেষের জন সিংহলে যান বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। জলপথে বাণিজ্য করতে এসেছেন ভাস্কো-ডা-গামা থেকে আরম্ভ করে ডাচ পর্যটক তাভারনিয়ের পর্যন্ত। র-সেনের সিংহল থেকে দেশযাত্রার সময় সমুদ্র পেরোতে হয়েছে বণিকদের মতোই।

সমুদ্রদেব জলের অধিপতি—গ্রিক পুরাণে এঁর কথা আছে। আমাদের শাস্ত্রানুযায়ী বরুণদেব জলের দেবতা। সূর্য তাঁর নেত্র, সুবর্ণময় তাঁর রথ ও প্রসাদ। সমুদ্রমন্থনজাত বারুণী তাঁর প্রিয় সুরা। এ জন্য ঋকবেদে আকাশ ও সমুদ্রের মিলন রেখাতেও বরুণের অবস্থিতির কথা বর্ণিত। বরুণ সূর্যের গমন পথ সুগম করেন—তাই তাঁর ভাণ্ডারে শত সহস্র ওষধি আছে। ইনি যমের মতোই পাপ-পুণ্যের বিচারকর্তা। ইনি ধনাধিকার জলবিন্দুর মতো শ্বেতবর্ণ, গৌর মৃগের ন্যায় বলবান।

দেশযাত্রা খণ্ড—দেশযাত্রা খণ্ডেই শ্বশুরগৃহ থেকে র-সেন পেয়েছেন প্রচুর ধনর- যৌতুকস্বরূপ। তাতে চিতোরাধিপতি কিছুটা গর্বিত। সমুদ্র ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে এসে র-সেনকে দানের মহিমা বোঝালেন। এবং সমুদ্রের রোষে র-সেনের ডিঙা ডুবে গেল। একটি কাঠের ভেলায় ভাসতে ভাসতে পদ্মাবতী আর তাঁর সখীরা গেলেন হারিয়ে। কাঠের পাটাতন ধরে র-সেন চললেন নিরুদ্দেশ ভেসে অজানা পথে।

পদ্মা-সমুদ্র খণ্ড—'সিন্ধুতীরে রহিছে মাঞ্জস' অর্থাৎ কাঠের ভেলায় পদ্মাবতী সমুদ্র গৃহে পৌঁছলেন। পুরাণে সমুদ্র কন্যার নাম বারুণী। জায়সীর নাম দিয়েছেন লক্ষ্মী। আর আলাওলের সমুদ্রকন্যার নামও পদ্মাবতী। সেই রমণী পঞ্চমুখী সহ পদ্মাবতীর জীবন রক্ষা করলেন ঃ

চিকিৎসিমু প্রাণপণ কৃপা কর নিরঞ্জন
দুঃখিনীরে করিয়া স্মরণ॥ (পদ্মা-সমুদ্র খণ্ড পৃ: ২৪০)

পদ্মাবতী র-সেন ও তার অনুচরদের হারিয়ে করুণ সুরে বিলাপ করলেন সমুদ্রতনয়ার কাছে। তখন সমুদ্রকন্যা পদ্মাবতী তাঁর পিতা সমুদ্রকে বললেন ঃ

স্বামী না পাইলে বালা মরিব সত্বর।
রহিব তাহার বধ আমার উপর॥ (পদ্মা-সমুদ্র খণ্ড পৃঃ ২৪৬)

তাঁর গর্বের জন্যই র-সেনের এই দুর্দশা জানালেন একথা সমুদ্র তাঁর কন্যাকে। বহু কষ্টে বহু তাপ সহ্য করে নৃপতি র-সেন যে পদ্মাবতীকে অর্জন করেন তাঁর বিহনে তিনি আত্মঘাতী হবার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ।—

দ্বিসহস্র সখী মোর পরম সুন্দরী।
প্রাণের দুর্লভ মোর পদ্মাবতী নারী॥
তিলেক সমুদ্র মাঝে ডুবিল সকল।
একেশ্বর আমার জীবনে কি ফল॥ (পদ্মা-সমুদ্র খণ্ড)

এর পরবর্তী পর্যায়েই সমুদ্র আশ্বাস দিলেন তাঁর প-ী সখীসহ জীবিত। সমুদ্রের সঙ্গে বিরহিণী মৃতপ্রায় পদ্মাবতীকে দেখার জন্য তখন নৃপতি র-সেন সমুদ্রতীরে উপস্থিত। এখানে একটি ছলনার দৃশ্য আছে—যে দৃশ্য পরবর্তী পর্যায়ের মঙ্গালকাব্যে পাবর্তীর মোহিনী বা মরতীবেশধারণ ও শিবকে ছলনা করার দৃশ্যটি মধ্যযুগের কাব্যে সুপরিচিত। মূল পদুমাবতে আছে যে সমুদ্রদুহিতা ছদ্মবেশী পদ্মদুহিতার গায়ে পদ্মগন্ধ ছিল না তাই রাজা র-সেনের মনে সন্দেহ জাগে। এখানে একটু রূপকথাধর্মী আখ্যান আছে আলাওলের কাব্যে :

'আসিতে আমি নহে সেই গতি॥
তথাপিহ ভরমে আইলু তোমার পাশ।
সেই পুষ্প হেন দেখি নহে সেই বাস॥
বচন প্রকাশ মাত্র জানিলু নিশ্চিতে।
পরাঙ্গানা অঙ্গা পরশিমু কোন মতে॥

শেষপর্যন্ত রাজার প্রতীক্ষার শেষ। প-ী পদ্মাবতীকে সখীসহ লাভ করে কৃতজ্ঞ নরপতির বিদায়-ভাষণ :—

(সমুদ্রকন্যা) তুমি মোর ভগ্নী নরপতি মোর পিতা।
মোর দোষ খেমিতে কহিয় সুচরিতা॥
আপনার প্রতিফল পাইলুঁ আপনে।
বুলিয় নৃপতি মোর তুষ্ট হৌক মনে॥ (পদ্মা-সমুদ্র খণ্ড পৃঃ ২৪৩)

এরপর সমুদ্রকন্যার সঙ্গে পদ্মাবতীর বিদায়-আলিঙ্গান পথনির্দেশকরূপে জলচর মনুষ্যদের সহগমন ঘটনা জায়সীর মূল কাব্যেও আছে—আলাওল এ ব্যাপারে মূলানুগ :

'ছয়জনে তুলি দিল জগন্নাথ কূলে'

উড়িষ্যার সমুদ্রতীর থেকেই শুরু হ'ল চিতোর যাত্রা। যে পঞ্চর- পেয়েছিলেন র-সেন তার সাহায্যেই আবার নৃপতি বিত্তশালী হন :

র- বিকাইয়া বহু তঙ্কা কৈল হাত॥
হয় হস্তী কিনিয়া জুড়িল বহু সৈন্য।
দেখিয়া সকল লোকে বোলে ধন্য ধন্য॥
* * * * *
চিতাত্তরে হরিষে আইল নৃপবর।

এখানে সমুদ্রদেব র-সেনের অহঙ্কার নাশ করলেন ও সমুদ্রদুহিতা পদ্মা পদ্মাবতীর ছদ্মবেশ গ্রহণ করে রাজার প্রেমের গভীরতা পরীক্ষায় রত 'প্রেমপুঁথি'র লেখক আলাওলের সুফি-কবিজনোচিত প্রেমের নানাবিধ সংঘাতের বর্ণনা রয়েছে এই পদ্মা-সমুদ্র খণ্ডে।

৫.৫.৩ পদ্মাবতী-র-সেন বিবাহ খণ্ড—চিতোর আগমন খণ্ড পর্যায়ে আলাওলের সুফি ভাবনার প্রকাশ

জায়সী ও আলাওল দুজনেই সুফি-কবি। আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যে সামাজিকতা যতটা বেশি তত্ত্বভাবনা ততটা নেই—তবুও কাব্যের স্থানে স্থানে কবির সুফি-ভাবনা মাঝে মাঝেই প্রকাশিত। জায়সীর মতো ব্যাপক তত্ত্বভাবনার শরিক না হলেও আলাওল মাঝে মাঝেই সুফি-ভাবনায় ভাবিত।

পদুমাবতের রূপক হল এই :

তন চিতউর, মন রাজা কীনহা।
হিয় সিংঘল, বুধি পদমিনি চীনহ॥
গুরু সুআ জেই পংথ দেখাবা।
বিনু গুরু জগত কো নিরঞ্জন পাবা॥
নাগমতী য়হ দুনিয়া ধংধা। (পদুমাবৎ-জায়সী)

অনু : র-সেনের দেহদুর্গ হল চিতোর, মন স্বয়ং র-সেন, হৃদয় তাঁর সিংহল, প্রজ্ঞা হলেন পদ্মাবতী। গুরুই পথ দেখান। গুরু ছাড়া কে নিরঞ্জনকে পাবে ? নাগমতী হল এই দুনিয়ার বাধাসৃষ্টিকারী পার্থিব মানুষের রূপক।

বিবারে মজলিসে পদ্মাবতী ও র-সেনের মালাবদলকে জায়সী রূপকচ্ছলে বলেছেন যে চাঁদের হাতে জয়মালা দেওয়া হয়েছে। চাঁদ সে মালা এনে সূর্যের গলায় পরিয়ে দিচ্ছে। জায়সীর উক্তি :

চাঁদ কি হাথ দিনই জয়মালা।
চাঁদ আনি সূর্য গীয় ঢালা॥

বাঙালির সুখদুঃখপূর্ণ সংসারের আঙিনায় এসে উপস্থিত হয়েছেন কবি আলাওল তাঁর নায়ক-নায়িকারা এতখানি কাব্যময় রূপকে বর্ণিত নন। আলাওলের উক্তি :

পুষ্প বৃষ্টি সম্বরিয়া গিম হস্তে মালা লৈয়া
কন্যাগণে দিলেক রাজন।
পুষ্প হস্তে পুষ্পমালা দুই করে লৈয়া বালা
পতি গলে করিল স্থাপন॥

পদ্মাবতী ভেঁট খণ্ডে পদ্মাবতীর মুখে আলাওল শুনিয়েছেন সুফি-তত্ত্বের বাণী :

যোগী হৈলে অনাহারে থাকে সর্বক্ষণ।
স্বপ্নেও না হেরে যোগী রমণী বদন॥
প্রচণ্ড তপন তেজ যোগীর শরীরে।
সোম সম সিদ্ধি রশ্মি যোগী কলেবরে॥
যোগী ভোগী মিশ্রিত না হয় কদাচিত।
নিশি দিনান্তর দহে হিমাংশু আদিত॥
ছলযোগে ঠগে যোগী টলএ ধনি মন।∗∗∗

সিদ্ধি পদ পাইলে যোগী ভোগী নাহি চিন।
সর্বত্রে আপনা তার কেবা আছে ভিন॥
শিব শক্তি মিলিলে যে সিদিদ্ধ হএ কায়।
শক্তি বিনে শিবশক্তি সব শঙ্কা পায়॥ (র-সেন পদ্মাবতী ভেঁট খণ্ড)

সুফি-সাধক হলেও তন্ত্রাশ্রিত দেহসাধনার তিনটি স্তরের কথা বলেছেন আলাওল। সাধনার তিনটি স্তর—শুদ্ধি, স্থিতি, অর্পণ সাধক প্রথমে ত্যাগ তিতিক্ষার দ্বারা কায়িক ও মানসিক মালিন্য দূর করে শুদ্ধ হয়। দ্বিতীয় স্তরে মোহান্ধকার বিনষ্ট হয়। জ্ঞানালোক বৃদ্ধি পায়। তৃতীয় স্তরে পরম আরাধ্যার সাথে যোগী মিলিত হয়ে একাত্ম হয়। র-সেনের যোগসাধনা এ আদর্শেই নিয়ন্ত্রিত ও রূপায়িত। র-সেন সাধক জীবাত্মা, পদ্মাবতী আরাধ্যা পরমাত্মা।

ষট্ ঋতু বর্ণন খণ্ডে শুক যখন দেহত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত তখন র-সেন বলছেন :

তুমি মোর গুরু হইয়া তত্ত্ব জানাইলা।
ভুবনদুর্লভ র- আনি মিলাইলা॥
প্রাণ দিলে তোমার শুধিতে নারি ধার।
তুমি চলি যাইবা পুরী করি অন্ধকার॥ (ষট্ ঋতু বর্ণন খণ্ড পৃ: ২১০)

সুফির মুর্শিদ আর যোগীর গুরু অভিন্ন ব্যক্তি। গুরু ছাড়া কোনো পথ নেই এই সাধনায়।—

মেলানি করিয়া শুক জন্মভূমি গিয়া।
যোগ ভাবি স্বর্গে গেল তনু বিসর্জিয়া॥
জন্মিলে অবশ্য নাহিক মৃত্যু এড়ান।
জীবন চিন্তহ যার কাছে ভাল জ্ঞান॥
কোথায় থাকিয়া আইল কোথা পুনি যাইব।
বুদ্ধিবন্ত হৈলে এই পন্থ উদ্দেসিব॥
আপনে আপনা চিন্ত মনিষ্য জনমে।
নিস্ফল নরক কর্ম সংসার ভরমে॥

সুফি-বিশেষজ্ঞ জুনাইন বাগদাদীর মতে, 'জীয়ন্তে মরা এবং বেঁচে ওঠা' যথাক্রমে 'ফানাহফিল্লাহ' ও 'বাকাবিল্লাহ' তত্ত্ব।

তাই গুরু শুকপাখীর যোগমৃত্যুকে 'ফানাহফিল্লাহ' বলা যায়। এ হল বৌদ্ধদের নির্বাণের সমগোত্রীয়। আবার সমুদ্রে পদ্মাবতী নিমজ্জিত জেনে রাজাও সিন্ধুনীরে প্রাণ দেবার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ।

'স্বামী নারী একত্রে না মৈল সে মুগধ।
সমুদ্র উপরে গিয়া দেও মোরে বধ॥
মৃত্যু দাঁড়াইল বসি সমুদ্রের তীরে।
দে তেয়াগিতে নৃপ-নামিলেক নীরে॥

এখানে মূল গ্রন্থে আছে সুফি-সর্বেশ্বরবাদের তত্ত্ব। অনুবাদে তা লীলাবাদে রূপান্তরিত। রাজার শিরচ্ছেদে আত্মহত্যা মূলে আছে। আর অনুবাদে শক্তি বিনে শিবরূপী র-সেন আত্মহননের প্রয়াসে রত। র-সেন জন্মান্তরে প্রিয়াকে পাবার প্রয়াসী। তবে সুফিবাদ অপেক্ষা নরনারীর মিলনতত্ব র-সেন ও পদ্মাবতীর বিবাহে বিবৃত :

রমণী নির্মল প্রভু পুরুষ কারণ॥
পুরুষ নারীর যদি প্রেম না লাগিত।
ত্রিভুবনে জীবজন্তু কিছু না রহিত॥ (র-সেন-পদ্মাবতী ভেঁটখণ্ড পৃ: ১৯১)

সুফিভাবনা জায়সীর মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে, আলাওলের কাব্যে সামাজিকতা ও নৈতিক আদর্শেরই জয়গান ঘোষিত। নিরঞ্জন আল্লাহ বাঙালি কবির ভাষায় 'করতার'। আলাওল ও জায়সী উভয়েই বৈষ্ণবপদাবলির ভাবে ভাবিত। পদ্মাবতী এখানে যথার্থ 'আশিক' আর 'মাশুক' হলেন র-সেন। পদ্মাবতী প্রেমের প্রতিমূর্তি আর বহু বিঘ্ন বিরদ পার হয়ে র-সেন সেই প্রজ্ঞাপূর্ণ প্রেম পেয়েছিলেন এ তত্ত্বটি 'পদ্মাবতী'র পাঠ্যাংশে বা পুরো কাব্যেই খুব একটা প্রকট নয়। তবু মাঝে মাঝে তন্ত্রশাস্ত্র ও যোগশাস্ত্রের কথা অবশ্যই পাওয়া যায়। কাব্যারম্ভে নিরঞ্জনের বন্দনা দিতে ভোলেননি আলাওল, তবে তাঁর কাব্যে কোরান ও পুরাণ একাকার। অসাম্প্রদায়িক কবি আলাওলের কাব্যে মানবতার জয়ই মুখ্য বিষয়।

(ক) নাগমতির বারমাস্যা : নাগমতী র-সেনের প্রথমা প-ী। র-সেন যোগী বেশে শুকের পরামর্শে সিংহল দ্বীপে গিয়ে পদ্মাবতীকে বিবাহ করেন। আলাওলের কাব্যে নাগমতী তার প্রিয়তম পতির বিরহে শোকাতুর। এই বারমাস্যাটি মঙ্গালকাব্যের অনুরূপ। তবে মঙ্গালকাব্যের বারমাস্যায় নায়িকার দুঃখের কথাই বেশি। চণ্ডীমঙ্গালের নায়িকা ফুল্লরার বারমাস্যায় ব্যাধজীবনের বারমাসের পাঁচালিই গীত হয়েছে ছদ্মবেশী সুন্দরী চণ্ডীকে তাড়ানোর জন্য। ফুল্লরার সতীনসমস্যা ছিল না সে জন্য অন্য কোনো নারী তার স্বামীকে অধিকার করবে এ কথা ভেবেই সে তার দারিদ্র্যের কথা বলে। নাগমতী রাজরানী। তাই দারিদ্র্য অপেক্ষা রোমান্টিক বিরহবেদনায় তাঁর বারমাস্যা পূর্ণ।

প্রথম আষাঢ় মাস বরিষা প্রবেশ।
মোর খণ্ডব্রতফলে পহু নাহি দেশ।

শ্রাবণে ময়ূরী, ভেক ও পাপিয়ার রোলে বর্ষা যেন রাজার মতো পৃথিবীকে পূর্ণ করে। কিন্তু নাগমতীর প্রিয়তম স্বামী নেই বলে বর্ষায় সে বিরহিণী। শরতকারে চন্দ্রকিরণের শোভা অতুলনীয় ঃ—'গ্রীষ্ম অর্ধ অহ জিনি চন্দ্রের কিরণ'॥ কার্তিক মাসে দীপাবলীর উৎসব কিন্তু নাগমতির অবস্থা নিজ পতি বিনে মোর ভোগে গেল রোগ।' অঘ্রাণের দীর্ঘ শীতের রাতে—'প্রিয়া বিনে একেশ্বরী শীতে তনু ক্ষীণ।' পৌষে প্রবল শীতে জগৎ যেন ধূম্রাকার তখন স্বামীর বিরহে নাগমতীর হৃদয় দগ্ধ হয়। মাঘ মাসের হিমার্ত রাত্রে নাগমতীর অগ্নিসম উষ্ণশয্যা বিরহ হুতাশে।' ফাল্গুন মাস মলয় পবনে মিলনের আনন্দে পূর্ণ কিন্তু নাগমতীর—'বায়ুকুণ্ড ঘূর্ণিত সমান মোর মন।।' চৈত্রের সমীরণ নাগমতীর প্রাণ দগ্ধ করে। বৈশাখে সূর্যের উত্তাপ প্রবল তখন—'পতি বিনে কেমনে সহিব কমলিনী।' জ্যৈষ্ঠ মাসে পুষ্পরেণু ও চন্দনেও নাগমতীর দেহের জ্বালা জুড়োয় না। 'কান্দি কান্দি রমণী গোঁয়ায় বারমাস'।

এই বারমাসের দুঃখ আষাঢ় থেকে আরম্ভ করে জ্যৈষ্ঠ মাসে শেষ হয়। শেষপর্যন্ত কামার্ত যক্ষের মতো বিরহিণী নাগমতী বলেন "শুন রে জলদ অলি পিক দ্বিঅরাজ।/বিরহিণী অবলা বধিয়া কোন কাজ।।/প্রভুপাশে তুরিত গমনে চলি যাও। আমার বিরহ দুঃখ প্রভুরে জানাও।। এই রোমান্টিক বারমাসের সুখ-দুঃখ ঠিক মঙ্গালকাব্যের বাঁধা ছক নয়। ইসলামি রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলিতে বিশেষ করে ইউসুফ-জোলেখা কাব্যে জোলখোর বারমাসীও প্রেমের বিরহ বেদনায় পূর্ণ। এব্যাপারে আলাওল মৌলিক কবিভাবনার বাহক।

(খ) শুকপাখী—পদ্মাবতী কাব্যে এক বিশিষ্ট চরিত্র। জায়সীর মতে শুক সুফিসাধনার গুরু তিনি ভাবক ও ভাবিনীর সংযোজক। গুরু বা মুর্শিদ ছাড়া সুফিসাধনা সফল হয় না। পদ্মাবতী-র-সেন তাঁকে গুরু মেনেই প্রেমসাধনায় বিজয়ী হয়েছেন। গন্ধর্বসেন ও নাগমতী দুনিয়ার ধান্ধায় আচ্ছন্ন তাই প্রকৃত মূল্যে বা মর্যাদায় শুককে গ্রহণ করেননি। পদ্মাবতী ও র-সেনের মিলন ঘটিয়েছেন শুক। রোমান্টিক কবিভাবনায় শুক ছাড়া সে যুগে কে আর সিংহলে ও তত্ত্ববাণীর প্রচারমন্ত্র হল শুক। পাঠ্যাংশে শুকের যোগমৃত্যু বরণ সম্পর্কে কিছু দার্শনিক তত্ত্ব আছে। প্রথমত র-সেন শুককে গুরুজ্ঞানে শ্রদ্ধা জানালেন—

তুমি মোর গুরু হইয়া তত্ত্ব জানাইলা।
ভুবনদুর্লভ র- আনি মিলাইলা॥ (ষট্ ঋতু বর্ণন খণ্ড পৃ: ২১০)

পদ্মাবতীও শুকের দৌত্যেই—'মহা সুখ দিলা মিলাইয়া যোগ্য স্বামী।' শুকের মৃত্যু হল এভাবে 'যোগ ভাবি স্বর্গে গেল তনু বিসর্জিয়া।' যোগমৃত্যুর পর আলাওল বেদান্তের জ্ঞানই শুনিয়েছেন পাঠকদের—

জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু নাহিক এড়ান।
জীবনে চিন্তহ যার কাছে ভাল জ্ঞান॥
কোথাত থাকিয়া আইল কোথা পুনি যাইব।
বুদ্ধিবন্ত হৈলে এই পন্থ উদ্দেসিব।
আপনে আপনা চিন্ত মনিষ্য জনমে।
নিস্ফল নরক কর্ম সংসার ভরমে॥ (ষট্ ঋতু বর্ণন খণ্ড)

কর্ম ও সংসারের মোহে মানুষ ভুলে যায় তার আত্মস্বরূপের কথা। কোথা থেকে সে এসেছে এবং অন্তিমে সে কোথায় বিলীন হবে সেই জ্ঞানই আত্মজ্ঞান। উপনিষদে আছে—'আত্মদীপো ভব'। আলাওল পাণ্ডিত্যে ও শাস্ত্রজ্ঞানে নিপুণ। শুক চরিত্র কল্পনায় আমরা বিদগ্ধ কবি আলাওলের দার্শনিক প্রত্যয়ের অংশীদার হই।

৫.৭ 'চিতোর আগমনে খণ্ডে' পদ্মাবতীর খণ্ডিতা রূপের পরিচয়

কান্তকে নিন্দাকারিণী নায়িকাই বৈষ্ণব-পদাবলীর খণ্ডিতা রমণী। তিনি অনুনয়রত কান্তকে তিরস্কার করেন কঠিন ভাষায়। অন্য নারীর সঙ্গে সম্ভোগ হেতু কান্তকে সিঁদুর কাজলে মণ্ডিতা দেখেও তিনি কুপিতা। কান্তের সঙ্গে তিনি কলহপরায়ণা। অন্য নায়িকার সম্ভোগচিহ্ন দেখে লজ্জান্বিতা নায়িকা। মুগ্ধা রোষবাষ্পে মৌনা। রোদনপরায়ণা ও সন্তপ্তা। নাগমতীর বিরহবেদনা প্রশমিত করে যখন চিতোরে নিজ গৃহে পদ্মাবতীর কাছে এলেন র-সেন, তখন কঠোর ভাষায় খণ্ডিতা পদ্মাবতী গঞ্জনা দেন র-সেনকে :

কোন রমণীর নীল বাস দিছ গায়॥
পৃষ্ঠেত কঙ্কণদাগ হারচিহ্ন উরে।
মাজিছ বয়ানচন্দ্র সুরঙ্গা সিন্দুরে॥ (চিতোর আমমন খণ্ড পৃ: ২৬১)

প্রথমেই খণ্ডিতা পদ্মাবতীর এই কঠিন বাক্য শুনে মনে পড়বে জয়দেবের খণ্ডিতা রাধার কথা :

কজ্জলমলিনবিলোচনচুম্ববিরচিতনীলিমরূপম্।
দশনবসনমরুণং তব কৃষ্ণ তনোতি তনোরনুরূপম॥ ৩॥
বপুরনুহরতি তব স্মরসঙ্গারখরনখরক্ষতরেখ্ম।

অনু : রাধা কৃষ্ণকে বলছেন 'সেই রমণীর কজ্জলমলিননয়ন-চুম্বনে নীলিম রূপ ধারণ করে তোমার অরুণাধর নীল। মদনযুদ্ধে সেই রমণীর তীক্ষ্ণ নখরেখায় চিহ্নিত তোমার শ্যামলাঙ্গ। ('গীতগোবিন্দম্-অষ্টম সর্গ বিলক্ষ-লেখক-জয়দেব লক্ষ্মীপতিঃ)

চণ্ডীদাসের খণ্ডিতার পদেও এই ধরনের ভাব রাধার মধ্যে লক্ষিত হয় :

হেদে হে নিলাজ বঁধু লাজ নাহি বাস।
বিহানে পরের বাড়ী কোন লাজে আস॥
বুক মাঝে দেখি তোমার কঙ্কণের দাগ।

কোন কলাবতী আজ পেয়েছিল লাগ ॥

কপোলে সিন্দূর রেখা অধরে কাজল। (চণ্ডীদাসের পদ)

আলাওল পদ্মাবতীর খণ্ডিতারূপটি নিয়েছেন জয়দেব ও বৈষ্ণবপদাবলির কাব্যধারা থেকে। আলাওল বাঙালির ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃত কাব্য ও বৈষ্ণবপদাবলির ধারায় তাঁর কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, বলা যায় তিনি বাংলাকাব্যধারার সার্থক উত্তরসূরি।

৫.৮ আলাওলের কাব্যের রোমান্স রস (পাঠ্যাংশে)

রোমান্সের জগতে অলৌকিকতা অতিপ্রাকৃত অবাস্তব ঘটনা বা বিষয় থাকে। রবীন্দ্রনাথও অতিপ্রাকৃত আবহ সৃষ্টি করে, গল্প লিখেছেন, কোলরিজের অনেক কবিতাতেই অশরীরী ভাবনা আছে। পরি ও গন্ধর্বের সাথে মানবের পরিচয়ও বহু রোমান্টিক সাহিত্যিকদের রচনায় লভ্য। তাছাড়া পাখিরা দৌত্যকার্যে পটু মানুষের গলায় কথা বলে এও রোমান্টিসিজমের রূপকথাধর্মী কল্পনা। আলাওলের শুকপাখি ও সংস্কৃত কবি বাণভট্টের কাদম্বরীর শুক প্রায় একই ধরনের দূত। মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজা ও সভাসদবর্গ প্রেমকাহিনির মধ্যে পেতেন রোমান্সের উত্তেজনা। তাই রাজসভার কবি আলাওল জায়সী সুফি-তত্ত্বাংশকে এড়িয়ে কাহিনিরসের মধ্যে পরিবেশন করেছেন রোমান্টিক প্রেম। লোক-কথা, মহাকাব্যের কাহিনি, বা ঐতিহাসিক উপাখ্যান অবলম্বনেই মধ্যযুগের সাহিত্য রচিত হ'ত। পদ্মাবতীকে নিয়ে র-সেনের সমুদ্রপথে প্রত্যাবর্তনকালে আকস্মিকভাবে তরণীনিমজ্জন সমুদ্রতনয়ার মধ্যস্থতায় উভয়ের পুনর্বার সাক্ষাৎ ও অলৌকিকভাবে পুনরুদ্ধার—সবই রূপকথাধর্মী অসম্ভব ঘটনার রোমান্স। রোমান্সের উৎকেন্দ্রিক কল্পনায় ছদ্মবেশী সমুদ্রের আবির্ভাব ও সংজ্ঞাহীন মৃতপ্রায় পদ্মাবতীকে সমুদ্রকন্যার সেবা করার ঘটনায় বাস্তব ও অবাস্তবের সীমা লঙ্ঘন করে কাহিনি রোমান্সের রাজ্যে উন্নীত। রাতজাগা পাখির নাগমতীর ও র-সেনের মায়ের দুঃখের কথা র-সেনকে পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারেও অবাস্তব রোমান্স রসের ভূমিকা আছে। তবে বৈষ্ণবপদাবলির ঢঙে রচিত পদগুলির মধ্যে রোমান্টিক ভাবনার প্রকাশ দেখা যায় পদ্মাবতীতে। বাংলাকাব্যে বিশেষ করে মধ্যযুগের কাব্যে এই ধরনের রোমান্স রস মুসলমান কবিদের রচনাতেই প্রথম পাওয়া যায়—তাই সেদিক দিয়ে আলাওলের রোমান্স-রস বাংলা মধ্যযুগের কাব্যের সম্পদ।

৫.৯ র-সেন—সাথী খণ্ডের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

র-সেনের বিবাহের পর রাজার অনুচররাও যোগী সাজ ছেড়ে বিবাহ করেন। রাজার মর্জি অনুযায়ী তার পার্ষদদের সুখ ও বিলাস নির্ভর করত মধ্যযুগে :

ধন্য রাজা তুমি তোমার হোন্সে ক্ষিতি ধন্যা।

যোগীরূপে বিবাহ করিলা রাজকন্যা ॥

আমি সব শিষ্যরূপে হৈলা আইল যোগী।

তোমার প্রসাদে এবে হৈল রাজভোগী ॥

তখনকার দিনের সুপুরুষের ধর্ম হল :

দুঃখে দুঃখ সুখে সুখ যথোচিত কর্ম।

এমত না কৈলে নহে সুপুরষ ধর্ম।। (র-সেন-সাথী খণ্ড পৃ: ২০৫)

রাজপুত্রদের কৌলীন্য বিচার করে বংশমর্যাদা দেখে র-সেন বিবাহ দিয়েছেন, এটি মূলে নেই। আলাওল এখানে রাজাদের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত তাই :

ষোলশত পদ্মিনী যে পরম সুন্দরী।
রাজকন্যা পাত্রকন্যা কুলিন বিচারী॥
সকলেরে বিভা দিলা আনন্দ উৎসবে।
ঘরে ঘরে রাজসুখে রহিলেন্ত সবে॥ (র-সেন-সাথী খণ্ড পৃ: ২০৫)

এখানে রাজকর্তব্য সম্পর্কে র-সেনের মাহাত্ম্যে রাজোচিত। আলাওলের কাব্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রোসাঙ্গের রাজা ও অমাত্যবৃন্দ—তাই আলাওল ভারতচন্দ্রের মতোই রাজসভার কবি।

৫.১০ অনুশীলনী

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন ঃ

১। পদ্মাবতীর বিবাহ, দেশে চিতাউর আগমন খণ্ডের মধ্যে 'র-সেন-পদ্মাবতী'-র বিবাহ অংশের সমাজচিত্র উদ্ধৃতিসহ বর্ণনা করুন।

২। 'র-সেন-পদ্মাবতী বিবাহ খণ্ড' ও পদ্মাবতী-র-সেন ভেঁট খণ্ডে প্রেম ও সৌন্দর্যের বর্ণনা দাও। প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টি পর্যালোচনা করুন।

৩। আলাওলের 'পদ্মাবতী'-র পাঠ্যাংশের ভাষা, ছন্দ ও কাব্যসৌন্দর্যের বিশ্লেষণ করুন।

৪। 'র-সেন বিদায় খণ্ড' অংশের ঐতিহ্যবাহী বর্ণনা তাৎপর্য উদ্ধৃতি সহ আলোচনা করুন।

৫। র-সেন-পদ্মাবতীর বিবাহ থেকে চিতাউর আগমন খণ্ডে জায়সীর মূল কাব্য পদুমাবৎ ও আলাওলের অনুবাদ কাব্য পদ্মাবতীর এই বিশেষ অংশের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন ঃ

১। আলাওলের অনুসরণে ষট্ ঋতু বর্ণনের পরিচয় দিন।

২। 'অষ্টনায়িকা ভেদ' বলতে সৈয়দ আলাওলের শাস্ত্রবাহী ভাবনা সম্বন্ধে লিখুন।

৩। 'পদ্মাবতী'র পাঠ্যাংশে সৈয়দ-আলাওলের সঙ্গীতরচনার নৈপুণ্য আলোচনা করুন।

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন ঃ

১। সধুবা প্রবন্ধসঙ্গীত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে একটি গান বিশ্লেষণ করুন।

২। পদ্মা-সমুদ্র খণ্ডের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩। 'পদ্মাবতীর' পাঠ্যাংশে সুফি-ভাবনা সম্পর্কে সুচিন্তিত মতামত দিন।

৪। **সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন :**

(১) নাগমতীর বারমাস্যা, (২) শুকপাখী, (৩) পদ্মাবতীর খণ্ডিতা রূপ, (৪) সৈয়দ আলাওলের 'পদ্মাবতী'-র পাঠ্যাংশে রোমান্স রস, (৫) র-সেন—সাথী খণ্ডের আলোচনা, (৬) পদ্মাবতীর সমগ্র গল্পটির বিবরণ।

৫.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১। শ্রীদেবনাথ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদনা—*পদ্মাবতী—জায়সী ও আলাওল—দ্বিতীয়খণ্ড*

২। ওয়াকিল আহমদ—*বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান*

৩। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদনা—*পদ্মাবতী*

৪। সুকুমার সেন—*ইসলামি বাংলা সাহিত্য*

৫। সৈয়দ আলী আহসান সম্পদনা—*পদ্মাবতী*

৬। শ্রী অমিতকুমার বন্দোপাধ্যায়—*বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—(৩য় খণ্ড)*

৭। আহমদ শরীফ—*মুসলিম বাংলা সাহিত্য—(১ম খণ্ড)*

৮। সুকুমার সেন—*বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—(৩য় খণ্ড)—(আনন্দ সংস্করণ)*

একক ৬ ❐ মেঘনাদবধ কাব্য (১ম, ৪র্থ, নবম সর্গ)

গঠন

৬.০ উদ্দেশ্য
৬.১ প্রস্তাবনা
৬.২ সারাংশ ও আলোচনা
৬.৩ প্রথম সর্গ
    ৬.৩.১ রস বিচার
    ৬.৩.২ রাবণ চরিত্র
    ৬.৩.৩ মহাকাব্যের লক্ষণ
৬.৪ চতুর্থ সর্গ
    ৬.৪.১ সীতা চরিত্র
৬.৫ নবম সর্গ
    ৬.৫.১ প্রমিলার বিষাদিনী মূর্তি
    ৬.৫.২ রাবণ
৬.৬ অনুশীলনী
৬.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৬.০ উদ্দেশ্য

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি শিক্ষা ও সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে বাঙালির চেতনায় এক বিস্তার ঘটে। ফলে বাংলা সাহিত্যের পালাবদল ঘটে। এ যুগের নাম দাঁড়ায় 'আধুনিক যুগ'। এই আধুনিকতা শুধু সাহিত্যের ভাব-পরিবর্তনে নয়, রূপ পরিবর্তনেও। মধ্যযুগের বর্ণনাত্মক (narative) আখ্যানকাব্য এযুগে নাটকীয় (dramatic) মহাকাব্যে রূপান্তরিত হল। দৈবমহিমা গৌণ হয়ে মুখ্য হল মানবমহিমা। পয়ার ভেঙে দাঁড়াল অমিত্রাক্ষরে। শতাব্দীর শুরুতেই এ শব্দের লক্ষণ ফুটে ওঠেনি। ইংরেজি শিক্ষাকে আত্মস্থ করে এই শতাব্দীর মধ্যভাগে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল। পুরাতনকে লোপ করে নয়, তাকে আত্তীকরণ করে নবরূপ দেবার এক দুর্নিবার প্রচেষ্টা দেখা দিল এই শতাব্দীর মধ্যভাগে এবং তা একক ভাবে করে দেখালেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনিই বাংলা সাহিত্যে একক ও অদ্বিতীয় ক্ল্যাসিক কবি। মেঘনাদ বধ কাব্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম ও শেষ মহাকাব্য।

৬.১ প্রস্তাবনা

মধুসূদন দত্ত : সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত ও কবি প্রতিভা

কপোতাক্ষ নদের তীরে যশোহর জেলার অন্তর্গত সাগরদাঁড়ি গ্রামে ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের (মতান্তরে ১৮২৩) ২৫শে জানুয়ারি শনিবারে এক সঙ্গতিপন্ন পরিবারে মধুসূদন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল রাজনারায়ণ

দত্ত, মাতা জাহ্নবী দেবী। অত্যন্ত অল্প বয়স থেকেই তাঁর চরিত্রে দুটি গুণ আত্মপ্রকাশ করে এবং তাহল—অধ্যয়নস্পৃহা ও কাব্যপ্রীতি। লেখাপড়ায় তিনি ছিলেন পরম উৎসাহী, অনলস ভাবে বিদ্যা শিক্ষা করতে পারতেন। শৈশবে তিনি তাঁর মায়ের কাছে রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ শুনতেন। এই রামায়ণ, মহাভারত ছিল তাঁর কবিজীবনের ভিত্তি স্বরূপ। পরবর্তীকালে এই দুটি অমূল্য গ্রন্থই তাঁর কবিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়তা করে।

গ্রাম্য পাঠশালায় পড়াশোনা শেষ করে মধুসূদন নয় বৎসর বয়সে কলকাতায় হিন্দুকলেজের জুনিয়র স্কুলে সর্বনিম্ন শ্রেণিতে ভর্তি হন। এখানেই তিনি মহাধ্যায়ীরূপে বাংলার অন্যতম মনস্বী ভূদেহ মুখোপাধ্যায়কে পান। জুনিয়র স্কুলের পাঠ শেষ করে মধুসূদন ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজের সিনিয়র ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হন। তিনি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র সেই সময় স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে শীর্ষস্থান অধিকার করেন এবং স্বর্ণপদক লাভ করেন। তিনি হিন্দু কলেজের মেধাবী ও কৃতী ছাত্র ছিলেন। হিন্দু কলেজে পড়াবার সময় তিনি বহু ইংরেজি কবিতা রচনা করেন। এই সময়েই তাঁর কবিত্বশক্তির উন্মেষ ঘটে। নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্যের বহু গ্রস্থ পাঠ করেন এবং তাঁর রিচত কোনো কোনো ইংরেজি কবিতা বিলেতের মাসিক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠান। হিন্দু কলেজে পড়বার সময় দু'জন ইংরেজ অধ্যাপকের সান্নিধ্যে আসেন তিনি। তাঁরা হলেন ডিরোজিও ও রিচার্ডসন। মধুসূদন প্রত্যক্ষভাবে ডিরোজিওর ছাত্র না হলেও, ডিরোজিওর শিক্ষা তাঁর জীবনে কার্যকরী হয়েছিল। রিচার্ডসন ছিলেন কবির কল্পনা-জগতের পথপ্রদর্শক। এই রিচার্ডসনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই মধুসূদন কলেজে অধ্যয়নকালে কেবল ইংরেজিতেই কবিতা রচনা করতে থাকেন।

হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালে মধুসূদন বিজাতীয় ভাব ও আদর্শে আত্মহারা হয়ে পড়েন। য়ুরোপের শ্রেষ্ঠকবি হোমর, ভার্জিল, তাসো, মিলটনের সমপর্যায়ভুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষা এই সময় থেকেই তিনি পোষণ করতে থাকেন। বিলেত যাবার আকাঙ্ক্ষাও তাকে পেয়ে বসে। আর তাই তিনি হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালেই তাঁর মাতা-পিতা, সাংসারিক সুখসম্পদ সমস্ত কিছুকে জন্মের মতো বিসর্জন দিয়ে হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন ১৮৪৩ সালে। খ্রিস্টান হবার পর তাঁর নাম হয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করায় মধুসূদনের হিন্দুকলেজে আর স্থান হল না, এমনকী হিন্দু সমাজেও নয়। তাই বাধ্য হয়ে তিনি বিশপস্ কলেজে ভর্তি হলেন। এই ধর্মান্তর গ্রহণ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে অনেক বিপর্যয়ের কারণ হলেও এরই মধ্যে ঘটে তাঁর কবিজীবনের বৃহত্তর বিকাশের দ্বারোদঘাটন।

হিন্দুকলেজের মতো বিশপস্ কলেজও তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনকে গঠন করতে অনেকখানি সাহায্য করেছিল। বিশপস্ কলেজ হয় তাঁর ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্র। এখানে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করবারও সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু খুব বেশিদিন এখানে পড়াশোনা করা সম্ভব হল না, কারণ তাঁর পিতা অর্থসাহায্য বন্ধ করে দিলেন। এরপর একদিন তিনি ভাগ্য পরীক্ষার জন্য কাউকে কিছু না বলে মাদ্রাজে চলে গেলেন। এই স্থানে এসে তিনি এক অনাথবিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পদে যোগ দেন। ক্রমে তিনি মাদ্রাজ প্রেসেডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ও মাদ্রাজের তদানীন্তন বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা 'Spectator'-এর সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। এখানকার প্রবাস জীবন দারুণ দারিদ্র্য ও নৈরাশ্যে পূর্ণ তাঁর। দারিদ্র্যমোচনের জন্য এবং দারিদ্র্যদুঃখ ও নৈরাশ্য বিস্মৃত হবার জন্য তিনি মাদ্রাজে থাকতেই সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এখানকার নানান ইংরাজি পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন তিনি এই সময়। 'Captive Lady', 'Visions of the Past' এই সময়েরই রচনা। তাঁর 'Captive Lady' মাদ্রাজে যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছিল। কিন্তু কলকাতায় এটি তেমন আদৃত হয়নি। তাঁর অনুরাগী বন্ধুরা মধুসূদনকে বারবার মাতৃভাষা চর্চা করবার জন্য অনুরোধ জানালেন। অতঃপর তিনি বাংলা ভাষার সেবায় আত্মনিয়োগের উদ্দেশ্যে কলকাতায় ফিরে এলেন।

মধুসূদন ছিলেন প্রধানত কবি, বাংলা কাব্যসাহিত্যে তাঁর প্রথম দান 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য'। কিন্তু তাঁর প্রতিভার উন্মেষ হয় নাটক রচনার মধ্য দিয়ে। তাঁর প্রথম নাটক 'শর্ম্মিষ্ঠা' (১৮৫৮)। ১৮৫৯ সালে 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মহাসমারোহে অভিনীত হয়। দ্বিতীয় নাটক 'পদ্মাবতী' (১৮৬০)। গ্রীক পুরাণের কাহিনিকে আশ্রয় করে তিনি সাহসের পরিচয় দিলেন। বেলগাছিয়া নাট্যশালার জন্য 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নামে তিনি দুটি প্রহসনও রচনা করেন। 'পদ্মাবতী'-র পর মধুসূদন 'কৃষ্ণকুমারী' নামে একটি বিয়োগান্তক নাটক রচনা করেন। নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৮৬১।

নাটক রচনার পর সহসা তাঁর কবি প্রতিভার পূর্ণ-জাগরণ ঘটে। তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টি করবার অভিপ্রায়ে 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্য রচনা করেন সর্বপ্রথম। কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে আরও উচ্চাঙ্গের কাব্য 'মেঘনাদবধ' রচনা করেন। বাঙলার শিক্ষিত সমাজ এই কাব্যরচনার জন্য তাঁকে মহাকবি স্বীকৃতি দিলো। এই কাব্যই বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর আনলো। 'মেঘনাদবধ' রচনার প্রায় সমকালে তিনি 'বীরাঙ্গানা' ও 'ব্রজাঙ্গানা' নামে আরও দু'খানি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করেছিলেন। এরপর জীবনের অপর বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য তিনি ইংলন্ড যাত্রা করেন। পরে ব্যারিষ্টার হয়ে দেশে ফিরে আইন-ব্যবসায় অবলম্বন করেন। কিন্তু উদ্দাম অমিতাচার এবং অদূরদর্শিতা ও মহানুভবতার ফলে ঋণজালে জড়িত ও ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে শোচনীয় অবস্থায় অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মধুসূদনের কাব্য গ্রন্থাবলি :

১। 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য' (১৮৬০)
২। 'ব্রজাঙ্গানা' (১৮৬১)
৩। 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১)
৪। 'বীরাঙ্গানা' (১৮৬২)
৫। চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬)

৬.২ সারাংশ ও আলোচনা

মেঘনাদবধ কাব্যের বিষয়বস্তু :

'মেঘনাদবধ' মধুসূদনের শ্রেষ্ঠকাব্য। উল্লাসে ও হাহাকারে মধুসূদনের কবিপ্রাণ এখানে সর্বাধিক মুক্ত। কবি 'মেঘনাদবধ' কাব্যের কাহিনি রামায়ণ থেকে গ্রহণ করেছেন। বীরবাহুর মৃত্যুর পরে ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ কর্তৃক রাক্ষসসেনার সৈন্যপত্য-গ্রহণ, নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে পূজারত নিরস্ত্র বীর ইন্দ্রজিতের লক্ষ্মণের হাতে মৃত্যুবরণ ; ক্রুদ্ধ রাবণের যুদ্ধযাত্রা এবং শক্তিশেলে লক্ষ্মণের আহত হওয়া, ঔষধাদি আনয়ন করে লক্ষ্মণের জীবনদান, মেঘনাদের মৃতদেহ সৎকার—এই হল মেঘনাদবধ কাব্যের কাহিনি। কাহিনির মূল কাঠামোর মধ্যে নানা ঘটনা বিস্তার ও বর্ণনার সমারোহ আছে। তবে কাহিনি অংশ রামায়ণ থেকে গৃহীত হলেও কবির বিশিষ্ট জীবন-জিজ্ঞাসার স্পর্শে তা নতুন হয়ে দেখা দিয়েছে। মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্যে উচ্চ শ্রেণির কবি প্রতিভা নিয়েই শুধু হাজির হননি, কবি বিদ্রোহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। বাল্মীকি রামায়ণে রাম যেমন আদর্শের মূর্ত প্রতীক, কৃত্তিবাসে রাম স্বয়ং ভগবানের অবতার ; মধুসূদনের রাম তেমনি নতুন যুগের মানুষের প্রতিনিধি। কৃত্তিবাস কল্পিত বাঙালি সুলভ দুর্লভ রাম চরিত্রই বোধহয় তাঁকে এই চরিত্রটি সম্পর্কে বিদ্বিষ্ট করে তুলেছিল। তাই এতদিন যাঁরা পূজিত ছিল তাঁরাই ধিক্কৃত হলেন, এবং যাঁরা ছিলেন নিন্দিত তথা বর্বর রাক্ষস তারাই মাহাত্ম্য পেল। মধুসূদনের রোমান্টিক মন রাবণ-ইন্দ্রজিতের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছিল। তাছাড়া ঊনবিংশ শতকে

জাতীয়তাবোধ বাংলাদেশে যখন দানা বাঁধতে শুরু করেছিল, তখন অবশ্যই পররাজ্য আক্রমণকারী রাম-লক্ষ্মণের তুলনায় রাবণ-ইন্দ্রজিতের প্রতিই তাঁর সহানুভূতি দেখা দেয় বলাই বাহুল্য। সর্বোপরি, রাবণের দুর্দম শক্তি, তার নিয়তি লাঞ্ছিত সর্বনাশ কবির আপন অন্তরের সঙ্গে সহজেই মিশে গেছে। রাবণ শুধু রামায়ণের অন্যতম বীরমাত্র নয়, কবি আত্মার প্রতিকলমে সে যেন স্বয়ং মধুসূদন হয়ে উঠেছে কাহিনি, বর্ণনা, চরিত্রসৃষ্টি সব কিছু ছাপিয়ে একটা বিস্ময় বিমূঢ় জিজ্ঞাসা, জীবন সম্পর্কে একটু নতুন বোধ যেন বড় হয়ে উঠেছে।

মেঘনাদবধ কাব্যের পটভূমিকা :

মহাকবি মিলটনের একলব্য শিষ্য ছিলেন মধুসূদন দত্ত। মিল্টন তাঁর কাব্যের কাহিনি সংগ্রহ করেছিলেন বাইবেল থেকে। আর মধুসূদনের কাব্যের উপাদান মিলেছিল রামায়ণে। রাম কাহিনিকে মধুসূদন যুগোপযোগী রূপ দিয়েছিলেন। প্রয়োজনে হোমার, ভার্জিল ও মিলটনের কাছ থেকে নিয়েছিলেন উপাদান। সহায়তা করেছিলেন কালিদাস, কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস। ভাস্করের নৈপুণ্যে মধুসূদন মহাকাব্যের মণিহর্ম্যে হীরকখণ্ড বসিয়ে দিয়েছেন দেশ-বিদেশের কাব্য থেকে সংগ্রহ করে। প্রাচ্য কাব্য নাটক প্রভৃতিতে নান্দী, স্তুতি বা মঙ্গলাচরণের পর যেভাবে গ্রন্থ আরম্ভ করা হয়, সেই রীতি পরিত্যাগ করে কবি এই কাব্যে প্রথমেই বীণাপাণির বন্দনা গান গেয়েছেন। এতে কবির উপর গ্রীক-কবি হোমার, ইতালির কবি ভার্জিল ও ইংরেজ কবি মিল্টনের প্রভাব স্পষ্ট রূপে ধরা পড়েছে। এইভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে কবি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কাব্য-সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদকে নতুনভাবে, নতুন সাজে 'মেঘনাদবধ' কাব্যে পরিবেশন করেছেন। তবে এই অনুকরণে কাব্যের সৌন্দর্যহানি হয়নি অথবা কবির মৌলিকতা ও স্পষ্ট হয়নি। রামচন্দ্রের প্রতি সহানুভূতি এবং রাক্ষসদিগের প্রতি বিরাগ উদ্রেক করাই রামায়ণের কবির উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এই চিরপুরাতন আদর্শ পরিত্যাগ করে 'মেঘনাদ বধে'র কবি রাক্ষসদিগের প্রতি অনুকম্পা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন। রাক্ষস-পরিবারের স্বজাতি-প্রেমে মুগ্ধ হতে হয়, তাদের বিপর্যয়ে কাতর হতে হয়। মধূসূদন রাক্ষসকে রাক্ষস করে আঁকেননি, মানুষের মতো দেখেছেন, বীরত্বের মহিমা দান করেছেন। অন্যদিকে রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, সীতাদেবী এঁরা কেউ অবতার নন, মানব-মানবী-সাধারণ মানুষের মতো তাঁরা সুখদুঃখভোগী। আপন স্বদেশপ্রীতি তিনি রাক্ষসগণের মাধ্যমে দেখিয়েছেন। রাম-রাবণের যুদ্ধে তিনি বিদেশি সৈন্য এসে কীভাবে অপরের দেশ আক্রমণ করল তা চিত্রিত করেছেন। সেই আক্রান্ত দেশ তথা লঙ্কার স্বাধীনতা বিপন্ন। এই যুদ্ধে তিনি ইংরেজ কর্তৃক ভারতবর্ষ আক্রমণের ছবি হয়তো দেখাতে চেয়েছিলেন। মধুসূদন রাবণ চরিত্রে এক অপ্রতিহত অদম্য শক্তির গতিবেগ লক্ষ করেছেন। আর তাই রাবণ তাঁর কাছে grand fellow, আর রাবণ পুত্র ইন্দ্রজিৎ তাঁর কাছে 'my favourite Indrojit'. রাবণ আপন দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তার দেশরক্ষায় অসাধারণ বীরত্ব কবিকে মুগ্ধ করেছে।

'মেঘনাদবধ' কাব্যে নারী চরিত্রগুলি অঙ্কনেও কবি অসাধারণ সাফল্য দেখিয়েছেন। প্রমীলা বীরাঙ্গনা, কঠিনে-কোমলে বীরাঙ্গনা কবির অসামান্য সৃষ্টি। সরমা রাক্ষস বধূ বিভীষণের পত্নী। রাজপুরীতে সীতার প্রতি তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি, রাবণের পাপাচরণের প্রতি ঘৃণা তাঁর চরিত্রটিকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। অন্যদিকে রামের চরিত্রকে অত্যন্ত শান্ত, বিপদে কাতর ও দুর্বলচিত্ত রূপে অঙ্কন করেছেন।

'মেঘনাদ বধ' কাব্য করুণ রস প্রধান। যদিও কবি তাঁর কাব্যের সূচনায় বলেছেন, 'গাইব মা, বীররসে ভাসি মহাগীত' তথাপি কাব্যের শুরু ও শেষ করুণ রসেই, বীররস স্থানে স্থানে উৎসারিত হয়েছে মাত্র। কাব্যের আরম্ভ হয়েছে রাবণের করুণ বিলোপে এবং পরিসমাপ্তি ঘটেছে মেঘনাদের মৃত্যুতে প্রমীলার সহমরণ ও রাবণের মর্মভেদী হাহাকারের সঙ্গে। মেঘনাদকে সেনাপতিপদে বরণকালে রাবণের উচ্ছ্বাস, সীতা ও সরমার কথোপকথন, লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রামের বিলাপ প্রভৃতি সকল উৎকৃষ্ট অংশেই করুণরস প্রাধান্যলাভ করেছে। এক কথায় বলতে গেলে পরাজয়ের কারুণ্যই সমগ্র মেঘনাদবধ কাব্যের বিষয়বস্তু।

'মেঘনাদবধ' কাব্যের গঠনশৈলী বিচার করলে দেখা যাবে কাব্যটি নয়টি সর্গে বিভক্ত। প্রতিটি সর্গের বিষয়বস্তু অনুযায়ী তার পৃথক পৃথক নামকরণ করা হয়েছে। যেমন—

১। প্রথম সর্গের নাম 'অভিষেক'।

২। দ্বিতীয় সর্গের নাম 'অস্ত্রলাভো'।

৩। তৃতীয় সর্গের নাম 'সমাগমো'।

৪। চতুর্থ সর্গের নাম 'সমাগমো'।

৫। পঞ্চম সর্গের নাম 'উদ্যোগো'।

৬। ষষ্ঠ সর্গের নাম 'বধো'।

৭। সপ্তম সর্গের নাম 'শক্তি নির্ভেদো'।

৮। অষ্টম সর্গের নাম 'প্রেতপুরী'।

৯। নবম সর্গের নাম 'সংস্ক্রিয়া'।

৬.৩ প্রথম সর্গ

এই নয়টি সর্গের মধ্যে প্রধান হল ষষ্ঠ সর্গ, এই সর্গেই রামানুজ লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে বধ করেছেন। 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের প্রথম সর্গের নাম 'অভিষেক'। মেঘনাদকে রাবণ সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করলেন। এটি আলোচ্য সর্গের কেন্দ্রীয় ঘটনা। অনেক সমালোচক এই প্রথম সর্গটিকে কাব্যের শ্রেষ্ঠ অংশ বলে অভিহিত করেছিলেন। তবে একথা সত্য যে, বাব্যোৎকর্ষের দিক থেকে প্রথম সর্গটির স্থান অতি উচ্চে। প্রথম সর্গের শুরু হয়েছে একটি নাটকীয় চমক দিয়ে—

'সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে.... ।'

বীরবাহুর অকাল মৃত্যুর সংবাদটি মাত্র পাঠকদের দিয়ে কবি ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করে পরবর্তী সেনাপতির প্রসঙ্গ তুললেন। তারপর দেবী সরস্বতীবন্দনা, রাবণের রাজসভার বর্ণনা করলেন। এভাবেই তিনি পাঠকদের ঔৎসুক্য সৃষ্টি করে নাট্যরস তৈরি করেছেন। এ ধরণের অসামান্য নাট্যমুহূর্ত এই সর্গে আরও লক্ষ্য করা যায়। রাবণের স্বর্ণসিংহাসনের বর্মনা দিয়েছেন কবি। তারপর ভগ্নদূতের মুখ দিয়ে বীরবাহুর যুদ্ধ ও মৃত্যুর কাহিনি শুনিয়েছেন এইভাবে—

"..... কতক্ষণ পরে,
প্রবেশিলা যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব।
কনক-মুকুট শিরে, করে ভীম ধনুঃ,
বাসবের চাপ যথা বিবিধ রতনে
খচিত," —এতেক কহি নীরবে কাঁদিল
ভগ্নদূত..... ।'

ভগ্নদূতের মুখে বীরবাহুর মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণে রাবণের চিত্ত-হাহাকারের আবেগ তাড়িত বর্ণনা সর্গের প্রথমেই স্থান পেয়েছে। কিন্তু বীরবাহুর মৃত্যুর বিস্তৃত বর্ণনা শোনবার পর হাহাকারের পরিবর্তে রাবণের কণ্ঠে

উল্লাস বুঝিয়ে দেয় এটি সাধারণ কোনো কাব্য নয়, মহাকাব্য ; আর মহাকাব্যের প্রয়োজনে এখানে বীররসের সঞ্চার ঘটেছে—

'এতেক কহিয়া স্তব্ধ হইল রাক্ষস
মনস্তাপে। লঙ্কাপতি হরষে বিষাদে
কহিলা ; সাবাসি দূত ! তোর কথা শুনি,
কোন্ বীর-হিয়া নাহি চাহেরে পশিতে
সংগ্রামে ?'

পুত্র বীরবাহু বীরের মতো যুদ্ধ করে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়েছে—এ তার পক্ষে কম গৌরবের নয়। যে বীর সে দেশের জন্য আত্মত্যাগ করতে ভয় পায় না। একদিকে বেদনার হাহাকার, অন্যদিকে বীরত্বের উল্লাস—এ দুয়ের বেনীবন্ধন ঘটেছে রাবণ চরিত্রে। আর এই বীর ও করুণের উৎস থেকে এ কাব্যের রসধারা উৎসারিত হয়েছে।

৬.৩.১ রস বিচার

প্রথম সর্গে বীর ও করুণরসের দুটি সুরই সমানভাবে বেজেছে, মাঝে মেঘনাদ ও প্রমীলার প্রমোদকাননের বর্ণনায় আদিরসের উল্লেখ আছে। এই প্রথম সর্গেই বীর ও করুণ দুটি রসই উৎসারিত হয়েছে। এ দুটি রস সমন্বিত হয়ে তাঁর কাব্য বীণায় যত সুন্দর ও গম্ভীর হয়ে বেজেছে এমন আর কোনোটিই নয়। রাবণের শত্রু হত্যার প্রতিজ্ঞার ভাষায় যেখানে বীরভাব প্রকাশিত সেখানেও ব্যঞ্জনায় ধ্বনিত হয়েছে কারুণ্য ; আর যেখানে বেদনার্ত প্রকাশিত সেখানে ব্যঞ্জিত হয়েছে বীরত্বধর্ম। চিত্রাঙ্গদার আবির্ভাব যে ব্যাখ্যার সৃষ্টি করেছে, সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধসজ্জা সেই ব্যথার মাঝে বীর্যবত্তাকে উৎসারিত করেছে। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে সৈন্যদের রণসজ্জা ও পথপরিক্রমার একাধিক চিত্র আছে, যুদ্ধান্তে রণক্ষেত্রের ধ্বংসাবশেষেরও ছবি আছে। কিন্তু প্রকৃত যুদ্ধবর্ণনা তেমন একটা নেই। রাবণের আদেশে সৈন্যবাহিনীর প্রস্তুতির বর্ণনা দিয়েছেন কবি এভাবে—

'এতেক কহিলা যদি নিকষা-নন্দন
শূরসিংহ, সভাতলে বাজিল দুন্দুভি
গম্ভীর জীমূতমন্দ্রে।

একটা কোলাহল মুখর প্রজ্জ্বলিত শোভাযাত্রার সামগ্রিক চিত্র এখানে প্রকাশিত হয়েছে। অশ্বারোহী, গজারোহী, রথারোহী, পদাতিক, ধ্বজাবাহী বিভিন্ন সৈন্যদের পরিচয় দিয়েছেন কবি। দুর্গ প্রাকার থেকে রাবণের রণক্ষেত্র প্রদর্শন বর্ণনা-সৌন্দর্যের দিক থেকে প্রথম সর্গটি উল্লেখযোগ্য। শুধু তাই নয়, এই সর্গে রাবণের আবেগের মধ্যেই তার ট্রাজিক সুর ধ্বনিত হয়েছে।

৬.৩.২ রাবণ চরিত্র

অমিত শক্তিধর ও অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী রাবণ যেন দৈবাহত এক মূর্তিমান পৌরুষ। বীরবাহুর মৃত্যুতে তিনি কেবল কাতর হননি। অনিবার্য ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়েছেন। এতবড় একজন বীরের পক্ষে শুধুই শোকে কাতর হওয়া শোভা পায় না—একথা যখন রাবণকে মন্ত্রী সারণ স্মরণ করিয়েদিলেন, তখন লঙ্কেশ্বর রাবণ তাঁর শোকের স্বাভাবিকতাকে অস্বীকার করেননি। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত বীরবাহুকে প্রাচীর থেকে দেখলেন, দেখলেন অবরুদ্ধ লঙ্কাপুরীকে। শত্রুবেষ্টিত লঙ্কাকে দেখে তাঁর মন বিষাদে ভরে উঠল। অতঃপর পুত্রের মৃতদেহ দেখে

তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন, বীরের মতো যুদ্ধ করতে গিয়ে বীরবাহুর এই নিহত হওয়া তিনি গৌরব বোধ করছেন। গ্রিসীয় কাব্য থেকে দেশপ্রেমের আদর্শ গ্রহণ করে মধুসূদন রাবণ চরিত্রে যুক্ত করেছেন। পুত্র বীরবাহুর আপন মাতৃভূমিকে রক্ষা করবার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছে এই অনুভূতি রাবণের হৃদয়ে গৌরব সঞ্চার করেছে। পুত্রশোকে কাতর রাবণের বিলাপের ভিতর দিয়ে জাগতিক দুঃখে কাতর ঈশ্বর বিশ্বাসী এক মানুষের চিরন্তন প্রশ্ন ধ্বনিত হয়েছে। মধুসূদন রাবণকে বিরাট বীর করে আঁকতে চেয়েছেন কিন্তু অতি মহৎ করে স্পষ্ট করেননি। জীবনযুদ্ধে বারবার পরাজিত হওয়ায় তিনি দৈবের আধিপত্যকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। তথাপি তিনি থেমে থাকার ব্যক্তি নন। তাই পুত্রবধের প্রতিশোধ নেবার জন্য রাবণ নিজেই যুদ্ধে যাত্রা করবেন ঠিক করলেন। পুত্র মেঘনাদ তাঁকে নিরস্ত করে স্বয়ং যুদ্ধ-যাত্রার জন্য পিতার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। পুত্রের আগ্রহ দেখে তিনি বললেন যে, মেঘনাদ যদি প্রকৃতই যুদ্ধে যাত্রার জন্য উৎসুক হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সমাপন করে ইষ্টদেবের আশীর্বাদ পূর্বক যুদ্ধযাত্রা করে। রাবণের একথায় তাঁর দুর্বলতাই প্রকাশিত হয়। আসলে বাল্মীকির রাবণকে এখানে চিত্রিত করেননি মধুসূদন ; তিনি দোষে-গুণে রক্তমাংসের মানুষ করে এঁকেছেন রাবণকে। তাঁর রাবণ অনাচারী পাপপরায়ণ অধিপতি মাত্র, অথচ তিনি রাক্ষস নন, দেবতার প্রতি তাঁর ভক্তি আছে, আছে নিষ্ঠা। এখানেই মধুসূদনের রাবণের অনন্যতা।

৬.৩.৩ মহাকাব্যের লক্ষণ

'মেঘনাদবধ' কাব্য বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মৌলিক মহাকাব্য। অ্যারিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিকস' গ্রন্থে মহাকাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—"ট্রাজেডির মত মহাকাব্যেরও মূল আখ্যান থাকে একটি, কিন্তু যেহেতু ইহা দৃশ্য কাব্য নহে সেইজন্য ইহার মধ্যে উপাখ্যান থাকে বেশি। ইহার ভাব ও ভাষা হয় ঐশ্বর্যবান এবং রাজসিক গুণবিশিষ্ট, হেক্সামিটার বা তজ্জাতীয় ছন্দে ইহা রচিত হয়। বিষয় ও বর্ণনার গৌরবে মহাকাব্য সমৃদ্ধ হইবে।" সুতরাং এথেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, মহাকাব্যে একটা বিশালতা থাকে, বিস্তৃতি ও উদার্য থাকে, যে কারণে অন্য সকল কাব্য থেকে একে পৃথক করা যায়। এই কারণে এতে উপাখ্যানের বাহুল্য থাকে এবং তা সাধারণত অষ্টাধিক সর্গের হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ যথার্থ বলেছেন যে, মহাকাব্যে একটা জাতির ইতিহাস, যুগের ইতিহাস, মানুষের ইতিহাস, জাতির ঐতিহ্য ধরা পড়ে। রসাত্মক বাক্যের মাধ্যমে একটি যুগকে বিধৃত করে তার সম্পূর্ণ পরিচয় তুলে ধরার মধ্যেই মহাকাব্যের সার্থকতা। অলঙ্কার শাস্ত্রবর্ণিত নয়টি রসের যে কোনও একটি মহাকাব্যের অঙ্গীরস হতে পারে।

'মেঘনাদবধ' কাব্যখানি শুধু পরিকল্পনায় নয়, চরিত্র সৃষ্টিতেও মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। প্রথমেই দেব-দেবীর কথা স্মরণ করতে হয়। মধুসূদন তাঁর দেবদেবীদের হোমারের আদর্শে পরিকল্পনা করেছেন। মহাদেবের ওপর কিঞ্চিত 'কুমার সম্ভবে'র প্রভাব লক্ষিত হয়। তাঁর চরিত্র পরিকল্পনার আর একটি বিশেষত্ব হল ঐশ্বর্য। তাঁর অঙ্কিত প্রতিটি চরিত্র অন্তর ও বাইরের ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান। 'মেঘনাদবধে'র প্রতিটি চরিত্র অনুভূতির ঐশ্বর্যে উজ্জ্বল। এই কাব্যে বর্ণনার ওজস্বিতা ও মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। কবির ভাষায় ও বর্ণনায় আমরা এই ওজস্বিতা লক্ষ্য করি। অতি দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ সংস্কৃতে প্রযোজ্য হলেও বাংলায় তা বেমানান ; তাই মধুসূদন সমাসবদ্ধ পদ সংযোজন না করে সংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ সমন্বিত গুরুগম্ভীর জাতীয় অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার করে ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি করেছেন শুধু নয়, ওজোগুণে এই কাব্যকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করেছেন। মধুসূদনের উপমা ব্যবহার যেমন হোমারকে স্মরণ করায়, তেমনি তাঁর স্বীকায়তাও প্রমাণ করে। 'Epic Simile' বলতে যা বোঝায় মধুসূদনের কাব্যে তার বহু নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। সুতারাং তাঁর 'মেঘনাদবধ' কাব্য একখানি শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য।

৬.৪ চতুর্থ সর্গ

সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রানুযায়ী মহাকাব্যের সর্গ সংখ্যা অষ্টাধিক অর্থাৎ মহাকাব্যের প্রধানগুণ বিস্তৃতি বা বিশালতা। প্রতিটি সর্গ মহাকাব্যকে পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যায়। 'মেঘনাদবধ' কাব্যের সর্গ সংখ্যা নয়টি। তন্মধ্যে চতুর্থ সর্গের নাম 'অশোকবনং'। অনন্যোপায় হয়ে চতুর্থ সর্গের অবতারণা করা হয়েছে একথা বলা যায় না। আবার কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন, কাব্যের ক্ষেত্রে চতুর্থ সর্গের তেমন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। তথাপি মধুসূদন-প্রতিভার স্পর্শে চতুর্থ সর্গের কাহিনিটি অত্যন্ত গাঢ়বন্ধ ও সজীব হয়েছে।

৬.৪.১ সীতা চরিত্র

ইন্দ্রজিতের অভিষেকে সমগ্র লঙ্কাপুরী যখন আনন্দে উদ্বেল, তখন কবি অঙ্কন করেছেন পুরীর এক দূরবর্তী প্রান্তে অবস্থিত শোকাচ্ছন্ন অশোককাননের এক মর্মস্পর্শী চিত্র। বস্তুত প্রথম তিনটি সর্গে বীররসের আধিপত্য চোখে পড়ে। চতুর্থ সর্গে কবি যেন রণক্ষেত্র থেকে বিশ্রাম গ্রহণ করেছেন। কাহিনির পটভূমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে অশোক কাননে, যেখানে রয়েছেন বন্দিনী সীতা। মধূসূদন অশোক কাননে সীতাকে বন্দনা করতে গিয়ে ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ সীতার উদ্দেশ্যে তাঁর বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। বাল্মীকির মানসকন্যার প্রতি এযেন মধূসূদনের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। কিন্তু সেই শ্রদ্ধা তিনি জ্ঞাপন করেছেন। বাল্মীকির মানসকন্যার প্রতি এযেন মধূসূদনের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। কিন্তু সেই শ্রদ্ধা তিনি জ্ঞাপন করেছেন অতি কৌশলে। সীতার মুখ দিয়ে রামকাহিনির পূর্বকথা অর্থাৎ সীতা অপহরণ পর্যন্ত কাহিনি তিনি বর্ণনা করেছেন। এখানে সীতাদেবী নিজেকে সমস্ত দুর্ভাগ্যের কারণ বলে ধিক্কার দিয়েছেন। আবার সরমার মাধ্যমে সীতার প্রতি শ্রদ্ধা ও রাবণের সমালোচনা করেছেন মধুসূদন। সরমা ও সীতাকে তিনি শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিতা করেছেন। আমরা জানি যদিও সীতা মধুসূদনের মানসদুহিতা নন, সে দাবি প্রমীলার, তথাপি সীতা চরিত্রে মধুসূদন প্রেমের যে আদর্শ ও পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন তা একান্তই ভারতীয় নারীসুলভ। সীতার আদর্শ প্রমীলার বিপরীত। সীতার প্রেম মৃতুতেই সহনীয় নয়, অথচ আত্মঘাতী। আত্মার তপশ্চরণে, ধ্যানে ও স্বপ্নে, সংযমে ও ধৈর্যে তাঁর বিচ্ছেদ সুসহ বলেই তো তা মহিমময়—'দুঃসহ সুন্দর' নয়। সীতার সেই সাধ্বী প্রেমের পরিচয় অশোককাননে তাঁর বিরহিনী বেশের মধ্যেই পরিস্ফুট। এ প্রেমের বেদনাও যেমন, এর সুখও তেমন। সীতার মুখে আমরা প্রিয় মিলনের যে সুখস্মৃতির কাহিনি শুনতে পাই তা উগ্রমিলনের কাহিনি নয়। সে সুখে উন্মাদনা নেই, কিন্তু প্রাণের পরিতৃপ্তি আছে। সেই পরিতৃপ্তির কাহিনি সীতা শুনিয়েছেন রক্ষোবধূ বিভীষণ পত্নী সরমাকে—

'কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদীতটে ; দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন ; নবতারা বলী
নবনিশাকান্ত—কান্তি।'

কিন্তু সীতা চরিত্রে কবি যে প্রেমের ধ্যান দেখিয়েছেন তা শুধু দাম্পত্য প্রেম নয়, অথবা সেখানেই তার পরিসমাপ্তি নয়। এ প্রেম নরনারীর যুগল হৃদয়ে জন্ম লাভ করে এবং করুণা বা মৈত্রীর মধ্যে তার চরম সার্থকতা সূচিত হয়। সীতা যেন মূর্তিমতী করুণা, আর এই করুণার মূলে আছে তাঁর পতিপ্রেম। সীতার রাবণ কর্তৃক লাঞ্ছিতা হয়েও মহাশত্রুরও দুঃখ সহ্য করতে পারেন না। সকল দুঃখকে তিনি আপনার দুঃখ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর উপরে পাপাচরণ করে যারা শাস্তি ভোগ করছে তাদের দুঃখ দেখে তিনি প্রকারান্তরে নিজেকে দায়ী করে তুলেছেন। যে ইন্দ্রজিতের মৃত্যু না হলে সীতার উদ্ধার নেই, সেই ইন্দ্রজিতের মৃত্যু সংবাদ দিয়ে সরমা যখন তাঁকে বললেন—

'দৈত্যবালা প্রমীলা সুন্দরী
বিদরে হৃদয়, সাধ্বী স্মরিলে সেকথা
প্রমীলা সুন্দরী ত্যজি দেহ দাহ মূলে
পতির উদ্দেশ্যে সতী, পরিপরায়না
যাবে স্বর্গ পূরে আজি।'
তখন সীতা 'করতলে মূর্তিমতী দয়া
সীতারূপে, দুঃখে কাতর সতত
কহিলা সজলে আঁখি সম্ভাষি সখীরে
কুক্ষণে জনম মম।.....
প্রবেশি যে গৃহে হায়, অমঙ্গালারূপী
আমি।'

এই যে মূর্তিমতী দয়া এর মূলে আছে প্রেম। নারীর সকল সাধনাই প্রেমে আরম্ভ, তা পুরুষের সাধনা-রূপ নয়।

'মেঘনাদ বধে' আমরা সীতা দেবীকে দু'বার মাত্র দেখতে পাই—প্রথমবার, মেঘনাদের অভিষেকের পর এবং দ্বিতীয়বার মেঘনাদের মৃত্যুর পর। প্রথমবারের থেকে দ্বিতীয়বারের চিত্র অনেক বেশি উজ্জ্বল। প্রথমবার বিভীষণ-প-ী সরমা, সীতাদেবীর অঙ্গো অলংকার অপহরণের জন্য রাবণের নিন্দা করলে সীতাদেবী রাক্ষসরাজকে সমর্থন করে বলেছেন—

'বৃথাগঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখী,
আপন খুলিয়া আইম ফেলাইনু দূরে
আভরণ, যবে পাপী ধরিল আমারে
বনাশ্রমে।'

আততায়ী শত্রুকে এভাবে নিন্দার হাত থেকে মুক্ত করা সীতাদেবীর চরিত্রের উপযুক্ত বটে। দ্বিতীয়বার সরমা এসে সীতাদেবীকে মেঘনাদের মৃত্যুর ও প্রমীলার চিতারোহণের সংবাদ প্রদান করলেন। বিধাতার অনুগ্রহে তাঁর কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত হবার উপক্রম হল দেখে তিনি বিধাতাকে ধন্যবাদ জানালেন কিন্তু সঙ্গো সঙ্গো রক্ষোবংশের দুরবস্থা স্মরণ করে তাঁর হৃদয় বিগলিত হল। তিনি স্বয়ং নিরপরাধিনী, তথাপি বিধাতা তাঁকে কেন রক্ষোবংশের কালরাত্রি স্বরূপিণী করলেন ? তাঁরই জন্য নিরপরাধ মেঘনাদ এবং নিরপরাধিনী সাধ্বী প্রমীলা যে চিতানলে উৎসর্গীকৃত হয়েছেন, একথা চিন্তা করে তাঁর হৃদয় অধীর হয়েছে। তিনি সজল নয়নে সরমাকে বলেছেন—

'কুক্ষণে জমন মম সরমা রাক্ষসি !
সুখের প্রদীপ সখি, নিবাই লো সদা,
প্রবেশি যে গৃহে হায়, অমঙ্গালারূপী
আমি। পোড়া-ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা।'

অত্যাচারী রাক্ষসবংশের প্রতি এরূপ অনুকম্পা রামায়ণের সীতা চরিত্রে লক্ষিত হয় না, এ মধুসূদনেরই সৃষ্টি, মধুসূদনেরই কল্পিত।

'মেঘনাদবধ' কাব্যে চতুর্থ সর্গটিকে একমাত্র লিরিকের বিশ্রাম বলে গণ্য করা যায়। পঞ্চম সর্গ থেকে যুদ্ধবিগ্রহ পূর্ণ বীররসাত্মক কাব্যধারা আবার আপনবেগে অগ্রসর হয়েছে। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে ইন্দ্রজিৎকে, যার বর্ণনা ষষ্ঠ সর্গে। সপ্তম সর্গে রাবণের রণক্ষেত্রে যাত্রা এবং লক্ষ্মণের সঙ্গে তার যুদ্ধের বর্ণনা, অষ্টমে নরক বর্ণনা এবং নবম সর্গে ইন্দ্রজিতের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার বর্ণনা আছে। সুতরাং সমগ্র কাহিনি বিশ্লেষণ করলে চতুর্থ সর্গকে মূল কাব্যধারা থেকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়। মধুসূদন 'মেঘনাদবধ' কাব্যকে যদিও একখানি পূর্ণাঙ্গ বীররসাত্মক কাব্যে পরিণত করতে পারেননি, তথাপি যুদ্ধের আয়োজন এবং বর্ণনাদির মধ্যে বীররসকেই কাব্যে দিয়েছিলেন প্রতিষ্ঠা। সেদিক থেকে দেখলে চতুর্থ সর্গ যেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। 'মেঘনাদবধ' কাব্যে ইন্দ্রজিৎ নিধন যদিও কেন্দ্রীয় আখ্যান, তথাপি মধুসূদন চতুর্থ সর্গে যেন সমগ্র রামকাহিনিকে পাঠকদের কাছে নতুন করে তুলে ধরেছেন। নাটকের ক্ষেত্রে একে রীতি হিসাবে ফ্ল্যাশব্যাক (flash back) বা পশ্চাৎ উদ্ভাসন বলা যায়। সাধারণত মহাকাব্যের মধ্যে যেহেতু কাহিনিগত বিস্তার থাকে তাই এই রীতি-প্রয়োগ প্রয়োজন হয় না কিন্তু মধূসূদন এখানে সেই রীতির ব্যতিক্রম ঘটালেন। বীররসাত্মক মহাকাব্য রচনা করতে অভিলাষী হলেও কবির আপন প্রাণের মধ্যে যে ব্যক্তিজীবনের ক্রন্দনধ্বনি প্রচ্ছন্ন ছিল তাকে তিনি দূরে ঠেলতে পারেন নি। বাঙালি সুলভ সেই গীতিময়তা, আপন প্রাণের না পাওয়ার সেই আর্তহাহাকার মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' কাব্যটিকে করুণ রসের পরিণতি দান করেছে। যখন সমগ্র লঙ্কাপুরী মৃত্যুশোকে সন্তপ্ত, যখন সেখানে যুদ্ধের প্রচণ্ড নির্ঘোষ ধ্বনিত হচ্ছে, তখন মধুসূদন পাঠককে কিছুটা রিলিফ (relief) দেবার প্রয়োজনে যেন চতুর্থ সর্গের আয়োজন করলেন। সুতরাং চতুর্থ সর্গ সমগ্র 'মেঘনাদবধ' কাব্যের মধ্যে স্বতন্ত্র মাত্রাযুক্ত হলেও তা যেমন বিচ্ছিন্ন কোনো অংশ নয়, তেমনি তার প্রয়োজনীয়তাকেও অস্বীকার করা উচিত নয়। আবার একথাও সত্য যে চতুর্থ সর্গ যদি রচিত না হত তাহলে আমরা জনম দুখিনী সীতার পরিচয় পেতাম কি ?

৬.৫ নবম সর্গ

'মেঘনাদবধ' কাব্য যে বিষাদময় সঙ্গীত দিয়ে শুরু হয়েছিল নবম সর্গে এসে তার সমাপ্তি ঘটল। মধুসূদন কাব্যের সূচনায় বীর রসাত্মক কাব্য রচনার অঙ্গীকার করেছিলেন। কিন্তু কাব্যের প্রথম সর্গে বীরবাহুর মৃত্যুতে যে করুণ রসের সঞ্চার হয়েছে, সমগ্র কাব্যে সেই রসেরই প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় এবং নবম সর্গে এসে তার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটেছে। সুতরাং বর্ণনীয় বিষয় পাঠশেষে পাঠকের হৃদয়ে যে ভাব স্থায়ী হয়, তদনুসারে যদি গ্রন্থের রস নির্ণয় করতে হয়, তবে 'মেঘনাদবধ'কে করুণ রস প্রধান কাব্য বলেই নির্দেশ করতে হয়। অশোক কাননে উপবিষ্টা মূর্তিমতী বিরহিনী জানকীর এবং শ্মশান শয্যার স্বামীর পদপ্রান্তে উববিষ্টা নববিধবা প্রমীলার অনুপম চিত্র দর্শনে কে বলবে যে মধুসূদন বীররসেরই কবি ? বস্তুত সমগ্র 'মেঘনাদবধ' কাব্যে মধুসূদনের কবি আত্মার হাহাকারই যেন ধ্বনিত হয়েছে।

এক ভয়ঙ্কর রাত্রে রামচন্দ্র, লঙ্কার সমুদ্রকূলস্থিত রণক্ষেত্রে ভ্রাতা লক্ষ্মণের মৃতদেহ কোলে নিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন, এবং লক্ষ্মণের পুনর্জীবন লাভের সঙ্গে তা প্রভাত হয়েছিল। রামচন্দ্রের শিবির তখন আনন্দ কোলাহলে পূর্ণ ; রঘুসৈন্যগণের বিজয়নাদ আকাশে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। সেই আনন্দ কোলাহল সমুদ্র কল্লোলকেও পরাজিত করে মনস্তাপে ভূমি-শয্যায় উপবিষ্ট রাবণের কর্ণেও প্রবেশ করল। মন্ত্রীর মুখে তিনি লক্ষ্মণের পুনর্জীবন লাভের সংবাদ শ্রবণ করলেন। পুত্রহন্তা শত্রুর পুনর্জীবন লাভ পুত্রশোক অপেক্ষাও অধিক মর্মভেদী ; কিন্তু এই মর্মবিদারী সংবাদে লঙ্কেশ্বর এবারে মূর্ছিত হলেন না। মানুষের সকল আশা যখন নিঃশেষ হয়ে যায় তখন নিরাশাই মানব-হৃদয়ে আশা দান করে ; রাক্ষসরাজ আজ নিরাশায় বুক বেঁধেছেন। স্বয়ং কৃতান্তও যখন তাঁর ভাগ্যক্রমে স্বধর্ম বিস্মৃত হলেন তখন আর আশা কোথায় ? তিনি বুঝলেন, রাক্ষস বংশের গৌরব-রবি সত্যি সত্যিই চির অন্ধকারে আবৃত হলেন। পুত্রের প্রেতকৃত্য সমাপনের জন্য তিনি মন্ত্রীর দ্বারা রামচন্দ্রের

নিকট সপ্তাহব্যাপী সন্ধি প্রার্থনা করে পাঠালেন। উদারহৃদয় রামচন্দ্র দুর্ভাগ্য পীড়িত শত্রুর প্রার্থনায় অসম্মত হলেন না। মেঘনাদের শেষকৃত্য এবং সাত দিনের জন্য লঙ্কাযুদ্ধের বিরাম আর্য রামায়ণে নেই, ইলিয়াডের আদর্শে মধুসূদন তা কল্পনা করেছেন। কিন্তু ভারতললনা পতির পদপ্রান্তে উপবিষ্টা হয়ে কীভাবে হাস্য মুখে চিতানলে জীবন উৎসর্গ করতে পারে, সাধ্বী প্রমীলার চিতারোহণে মধুসূদন তা বর্ণনা করেছেন, যা পাশ্চাত্য কবির পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না। এখানেও মধুসূদনের মৌলিক-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

৬.৫.১ প্রমীলার বিষাদিনী মূর্তি

আমরা, তৃতীয় সর্গে প্রমীলার বীরাঙ্গানা মূর্তি দেখেছি, আর নবম সর্গে দেখলাম বিষাদিনী মূর্তি। শ্মশান শয্যায় উপবিষ্টা নববিধবা বিষাদিনী মূর্তি না দেখলে তৃতীয় সর্গের সেই রণরঙ্গিণী মূর্তির গাম্ভীর্য অনুভব করা সম্ভব হত না। প্রমীলার চিতারোহণের ন্যায় গম্ভীর ও কুরণভাবোদ্দীপক চিত্র বঙ্গ সাহিত্যে আর কোথাও দেখা যায় না। কবির বর্ণনা শুনে সেই কল্পনাসৃষ্ট দৃশ্য যেন প্রকৃতির ঘটনার মতো প্রত্যক্ষবৎ বলে মনে হয়। লঙ্কার সমুদ্রকূলবর্তী শ্মশান, সেই শ্মশানস্থিত অশ্রুনয়না রক্ষোবালাগণ এবং তাঁদের মধ্যে বিষাদমূর্তি প্রমীলাকে যেন আমরা প্রত্যক্ষের ন্যায় দর্শন করি। এই কি সেই প্রমীলা ? বসন্ত সমাগমে মত্ত মাতঙ্গিনীর ন্যায় যিনি দর্পিত পদভরে রঘুসৈনিকগণকে দলিত করেছিলেন ? প্রমীলার সেই বিদ্যুল্লতীসদৃশী প্রভা আজ কোথায় ! প্রমীলার মুখে আজ কথা নেই, অধরে হাসি নেই, নয়নে জ্যোতি নেই ; প্রমীলার ললাটে সিন্দুর বিন্দু, কণ্ঠে পুষ্পাদাম, করে শদবা চিহ্ন কঙ্কন, প্রমীলা পতির পদতলে উপবিষ্টা—

'.....মৌনব্রতে ব্রতে বিধুমুখী ;
পতির উদ্দেশে প্রাণ ও বরাঙ্গ ছাড়ি
গেছে যেন, যথা পতি বিরাজেন এবে ;
শুকাইলে তরুরাজ শুকায় রে লতা।'

৬.৫.২ রাবণ

কিন্তু কেবল প্রমীলারই এই পরিবর্তন ঘটেনি, রক্ষোরাজ রাবণেরও ঘটেছে। সেদিন রক্ষোনাথ নবোদিত দিবাকরের ন্যায় স্বর্ণচক্র রথে আরোহন করে লঙ্কার পুরদ্বার থেকে বহির্গত হচ্ছেন, তাঁর রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দে, তুরঙ্গামগণের হ্রেষাধ্বনিতে দিঙমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ; তাঁর মহিমামণ্ডিত উজ্জ্বল মুখমণ্ডল দর্শন করে রক্ষোসৈনিকগণ আনন্দে জয়ধ্বনি করছে।—এ দৃশ্য যেমন সুন্দর, তেমনই বিস্ময়কর ! তাঁর এই রুদ্রতেজ-ভাস্বর মূর্তি দর্শন করে—

'পলাইল রঘুসৈন্য পলায় যেমনি
মদকল করিরাজে হেরি উর্দ্ধশ্বাসে
বনবাসী ; কিম্বা যথা ভীমাকৃতি ঘন
বজ্রঅগ্নি-পূর্ণ, যবে উড়ায় বায়ু পথে
ঘোর নাদে, পশু-পক্ষী পলায় চৌদিকে
আতঙ্কে।'

সেদিনের সেই দৃশ্যের পাশে আজ এই শ্মশান ভূমিতে আর এক দৃশ্য—

'বাহিরিলা পদব্রজে রক্ষকুল রাজা
রাবণ, বিষাদ বস্ত্র, বিশদ উত্তরী
ধুতুরার মালা যেন ধূর্জটির গলে
চারিদিকে মন্ত্রিদল দূরে নতভাবে।'

সৌভাগ্য লক্ষ্মীর সেই প্রিয়তম পুরুষের পক্ষে একদিনে কি এই পরিবর্তন ঘটা সম্ভব ? বিধাতার লীলা কে বুঝিতে পারে ! রাক্ষসরাজের এই অবস্থা অনুভব ভিন্ন বোঝানো সম্ভব নয়।

বর্ণনা এবং চিত্ররচনার গুণে 'মেঘনাদবধ' কাব্যের এই অংশ সর্বোৎকৃষ্ট। সাগর কূলবর্তী শ্মশানে মেঘনাদ ও প্রমীলার পবিত্রদেহ ভস্মীভূত করবার জন্য চন্দন কাঠের চিতা নির্মিত হয়েছিল। আলুলায়িতাকুন্তরা, সাধ্বী প্রমীলা তার অলঙ্কারগুলি একে একে খুলে সখীদিগকে বিতরণ করলেন এবং তারপর পুষ্পশয্যার ন্যায় চিতা শয্যায় আরোহণ করে পতি মেঘনাদের পদতলে উপবিষ্টা হলেন। তার কণ্ঠে পুষ্পমালা এবং কেশপাশে কুসুমদাম—চিতার চতুর্দিক বেষ্টন করে আর এ সকলের মধ্যে ত্রিভুবনজয়ী রাক্ষসরাজ পাষাণ মূর্তির ন্যায় দণ্ডায়মান—এ দৃশ্য যেমন গম্ভীর, তেমনি হৃদয়বিদারক ! চিতারোহণের পূর্বে সঙ্গিনীগণের কাছে প্রমীলার বিদায় গ্রহণ এবং পরলোকগত বীরপুত্রকে সম্বোধন করে রাক্ষসরাজের মর্মভেদী বিলাপ পাঠ পাষাণ হৃদয়কে বিগলিত করে। এমন স্বাভাবিক, এমন হৃদয়বিদারক বিলাপ অতি অল্পই চোখে পড়ে। প্রমীলা চিতারোহণের পূর্বে সখীদিগকে সম্বোধন করে বললেন—

'লো সহচরি, এতদিনে আজি
ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলা স্থলে
আমার, ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে
কহিও পিতার পদে এসব বারতা।'

হতভাগ্য রাক্ষসরাজকে এসকল শোনাবার জন্যই কি বিধাতা এত কিছুর পরেও বাঁচিয়ে রেখেছেন ? রাবণের এই দুঃখের কাছে রামচন্দ্রের শাণিত অস্ত্রের তীক্ষ্ণতাও যেন ম্লান হয়ে যায়। এমতাবস্থায় হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করার শক্তি তাঁর ছিল না, আবার আত্মসংযমেও তিনি যেন অক্ষম। ধীরে ধীরে, পুত্র ও পুত্রবধূর চিতার সামনে অগ্রসর হয়ে তিনি বলতে লাগলেন—

'ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে,—
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র তোমায়, করিব
মহাযাত্রা। কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা ? ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে।'

একথা সত্য যে রাবণ অপরাধী, কিন্তু কবি তাঁর যে প্রায়শ্চিত্ত বর্ণনা করেছেন, তা যেন তাঁর অপরাধের থেকেও বেশি বলে মনে হয়েছে। নবম সর্গের পুত্রশোক-কাতর রাক্ষসরাজকে দেখলে তাঁর অপরাধ বিস্মৃত হয়ে তাঁর প্রতি সহানুভূতি জাগবে পাঠকের। রাক্ষসরাজের অতি বড় শত্রুও এই সর্গে তাঁর দুঃখে অশ্রুপাত না করে পারবে না। শোকজর্জরিত রাক্ষসরাজের ব্যবহারে কবি মানব-হৃদয়ের একটি নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। অনেক সময় দেখা যায়, অপরাধ করেও মানুষ তার নিজের অপরাধ বুঝতে পারে না, অথচ বিধাতার ন্যায় দণ্ডে দণ্ডিত হলে তখন সে ভাবে কি অপরাধে তাকে এই দণ্ড পেতে হচ্ছে ! মেঘনাদের শ্মশান শয্যাতেও সীতাপহারক রাক্ষসরাজের মুখে আমরা শুনতে পাই—

'.....কি পারে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে ?'

এই আত্মবঞ্চনাই মানব-প্রকৃতির ধর্ম, যা রাবণ চরিত্রের মধ্য দিয়ে কবি দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু রাবণ আত্মবঞ্চক হলেও ইষ্টদেবে ভক্তিপরায়ণ ; তাই তাঁর মর্মভেদী আর্তনাদে কৈলাসে ভক্তবৎসলের হৃদয় ব্যথিত হয়েছিল। তিনি মেঘনাদ ও প্রমীলাকে কৈলাসপুরীতে আনার জন্য পুতাশনকে আজ্ঞা দিলেন। ইরম্মদরূপী অগ্নির স্পর্শে সহসা চিতা প্রজ্জ্বলিত হ'ল। স্বদেশ বৎসল, পিতৃ-মাতৃভক্ত বীর মেঘনাদের এবং পতিগতপ্রাণা সাধ্বী প্রমীলার ভৌতিক দেহ ভস্মীভূত হল। কিন্তু তাঁদের অমর আত্মা দিব্যদেহ গ্রহণ পূর্বক ঊর্ধ্বলোকে প্রস্থান করল। বিস্মিত লঙ্কাবাসীগণ—

'দেখিলা আগ্নেয়রথ, সুবর্ণ আসনে
সে রথে আসীন বীর বাসবিজয়ী
দিব্যমূর্তি ; বামভাগে প্রমীলা রূপসী
অনন্ত যৌবন-কান্তি শোভে তনুদেশে
চিরসুখ হাসি রাশি মধুর অধরে।'

যেখানে মেঘনাদ ও প্রমীলার দেহ ভস্মীভূত হয়েছিল, সেই স্থানে একটি সুন্দর মঠ নির্মিত হল। চিতাভস্ম সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করে এবং দাহ্যস্থান মন্দাকিনীর জলে ধৌত করে—

'করি স্নান সিন্ধুনীরে রক্ষঃদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পারে, আর্দ্র অশ্রুনীরে,
বিসর্জি প্রতিমা যথা দশমী দিবসে ;
সপ্ত দিবা নিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।'

কবি অশ্রুজলের মধ্য দিয়ে তাঁর কাব্য আরম্ভ করেছিলেন এবং অশ্রুজলের সঙ্গেই তা শেষ করেছেন। বীরবাহুর শোকে কাতর রাক্ষসরাজের আর্তনাদে যে কাব্যের আরম্ভ, মেঘনাদ ও প্রমীলার চিতারোহণের সঙ্গেই তার শেষ। 'মেঘনাদবধ' কাব্যের আদি, মধ্য এবং অন্ত—সমস্তটাই বিষাদপূর্ণ, সেখানে বীররস অপেক্ষা করুণ রসেরই প্রাধান্য।

৬.৬ অনুশীলনী

১। 'মেঘনাদবধ' কাব্যের মহাকাব্যত্ব নির্ণয় করুন।

অথবা 'মেঘনাদবধ' কোন্ শ্রেণির মহাকাব্য ? প্রথম সর্গ অবলম্বনে এই কাব্যের মহাকাব্যেত্ব নির্দেশ করুন।

২। মধুসূদন কাব্যের সূচনায় জানিয়েছেন যে তিনি বীররসের মহাকাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছেন—পাঠ্য সর্গ অবলম্বনে 'মেঘনাদবধ' কাব্যের রস বিচার সম্পর্কে কবির এই মন্তব্য কতখানি গ্রহণযোগ্য।

৩। প্রথম সর্গ অবলম্বণে 'মেঘনাদবধ' কাব্যের রাবণ চরিত্রের পরিচয় দিন।

অথবা মধুসূদনের রাবণ চরিত্রের বিশেষত্ব কোথায় আলোচনা করুন।

৪। 'মেঘনাদবধ' কাব্যে চতুর্থ সর্গের প্রয়োজনীয়তা কতখানি—আলোচনা করুন।

অথবা 'সমালোচকগণ মনে করেন 'মেঘনাদবধ' কাব্যের চতুর্থ সর্গ একটি বিচ্ছিন্ন অংশ'—এ সম্পর্কে আপনার মত জানান।

৫। 'মেঘনাদবধ' কাব্যের চতুর্থ সর্গ অবলম্বনে সীতা চরিত্রের পরিচয় দিন।

অথবা রামায়নের সীতার চরিত্রের সঙ্গে মধুসূদনের সীতা চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য দেখান।

৬। নবম সর্গ অবলম্বনে মেঘনাদ ও প্রমীলার চিতারোহণের যে বর্ণনা কবি দিয়েছেন তা আলোচনা করুন।

অথবা নবম সর্গ অবলম্বনে রাবণের ট্র্যাজেডির পরিচয় দিন।

৭। প্রথম সর্গের সূচনা হয়েছিল বীরবাহুর মৃত্যুতে রাবণের চিত্ত-হাহাকারের মধ্য দিয়ে এবং নবম সর্গ শেষ হয়েছে পুত্র মেঘনাদ ও পুত্রবধূ প্রমীলার অন্তোষ্টিক্রিয়ায় রাবণের মর্মভেদী হাহাকারে। আলোচনা করুন।

৮। প্রথম ও নবম সর্গ অবলম্বনে 'মেঘনাদবধ' কাব্যের রস পরিণাম বিচার করুন।

৬.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১। ড. সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত— মধুসূদন কবি ও নাট্যকার

২। ড. ক্ষেত্র গুপ্ত—মধুসূদনের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্প

৩। দীননাথ সান্যাল—মেঘনাদবধ কাব্য

৪। সম্পাদনা মোহিতলাল মজুমদার—মেঘনাদবধ কাব্য

৫। ড. তারাপদ মুখোপাধ্যায়—আধুনিক বাংলা কাব্য

একক ৭ ❐ রবীন্দ্রনাথ

গঠন

৭.০ উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবনা
৭.১ সারাংশ ও আলোচনা
৭.১.১ মেঘদূত
৭.১.২ অনুশীলনী
৭.২ বসুন্ধরা
৭.২.১ অনুশীলনী
৭.৩ জীবনদেবতা
৭.৩.১ অনুশীলনী
৭.৪ স্বপ্ন
৭.৪.১ অনুশীলনী
৭.৫ উদাসীন
৭.৫.১ অনুশীলনী
৭.৬ আগমন
৭.৬.১ অনুশীলনী
৭.৭ অপমানিত
৭.৭.১ অনুশীলনী
৭.৮ দূর হতে কী শুনিস
৭.৮.১ অনুশীলনী
৭.৯ মুক্তি
৭.৯.১ অনুশীলনী
৭.১০ তপোভঙ্গ
৭.১০.১ অনুশীলনী
৭.১১ সবলা
৭.১১.১ অনুশীলনী
৭.১২ সাধারণ মেয়ে
৭.১২.১ অনুশীলনী
৭.১৩ বাঁশিওয়ালা
৭.১৩.১ অনুশীলনী
৭.১৪ দেখিলাম অবসন্ন চেতনার গোধূলি বেলায়
৭.১৪.১ অনুশীলনী
৭.১৫ তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
৭.১৫.১ অনুশীলনী
৭.১৬ গ্রন্থপঞ্জি

৭.০ উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবনা

রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবন ধরে সাহিত্য চর্চা করেছেন। তাঁর প্রথম কাব্য 'কবিকাহিনী' লেখা হয় ১৮৭৮ সালে এবং শেষ কাব্য 'জন্মদিনে' লেখা হয় মৃত্যুর পূর্বে ১৯৪১ সালে। অর্থাৎ ষাট বছরেরও বেশি সময়ে তিনি অজস্র কাব্য কবিতা এবং গান রচনা করেছেন। সেই সব কাব্য-কবিতা এবং গানের বিষয়বৈচিত্র্য ও ভাব গভীরতা পাঠককে মুগ্ধ ও বিস্ময়বিমূঢ় করে। সীমা এবং অসীমের মিলন সাধনে কবি-চিত্ত নিত্য আন্দোলিত হয়েছে। মানবজীবন ও বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরালে যে আনন্দময় পরমসত্তার লীলা তাকে তিনি অনুভব করতে চেয়েছেন। বিশ্বের যাবতীয় খণ্ড সৌন্দর্যের পিছনে তিনি অখণ্ড সৌন্দর্যসত্তার অস্তিত্ব লক্ষ করেছেন। রূপ এবং অরূপকে তাই তিনি ঐক্যসূত্রে বন্ধ করতে চেয়েছেন। এই অরূপের অনুভূতি থেকেই তাঁর কাব্যে জন্ম নিয়েছে বিশ্ববোধ, প্রকৃতি ও মানবের মধ্যেকার গূঢ় রহস্য-চেতনা, মানব মহিমার জয়গান, অপার্থিব প্রেম ও সৌন্দর্য ধ্যান, প্রকৃতির প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণ ও গভীর মমত্ববোধ রবীন্দ্রকাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতির রূপ-রস-গান তিনি যেমন উপভোগ করেছেন, তেমনি তাঁর অলৌকিকত্ব, অনন্তত্ব ও অসীমত্বও উপভোগ করেছেন। প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক। প্রকৃতির মধ্যে তিনি প্রাণের সন্ধান পেয়েছেন। তাই সমুদ্র তাঁর কাছে আদিজননী বসুন্ধরা, পদ্মা তাঁর প্রেয়সী, সূর্য তাঁর কাছে অনুভূত হয়েছে সর্বপ্রামের উৎসরূপে। বিশ্ব নিখিলের প্রাণের সঙ্গে আপনার যোগকে তিনি উপলব্ধি করেছেন গভীরভাবে। মর্ত্য-পৃথিবীর প্রতি তাঁর নিবিড় ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ষাট বছরেরও বেশি সময় ধরে কাব্যচর্চা করেছিলেন। পঁয়তাল্লিশ খানারও বেশি কাব্য তিনি রচনা করেছেন। 'কবিকাহিনী', 'বনফুল', 'ভগ্নহৃদয়', 'ভানুসিংহের পদাবলী', 'শৈশব সঙ্গীত'—এগুলি মূলত অপরিণত পর্বের রচনা। তবে এগুলির মধ্যে 'ভানুসিংহের পদাবলী' বিস্ময় জাগায়। এগুলি মূলত ১৮৭৮ সাল থেকে প্রকাশিত এবং ১৮৮২ সালের পূর্বে রচিত কাব্য। এগুলিকে তিনি পরিণত কাব্য সংকলনে স্থান দিতে চাননি। সন্ধ্যাসঙ্গীত (১৮৮২) থেকে কবির কবিতা পরিণতি পেতে থাকল। এরপর লেখা হল 'প্রভাত্ সঙ্গীত', 'ছবি ও গান', 'কড়ি ও কোমল'। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' বিষণ্ণতার কাব্য, 'প্রভাত সঙ্গীতে' কবির দৃষ্টি বহির্জগতে প্রসারিত হল, 'ছবি ও গানে' বস্তুজগতের অজস্র ছবি শব্দ সহযোগে আঁকা হয়েছে। 'কড়ি ও কোমলে' কবির ভাবানুভূতি ও রূপসাধনা ক্রমে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে শুরু করেছে। তার নবপর্বের সূচনা হয়েছে 'মানসী' (১৮৯০) থেকে। এই পর্বেই কবির সঙ্গে শিল্পী এসে যোগ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন কবি। ১৮৯৪-এ প্রকাশিত হয় 'সোনারতরী'। 'মানসী' কবির যৌবনকালের কাব্য। এই কাব্যে কবির প্রেম-চেতনা প্রকাশিত। তবে ইন্দ্রিয়ানুগ প্রেমচেতনাকে কবি ক্রমে ইন্দ্রিয়াতীত ভাবসর্বস্বতায় পরিণতি দিয়েছেন। 'সোনারতরী' ও 'চিত্রায়' (১৮৯৬) কবির সৌন্দর্য ও প্রেমচেতনার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। 'মানসী' থেকে কবির প্রকৃতি চেতনার বিশিষ্টতা দানা বাঁধতে থাকে। কোনো কোনো কবিতায় চিরন্তন সৌন্দর্যের জন্য রোমান্টিক কবির বিরহার্তি ফুটে উঠেছে। 'সোনারতরী'তে অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের জন্য নিরুদ্দেশ যাত্রার কামনা যেমন বাণীরূপ পেয়েছে, তেমনি মর্তমমতার প্রতি গভীর আকুলতা আত্মপ্রকাশ করেছে। সৌন্দর্য ও প্রেমের যে নিবিড় অনুভূতি আমরা 'চিত্রা'য় পেয়েছি 'চৈতালী' (১৩০৩)-তে তারই পরিণতি দেখতে পাই। 'কল্পনা' (১৯০০) রোমান্টিক কবির স্বপ্নলোকের কাব্য। এই কাব্যে কবি কল্পনাকে দূত করে কালিদাসের উজ্জয়িনীতে, এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের যে-কোনো স্থানে মানস ভ্রমণ করেছেন। 'ক্ষণিকা' (১৯০০)-য় লঘু চটুল সুরে কবি জীবনের এক গভীর সত্যকে তুলে ধরেছেন। 'নৈবেদ্য' (১৯০১) কাব্যে কবির আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রাথমিক ধারা ব্যক্ত হয়েছে। 'স্মরণ' এবং 'শিশু' ব্যক্তিজীবনের ঘটনা অবলম্বনে রচিত।

১৯১০ থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত একটি নতুন পর্বের সূচনা হয়। এই পটে লেখা হয় 'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি'। 'খেয়া'তে পার্থিব জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে কবি অরূপানুভূতির আহ্বানে যাত্রা করেছেন।

'গীতাঞ্জলি'তে অরূপকে লীলাময় রূপে কবি কাছে পেয়েছেন। কাব্যের আঙ্গিক হিসেবে কবি গানকেই আশ্রয় করেছেন। ভক্ত-ভগবানের প্রকৃত মাধুর্যময় লীলার অনেকটাই প্রকাশ পেয়েছে গীতিমাল্যে। 'গীতিমাল্য'তে কবি যেন পৃথিবীর দিকে তাকিয়েছেন, বিশ্ব-লীলার মধ্যে ভগবানকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন।

'বলাকা' (১৯১৬) থেকে 'বনবাণী' (১৯৩১) পর্যন্ত কবির কাব্যের পরবর্তী যুগ। 'বলাকা' রবীন্দ্র-কাব্যের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। 'বলাকা' কবির গতিরাগের কাব্য। এর শিল্পরূপেও আছে নতুনত্ব। 'পূরবী' (১৯২৫) তে পৌঢ় কবি যৌবন স্মৃতি রোমমন্থন করতে চেয়েছেন। 'পূরবীর' জগৎ ও জীবন-প্রীতি 'মহুয়া'তে এক নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। 'মহুয়া'তে কবির প্রেমচেতনার প্রসাধনকলা ও সাধনবেগের প্রকাশ ঘটেছে। 'পুনশ্চ' থেকে রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্বের শুরু। 'পুনশ্চের' প্রকাশ ১৯৩২। 'পুনশ্চ' (১৯৩২), 'বিচিত্রতা', 'শেষ সপ্তক', 'বীথিকা', 'পত্রপুট', 'শ্যামলী' (১৯৩৬) প্রভৃতি কাব্যে নতুন ছন্দ ও বাক্‌বিন্যাসরীতির বিচিত্র পরীক্ষা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'প্রান্তিক' (১৯৩৮), 'সেজুঁতি', 'আকাশ প্রদীপ', 'নবজাতক', 'সানাই' (১৯৪০) কাব্যে কবির মৃত্যুভবনা, উপনিষদিক বোধ, অতীত জীবনের মূল্যায়ন, মর্তমমতা প্রভৃতি প্রকাশ পেয়েছে। 'রোগশয্যায়' (১৯৪০) এবং 'আরোগ্য' (১৯৪১)-তে কবির রোগ-ভোগ জনিত বিক্ষোভ, মৃত্যুর সত্যরূপ, মানবত্বের অমরাত্মার প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস ভাষা পেয়েছে। 'জন্মদিনে' কাব্যে পৃথিবীর প্রতি আসন্ন বিশ্বাস ধ্বনিত হয়েছে। তাঁর শেষ কাব্য গ্রন্থ 'শেষলেখা' মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়।

৭.১ সারাংশ ও আলোচনা

৭.১.১ মেঘদূত

কালিদাসের অমর কাব্য 'মেঘদূত' রবীন্দ্রনাথের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছে। এই প্রভাবের শ্রেষ্ঠ নির্দশন তাঁর অনবদ্য কবিতা 'মানসী'র 'মেঘদূত'। আষাঢ়ের প্রথম দিনের মেঘ দেখে কালিদাস তাঁর মেঘদূত রচনা করেন। ফলে প্রথম আষাঢ়ের বর্ষার সঙ্গে মেঘদূত চিরকালের মতো বিজড়িত হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন—'.....মেঘদূতের মেঘ প্রতিবৎসর চিরনূতন চিরপুরাতন হয়ে দেখা দেয়। কালিদাস উজ্জয়িনীর প্রাসাদশিখর হইতে যে আষাঢ়ের মেঘ দেখিয়াছিলেন, আমরাও সেই মেঘ দেখিয়াছি.....। মেঘদূত ছাড়া নববর্ষার কাব্য কোনো সাহিত্যে কোথাও নাই। ('নববর্ষা'/বিচিত্র প্রবন্ধ)। কালিদাসের 'মেঘদূত' এক বিরহী যক্ষের হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত বেদনার রাগিণী। কালিদাসের যক্ষের বিরহ ব্যক্তিগত, রবীন্দ্রনাথ যক্ষের সেই ব্যক্তিগত বিরহের মধ্যে বিশ্বের সকল বিরহীর বাণীকে পুঞ্জীভূত হতে দেখেছিলেন। এ দেখা আধুনিক কবির দেখা। দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতায় কালিদাসের 'মেঘদূত' পরিণত হয়েছে নবমেঘদূতে।

কালিদাসের 'মেঘদূত' মূলত সম্ভোগের কাব্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কবি-মানস মেঘদূতের কাঠামোর মধ্যে বারে বারে নতুন তাৎপর্য আবিষ্কার করেছে ; এক অভিনব ভাবলোক সৃষ্টি করেছে। যক্ষ ও যক্ষবধূর বিরহকে রবীন্দনাথ মানুষের চিরন্তন বিরহের প্রতীকরূপে দেখিয়েছেন। অলকা তাঁর কাছে কামনার মোক্ষধাম, আদর্শ সৌন্দর্যের পাদপীঠ। যক্ষ ও যক্ষবধূর বিরহের উপর তিনি নতুন আলোক সম্পাত করেছেন—আপন কল্পনা ও অনুভূতির রঙে রাঙিয়ে নিয়েছেন। কালিদাস বর্ণিত সৌন্দর্যময় অলকায় রক্তমাংসের বাস্তব যক্ষপত্নী বাস করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিকট সেই বিরহিনী তাঁর অশরীরিনী মানস-প্রিয়া, অনন্ত সৌন্দর্য ও নিত্য প্রেমের রাজ্য অলকায় একাকী কবির উদ্দেশ্যে নিত্যকাল একাকিনী জেগে আছে। কবির ভাগ্যে এ অভিশাপ আর ঘুচবে না, মিলন আর কোনোমতেই যেন সম্ভব নয়, কেবল চিরন্তন বিরহ-বেদনা, অপ্রাপ্তির বিষণ্ণতায় বিভোর হয়ে থাকা :

'ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি অনিদ্রনয়ান,
কে-দিয়েছে হেনশাপ, কেন ব্যবধান!
কেন ঊর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ!
কেন প্রেম নাহি পায় আপনার পথ!'

কালিদাসের কার আর একাল অর্থাৎ সেকাল থেকে একালের এই ব্যবধানই রোমান্টিক কবিকে বিরহাতুর করে তুলেছে। কবি আজ শত চেষ্টা করলেও কালিদাসের কালের সেই উজ্জয়িনী অথবা অলকা, যেখানে নিত্য-জ্যোৎস্না বিরাজিত ছিল, যেখানকার জনপদবধূদের চোখের চাহনিতে পথিকের দিকভ্রম হত, যেখানকার নারীরা ধূপের ধোঁয়ায় তাদের কেশরাশির পরিচর্চা করত, সেখানে কবি সশরীরে পৌঁছোতে পারবেন না। সেই অগম্য স্থানে, ভ্রমণ না করতে পারা, সেখানকার সেই সৌন্দর্য আস্বাদ করতে না পারার কষ্টই কবিকে বিচলিত করেছে। তাই কবি কল্পনাকে দূত করে পৌঁছে যেতে চেয়েছেন তাঁর বিরহিনী মানস-প্রিয়ার কাছে। একালের কবি মেঘদূতের মধ্যে বিশ্বের সকল বিরহীর বেদনাকে অনুভব করেছেন। অনুভব করেছেন সেদিনের উজ্জয়িনী প্রাসাদ শিখরের ঘনঘটা, 'বিদুৎ-উৎসব' বাতাসের উদ্দামবেগ, মেঘের গুরুগুরু রব। মেঘের সেই গম্ভীর নির্ঘোষের মধ্যে কবি শুনেছেন বহু বরষের বিরহীর বিচ্ছেদ ক্রন্দন। কালের প্রাচীরকে ধ্বংস করে সেইদিন মেঘদূতের শ্লোকরাশির মধ্যে চিরদিবসের রুদ্ধ-অশ্রুজলকে ঝরে পড়তে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রিয়া-বিরহে কাতর যত বিরহীর গান 'তোমার সংগীতে/পাঠায়ে কি দিলে, কবি, দিবসে নিশীথে/দেশে দেশান্তরে খুঁজি বিরহিনী প্রিয়া?' কালিদাসের সেই 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবস' এরপর কত শতবার নববর্ষার স্নিগ্ধ দিবস পার হয়ে গেছে, প্রতি বর্ষা দিয়ে গেছে নতুন জীবন শুধু নয়, 'নবঘনস্নিগ্ধ মেঘচ্ছায়া', নব নব 'জলমন্ত্রের' ধ্বনি।

সঙ্গিহীন কবি বহুকাল ধরে প্রিয়াহীন ঘরে আষাঢ়ের সন্ধ্যায় ক্ষীণদীপালোকে বসে মেঘদূত পাঠে নিমগ্ন হয়েছেন। বহুযুগের ওপার থেকে সেকালের মানুষের কলধ্বনি সমুদ্রে তরঙ্গের মতো যেন কাব্যপাঠে আত্মমগ্ন কবির কর্ণে এসে প্রবেশ করেছে। আর কবি ভারতের পূর্বে সেই শ্যামবঙ্গাদেশে অবস্থান করছেন যেখানে কবি জয়দেব কোনো এক বর্ষা দিনে দেখেছিলেন 'শ্যামছায়া, পূর্ণ মেঘে মেদুর অম্বর।'

আজকের কাজল কালো মেঘের ঘনঘটায় যে অন্ধকার দিবস, সেখানে দুরন্ত বাতাসের হাতছানি, অরণ্যের উদ্যত হাহাকার এবং বিদ্যুতের বক্র হাসি যেন শূন্যে আছড়ে পড়েছে। এই অন্ধকারময় পরিবেশে রুদ্ধদ্বার গৃহে কবি পড়ছেন মেঘদূত, তাঁর গৃহত্যাগী মন ছুটে যেতে চাইছে দেশ থেকে দেশান্তরে, আম্রকূট পর্বতের চূড়ায়, রেবা নদীতীরে, বিন্ধ্যপর্বতে, বেত্রবতীর কূলে, জম্বুবনচ্ছায়ে, কেতকীর বেড়া ঘেরা দশার্ন গ্রামে, যেখানে বিহগেরা বর্ষায় নীড় রচনা করতে ব্যস্ত, যেখানকার জনপদ বধূরা ভ্রূবিলাস শেখেনি, মেঘের ঘনঘটা দেখে যাদের নীল নয়নে ছায়া পড়ে, যেখানকার সিদ্ধাঙ্গানারা স্নিগ্ধমেঘ দেখে উন্মনা হয়ে উঠে গুহাশ্রয় খোঁজে, যেখানে দ্বিপ্রাহরিক অন্ধকারকে সন্ধ্যা মনে করে প্রণয় চাঞ্চল্য বিস্মৃত হয়ে পারাবতরা ভবনশিখরে আত্মরক্ষায় তৎপর হয়, যেখানকার রমণীরা শুধুমাত্র বিরহবিকারে প্রেমাভিসারিণী হয় অন্ধকার রাজপথ মধ্যে। কোথায় সেই ব্রহ্মবর্ত কুরুক্ষেত্র, কোথায় সেই কনখল যেখানে জহ্নুকন্যা যৌবন চাঞ্চল্যে গৌরীর ভ্রূকুটিকে অবহেলা করে পরিহাসছলে ধূর্জটির জটা ধরে খেলা করে। এইভাবে কবিমন মেঘরূপে দেশ-দেশান্তরে ভেসে শেষে কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে যেখানে বিরহিণী প্রিয়া তথা সৌন্দর্যের আদিস্রষ্টা বিরাজ করছে সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। সেই অমর ভুবনে মহাকবি কালিদাস ছাড়া আর কেই বা নিয়ে যেতে পারত! সেখানে অনন্ত বসন্ত, নিত্য পুষ্পবনে নিত্যচন্দ্রালোক, সুবর্ণসরোজফুল্ল সরোবরকুলে ক্রন্দনরতা বিরহিণী বসে। কালিদাসের প্রেম-মন্ত্রে আজ কবি-রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের যত বন্ধনের ব্যথা সব মুক্ত হয়ে গেছে। কবি আজ বিরহের স্বর্গলোকে উপস্থিত হয়েছেন। এই বিরহের স্বর্গলোক কবির কাছে অনন্ত সৌন্দর্যের আধার।

বস্তুত মনুষ্যজীবন বন্ধনের ব্যথায় সর্বদাই কাতর। বন্ধন মানুষকে সংকীর্ণ সীমায় বন্ধ করে, মুক্ত প্রান্তরে বিস্তীর্ণ করে দেন না। কবি আজ প্রিয়াবিরহে কাতর, কালের প্রাচীরে বন্ধ মন আজ মুক্তি পেয়েছে মেঘদূত পাঠে। কবি এখন বিরহের স্বর্গলোকে উপস্থিত হয়েছেন। এই বিরহই জীবনের সত্য। যে বিরহিণী প্রিয়া, প্রিয়-বিরহে কাতর হয়ে অশ্রুমোচন করছে, সে প্রকৃতপক্ষে প্রতীক্ষা করছে, তার এই প্রতীক্ষায় আছে সাধনা। রবীন্দ্রনাথ একেই প্রেমের 'সাধনবেগ' বলেছেন। কালিদাসের 'মেঘদূত', 'পূর্বমেঘ' এবং 'উত্তরমেঘ' অর্থাৎ 'প্রতীক্ষা' এবং 'মিলন' এই দু'খণ্ডে বিভক্ত। যে প্রেমে প্রতীক্ষা আছে, যে প্রেম ত্যাগে বা সাধনায় মহিমাজ্জ্বল রূপলাভ করে সেখানেই থাকে প্রকৃত সৌন্দর্য। 'অলকাপুরী' তাই রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রেমের মোক্ষধাম, 'বিরহের স্বর্গলোক'—সৌন্দর্যের প্রাসাদপুরী। একসময় এই অলকাপুরী কবি-চিত্ত থেকে হারিয়ে যায় বাস্তবের অভিঘাতে। শুরু হয় বৃষ্টির অবিরাম ধারা। আর রোমান্টিক কবি অতল বেদনারাশি নিয়ে বিস্ময় ব্যাকুলভরে এই প্রশ্ন করেন—'সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে/মানস সরসী তীরে বিরহ শয়ানে/রবিহীন মনিদীপ্ত প্রদোষের দেশে... ।' কবির সেখানে না যেতে পারাই বেদনার কারণ। একালের প্রাচীরে বন্ধ কবি কালিদাসের কালে কী করে যাবেন ? কবিমন উপস্থিত হতে পারলেও সশরীরে সেখানে যাওয়া তো কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। কালের এই ব্যবধান কবিকে বেদনার্ত করেছে ....'মেঘদূত' কবিতায় তারই প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

৭.১.২ অনুশীলনী

১। 'মানসী' কাব্যের 'মেঘদূত' কীভাবে নবমেঘদূতে রূপান্তরিত হয়েছে লিখুন।

অথবা 'মেঘদূত' কবিতাটি কোন্ কাব্যের অন্তর্ভুক্ত ? কবিতাটির মধ্যে এই কাব্যের মূল সুর কীভাবে ধরা পড়েছে দেখান।

অথবা 'মেঘদূত' কবিতায় রোমান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথের বিরহ চেতনার প্রকাশ ঘটেছে—আলোচনা করুন।

৭.২ বসুন্ধরা

'সোনারতরী' কাব্যের একটি বিখ্যাত কবিতা 'বসুন্ধরা'। আলোচ্য কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের মর্তপৃথিবীর প্রতি গভীর ভালোবাসার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। মাটির প্রতি দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় আকর্ষণ, মর্ত পৃথিবীর জল, হাওয়া, তৃণ-গুল্মলতার প্রতি তীব্র আসক্তি, রবীন্দ্র-কাব্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। কবির বাল্যকালে যে প্রকৃতি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির জানালার গরাদের ফাঁকফোকর দিয়ে ইসারায় কবিতে ডাকত কিন্তু কাছে পেত না ; সেই প্রকৃতিকেই কবি মুক্ত চিত্তে আলিঙ্গান করলেন শিলাইদহে পৌঁছিয়ে 'সোনার তরীর' অসামান্য কবিতাগুলি তাই এক অর্থে শিলাইদহের প্রকৃতির দান। একদা গরাদে বন্ধ কবির মুক্ত প্রকৃতির প্রতি প্রণয়ের আকর্ষণ প্রবল থাকা সত্ত্বেও যা মিলনে পর্যবসিত হওয়া সম্ভব ছিল না, জীবনের পরিণত পর্বে শিলাইদহের সেই গ্রাম্য প্রকৃতির বিস্তীর্ণ প্রান্তরে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ আস্বাদ করে কবি প্রাণ তৃপ্ত হল। সেই প্রশান্ত প্রাণে কবি সুন্দরী প্রকৃতির যে বর্ণনা দিলেন তা 'ছিন্নপত্রাবলী'র পৃষ্ঠা থেকে গ্রহণ করা যেতে পারে :

> 'ঐ যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন
> ভালোবাসি ! ওর এই গাছপালা, নদী, মাঠ, কোলাহল,
> নিস্তব্ধতা, প্রভাত, সন্ধ্যা, সমস্তটা সুদ্ধ দু'হাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে।'

প্রকৃতির প্রতি এই ভালোবাসা, সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে নিজেকে প্রসারিত করে দেবার আকাঙ্ক্ষাই ঘোষিত হয়েছে 'বসুন্ধরা' কবিতায়। বসুন্ধরার সঙ্গে কবির জননী সন্তানের সম্পর্ক। জননী বসুন্ধরার ক্রোড়ে কবি ফিরে যেতে চেয়েছেন, অনুভব করেছেন তার সঙ্গে নাড়ির যোগ। বসুন্ধরার সঙ্গে কবির পরিচয় জন্ম-জন্মান্তরের। জননী বসুন্ধরার উদ্দেশে কবি তাই বললেন—

আমারে ফিরায়ে লহো অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে
বিপুল অঞ্চলতলে।'

সৌন্দর্যপিপাসু কবি জীবনের সংকীর্ণ প্রাচীর ভেঙে, নিরানন্দ অন্ধ কারাগার ভেদ করে তৃণ গুল্মপত্রের সরস জীবন রসে মিশে যেতে চেয়েছেন, স্পর্শ করতে চেয়েছেন 'শস্যক্ষেত্রতল'। মহাসিন্ধুর তীরে তীরে কবি-মন নৃত্যে সংগীতে হিল্লোল তুলতে চাইছে।

কবি কল্পনার সাহায্যে উদ্দাম-উন্মুক্ত প্রকৃতি প্রান্তরে গেছেন, প্রকৃতির উদার প্রবাহের মাঝে দাঁড়িয়ে তাঁর বদ্ধ হৃদয় দেশ-দেশান্তরের পানে ছুটে যেতে চেয়েছে। কবি গৃহকোণে বসে লুব্ধ চিত্তে কৌতূহল বশে অধ্যয়ন করেছেন সেই সমস্ত মানুষের কথা যারা দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করে ফিরেছেন একদা, কবি যেন তাদেরই সঙ্গে মনে মনে কল্পনার জাল বুনে এক দেশ থেকে অন্যদেশে যাত্রা করেছেন। মহাপিপাসার রঙ্গভূমি সেই দুর্গম প্রদেশের পথহীন, তরুহীন সীমাহীন প্রান্তরের ধূলিশয্যার উপর কবি জ্বরাতুরা, শুষ্ককণ্ঠ, একাকী বসুন্ধরাকে যেন পড়ে থাকতে দেখলেন। অথচ কবি বাতায়নে বসে বসে এতদিন বসুন্ধরার যে ছবি এঁকেছিলেন সেখানে স্ফটিক স্বচ্ছ নীলাকাশ, নীল সরোবর, শৈলমালা, মেঘখণ্ড বসুন্ধরাকে যেন শিশুর মতো আঁকড়ে ছিল। নীল গিরিপর্বতমালার হিমরেখা যেন স্বর্গভেদ করে পৌঁছিয়েছে যোগমগ্ন মহাদেবের তপোবন দ্বারে। কবি মানসভ্রমণ করেছেন সুদূর সিন্ধুপারে, যেখানে ধরণি অনন্ত কুমারী ব্রত ধারণ করে, হিমবস্ত্রে আভরণহীন নিঃসঙ্গ অবস্থায় পড়ে রয়েছে, যেখানে 'অনন্ত আকাশে/অনিমেষ জেগে থাকে নিদ্রাতন্দ্রাহত / শূন্যশয্যা মৃতপুত্রা জননীর মতো।' কবি মন পর্বতসংকটে একখানা ছোট্টগ্রামে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এখানে নদীর তীরে পড়ে আছে জাল, তরী ভাসছে জলে, জেলে ধরছে মাছ ; আর গিরির মাঝ দিয়ে চলেছে নদী। কবির ইচ্ছে করে সুখাচ্ছন্ন সেই গৃহগুলিকে বাহুপাশে আঁকড়ে ধরতে। দুর্দম আরব সন্তান হয়ে স্বাধীনভাবে মরুতে মরুতে বিচরণ করতে ইচ্ছে করে কবির, স্বজাতি হয়ে সবার সঙ্গে দেশ থেকে দেশান্তরে ভ্রমণ করতে সাধ হয় তাঁর। তিব্বত, পারসিক, প্রাচীন, চীন, জাপান....যেখানে নেই কোনো ধর্মাধর্ম, নেই প্রথা, নেই দ্বন্দ্ব, যেখানে আপন-পর ভেদ নেই, যেখানে 'উন্মুখ জীবনস্রোত বহে দিনরাত', যেখানে 'বৃথাক্ষোভে নাহি চায় অতীতের পানে/ভবিষ্যৎ নাহি হেরে মিথ্যা দুরাশায়/বর্তমান তরঙ্গের চূড়ার চূড়ায়/নৃত্য করে চলে যায় আবেগে উল্লাসি'...সেই সতেজ, নির্ভীক, শিষ্টাচার দেশে জন্ম নিতে ইচ্ছা করে কবির ; সে জীবন উচ্ছৃঙ্খল হলেও কবি তাকেই ভালোবাসেন।

কবি-প্রাণ সব সময়ই সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে। নগরকলকাতার বাসিন্দা কবি যখন পরিচিত শহর ছেড়ে শিলাইদহের প্রান্তরে এসে প্রকৃতির নিষ্কলঙ্ক রূপ পরিদর্শন করলেন তখন এতদিনকার অভ্যস্ত প্রতিবেশ, সেখানকার মানুষ, দৈনন্দিন জীবন সবই কবির কাছে তুচ্ছ হয়ে ধরা পড়ল। প্রকৃতি জননী কত উদার, কত সুন্দর, কত নির্মল তা কবি প্রত্যক্ষ করলেন এবং প্রকৃতির সেই স্নেহময়ীরূপ দেখেই কবি ঘুম ভেঙে 'সোনার তরী'তে উঠে বসলেন, আহ্বান করলেন মানসসুন্দরীকে, আর ব্যাকুলকণ্ঠে জননী বসুন্ধরার উদ্দেশে বললেন : 'আমারে ফিরায়ে লহ অয়ি বসুন্ধরে'। শূন্য প্রকৃতি প্রান্তর কবিকে হাতছানি দিয়ে নিয়ে গেল মহাজ্যোতিষ্কের পথে এই নক্ষত্রের দেশে।

'বসুন্ধরা' কবিতাটি কবি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি প্রীতির একটি বড় পরিচয়। সমগ্র বিশ্বের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত ও মিশ্রিত করে দিয়ে জল-স্থল-অন্তরীক্ষের প্রতিটি অবস্থার সৌন্দর্য ও রস পান করবার জন্য কবি আকুল হয়েছেন। নিখিলের বিচিত্র আনন্দ কবি সকলের সঙ্গে এক হয়ে আস্বাদন করতে চেয়েছেন। বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে এক-আত্মা, এক-দেহ হয়ে জীবনের অন্তহীন রসোপলব্ধির পিপাসা মেটাতে উৎসুক। তিনি কীট-

পতঙ্গ, পশু-পক্ষী, তরু-লতা হয়ে যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করে ধরিত্রীর স্তনসুধা পানের জন্য ব্যাকুল। তিনি জানেন একই প্রাণ জড়জগৎ, প্রাণীজগতের মধ্যে দিয়ে বিকাশের স্তরে স্তরে তরঙ্গায়িত হয়ে চলেছে। এখানকার নদী-গিরি-সমুদ্র-আকাশের সৌন্দর্য ও সংগীত কবির মনকে আনন্দে মাতোয়ারা করে। কবি তাঁর এই আবেগময় অনুভূতিকে কাব্যের ঐশ্বর্য দান করেছেন। এই অনুভূতিই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাত্মা বোধের মূল প্রেরণা। বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা হওয়াতেই কবি-প্রাণের পরম শান্তি—'বসুন্ধরা' কবিতায় তারই প্রকাশ।

৭.২.১ অনুশীলনী

১। 'বসুন্ধরা' কবিতা অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাত্মাবোধের পরিচয় দিন।

২। 'বসুন্ধরা' কবিতা অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রীতির পরিচয় দিন।

৭.৩ জীবনদেবতা

'চিত্রা' কাব্যের একটি অন্যতম প্রতিনিধি স্থানীয় কবিতা হ'ল জীবনদেবতা'। এই কাব্যে 'অন্তর্যামী' কবিতাতেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম স্পষ্টভাবে তাঁর জীবনে মহাশক্তির লীলার কথা বলেছেন। কবির অন্তরবাসিনী কবিকে নিয়ে এক কৌতুকে মেতেছেন। কবি যা কিছু রচনা করেছেন তাতে তাঁর কোনো আত্মকর্তৃত্ব নেই, তাঁর অন্তর্যামী—'অন্তর মাঝে বসি অহরহ/মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ/মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ/মিশায়ে আপন সুরে।' এই অন্তর্যামী 'জীবনদেবতা' কবিতায় কবির জীবনদেবতা রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কখনও বলেছেন 'জীবনদেবতা', কখনও বা 'জীবননাথ'। কবির এই জীবনদেবতাকে নিয়ে সমালোচক মহলে বিতণ্ডার শেষ নেই। কিন্তু কবি যখন স্বয়ং এই জীবনদেবতার স্বরূপ ব্যাখ্যায় প্রয়াসী হন, তখন সেই তত্ত্বে একটা নতুন মাত্রা যুক্ত হয়।

জীবনদেবতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আত্মপরিচয় প্রবন্ধে কবি 'চিত্রা' কাব্যের 'জীবনদেবতা' কবিতা থেকে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করেছেন। কবিকে দেওয়া জীবনদেবতার সম্পদ তিনি ফিরে পেয়েছেন অন্যভাবে। আপনার দুঃখ ও আনন্দ সবকিছুই তিনি তুলে দিয়েছেন ঐ জীবনদেবতার করপুটে! এই জীবনদেবতা কবির জীবননাথ। কবির জীবনে, তাঁর সুখ-দুঃখের মধ্যে লীলাময় রূপে বিরাজ করেছেন। কবি তাঁকে 'বঁধু' ও 'কবি' বলেও সম্বোধন করেছেন। সর্বোপরি এই জীবনদেবতার সঙ্গে গড়ে উঠেছে কবির বিবাহবন্ধন—

'নূতন করিয়া লহ আরবার
চিরপুরাতন মোরে
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমা নবীন জীবন ডোরে।'

'চিত্রা' কাব্যের নাম কবিতায় কবির জীবন দেবতা এসেছে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর রূপ ধরে। এই সৌন্দর্যলক্ষ্মী কবির কাছে দুইভাবে প্রকাশিত—জগতের মাঝে যিনি বিচিত্র রূপিণী, তিনিই কবির অন্তরবাসিনী। এই বিশ্বসৌন্দর্য লক্ষ্মীকে যখন কবি দেখলেন, তখন লাভ করলেন নবজন্ম। কবির সঙ্গে তাঁর অন্তরবাসিনীর এই ভালোবাসা শুধু ব্যক্তিগত অনুভূতিতে সীমাবদ্ধ নয়, বিশ্বচেতনার সঙ্গে কবি চেতনার সংযোগ সাধন। তাঁর কাছে কবি নিজেকে নিঃশেষে সঁপে দেন 'অকুল শান্তির আশায়'। কবি এই অন্তরবাসিনীকে কৌতুকময়ী আখ্যা দিয়েছেন। কৌতুকময়ীর সংগীতস্রোতের কুল দেখতে না পেয়ে কবি শেষ পর্যন্ত বিস্ময়ে হার মেনেছেন। কৌতুকময়ীকে তিনি বলেছেন 'আমার প্রেয়সী, আমার দেবতা, আমার বিশ্বরূপী'। শেষে এই কৌতুকময়ীর চরণে ঘটেছে কবির নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। অতঃপর কবিকণ্ঠে ব্যাকুল প্রশ্ন ধ্বনিত হয়েছে—

'ওহে অন্তরতম
মিটেছে কি তব সকল তিয়াস
আসি অন্তরে মম।'

এই কৌতুকময়ীই কবির জীবনদেবতা। কিন্তু কবির এই অন্তরতম জীবনদেবতা কে ? এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে জানিয়েছেন—'চিত্রায় জীবনরঙ্গভূমিতে যে মিলন-নাট্যের উল্লেখ হয়েছে তার কোনো নায়ক-নায়িকা জীবের সত্তার বাইরে নেই, এবং তার মধ্যে কেউ ভগবানের স্থলাভিষিক্ত নয়।' কবির মনোলোকের আদর্শ প্রেরণাকেই কবি বলেছেন 'অন্তরতম'। রবীন্দ্রনাথ জীবনদেবতাকে শুধু কেবল তাঁর কাব্য প্রচেষ্টার নিয়ামক বলে মনে করেন নি, জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়ে জীবন-দেবতা তাঁর জীবন-সূত্রটি ধরে আছেন এবং সুখ-দুঃখ, ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে তাঁকে পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর করে দিয়েছেন।

চারটি স্তবকে বিন্যস্ত 'জীবনদেবতা' কবিতায় কবি তাঁকে অন্তর্যামী তথা অন্তরতম বলে সম্বোধন করেছেন। কবি জানতে চেয়েছেন, কবিচিত্তে তাঁর আবির্ভাব হওয়ার আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে কিনা। এখানে জীবনদেবতাকে নায়ক রূপে কল্পনা করে তাঁর পৃথক সত্তা মেনে নিয়ে কবি তাঁর প্রীতি উৎপাদনের চেষ্টা করেছেন। দ্রাক্ষাসম আপন বক্ষদেশকে কবি তাই নিষ্ঠুর পীড়নে পীড়িত করেছেন। হৃদয়ের সমস্ত কামনা-বাসনা পুড়িয়ে কবি নিজেকে খাঁটি বিশুদ্ধ সোনায় পরিণত করেছেন। জীবনদেবতার সঙ্গে ক্ষণিক খেলায় কবি মেতেছেন। তাঁর সঙ্গে খেলার জন্য নিত্যনতুন রূপ সৃষ্টি করেছেন।

দ্বিতীয় স্তবকে কবির জীবনদেবতা কেন তাঁকে আপনার লীলাক্ষেত্রে বরণ করেছেন তা কবি জানেন না। কবির জিজ্ঞাসা তাঁর কর্ম ও নর্ম জীবনদেবতার তৃপ্তিসাধন করতে পেরেছে কিনা। তাঁর আরও জিজ্ঞাসা, জীবনদেবতা কি তাঁর সৌন্দর্যময়ী জীবন উদ্যানে ভ্রমণ কারে যৌবনকুসুমগুলি তুলে নিয়ে গলায় পরিধান করেছেন ?

তৃতীয় স্তবকে কবি আপন স্খলন, পতন, ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। এখানে তিনি জীবনদেবতাকে 'বঁধু' বলে সম্বোধন করেছেন। কবি মনে করেন, তাঁর জীবনদেবতা তাঁকে দিয়ে যে রাগিণী ধ্বনিত করে তুলতে চেয়েছিলেন তা যেন কবি ঠিকমতো রচনা করতে পারেননি। সর্বশেষ স্তবকে কবি তাঁর জীবনদেবতাকে নতুন রূপে তাঁকে গড়ে নিতে বলছেন। জীবনদেবতার সঙ্গে কবির জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক, তাই চির-পুরাতন কবিকে তিনি যেন নতুন করে নতুনভাবে তাঁকে গড়ে নিয়ে নতুন বিবাহ ডোরে যেন বাঁধেন।

রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা'র স্বরূপ সন্ধানে অগ্রসর হয়ে 'চিত্রা' কাব্যের 'সিন্ধুপারে' কবিতাটির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এক অপ্রাপনীয় সৌন্দর্য সন্ধানে কবি যাত্রা করেছেন 'সিন্ধুপারে', 'পৌষের রাতে' এক অবগুণ্ঠনবতীর অঙ্গুলি সংকেতে। অজানা এক নতুন দেশে কবি এলেন জনহীন এক প্রাসাদপুরীতে, যেখানে নীরবে সেই রহস্যময়ী কবিকে তাঁর পাশে বসালেন। তাঁর স্পর্শে কবির 'হিম হয়ে এলো সর্বশরীর শিহরি উঠিল প্রাণ'। কবি সেই অবগুণ্ঠনবতীকে প্রশ্ন করলেন 'কে তুমি নিদয় নীরবললনা কোথায় আনিলে দাসে ?' সে কথার উত্তর না দিয়ে অবগুণ্ঠনবতী কবির দিকে দৃষ্টিপাত করলেন ; প্রাণ পেয়ে জেগে উঠল বিজন প্রাসাদ। কবি ব্যাকুল হয়ে জানালেন মণিবেদিকায় উপনিতা সেই রমণীকে—'সব দেখিলাম, তোমারে দেখিনি শুধু।' অতঃপর কৌতুকময়ী অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে কবির সামনে দাঁড়ালেন। কবিকণ্ঠে বিস্ময় ধ্বনিত হল এই বলে—'এখানেও তুমি জীবনদেবতা ?' আদর্শ সৌন্দর্য চিরকালই অপ্রাপনীয়। একদা কীটসও সৌন্দর্যের সন্ধানে যাত্রা করেছিলেন নাইটিঙ্গেলের উদ্দেশ্যে। রবীন্দ্রনাথও যাত্রা করেছেন সেই সৌন্দর্যের অভিলাষে। এই যাত্রায় যত বেদনা, ততই প্রেমের উৎকর্ষ। সেই আনন্দ বেদনার উজ্জ্বল স্বাক্ষর 'চিত্রা' কাব্য।

বস্তুত কবির অন্তরে যিনি কবি, যিনি দুঃখ সুখের বিচিত্র সম্পদের আপনার চেয়ে আপন তিনিই কবির জীবনদেবতা। 'The Poetic personality within the Poet'—এই জীবনদেবতা শুধু রবীন্দ্রনাথের আপন

সম্পদ নন, প্রতিটি মানুষের অন্তরে রয়েছে তাঁর স্থান। অতএব রবীন্দ্রনাথের কাব্যে জীবনদেবতা নিঃসন্দেহে কবি রবীন্দ্রনাথের অন্তরের কবিসত্তা। মূর্তিমান 'Artistic Tallent', যাকে ব্যাখ্যার দ্বারা স্পষ্ট করা যায় না, তা শুধু অনুভববেদ্য। এই মূর্তিমান কবি প্রতিভা, যা কবির সৃষ্টি লীলায় বাঙ্ময়। জীবনের উপান্তপর্বে 'পূরবীর' লীলাসঙ্গিনী কবিতায় ফিরে এসেছিলেন কি তিনিই? কোনো কোনো সমালোচকের মতে, এই জীবনদেবতা আত্মপ্রকাশ করেছেন 'পূরবীর' 'লীলাসঙ্গিনী' কবিতায়। অনেকের মতে, কবির জীবনদেবতা বিশ্বদেবতার নামান্তর। কিন্তু কবি নিজে জীবনদেবতাকে শুধু আত্মানুভূতি হিসেবেই দেখেননি। আপনার গভীরতম সত্তাকে কবি বিশ্বের জল-মাটি-হাওয়ার মধ্যে অনুভব করতে চেয়েছেন। বাস্তবিক পক্ষে জীবনদেবতা রবীন্দ্রনাথের কাব্যজগতে একটি বিচ্ছিন্ন কোনো ব্যাপার নয়, মরমী কবির কাব্যের বৈশিষ্ট্যের অঙ্গামাত্র। তাই 'চিত্রার' জীবনদেবতা একাধারে 'অন্তরতম' এবং লীলাসঙ্গিনীও বটে। তিনিই 'কৌতুকময়ী', তিনিই 'জীবনদেবতা', তিনি 'বধূ', সৌন্দর্যলক্ষ্মী, লীলাসঙ্গিনী, কবির অন্তরবাসিনী। 'তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'লীলা' শব্দটির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার থেকে এ সত্য প্রমাণিত হয়। সেখানে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'অন্তরের অহেতুক আনন্দকে বাহিরে প্রত্যক্ষগোচর করার দ্বারা তাকে পর্যাপ্তি দান করবার যে চেষ্টা তাকে খেলা না বলে লীলা বলা যেতে পারে।' সুতরাং 'লীলা' শব্দটির দ্বারা রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টিতত্ত্বও বোঝাতে চেয়েছিলেন। জগৎ স্রষ্টা লীলাময় এবং সেই রকম সাহিত্য স্রষ্টাও। অতএব 'লীলাসঙ্গিনী' বলতে কবির সৃষ্টি কর্মের যিনি সহচরী তাকেই বোঝাতে চেয়েছেন। সুতরাং এই জীবনদেবতা কবির জীবনের সৃষ্টি সহচরী, 'গোপনতরঙ্গিনী' এবং 'রসতরঙ্গিনী'। এই কবিসত্তাই কবির জীবনদেবতা।

৭.৩.১ অনুশীলনী

১। 'চিত্রা' কাব্যের 'জীবনদেবতা' কবিতার জীবনদেবতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করুন।

২। 'চিত্রা' কাব্যের 'জীবনদেবতা' কবিতাটির মূল ভাব ব্যক্ত করুন।

৩। 'চিত্রা' কাব্যের 'জীবনদেবতা' কবিতার জীবনদেবতা কে? এই জীবনদেবতার সঙ্গে কি পুরবীর 'লীলাসঙ্গিনী' কবিতার কোনো যোগ আছে?—আলোচনা করে বুঝিয়ে দিন।

৭.৪ স্বপ্ন

'কল্পনা' কাব্য রোমান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথের এক অমূল্য সম্পদ। 'কল্পনা' কাব্যের প্রধান লক্ষণীয় বিষয়বস্তু হল এই কাব্যের রূপনির্মাণ এবং সংস্কৃতের স্বাদ। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ অনুরাগ 'স্বপ্ন' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। কালিদাসের কালের একটি অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এ কবিতায়।

ছটি স্তবকে বিভক্ত 'স্বপ্ন' কবিতাটিতে কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের প্রভাব লক্ষ করা যায়। কালিদাসের কাব্য রবীন্দ্রনাথকে জীবনের প্রারম্ভ থেকেই প্রভাবিত করেছিল। সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের সমালোচকেরা বলে থাকেন যে, কালিদাসের সর্বস্ব হল 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'। রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের শকুন্তলার প্রভাব 'মানসী'র 'কুহুধ্বনি' কবিতায় গ্রহণ করেন। কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্যে 'শকুন্তলা'র চেয়েও 'মেঘদূত'-এর প্রভাবই সমধিক। একালের কবি রবীন্দ্রনাথ উজ্জয়িনীর কবি কালিদাসের সঙ্গে রোমান্টিক ভাব সাযুজ্য অনুভব করেছেন। 'স্বপ্ন' কবিতাটি লেখা হয় বোলপুরে ৯ই জৈষ্ঠ তারিখে। কবিতাটির মধ্যে বর্ষার কাব্য 'মেঘদূতের' স্মৃতি আছে, অথচ কবিতার রচনাকাল বর্ষা নয়। বস্তুত কবি কল্পনা এমন একটি শক্তি, যা পাঠককে অনায়াসে একাল থেকে সেকালে আকর্ষণ করে। কবিতার বিভিন্ন অংশে 'মেঘদূতে'র ছাপ আছে। কবি মনে করেন তিনি জন্মজন্মান্তর ধরে বর্তমান আছেন। কালিদাসের কালেও তিনি ছিলেন। এ যুগে তিনি বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করে স্বপ্নে শিপ্রানদীতীরে উজ্জয়িনীপুরে তাঁর পূর্বজন্মের প্রিয়ার সন্ধানে অভিসার করেছেন। এই নারীর রূপ বর্ণনা করেছেন

রবীন্দ্রনাথ অলকার নায়িকার রূপানুসারে। তাঁর প্রিয়া সে যুগের বেশ-বাস ও প্রসাধনে সুসজ্জিত হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করল বটে, কিন্তু সে ভাষা ভুলে যাওয়ায় তাঁদের বাক্যালাপ হল না—কেবল দৃষ্টি বিনিময়ে মুখের ভাবে ও দেহের স্পর্শে তাঁদের প্রণয় ব্যক্ত হল—

মোরে হেরি প্রিয়া
ধীরে ধীরে দীপখানি দ্বারে নামাইয়া
আইল সম্মুখে—মোর হস্তে হস্ত রাখি
নীরবে শুধাল শুধু, সকরুণ আঁখি
'হে বন্ধু আছতো ভালো?' মুখে তার চাহি
কথা বলিবারে গেনু—কথা আর নাহি।'

দ্বিতীয় স্তবকে উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দিরের কথা আছে। আছে মঙ্গালচিহ্ন যুক্ত প্রেয়সীর ভবনের কথা, রয়েছে কপোতের কথা। পরবর্তী স্তবকে আছে মালবিকার উল্লেখ এবং মহাকাল মন্দিরে সন্ধ্যারতির প্রসঙ্গ।

তৃতীয় স্তবকে চন্দনের পত্রলেখা বহন করে গায়ে উতলা নিশ্বাস ফেলে যার আবির্ভাব হল তার কথা কিন্তু 'মেঘদূতে' নেই। আছে রবীন্দ্রনাথেরই অন্তরে, যেহেতু সেই নায়িকা কালের নয়, একালের। তাই কবিকে সে প্রশ্ন করেছে শব্দহীন ইঙ্গিতে, 'হে বন্ধু আছ তো ভালো?' এই নায়িকা যক্ষবধূর সঙ্গে নিঃসম্পর্কিতা এবং একালের কবির প্রেয়সী নয়, কবির জন্ম-জন্মান্তরের পূর্বেকার প্রেয়সী। তাই কারুরই অপরের নাম মনে নেই। চতুর্থ স্তবকে দুজনে তরুতলে দাঁড়িয়ে অনেক ভাবনার পর পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিবিনিময় পূর্বক 'অবারে ঝরিল অশ্রু নিস্পন্দ নয়ানে।'

পঞ্চম স্তবকে সেই নায়িকা তার পূর্বজনমের প্রেমিকের হাতে হাত রেখেছেন এবং নত বৃন্তপদ্মের মতো প্রেমিকের বক্ষে নামিয়েছেন মুখখানি। উভয়ের নিশ্বাসে নিশ্বাসে মিলন হল—'ব্যাকুল উদাস/নিঃশব্দে মিলিল আসি নিশ্বাসে নিশ্বাস।' সর্বশেষ স্তবকে যেন মোহঘোর অবলুপ্ত, হারিয়ে গিয়েছে উজ্জয়িনী। মনের পট থেকে দূরে সরে গিয়েছে শিপ্রানদী তীরে আরতির ধ্বনি। বস্তুত কল্পনার লীলায় একালের কবি ছিলেন সেকালে, কিন্তু যেহেতু তা কল্পনাই, সুতরাং বর্তমানের স্বপ্ন চুরমার হয়ে কবি বাস্তবের মাটিতে ফিরে এলেন। কবিতাটির নামও তাই স্বপ্ন! এ যেন বাস্তবের নয়, কল্পনা বিলাসীর স্বপ্নের জগতের পরিভ্রমণের কবিতা।

৭.৪.১ অনুশীলনী

১। 'স্বপ্ন' কবিতায় রোমান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি যে অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে তা আলোচনা করুন।

২। কালিদাসের কালের অপূর্ব স্মৃতি 'স্বপ্ন' কবিতায় কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে দেখান।

৩। 'স্বপ্ন' কবিতায় কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের যে প্রভাব অনুভূত হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৭.৫ উদাসীন

'ক্ষণিকা' কাব্যের একটি অন্যতম প্রধান কবিতা 'উদাসীন'। এই কবিতায় কবি সহজ জীবনের সহজ আনন্দটুকু উপভোগ করতে চান। জগৎ ও জীবনের মোহ থেকে মুক্ত মন সকল বন্ধন ভেঙে ফেলে মনের স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছেন। সমস্ত কর্ম বন্ধন থেকে রেহাই মিলেছে তাঁর, তিনি এখন ছুটি পেয়ে এসে উঠছেন খেলা ঘরে। তিনি জীবনে কোনো সুযোগ-সুবিধার আশায় বসে থাকেন না, নিজে যেটুকু পেয়েছেন, তাতেই তিনি

তুষ্ট, পরের জিনিসে তাঁর কোনো আগ্রহ নেই। জীবনের সকল কামনা-বাসনা ত্যাগ করে কবি এক সহজ জীবনে প্রবেশ করেছেন, এখানে কেবলই মুক্তি ও আনন্দ।

জীবনের তরীখানি কোনো এক অদৃশ্য কাণ্ডারীর দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। আমরা যখন নিজেরা তার হাল ধরার চেষ্টা করি তখন নান বিপর্যয় এসে হাজির হয়। তাই কবি হাল ছেড়ে দিয়ে নৌকাটিকে তার মতন চলার সুযোগ করে দিয়েছেন। জগতের কোনো কিছুর প্রতি তাঁর মন আসক্ত নয়, তিনি বৈরাগীর উদাসীন দৃষ্টিতে জগৎকে দেখেছেন। এখন তাঁর দৃষ্টি মোহমুক্ত স্বচ্ছ ও সহজ। জীবনপথে চলতে চলতে মানুষ নানা সুযোগের অপেক্ষা করে, কিন্তু সন্ন্যাসী কবি সে-সব থেকে দূরে অবস্থান করেন, কোনো কিছুর খেয়াল না করে এগিয়ে চলেন। উন্নতকামী মানুষের মতো কবি সব সময় উপরে ওঠার খেলায় না মেতে, সে পথ এড়িয়ে চলেন। বস্তুত কবি সেই উদাসীন মানুষ, যিনি উপরে ওঠার সুবিধা না পেলে নীচে পড়ে থাকতেও তাঁর আপত্তি নেই।

যেটুকু সহজ ভাবে আসে কবি তাকেই পেতে চান। যেখানে কিছু দেবার আছে বা জানবার আছে তাকেও দেখতে-জানতে চান সহজভাবে। তাইতো কবি বলেছেন 'ভালো মন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে।'—এটাই ক্ষণিকার জীবনদর্শন। কোনো কিছুকে জোর পূর্বক আঁকড়ে ধরার ইচ্ছে তাঁর নেই, তাই যা কিছু হাত ছাড়া হয়ে যায় তাকে তিনি নির্দ্বিধায় ছেড়ে দেন। কারও কথা শোনার ধৈর্যও যেমন তাঁর নেই, কারুকে কথা শোনাবার দায়ও তাঁর নয়। সুখকর হোক বা দুঃখকর—যে-কোনো স্মৃতিই মানুষের অনেক কথাকে ধরে রাখে। সেই সব স্মৃতি কখনও বিস্মৃতির অতল গহ্বর থেকে উঠে আসে মানুষের মনে। কিন্তু কবির মনের মধ্যে লীন হয়ে থাকা যে সকল স্মৃতি আছে তাকে তিনি তুলে আনতে চান না। সাধারণত প্রেমের ক্ষেত্রে দেখা যায়, মন দেওয়া নেওয়াতেই মানুষের তৃপ্তি—যদি মনের মতো মানুষ মেলে। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় জীবনে বিপরীতটাই ঘটে। প্রেমের ছলনায় মানুষ বারবার ভুল করে, আঘাত পায়, আঘাত দেয়। এই কারণে কবি মনের কারবারে রাজি নন—দীর্ঘজীবনে নানা ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে কবি প্রেমের অসারতা সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত হয়েছেন, তাই তিনি মানুষের মনের গতিপ্রকৃতির অনুসরণ করতে চান না। অন্যর হৃদয়ে স্থান পাবার আশায় তিনি হৃদয় দুয়ারে আঘাত করেছেন বারংবার, সাধ্য-সাধনাও করেছেন অনেক, এমনকী অশ্রুবিসর্জনও করেছেন একদা, কিন্তু এসব কিন্তু মানুষকে কখনই স্থায়ী শান্তি দিতে পারে না বলে উপলব্ধি হয়েছে তাঁর। তিনি মনে করেন, এভাবে কখনও প্রেম মেলে না। তবু মানুষ প্রেমের ছলনায় ভুল করে পথভ্রষ্ট হয়।

জীবনের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে কবি ছুটির আনন্দে বিভোর। জীবনের সকল দায়দায়িত্ব, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনার হাত থেকে মুক্ত হয়ে কবি খেলার আনন্দে মেতেছেন। কবি এখানে জগৎকে খেলার দৃষ্টিতে দেখেছেন, এবং ঠিক ভাবে খেলে যেতে পারলেই জীবনের সহজ সুরটা চিরকাল অব্যাহত থাকবে। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষায় কোনো শেষ নেই, সীমা নেই—তা কখনোই সম্পূর্ণ পূরণ হয় না। ফলে ব্যর্থতার বেদনায় মানুষ কাতর হয়, আশাহত হয়। কিন্তু আজ কবির মনে কোনো আশা নেই, তাই বুকভাঙার কোনো অবকাশও নেই। যা কিছু ভুলে যাওয়ার তাকে তিনি একেবারে ভুলে যেতে চান—কারণ স্মৃতি সব সময়ই বেদনাদায়ক ; বিস্মৃতি সেখানে শান্তি নিয়ে আসে। জগৎ স্রষ্টা নানা বন্ধনের বেড়ি পরিয়ে আমাদের পৃথিবীতে পাঠান, কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার শৃঙ্খলে বেঁধে তিনি আমাদের স্বাভাবিক স্বাধীন গতিকে রুদ্ধ করেন। কবি আজ সেই সব বেড়িকে ভেঙে ফেলে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন।

প্রকৃতিতেও বসন্তকালে ফুলের যে শোভা দেখা যায় তা উপলব্ধ হবে না যদি সঞ্চয়ের নেশা আমাদের পেয়ে বসে। বস্তুত সঞ্চয়ের মনোভাব মানুষকে জীবন ও জগৎকে উপভোগ করতে দেন না। হিসেবি মানুষের কাছে জীবনের সহজ রূপ ও রস কোনোটাই ধরা দেয় না। কবি আজ সেই ভুল সম্বন্ধে অবহিত হয়েছেন। কবি

এখানে ভ্রমরের উদাহরণ এনে জানিয়েছেন, ভ্রমর মধু সঞ্চয়ের জন্য ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু ফুলের সৌন্দর্য দেখে না। মধুপিয়াসী কবিও তেমনি জীবনে সঞ্চয় করতে গিয়ে জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। আলস্যে জীবনের কত বকুল, কত মুকুলকে তিনি দলিত মথিত করেছেন—আজ তাই তিনি সব থেকে দূরে সরে গেছেন নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তিনি জীবনকে দেখেছেন, জগৎকে দেখেছেন এবং এই দেখার মুহূর্তে তিনি লক্ষ করেছেন ত্রিভুবন তাঁকে অনুসরণ করছে। পুষ্পকে স্বাভাবিকভাবে ফুটতে দেওয়াই আমাদের দায়িত্ব, তাকে চেষ্টা করে ফুটিয়ে তোলা যায় না, আবার মুঠিতে চেপে ধরলে তা মলিন হয়ে যায়। এই সহজ সত্যটি উপলব্ধি করে কবি আজ সব কিছুর ওপর থেকে বাসনার দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে তাদের স্বাভাবিক বিকাশের সহায়ক হয়েছেন। কবি স্পষ্ট করে বলেছেন 'বড়ো যদি হতে চাও ছোট হও তবে'। তাই তো তিনি জীবনের সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে সহজ সত্যকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

বস্তুত 'ক্ষণিকা' আপাতদৃষ্টিতে হালকা সুরের কাব্য মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে সেই হালকা সুরের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শনটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। জীবনের অনেক পথ পাড়ি দিয়ে কবি উপলব্ধি করেছেন, সহজতাই জীবনের মূল মন্ত্র। এই সহজ সুরের সাধনায় কবি ব্রতী হয়েছেন এখানে। 'উদাসীন' কবিতাটি 'ক্ষণিকা' কাব্যের মূল সুরকে তুলে ধরেছে—এখানেই কবিতাটির সার্থকতা।

৭.৫.১ অনুশীলনী

১। 'উদাসীন' কবিতায় 'ক্ষণিকা' কাব্যের মূল সুর কীভাবে ধ্বনিত হয়েছে আলোচনা করুন।

২। 'উদাসীন' কবিতায় কবির যে জীবনদর্শন ফুটে উঠেছে তা দেখান।

৭.৬ আগমন

রবীন্দ্রনাথের ভগবদতেচতনার এক নতুন কাব্যফসল হল 'খেয়া'। 'খেয়া'র 'আগমন' কবিতায় এই কাব্যের মূল সুর ভগবদভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। রবীন্দ্র কাব্য-সাহিত্য-নাটকে রাজার নানা মূর্তির ছবি আঁকা আছে। রাজার চরম এবং পরম উভয় মূর্তিই সেখানে লক্ষিত হয়। তবে 'রাজা' সাংকেতিক অর্থেই বেশি ব্যবহৃত। 'ডাকঘর', 'রাজা' প্রভৃতি নাটকে 'রাজা' 'পরমাত্মা' বিশেষ। 'রক্তকরবী' ও 'মুক্তধারা'র রাজা মূলত প্রশাসক। 'খেয়া'র আগমন কবিতায় কবির সেই প্রিয়তম রাজার আগমন ঘটেছে রুদ্রমূর্তিতে। স্বয়ং কবি 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে এর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন—'খেয়াতে 'আগমন' বলে যে কবিতা আছে, সে কবিতায় যে মহারাজ এলেন তিনি কে ? তিনি যে অশান্তি। সবাই রাত্রে দুয়ার বন্ধ করে শান্তিতে ঘুমিয়ে ছিল, কেউ মনে করেন নি তিনি আসবেন। যদিও থেকে থেকে দ্বারে আঘাত লেগেছিল, যদিও মেঘ গর্জনের মতো ক্ষণে ক্ষণে তাঁর রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি স্বপ্নের মধ্যেও শোনা গিয়েছিল তবু কেউ বিশ্বাস করতে চাচ্ছিল না যে তিনি আসছেন, পাছে তাদের আরামে ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু দ্বার ভেঙে গেল—এলেন রাজা। ' বস্তুত 'আগমন' কবিতায় এই অশান্ত রাজার আগমনের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে।

ছ'টি স্তবকে বিন্যস্ত 'আগমন' কবিতায় 'আঁধার ঘরের রাজা'র আগমনের কথা বলা হয়েছে। তিনি আঁধার রাতে আসেন, মানুষের আরামের ব্যাঘাত ঘটাতে। রবীন্দ্র-ভাবনায় রাজার বিভিন্ন Concept ধরা পড়ে। তার মধ্যে 'আঁধার ঘরের রাজা' অন্যতম। 'রাজা' নাটকের রাজাও অন্ধকারেই দেখা দিয়েছিলেন রানী সুদর্শনাকে। তিনি যেমনি কঠিন, তেমনি কোমল। তার এক পদপাতে ধ্বংস, অন্য পদপাতে সৃষ্টি। এখানেও সেই রাজার কথা আছে। রাতে যখন সবাই দ্বার দিয়ে নিদ্রার আয়োজন করছিল তখন দু' একজন বলেছিল 'আসবে মহারাজ।'

অন্যদিকে 'সবাই তখন ভেবেছিল 'আসবে না কেউ আজ।' এখানে স্পষ্ট ঈশ্বর-আগমনের কথা বলা হয়েছে। আসলে ঈশ্বরানুভূতি বা ঈশ্বর উপলব্ধি সকলের হয় না, দু' এক জনেরই হয় এবং নিশ্চিত ভাবেই হয়। তাই দু' একজন বলেছিল স্থির বিশ্বাস রেখে যে 'আসবে মহারাজ'। কিন্তু অবিশ্বাসীর দল মনে করেছিল 'আসবে না কেউ আজ।' দ্বারে করাঘাত হয়েছিল, কিন্তু সবাই মনে করেছিল 'বাতাস বুঝি হবে'। নিশীথরাতে শোনা গিয়েছিল কোনও একটা শব্দ, ঘুমের ঘোরে সবাই ভেবেছিল বোধহয় মেঘের গর্জনধ্বনি। মাঝে মাঝে ধরণি কেঁপে কেঁপে উঠেছিল, যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা বলেছিলেন এ বুঝি রাজার রথচক্রের ঝন্‌ঝনানির শব্দ। কিন্তু যারা ঘুমিয়েছিল তারা বলেছিল এ হল 'মেঘের গরজনি।' তখনো রাত ফুরায়নি, এমন সময় বেজে উঠল ভেরী, কেউ যেন বলে গেল, আর দেরি নেই, তিনি আসছেন। সর্বত্র রব পড়ে গেল, মালা এলো, আলো এলো—আয়োজন শুরু হল। কিন্তু কোথায় সিংহাসন, কোথায় সভা, কোথায় কি ! আসলে তারা তো বিশ্বাস করতেই পারেনি যে রাজা আসবেন। তাই কোনও আয়োজনও করেনি। কিন্তু সর্বজ্ঞরা বলেছিল—'বৃথা এ ক্রন্দন / রিক্ত করে শূন্য ঘরে / করো অভ্যর্থনা'। কবিতার অন্তিম স্তবকে রাজার আগমন বার্তা পাওয়া গেল। চারদিকে শঙ্খধ্বনি বাজছে : 'বিদ্যুৎ ঝিলিক হানছে, ছিন্ন শয্যা দিয়েই আঙিনা সাজানো হচ্ছে। এমন সময় ঝড়ের সঙ্গে হঠাৎ এলেন 'দুঃখ রাতের রাজা'।

বস্তুত সাধারণ মানুষ ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা আলস্যে জীবন কাটাতে পারলেই খুশি থাকে। তাই তারা যখন শুনল রাজা আসবেন তখন সেকথা বিশ্বাস করতে পারল না, আরামের শয্যা ত্যাগ করে তারা তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করবে, এটাও তাদের স্বভাব বিরুদ্ধ। আসলে তারা অবিশ্বাসী। কিন্তু তিনি 'দুঃখরাতের রাজা', তাই অন্ধকার রাতেই তাঁর আগমন ভক্তের গৃহে। তিনি ঝড়ের মতন, যখন আসেন তখন তাণ্ডব নামে প্রকৃতিতে, তাই ধরণি কেঁপে ওঠে তাঁর রথচক্রধ্বনিতে। 'রাজা' নাটকেও রানী সুদর্শনার সঙ্গে রাজার মিলন হয়েছিল অন্ধকার ঘরেই—'আলোর ঘরে সকলেরই আনাগোনা—এই অন্ধকারে কেবল একলা তোমার সঙ্গে মিলন।' আসলে রুদ্রকে বাদ দিয়ে যে প্রসন্নতা, অশান্তিকে অস্বীকার করে যে শান্তি সে সত্য নয়। তাই বাস্তবে শান্তি আনয়ন করতে গেলে অশান্তি রূপ ভগবান তথা রাজার রুদ্রমূর্তিরই প্রয়োজন—'খেয়া'র 'আগমন' কবিতায় কবি সেই সত্যকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন।

৭.৬.১ অনুশীলনী

১। খেয়ার 'আগমন' কবিতায় কার আগমনের কথা বলা হয়েছে ? তাঁর আগমন কীভাবে হল বর্ণনা করুন।

২। 'আগমন' কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথের ভগবদ্ চেতনার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা আলোচনা করুন।

৭.৭ অপমানিত

'অপমানিত' গীতাঞ্জলির ১০৮ সংখ্যক গান, 'সঞ্চয়িতায়' 'অপমানিত' নামে সংকলিত হয়েছে। কবিতাটিতে কবির ঈশ্বর ভাবনার সঙ্গে স্বদেশ প্রেম যুক্ত হয়েছে। 'অপমানিত' গীতাঞ্জলির একটি বিখ্যাত কবিতা এবং কবির স্বদেশ ভাবনার একটি বলিষ্ঠ প্রকাশ এখানে লক্ষ করা যায়। 'গীতাঞ্জলি' রবীন্দ্রনাথের ভগবদ্ বিশ্বাসের কাব্য। তবে তাঁর ভগবদ্ বিশ্বাস কোনো বিশেষ ধর্ম নির্ভর নয়, সংসার বিরাগী কোনো তপস্বীর সাধনা নয়। তাঁর দেবতা কোনো মন্দিরে আবদ্ধ নন, মানুষের সমাজে যারা অধঃপতিত, নির্যাতিত, দরিদ্র, নিঃস্ব, সর্বহারা তাদের মধ্যেই তাঁর ভগবানের আসন পাতা। বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি তিনি কোনোদিনই কামনা করেননি, সংসারের সহস্র বন্ধনের মাঝেই তিনি মুক্তি সন্ধান করেছেন। আপন দেশেই তিনি তাঁর বিশ্বদেবতাকে উপলব্ধি করেছেন। যে স্বদেশে কবি তাঁর বিশ্বদেবতার প্রতিমূর্তি দেখেছেন, যে স্বদেশ বিশ্বমানবের মিলনক্ষেত্র ; সেই স্বদেশ কৃত্রিম

জাতিভেদের দ্বারা, কুসংস্কারের দ্বারা মানুষকে যে অস্পৃশ্য করে রেখেছে তাতে কবি ব্যথিত হয়েছেন। সেই ব্যথা থেকেই জন্ম নিয়েছে 'গীতাঞ্জলি'র 'অপমানিত' কবিতাটি।

কবি-মনের আন্তরিক ক্ষোভ প্রকাশের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে আলোচন্য কবিতাটি—

'হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।'

কবি মনে করেন, মানুষকে ঘৃণা করার প্রতিফল স্বরূপ ভগবানের কাছে একদিন তাকে চরমমূল্য দিতেই হবে—'মানুষের অধিকারে/বঞ্চিত করেছ যারে/সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান/অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।' বস্তুত গীতাঞ্জলিতে কবি এই সর্বমানবের ভগবানকে উপলব্ধি করেছেন। সকলের সঙ্গে তাঁর প্রেম লাভ করে তিনি ধন্য হতে চেয়েছেন।

মানবজীবনের একটি বড় অভিশাপ অস্পৃশ্যতা। ছোঁয়াছুঁয়ি, বাচবিচার, ছোট-বড়, উচ্চনীচ—এই ভেদাভেদ মানুষকে ক্রমে একে অপরের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। কিন্তু মানুষের মধ্যেই যে তার প্রাণের ভগবান বিরাজ করেন একথা সে বিস্মৃত হয়। ফলে মানুষকে ঘৃণা করে। কিন্তু মানুষকে ঘৃণা করা মানে সে তার প্রাণের ঠাকুরকেও ঘৃণা করে বসে। এই অপরাধের জন্য একদিন মানুষকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। দুর্ভিক্ষ, মহামারি, বন্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ যখন আসে তখন মানুষের সংসারের সকল বিভেদ ঘুচে যায়, মানুষ মানুষের সঙ্গে মিলিত হয়, একই সঙ্গে অন্ন ও জল গ্রহণ করে—এভাবেই তারা এক হয়ে যায়।

আমাদের বৃহৎ ভারতবর্ষে নিম্নবিত্ত অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষই অধিক। হিসেব করলে দেখা যাবে হাজারে নয়শত নিরানব্বই জনই সাধারণ মানুষ। সুতরাং তাদের অবহেলা করার অর্থ নিজেদের শক্তিকেই দুর্বল করে ফেলা। দেশের শক্তিকে অবহেলা করে দেশকে শক্তিশালী করা যায় না। দেশের প্রাণ যারা তাদের মধ্যেই নিজের স্থান করে নিতে হবে, পদদলিত, অবহেলিতদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে, তবেই অন্যায়ের হাত থেকে, পাপের হাত থেকে পরিত্রাণ মিলবে।

দেশের যারা শক্তি, সেইসব দরিদ্র, অসহায় মানুষদের যদি পিছনে ফেলে রাখা হয়, তাহলে তারাও সমাজকে পিছনের দিকেই টানবে। সমগ্র দেশকে যদি একটি মানবদেহ বলে ধরতে হয় তাহলে তার পিছনের অংশকে বাদ দিয়ে সামনের অংশকেই শুধু ধরলে চলবে না। এভাবে কখনোই সামনে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। কারণ দেহ সমগ্র, এক এবং অখণ্ড। তার কোনো অংশকে বর্জন করা মানে তার সামগ্রিকতা বা অখণ্ডতা নষ্ট হওয়া। পিছনের অংশকে যত দূরে সরিয়ে রাখা হবে ততই তার ভার বৃদ্ধি পাবে, ফলে সামনের অংশকে পিছনের ভারে বারবার পিছিয়ে পড়তে হবে—'যারে তুমি নিচে ফেল সে তোমারে বাধিবে যে নীচে,/পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে। অশিক্ষা, দারিদ্র্য, কুসংস্কার প্রভৃতির বন্ধনে সমাজকে আচ্ছন্ন করে রাখলে সমাজের কখনোই উন্নতি হতে পারে না। সকলের মঙ্গালেই সমাজের মঙ্গাল সাধিত হয়—দু'একজনের মঙ্গালে নয়। সে চেষ্টা করলে উভয়ের মধ্যে শুধু ব্যবধানই বেড়ে যায়। ফলে দেশের সার্বিক মঙ্গাল তাতে ব্যাহত হয়, জাতির উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হয়।

পঞ্চম স্তবকে কবি শতেক শতাব্দী ধরে অবহেলিত হয়ে আসা মানুষের চিত্র অঙ্কন করেছেন। কবি বলছেন, এই অপমানিত মানুষদের প্রণাম জানাতে হবে, তবেই ঈশ্বরকে প্রণাম জানানো হবে। একথা কবি গীতাঞ্জলির বেশিরভাগ কবিতাতেই বলেছেন। 'দীনের সঙ্গী', 'ধূলা মন্দির', 'ভারততীর্থ' প্রভৃতি কবিতা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কবির মতে, ভগবান মন্দির বা মসজিদে থাকেন না, তিনি আছেন দীন পতিতের মাঝখানে, খেটে খাওয়া মানুষের মাঝে। সুতরাং তাঁকে পেতে গেলে অপমানিতদের মাঝখানে নেমে আসতে হবে।

জাতি অভিমান মানুষকে মানুষের কাছ থেকে সরিয়ে রাখে। কবি তাই তার নিন্দা করেছেন। তিনি মৃত্যুকে

স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন যে, যদি এখনও মানুষ তার ভুল না বুঝতে পেরে থাকে তবে তার ভুল ভাঙতে মৃত্যুদূতকেই এগিয়ে আসতে হবে। চিতাভস্মের মধ্য দিয়ে সে প্রমাণ করে দেবে সব মানুষ সমান। জাত, ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের একটাই রূপ—সে মানুষ। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই একই উপাদানে গঠিত সকল মানুষ।

বস্তুত 'গীতাঞ্জলি'তে কবি এই সর্ব মানবের ভগবানকে কামনা করেছেন। মানবপ্রেমিক কবি রবীন্দ্রনাথ সকলের সঙ্গে তাঁর প্রেম লাভ করে ধন্য হতে চেয়েছেন। কারণ তিনি জানেন, জগতের দীন-দরিদ্র, রিক্ত-নিঃস্ব মানুষের মধ্যেই ভগবান বিরাজ করেন ; ধনী-মানীর সমাজে তাঁকে পাওয়া যায় না। কবি সেই ভগবানের প্রেম কামনা করে বলেছেন—'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো,

সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।'

'অপমানিত' কবিতায় এই কথাই বলেছেন। এই মানবপ্রেমের সঙ্গে কবির স্বদেশপ্রেমও যুক্ত হয়ে গেছে এখানে।

৭.৭.১ অনুশীলনী

১। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর ভাবনা সঙ্গে যে বলিষ্ঠ স্বদেশপ্রেম যুক্ত হয়েছে 'অপমানিত' কবিতা অবলম্বনে তা দেখান।

২। 'অপমানিত' কবিতা 'গীতাঞ্জলি' কাব্যধারার একটি অন্যতম কবিতা—আলোচনা করুন।

৩। 'রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর ভাবনা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকেন্দ্রিক নয়, সর্বমানবের মধ্যেই তিনি তাঁর ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছেন'—'অপমানিত' কবিতা অবলম্বনে সমালোচকের এই মন্তব্যের যাথার্থ্য নির্ণয় করুন।

৭.৮ ॥ 'দূর হতে কী শুনিস' ॥ (৩৭ সংখ্যক)

'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি'-র অধ্যাত্ম পর্বের পরে 'বলাকা' যেন রবীন্দ্রকাব্যের পালাবদলের সূচনা করল। রবীন্দ্রনাথ আবার প্রকৃতি ও মানুষের মাঝে ফিরে এলেন। রবীন্দ্র-কাব্যের ইতিহাসে 'বলাকা' একটা গুরুত্বপূর্ণ আসন দখল করে আছে। 'বলাকা' রবীন্দ্র কাব্যে একটা স্বতন্ত্র যুগ সৃষ্টি করল। সৃষ্টির অন্তর্নিহিত সত্যরূপটি এই পর্বে কবির চোখে পড়ল। সৃষ্টি নিরন্তর বেগে ছুটে চলেছে চির-পথিকের ন্যায়। এই গতিই বা অগ্রসর হওয়াই প্রকৃতি ও মানুষের ধর্ম। 'বলাকা'য় কবি দেখলেন নিরন্তর গতির মধ্যেই বিশ্বের প্রাণশক্তি নিহিত। এই গতির প্রতিপদে ধ্বংস এবং মৃত্যুর আবির্ভাব হচ্ছে, আর তার আবির্ভাবই নতুনের সম্ভাবনাকে সূচিত করছে। 'দূর হতে কী শুনিস' 'বলাকা' কাব্যের '৩৭' সংখ্যক কবিতায় তারই আভাস লক্ষিত হয়।

'বলাকার' '৩৭' সংখ্যক কবিতাটি 'ঝড়ের খেয়া' নামে পরিচিত। কবিতাটি প্রথম মহাযুদ্ধে সময় লেখা হয়। এই পর্বে কবি-প্রাণ যথেষ্টই পীড়িত হয়েছিল, তার প্রমাণ মেলে শুধু 'বলাকা'র কবিতায় নয়, ১৯১৪-র বেশ কিছু ভাষণে। এই ভাষণের বক্তব্য এবং 'ঝড়ের খেয়া' কবিতার পঙ্‌ক্তিতে হুবহু মিল লক্ষ করা যায়। বস্তুত যখন যুগ সংকট উপস্থিত হয়, কাল আবিল হয়ে ওঠে, তখন ইতিহাস পুরুষের কণ্ঠে নতুন পথে যাত্রার আহ্বান ধ্বনিত হয়। পুরানোর পুনরাবৃত্তিতে ক্লান্ত অতীতকে ঘুচিয়ে অনাগত ভবিষ্যৎকে বর্তমানের মধ্যে মূর্ত করে তোলার জন্য যুগন্ধর পুরুষ আহ্বান জানান। এই যুগন্ধর পুরুষকে কবি বলেছেন কাণ্ডারী। তারই আহ্বানে অনুগামীরা বেরিয়ে আসে। কবিতায় এই অনুগামীরা হল দাঁড়ি। কাণ্ডারীর দৃষ্টি নিবদ্ধ সুদূর ভবিষ্যতে। তার বজ্রমুষ্টিতে ধরা আছে হাল, কারণ তিনিই তরণীর কর্ণধার। কিন্তু তাঁর একার চেষ্টায় শুধু ইতিহাসের তরী গতি পায় না, গতি পায় অনেক দাঁড়ির সমবেত দাঁড় টানায়। ইতিহাসের তরী বর্তমানের বন্দর থেকে যাত্রা করে নতুন সৈকতের

সন্ধানে। এই যাত্রাপথ কণ্টকাকীর্ণ। সম্মুখে মৃত্যুর সমুদ্র তরঙ্গা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে। সমুদ্রের অপর পারে অমৃত। মৃত্যুকে পেরিয়ে সেই অমৃত লাভ করতে হয়। অন্ধকার থেকে আলোয়, মৃত্যু থেকে অমৃতে—মানুষের এই যাত্রা চলছে চিরকাল। মানুষের নিজের ভুলে ভরে ওঠে তার বর্তমান, আর তখনই ভুল থেকে বেরিয়ে সত্য লাভের আকুতি জাগে প্রাণে। সেই সত্যসন্ধিৎসা থেকে ভবিষ্যতের দিকে যাত্রার উৎসাহ মানুষকে পেয়ে বসে। আলোচ্য কবিতায় সেই দুঃসাহসিক যাত্রার এক বলিষ্ঠ ছবি আছে।

'বলাকার' 'শঙ্খ' কবিতায় কবি যে ফুলের অর্ঘ্য সাজিয়ে পূজার ঘরে শান্তি-স্বর্গ খুঁজতে গিয়েছিলেন, সে শান্তি বেশিক্ষণ মিললো না। তাই কবি পুজোর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন এবং 'ঝড়ের খেয়া'-য় লিখলেন—

'দুঃখের দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানা ছলে
অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে।'

দুঃখ-পাপ, অশান্তি-অমঙ্গালের এমন অকুণ্ঠ স্বীকৃতি রবীন্দ্র কবিতায় কখনও আগে চোখে পড়েনি। 'শঙ্খ' কবিতায় মানুষকে আহ্বান জানানোর শঙ্খ ধুলোয় পড়ে আছে দেখে কবি তা হাতে তুলে নিলেন এবং মানুষকে ডাক দিলেন অমঙ্গালের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দাঁড়াতে। সেই সংগ্রামের বলিষ্ঠ রূপ আঁকা হয়েছে 'ঝড়ের খেয়ায়'।

'উগ্রজাতি-অভিমান' সাম্রাজ্যবাদের রূপ নেয় যখন একটি জাতি ভাবতে শুরু করে তার পৃথিবী জুড়ে প্রভুত্বে অধিকার আছে, আর সকল জাতি তার দাস, তখন সেই সংকীর্ণ জাতি অভিমান 'মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান' ঘটায়, লোভী জাতি বিশেষের লোভ নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে দেখা দেয় 'বঞ্চিতের নিত্য চিত্ত ক্ষোভ'। একদিকে প্রবলের অন্যায় নখদন্ত বিস্তার করে, অন্যদিকে 'ভীরুর ভীরুতা পুঞ্জ' মাথা চাড়া দেয়। এভাবেই একদিন য়ুরোপীয় জাতিগুলি নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্বের অভিমানে এশিয়ায়, আফ্রিকায় প্রভুত্ব বিস্তার করেছিল। প্রভুত্ব বিস্তারে জার্মান যথাসময়ে মন দেয়নি, যখন দিল তখন 'আজ ক্ষুধিত জার্মানীর বুলি এই যে, প্রভু এবং দাস দুইজাতের মানুষ আছে, প্রভু সমস্ত আপনার জন্য লইবে, দাস সমস্তই প্রভুর জন্য যোগাইবে। যার জোর আছে সে রথ হাঁকাইবে আর যার জোর নাই সে পথ করিয়া দিবে।' 'কালান্তর' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'লড়াইয়ের মূল' প্রবন্ধে বিশ্বযুদ্ধ সম্বন্ধে প্রথম আলোচনা করেন রবীন্দ্রনাথ। যে সত্যের বোধে উজ্জ্বল 'লড়াইয়ের মূল' প্রবন্ধটি, সেই সত্য বোধের চকিত উদ্ভাস আছে 'ঝড়ের খেয়া' কবিতায়।

আলোচ্য কবিতায় পাপের দায় কবি চাপিয়েছেন অত্যাচার-অত্যাচারিত, প্রভু-দাস, বিজেতা-বিজিত নির্বিশেষ সকলে ঘাড়েই। বলেছেন—'ওরে ভাই কার নিন্দা কর তুমি ? মাথা কর নত/এ আমার এ তোমার পাপ।' এই কথাই তিনি 'ঝড়ের খেয়া' লেখার একবছর আগে শান্তিনিকেতনে ভাষণ মালায় 'পাপের মার্জনা'য় কবি বলেছিলেন। সমগ্র মানবসমাজ অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বন্ধ। একের বেদনা যেমন অপরকে সহ্য করতে হয়, একের ফল ভোগও তেমনি অপরকে ভাগ করে নিতে হয়। এইজন্য 'জাতি-অভিমানে' যারা মত্ত হ'ল, তাদের মত্ততার ফলভোগ করতে হয় নিরীহ দাস জাতিকে। বাতাস যখন ভারী হয়ে হাল্কা হতে থাকে, তখন তার প্রতিক্রিয়া চোখে পড়ে না। কিন্তু তারপর হঠাৎ ঝড় ওঠে, শুরু হয় ধ্বংসলীলা। এভাবেই সমাজের কোথাও পাপ জমে উঠলে তার বিষক্রিয়া সমগ্র মানব সমাজকে ভোগ করতে হয়, তাই কবি লিখলেন—'বিধাতার বক্ষে এই তাপ/বহুযুগ হতে জমি বায়ু কোণে আজিকে ঘনায়।' মানুষের পাপে বিধাতার বক্ষে যে তাপ জমেছে তার থেকেই আজ বায়ু কোণে ঝড় উঠেছে। এই পাপ যেমন সকলে, ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবেও সকলে।

যেখানে ক্রন্দনে আর্তনাদে লক্ষ বক্ষ থেকে রক্তের কল্লোল, যেখানে বহ্নিবন্যা তরঙ্গিত হচ্ছে, যেখানে ঝড়ের মেঘ জমেছে, যেখানে আকাশ আর পৃথিবীর দূরত্ব ঘুচে গিয়ে শুধুই মরনে মরনে আলিঙ্গান চলেছে—সেখানে তারই মধ্য দিয়ে পথ করে তরী নিয়ে পাড়ি দিতে হবে নতুন সমুদ্রতীরে। সুতরাং এই কবিতায়

প্রারম্ভেই আছে অশুভ শক্তির হাতে বিপর্যস্ত জগৎ ও জীবনের ছবি। এরই মধ্যে কাণ্ডারী এসেছেন, তার কণ্ঠে আদেশ ধ্বনিত হয়েছে—'বন্দরের বন্ধন কাল এবারের মত হল শেষ।' যখনই অতীত ধূসর হয়ে ওঠে, তার সত্যের পুঁজি ফুরায়, তখনই যুগ স্রষ্টার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় নবযুগের আহ্বান। এই যুগস্রষ্টাই কাণ্ডারী। তাদের কণ্ঠে ব্যাকুল প্রশ্ন—'নূতন ঊষার স্বর্ণদ্বার/খুলিতে বিলম্ব ককত আর।' ইতিহাসের তরী এইভাবে মৃত্যুভেদ করে চলে। কারণ তার গন্তব্য আগামীর পথে। ঝোড়ো রাত্রির অন্ধকারে তাদের মনে দূর প্রভাতের প্রত্যাশা আর 'ঊষার স্বর্ণদ্বারে'র স্বপ্ন আছে বলেই এভাবে তারা ঘর ছেড়ে বেরিয়েছেন। তারা জানেন বীরের রক্তস্রোত, জননীর অশ্রু কখনও ব্যর্থ হতে পারে না। দাঁড়ি তাদের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ সম্পদ যখন বিকশিত করে তুলবেন, তখন মানুষ হিসাবে তাদের সীমাবদ্ধতা যাবে ঘুচে। এই সীমাবদ্ধতাই কবিতার ভাষায় 'মর্ত্যসীমা'! একেই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'মুষ্যত্বের চরম বিকাশ।'

বস্তুত অমৃতের সাধক রবীন্দ্রনাথ মানুষের মধ্যে দেবতার অমর মহিমা লক্ষ করেছিলেন। 'ঝড়ে খেয়া' কবিতার শেষে কল্পনার সেই সত্যরূপ আভাসিত হয়েছে। যদিও কবিতাটির শেষ হয়েছে প্রশ্নের পর প্রশ্ন উত্থাপন করে, তথাপি কবি মনে কোথাও কোনা সংশয় দেখা দেয়নি। যে আশ্বাসে কালের যাত্রীরা চলেছেন তা স্থির এবং নিষ্কম্প। তারা জানেন এবং বিশ্বাস করেন রাত্রির তপস্যা দিন আনবেই। রক্তপাত, দুঃখ, আঘাতের বিনিময়ে এরা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবেন। সেখানে মানুষ তার জীবনধর্ম অতিক্রম করে যথার্থ মানবধর্মে প্রতিষ্ঠিত হবে।

৭.৮.১ অনুশীলনী

১। 'ঝড়ের খেয়া' কবিতাটি 'বলাকা'র প্রতিনিধি স্থানীয় কবিতা—আলোচনা করুন।

২। বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লেখা 'ঝড়ের খেয়া' কবিতায় কবি যে সত্যকে বাণীরূপ দিয়েছেন তা ব্যাখ্যা করুন।

৩। 'বলাকা' গতিরাগের কাব্য, সেই গতিতত্ত্বের প্রেক্ষাপটে '৩৭' সংখ্যক কবিতাটি আলোচনা করুন।

৭.৯ মুক্তি

'পলাতকা' কাব্যের অন্যতম কবিতা 'মুক্তি'। 'বলাকা'র পর 'পলাতকা'-য় এসে যেন কবি-প্রাণের বিশ্রাম ঘটল। কবি মাটির মানুষের কাছাকাছি এলেন, তাদের সুখ-দুঃখের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে ফেললেন। 'বলাকা'য় যে গতিবেগের কথা আছে তার বৃহৎ পরিণাম হ'ল মুক্তি। বন্ধন থেকে মুক্তি না পেলে জীবনের সার্থকতা নেই, সুদূরের বাঁশি সর্বদাই আমাদের ঘর-ছাড়ার আহ্বান জানাচ্ছে, এক বৃহত্তর মুক্তির ক্ষেত্রে দাঁড় করাবার জন্য। 'মুক্তি' কবিতায় সেকথাই বাণীরূপ পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রমথ বিশীর উক্তিটি স্মরণযোগ্য—

'রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের রচনা ব্যক্তির বন্ধন মোচনের আহ্বানে পূর্ণ। তিনি দেখিয়েছেন জরা, জড়তা, অভ্যাস, সংস্কার, একান্তবর্তী প্রথা—বন্ধনের আর অন্ত নাই, সমস্তই ব্যক্তির বিকাশের পক্ষে অন্তরায়। এই সমস্ত বাধা অতিক্রম করে ব্যক্তিকে individual কে পূর্ণভাবে বিকশিত হইতে তিনি বারম্বার আহ্বান করিয়াছেন। এই আহ্বানের একপ্রান্তে মুক্তি নামে কবিতাটি ; হালদার গোষ্ঠী, স্ত্রীর পত্র, পয়লা নম্বর প্রভৃতি অন্য প্রান্তে...পলাতকা কাব্যের নারী নায়িকার দল মাতৃত্ব-প্রেয়সীত্ব-পত্নীত্বের ধাপে ধাপে উন্নীত হইয়া এক সময়ে বিশুদ্ধ নারীত্বে আসিয়া উপনীত হয়—তখন বুঝিতে পারে 'আমি নারী, আমি মহিয়সী।' (রবীন্দ্র সরণী)

পাঁচটি স্তবকে বিন্যস্ত 'মুক্তি' কবিতাটি। মধ্যবিত্ত বাঙালির একান্নবর্তী পরিবারে বধূরা যে অন্ধকারময়, বৈচিত্র্যহীন, নিরানন্দ জীবনযাপন করে, তার মধ্যে যে দুঃখ-বেদনা ও নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতা কবি তারই প্রকাশ ঘটিয়েছেন আলোচন্য কবিতায়। স্বামীগৃহে প্রবেশ করে বৃহত্তর জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বধূটি সংসারের

অন্তঃপুরের কারাগারে বন্দিনী জীবনযাপন করে চলেছে বাইশ বছর ধরে। ন'বছরের মেয়ে 'দশের-ইচ্ছা-বোঝাই করা' জীবনটাকে বাইশ বছর ধরে টেনে টেনে আজ পথের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। তার কর্মের চাকা অক্লান্ত ভাবে বয়ে গেছে, এই সংকীর্ণ পরিবেশের বাইরে যে একটা বৃহৎ বিশ্ব তার অপার সৌন্দর্য নিয়ে অপেক্ষা করছে তা তার অগোচরেই রয়ে গেছে। নিজের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষাও তার কাছে ছিল অজ্ঞাত। সে শুধু জানত—'রাঁধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে রাঁধা। তারপর একদিন তাকে ধরল এক সাংঘাতিক রোগে। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে জানালা দিয়ে এই প্রথম সে বিশ্ব প্রকৃতির স্পর্শ অনুভব করল। এক অনির্বচনীয় মুক্তির আনন্দে তার দেহ মন পূর্ণ হল। সেইদিন সে প্রথম নিজের অন্তরের সত্তাটির পরিচয় পেল—

'প্রথম আমার জীবনে এই বাইশ বছর পরে
বসন্তকাল এসেছে মোর ঘরে।
জানালা দিয়ে চেয়ে আকাশ-পানে
আনন্দে আজ ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠছে প্রাণে
আমি নারী, আমি মহীয়সী
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্নাবীণায় নিদ্রাবিহীন শশী।'

দীর্ঘকালের অসুস্থতা বধূটির চোখের সামনে থেকে সংস্কারের জড়তা ও অভ্যাসের পর্দাগুলি সরে গিয়ে তাকে যেমন দিব্যদৃষ্টির অধিকারী করে তুলেছে। সে বুঝতে পারছে, বসন্ত কাল বাইশ বছর ধরেই তার মনের আঙিনায় দোলা লাগিয়েছিল—আহ্বান জানিয়েছিল জলে-স্থলে সর্বত্র। কিন্তু সে তাতে সাড়া দেয়নি। আসলে গৃহকর্মে সদাব্যস্ত বধূটির পক্ষে জানাই সম্ভব হয়নি, কখন বসন্ত কাল এলো আর গেলো। আজ সে উপলব্ধি করছে, বসন্ত হয়তো এসে তার মনে সাড়া জাগাতো। কিন্তু সচেতন ভাবে সেকথা সে বুঝতে চাইতো না, সন্ধ্যাবেলায় তার স্বামী আসত আপিস থেকে, তারপর পাড়ায় যেত পাশা খেলতে। সেদিনের সেই বঞ্চিত জীবনের কথা আজ সহসা মনে পড়ে যাচ্ছে ক্ষণিক ব্যাকুলতায়।

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আজ বধূটি বাইশ বছর পর তার জীবনে বসন্ত এসেছে তা অনুভব করছে। বস্তুত আসন্ন মৃত্যু তার জীবনে চিরন্তন মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে দেখা দিল। মরণ তার কাছে আজ পরম প্রিয়তম, সেই তাকে আজ বাসর ঘরে আহ্বান জানিয়েছে, তাকে অমৃতরসের সন্ধান দেবে বলে—

'এতদিনে প্রথম যেন বাজে
বিয়ের বাঁশি বিশ্ব-আকাশ মাঝে।
তুচ্ছ বাইশ বছর আমার ঘরের কোণের ধূলায় পড়ে যাক।
মরণ-বাসরঘরে আমায় যে দিয়েছে ডাক
দ্বারে আমার প্রার্থী সে যে, নয় সে কেবল প্রভু—
হেলা আমায় করবে না সে কভু।'

বন্ধন মানুষকে জীবনের প্রকৃত আনন্দময় স্বরূপের উপলব্ধি দেয় না। জীবনে তাই প্রয়োজন হয় মুক্তির, সেই মুক্তিই মানুষকে বৃহৎ বিশ্বে ছড়িয়ে জীবনের সার্থকতা আনয়ন করে। মৃত্যু সেই অনন্ত মুক্তির দূত। সে শুধু জীবনের বন্ধনকেই ভাঙে না, সমগ্র জীবনের বন্ধ অবস্থাকে ভেঙে মুক্তির আনন্দ এবং নতুন জীবনের আস্বাদ আনে। মৃত্যু কারও ওপর প্রভুত্ব করে না, সে ভালোবেসে সকলকে গ্রহণ করে, কারুর প্রতি তার কোনো অবহেলা নেই। সেই অন্তর্যামী, মানুষের মাঝে যে সুধারস আছে তাকেই প্রার্থনা করে সে। বধূটির মাঝে যে সুধারস আছে তাকেই সে প্রার্থনা করেছে। তার সেই চেয়ে দেখার আলোকে বধূটি নতুন করে আপনাকে আবিষ্কার করল এবং বলে উঠল—

'মধুর ভুবন, মধুর আমি নারী,
মধুর মরণ, ওগো আমার অনন্ত ভিখারী।
দাও, খুলে দাও দ্বার,
ব্যর্থ বাইশ বছর হতে পার করে দাও কালের পারাবার'।

এইভাবে সে তার ব্যর্থ বাইশ বছরের জীবন থেকে মুক্তি কামনা করেছে। আর সেই মুক্তির দূত হয়ে এসেছে মৃত্যু।

৭.৯.১ অনুশীলনী

১। 'মুক্তি' কবিতাটি 'পলাতকা' কাব্যের প্রতিনিধি স্থানীয় কবিতা—আলোচনা করুন।

২। 'মুক্তি' কবিতায় কার মুক্তির কথা বলা হয়েছে? সেই মুক্তির স্বরূপটি পরিস্ফুট করুন।

৩। 'মুক্তি' কবিতাটি ব্যর্থ নারী জীবনের এক করুণ রাগিণী'—সমালোচকের মন্তব্যের যাথার্থ্য নির্ণয় করুন।

৭.১০ তপোভঙ্গ

'পূরবী'র এক অসামান্য কবিতা 'তপোভঙ্গ'। 'পূরবী' রবীন্দ্রনাথের পরিণত পর্বের কাব্য। এই পর্বে কবি মাটিমায়ের প্রতি, তৃণ-তরুলতার প্রতি জল-হাওয়ার প্রতি গভীর ভাবে আসক্ত হয়েছেন। জীবন-সায়াহ্নে পৌঁছিয়ে কবি একবার তাঁর ফেলে আসা জীবনের প্রতি, এই পৃথিবীর সৌন্দর্যের প্রতি, আতুর হয়েছেন, এবং দুর্লভ সেই স্মৃতিগুলিকে বুকে আঁকড়ে রাখতে চাইছেন। জীবনের এই শেষবেলায় এসে কবি 'কান্না-হাসির-গঙ্গা-যমুনায়' ভাসতে চেয়েছেন। বিদায়ের করুণ রাগিণী ধ্বনিত হতে শুরু করেছে, নতুন করে জীবন-উপভোগ করবেন সে সম্ভাবনাও নেই। পরপারের ডাক এসেছে, কিন্তু একজন রোমান্টিক অনুভূতি প্রবণ কবির পক্ষে পৃথিবীর সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করা সম্ভব নয়। বরং ধরণি থেকে বিদায়ের পূর্বে কবি আবার নতুন করে তার সঙ্গে সম্পর্ক সূত্রে বাঁধা পড়তে চান—এই মূল ভাবটিই 'পূরবী' কাব্যে ধরা পড়েছে। চিরতারুণ্যের পূজারি কবি তাই যৌবনের সেই সৌন্দর্যময় দিনগুলি ফিরে পাবার জন্য মহাকালের কাছে আবেদন জানিয়েছেন 'তপোভঙ্গ' কবিতায়।

'পূরবী'র 'তপোভঙ্গ' কবিতায় বৃদ্ধ কবি রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের 'কুমার সম্ভব' স্মরণে রেখে উপস্থিত হতে চেয়েছেন প্রেম-সৌন্দর্যের অমরাবতীতে। প্রেম হল মৃত্যুঞ্জয়, কামনার অগ্নিগর্ভ বহিঃপ্রকাশ পরাভূত হয় তার কাছে। কবির কাজই তো চিরবসন্ত, চির যৌবনের লীলাকে অব্যাহত রাখা। যৌবনের আনন্দের সুধাপাত্র কখনোই রিক্ত হতে পারে না। সেই চিরন্তন অথচ বিস্মৃত যৌবনের দিনগুলির জন্য কবি কালের অধীশ্বর মহাদেব সর্বভোলা, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর শরণাপন্ন হয়েছেন। কবি প্রশ্ন করেছেন, তার যৌবন 'বেদনা রসে উচ্ছল' 'দিনগুলি কি তিনি ভুলে গেছেন? কবি তাঁর জীবনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির মধ্যেও দেখেছেন কিংশুক মঞ্জরীর ঝরে পড়াকে। 'স্বেচ্ছাচারী হাওয়ার খেলায়' 'আশ্বিনের শীর্ণশুভ্র মেঘের মত' সেই জ্বলন্ত যৌবনস্মৃতি কি অন্তর্হিত হয়েছে? অথচ একদিন কবির এই উদ্দাম যৌবনের দিনগুলি তাঁর রুক্ষ, রিক্ত, সন্ন্যাসীবেশকে দূর করে তাঁকে অপূর্ব সৌন্দর্য সাজে সাজিয়ে দিয়েছিল। ভোলানাথের ডম্বরু-শিক্ষা কেড়ে নিয়ে হাতে তুলে দিয়েছিল মন্দিরা, বাঁশি এবং তার ভিক্ষাপাত্তার পূর্ণ করে দিয়েছিল বসন্তের গীত-রসে।

ভোলানাথ-শিবের তপস্যায় শুষ্কতা ও রিক্ততা সেদিন কোথায় ভেসে গেল শূন্যে, তাঁর ধ্যানের নিগূঢ় আনন্দ মন্ত্রটি বাইরে এসে ধরণিকে পুষ্প সম্ভারে এবং নব কিশলয়ে পূর্ণ করল। বসন্তের আবির্ভাবে সন্ন্যাসের হল অবসান। ভোলানাথ আপন অন্তরে এই সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়ে আনন্দে অধীর হয়ে 'বিশ্বের ক্ষুধার' 'সুধার

পাত্রটি' পান করলেন। শুরু হল মহেশ্বরের উদ্দাম নৃত্য। সেই অপূর্ব নৃত্যের নব নব রূপ ও নব নব সৌন্দর্যের লীলা দেখে কবি আত্মহারা হয়ে সেই নৃত্যের ছন্দে ও তালে কবি কত গান রচনা করলেন। কিন্তু আজ সেই সুধার পানপাত্র কি ক্ষ্যাপার তাণ্ডব নৃত্যে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল ? কবির সেই যৌবনের উচ্ছল দিনগুলি কি 'নিঃস্ব কালবৈশাখীর নিঃশ্বাসে' রিক্ততার বেদনায় ম্লান হয়ে গেল ? কবির বিশ্বাস সেই দিনগুলি কখনোই নিঃশেষ হয়ে যায়নি। মহেশ্বর সেই চঞ্চল আনন্দোচ্ছল দিনগুলিকে নিজের মধ্যে সংগোপনে রেখেছেন, সেই উদ্দাম ও প্রাচুর্যকে তপস্যার দ্বারা শান্ত করে রেখে লীলাচ্ছলে সেজেছেন। কবি নিশ্চিত জানেন, এই তপস্যার নিস্তব্ধতা ভাঙবে, আবার যৌবনের দিনগুলো ফিরে আসবে—

'জানি জানি, এ তপস্যা দীর্ঘরাত্রি করিছে সন্ধান
চঞ্চলের নৃত্যস্রোতে আপন উন্মত্ত অবসান
দুরন্ত উল্লাসে।
বন্দী যৌবনের দিন
আবার শৃঙ্খলহীন
বারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্র বেগে উচ্চ কলোচ্ছাসে।'

কবি করবেন মহেশ্বরের তপস্যাভঙ্গ। তাঁর প্রধান কাজই হল রিক্ততা ও শুষ্কতাকে দূর করে নতুন রূপ, রস ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করা, আনন্দের উদ্দাম প্রবাহে জীবনকে প্লাবিত করা, বেদনার সঙ্গীতে ধরণিকে আনন্দে শিহরিত করা—

'তপোভঙ্গ দূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী
স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি
তব তপোবনে।'

বাইরের এই রিক্ততা ও শুষ্কতা ভোলা মহেশ্বরের ছদ্মবেশ ; কবি সন্ন্যাসীর ছলনা বুঝাতে পেরেছেন। তিনি বিচ্ছেদের দুঃখদাহে উমাকে কাঁদিয়ে মিলনের আনন্দকে নিবিড় ও তীব্র করার জন্য এই ছল অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর প্রিয়া-মিলনের বিচিত্র ছবি এঁকেছেন কবি। তিনি মিলনের পরমলগ্নে শ্মশান-বৈরাগীর বেশ পরিবর্তন করে তাঁকে পুষ্পমাল্যে, পট্টবস্ত্রে সজ্জিত করেছেন। কবি চির-তরুণ, যৌবনের সম্ভারে, তাঁর নিত্য অধিকার, ধরণির সৌন্দর্য-মাধুর্যের চিরন্তন উপাসক।

'তপোভঙ্গ' কবিতাটি বিশ্লেষণ করলে তার মূলভাবের ভিতর থেকে তিনটি উপাদানের সাক্ষাৎ মেলে—

১। জীবন সায়াহ্নে উপনীত কবির এতদিনকার ধরণির রূপ-রস-গন্ধস্পর্শাত্মক উপলব্ধি, মানবজীবনের প্রেম-সৌন্দর্য-মাধুর্যের তীব্র অনুভূতি ক্ষীয়মান হয়ে পড়েছে, কবির এতদিনকার কাব্যরচনাও স্তিমিত হয়ে এসেছে। কিন্তু কবি তো চিরতরুণ, তাঁর উৎসাহ তো শেষ হবার নয়। তাই যৌবনবেগে প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করেছেন। আলোচ্য কবিতাটি কবির সেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা—আপনার-কবি-সত্তাকে পুনর্জাগরণের প্রয়াস।

২। কবি তাঁর এই মূল ভাবটিকে প্রকাশ করার জন্য কালিদাসের 'কুমারসম্ভব'-এর শিবের তপোভঙ্গের বিষয়টিকে একটি রূপকের মাধ্যমে দেখিয়েছেন। কালিদাসের শিব কল্পনার সঙ্গে নটরাজ শিবের কল্পনা মিশ্রিত হয়ে আছে। নটরাজ বিশ্বরঙ্গামঞ্চে নৃত্যরত—তাঁর এক পদপাতে ধ্বংস, অন্য পদক্ষেপে সৃষ্টি। তাঁর কাজই হচ্ছে ধ্বংস-সৃষ্টি-শূন্যতা-ঐশ্বর্য নিয়ে লীলা করা। কবির বিশ্বেশ্বরের এই নটরাজমূর্তি—লীলারসে মত্ত হয়ে একবার ভাঙছেন ও একবার গড়ছেন।

৩। বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে প্রাণপ্রবাহের একটা লীলা চলছে—সেখানেও যেন একটা নৃত্যের আবর্ত। ধূসর বসন বৈশাখের পরে আসে সজল-শ্যামল মেঘমালা বর্ষণ ; সন্ন্যাসী বৈশাখের সঙ্গে শ্যামলী প্রিয়া বর্ষার মিলন সাধিত হয়। তারপর মেঘমুক্ত আকাশে শরতের সোনালি আলোর স্বপ্ন, সেই স্বপ্ন বিলীন হয় হেমন্তের ধূসর ঘোমটার আড়ালে, পরিশেষে শীতের উত্তর-সমীরণে জীর্ণ পাতার শ্মশান শয্যা—আবার বসন্তের নতুন হিল্লোল, গাছে গাছে নবপত্রপুষ্পের সম্ভার।

চৌদ্দটি স্তবকে বিন্যস্ত 'তপোভঙ্গ' কবিতার ভাববস্তু বিশ্লেষণ করে যে তিনটি উপাদানের সাক্ষাৎ মিলল, তাঁর প্রিয় পৌরাণিক কাহিনি (পার্বতী-পরমেশ্বর) অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ সেই সমস্ত উপাদানের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এমনভাবে বিন্যাস করেছেন যে, কবি, যিনি মূলত স্রষ্টা তিনি একসময় পরিণত হলেন বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টি সহচরে। শুধু সৃষ্টি সহচর নন, স্থবিরতার মধ্যে প্রাণ সঞ্চারী। ভোলা মহেশ্বরকে তিনি সজাগ করেন, পরিণত করেন স্রষ্টাতে। কবি সেই মহেন্দ্রের দূত, যিনি উদাসীনকে করেন জীবনরসিক, স্থবিরতার মধ্যে সঞ্চার করেন প্রাণ। কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তর জীবনের এই উপলব্ধিকে উজ্জ্বল বাণী মূর্তি দিয়েছেন পৌরাণিক কাহিনির আশ্রয়ে।

'যৌবন বেদনারসে উচ্ছল আমার দিনগুলি'...হে ভোলা সন্ন্যাসী'—প্রথম স্তবকের এই প্রথম তিনটি চরণে একটা স্পষ্ট প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন কবি। প্রশ্নটি কবি করেছেন সেই 'ভোলা সন্ন্যাসী'কে যাঁর কোপানলে দগ্ধ হয়েছিলেন কামদেব মদন। এই জিজ্ঞাসাই আবার ধ্বনিত হল স্তবকের দ্বিতীয় ভাগে। চৈত্রের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সেই দিনগুলি কি ভেসে গেল অকূল পাথারে? চৈত্র মানে শেষ বসন্ত। বসন্ত যৌবনের কাল, সেই যৌবনকেই তো কবি পুনরায় ফিরে পেতে চাইছেন আপন জীবনে।

তপোভঙ্গের দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম স্তবকে আছে কীভাবে একদিন বসন্তের বন্যা স্রোতে সন্ন্যাসের হয়েছিল অবসান। তপোভঙ্গের প্রথম স্তবকে কবি মহেশ্বরকে বলেছেন 'ভোলা সন্ন্যাসী'। 'পূরবী'র পূর্ববর্তী কাব্যের নাম 'শিশু ভোলানাথ'। কবি 'শিশু ভোলানাথে'র শিশু হতে চেয়েছেন। শিশু ভোলানাথের অব্যবহতি দিনগুলি কেটেছে কাব্যলোক থেকে অনেক দূরে। বলা বাহুল্য শিশু ভোলানাথ এবং তার সহচর বয়ঃধর্মে নয়, মনোধর্মে শিশু। এই শিশুর জগৎ কাজ ভোলানোর জগৎ, খেলার জগৎ। এই খেলার জগৎই যৌবনের যোগে হয় প্রেমের জগৎ। আর এই প্রেমের সূত্রেই কবি-শিষ্যের সঙ্গে তাঁর প্রেমময় দেবতার সাজুয্য ঘটে। দ্বিতীয় স্তবকের অন্তিমভাগে সুন্দর বেশে সন্ন্যাসীর রূপান্তর সম্ভব হয়েছে বসন্তের 'উন্মাদন রসে'। জয় হয়েছে ঋতুরাজ বসন্তের। কালিদাসের 'কুমার সম্ভবম্'-এর ঐতিহ্য এখানে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন। উমাপ্রেমেই কালিদাসের মহেশ্বরের নবনব ঐশ্বর্যের প্রকাশ। পঞ্চম স্তবকে সন্ন্যাসীর এই রূপান্তর কবির দৃষ্টিতে অপরূপ মহিমায় মণ্ডিত। কবিতার ষষ্ঠ ও সপ্তম স্তবকে কবির সংশায়াত্মক জিজ্ঞাসা এবং তার সদর্থক উত্তর। ষষ্ঠ স্তবকের শুরুতে ছিল প্রশ্ন—'সেদিনের পান পাত্র, আজ তার ঘুচালে পূর্ণতা?' সপ্তম স্তবক শুরু হল এই ঘোষণা দিয়ে—'নহে নহে আছে তারা'। এই ধ্যান সন্ন্যাসীর ধ্যান, নিঃশব্দের নামে সংগোপনে সংহরণ, আবার সম্বরণও বটে। কালিদাসের 'কুমার সম্ভবে'র তপস্যা প্রেমেরই তপস্যা। এই প্রেমের ধ্রুবমন্ত্র হল 'নাহিরে, নাহিরে'।

অষ্টম স্তবক শুরু হয়েছে একটি অভিনব রূপকল্পের আশ্রয়ে। কবিতাটির দ্বিতীয়ার্ধের শুরু হয়েছে এখান থেকেই। কালের অধীশ্বর হয়েছেন 'কালের রাখাল'। এই রূপকল্পের প্রথম সন্ধান মেলে 'গীতিমাল্যে'র ১০৩ সংখ্যক গানে। সেখানকার রাখাল আলোর রাখাল। 'তপোভঙ্গ' কবিতার রাখার 'কালের রাখাল'। তিনি শিঙা বাজিয়ে ধেণুকে গোষ্ঠে ফিরিয়ে আনেন। অষ্টম স্তবকের দ্বিতীয়ভাগে আছে যুগান্তের কথা, এই যুগান্ত বা কল্পান্ত রচনা করে সৃষ্টির ভূমিকা। অষ্টম স্তবকে শান্ত হয়ে আসা মুহূর্তগুলির পর নবম স্তবকে হয়েছে চঞ্চলের বন্যাস্রোত। চঞ্চলের নৃত্যস্রোতকেই কবি চতুর্থ স্তবকে বলেছেন 'বসন্তের বন্যাস্রোত'। বসন্তের বন্যাস্রোতেই

তপস্যার অবসান। এই তপোভঙ্গের ফলে যৌবনেরই পুনরুজ্জীবন। এই যৌবন শাশ্বত যৌবন, সে বয়সের জানে বন্দি নয়। দশম স্তবক থেকে উমা মহেশ্বরের চির পুরাতন বিরহলীলার সঙ্গে কবির একাত্মতা ঘটেছে। এ একাত্মতা কবির ব্যক্তিসত্তার নয়, কবি সত্তার একাত্মতা। একাদশ স্তবকে বল্কলধারী বৈরাগীর তপস্যাকে বলেছেন 'ছলনা' ; বলেছেন তপস্যার 'ছদ্মরণ বেশে' তিনি সুন্দরের হাতে একান্ত পরাভব কামনা করেছেন। তপোভঙ্গের কবি তপস্যাভঙ্গের পর মিলনের বিচিত্র ছবি দেখে 'বীণা যন্ত্রে বাজিয়েছিলেন ভৈরবী'। তপোভঙ্গের শেষে কবিচিত্তে শোনা গেল বংশীধ্বনি। বলা বাহুল্য বংশীধ্বনিতে প্রেমেরই জয়ধ্বনি ঘোষিত হল।

বস্তুত চোদ্দোটি বিন্যস্ত 'তপোভঙ্গ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বন্দনা করলেন যৌবনকে। যৌবনের এক পিঠে ভোগ, অন্যপিঠে ত্যাগ। সন্ন্যাসহীন ভোগ মহেশ্বরের তৃতীয় নয়নের বহ্নিতে দগ্ধ। 'তপোভঙ্গ' কবিতায় আছে মৃত্যুঞ্জয় প্রেমের রূপ, যে-প্রেম-ভস্ম অপমান শয্যা ত্যাগ করে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে চিরন্তন সত্যরূপে। শৈবকালিদাসের পন্থানুসারী রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায় শৈবপ্রেমাদর্শের রূপ চিত্রায়িত করেছেন।

৭.১০.১ অনুশীলনী

১। 'তপোভঙ্গ' কবিতায় রূপকের আড়ালে যে জীবন সত্য ঘোষিত হয়েছে তা আলোচনা করুন।

২। 'তপোভঙ্গ' কবিতায় শৈব কালিদাসের আদর্শ গ্রহণ করে কীভাবে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে প্রেমের জয়ধ্বনি ঘোষিত হতে শুনলেন তা দেখান।

৩। 'তপোভঙ্গ' কবিতাটির মর্মার্থ উদ্‌ঘাটন করুন।

৭.১১ সবলা

'মহুয়া' কাব্যের একটি বিখ্যাত কবিতা 'সবলা'। 'মহুয়া' মূলত প্রেমের কাব্য। তবে এখানে কবি প্রেমকে এক মহীয়সী শক্তিরূপে অনুভব করেছেন। নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বরাবরই ভাবিত ছিলেন। ১৯২৮ সালে 'মহুয়ার' 'সবলা' কবিতাটি যখন কবি লেখেন তখন 'বিচিত্রা' পত্রিকায় 'যোগাযোগ' উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে এবং 'শেষের কবিতার' প্রকাশ শুরু হয়েছে। মোটকথা কবিতায়, উপন্যাসে, প্রবন্ধে, নারী ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা ঘোষণার কাল এটা। এর দু'বছর আগে ১৯২৬-এ রবীন্দ্রনাথ নরওয়ে ভ্রমণ করেন। 'মহুয়া' রচনার কিছু আগে ও পরে রবীন্দ্র সাহিত্যে নারীর প্রেম, মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তিত্বের প্রচার নানা ভাবে শুরু হয়েছিল। 'সবলা' কবিতায় তারই প্রকাশ লক্ষ্য করা গেল। 'চিত্রাঙ্গদা'য় আপন স্বরূপে উদ্ভাসিতা চিত্রাঙ্গদাকে বলতে শুনেছিলাম 'আমি চিত্রাঙ্গদা। দেবী নহি, নহি আইম সামান্য রমণী'। ঠিক এই কথাই বলতে শুলনাম 'পলাতকা'য়—'আমি নারী আমি মহীয়সী'। এই বাণীই ঘোষিত হয়েছিল ১৩০৮-এ 'নষ্টনীড়' এবং ১৩২১ লেখা 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে। 'পয়লা নম্বরে'র অনিলা কিংবা 'ল্যাবরেটরি' গল্পের সোহিনীর কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে মৃণাল তার স্বামীকে যে পত্র লিখেছিল তা শুধু স্বামীকে লেখা নয়, সমগ্র পুরুষ সমাজের কাছে লেখা নারীর অভিযোগ পত্র। অনুরূপ মনুষ্যত্বের পূর্ণ অধিকার নিয়ে সকল নারীর পক্ষ নিয়ে লেখা এক মানবীর দৃপ্ত জিজ্ঞাসা ধ্বনিত হয়েছে 'সবলা'র এই ছত্র কয়টিতে—

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা ?

কবিতাটির সূচনা হয়েছে এই প্রশ্নচিহ্নের সাহায্যে। এই জিজ্ঞাসা সবলার হয়ে স্বয়ং কবি উত্থাপন করেছেন সমাজে নারী জাতির প্রকৃত মূল্য নিরূপণকে কেন্দ্র করে। উনিশ শতকে নারী ছিল শিক্ষার আলো বঞ্চিতা নানা সামাজিক প্রথার শিকার। কিন্তু বিশ শতকে নারী শিক্ষার আলোকপ্রাপ্তা এবং সমাজের নানা সংস্কার থেকে মুক্ত। এই সময় থেকেই নারীর ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটতে থাকে। 'সবলা'য় সেই নারী ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর শোনা গেল। এ নারী আর দৈবের ভরসায় শূন্যের পানে চেয়ে থাকে না। আপন সার্থকতা সে আপনি খুঁজে নেয়। অন্তঃপুরের নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে সে স্বয়ং অভিযানে বের হয়। প্রাণকে পণ করে দুর্গমের সাধনা করতে, দুর্গমকে জয় করতে চায় সে।

পুরুষশাসিত সমাজে নারীর একমাত্র পরিচয় বধূ হিসেবে এবং সন্তানের জননী হওয়ার মধ্যেই তার জীবনের চরম সার্থকতা। কিন্তু 'সবলা'র নারী এই জীবনকে স্বীকার করতে বাধ্য নয়। সে প্রথমেই জানিয়ে দিয়েছে বধূবেশে কিঙ্কিনী বাজিয়ে বাসরকক্ষে প্রবেশ করবে না। কারণ, তার দৃপ্ত ঘোষণা—'যে নারী নির্বাক ধৈর্যে চির মর্মব্যথা/নিশীথ নয়নজলে কররে পালন/দিবালোক ঢেকে রাখে ম্লান হাসি তলে/আজন্ম বিধবা, আমি সে রমণী নহি'। আত্মজাগ্রতা এই নারী পুরুষের প্রেমের বীর্যে বীর্যবর্তী হয়ে তার কণ্ঠলগ্না হতে চায়। সবলা নারী বিশ্বাস করে বীরের সঙ্গে তার মিলনের দিন একদিন আসবেই। তবে সে মিলনের লগ্ন হয়তো গোধূলীর ম্লান আলোতে নয়, বীর্যবান প্রেমের খরদীপ্তির কথা প্রেমিককে সে কোনোভাবেই ভুলতে দেবে না। তার এ কঠিন শপথ তাকে জানিয়ে দিতে হবে। তাই নম্র দীনতা তার যোগ্য আচরণ নয়—তা সম্মানের যোগ্যও নয়। আজ থেকে সবলা তাই লজ্জার দুর্বলতাকে দূরে সরিয়ে বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ে প্রত্যয়ী হতে চায়।

বীর্যবান প্রেমিক ও বীর্যবর্তী প্রেমিকার মিলনের স্থান-কালটিও অসাধারণ। তাদের সাক্ষাৎ বাসর ঘরে নিশ্চিন্ত নিরালায় বসে হবে না, হবে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ, সংঘাতময় সংসার তীরে, এ মিলনে সানাই বাজবে না, সমুদ্রের তরঙ্গের গর্জনই বিজয়ের ধ্বনিতে তাদের মিলনের সুর হয়ে রনিত হবে। সেই বীর বর বধূর মিলন গাথা চারিদিকে ধ্বনিত হবে। সবলা নারীর মাথায় থাকবে না অবগুণ্ঠন, তার কণ্ঠে উচ্চারিত হবে—'মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব তুমি আছ আমি আছি।' সমুদ্রের পাখির যানায় যখন পশ্চিম দিকের হাওয়া হুংকার তুলবে তখন তারা তাদের যাত্রা পথের দিশা খুঁজে পাবে।

কবিতার সর্বশেষ স্তবকে সবলা নারী পুনরায় ভাগ্যবিধাতাকে সম্বোধন করে আপনার মধ্যে শক্তির জাগরণ কামনা করেছে, প্রার্থনা জানিয়েছে প্রয়োজনে সে যেন বাক্‌হীন না হয়ে যায়, তার ধমনিতে যে জাগরণ সঙ্গীত ধ্বনিত হচ্ছে তাকে যেন সে বাইরে প্রকাশ করতে পারে। নারীজীবনের চরম সার্থকতা লাভের মুহূর্তে সে যেন তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ গান গাইতে পারে। তার ভিতরে যা কিছু অনির্বচনীয়তা আছে তা যেন সে উজাড় করে নিতে পারে প্রিয়জনের চরণে। নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করার মধ্যেই তার জীবনের চরম সার্থকতা। জীবনে এই সার্থকতা লাভের পর প্রেমের এই নির্ঝরিণী যদি নিঃশেষ হয়ে যায় তাতেও আক্ষেপের কিছু নেই, কারণ জীবনে চরম উপলব্ধির পর কারুর মনেই কোনো ক্ষোভ থাকে না।

'সবলা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ নারীর এক পরিপূর্ণ রূপ অঙ্কন করেছেন। প্রথমে যে বিদ্রোহিনী ছিল, কবিতার শেষে সে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ববোধে উদ্দীপ্ত পূর্ণ নারীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিতা।

৭.১১.১ অনুশীলনী

১। 'সবলা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যে নারীর মহীয়সী রূপ অঙ্কন করেছেন—তা দেখান।

২। 'মাতা বা গৃহিণীর বিশেষ মোড়কেই তাদের (নারীর) পরিচয়' নয়—মনুষ্যত্বের স্বাতন্ত্র্যেও তারা পরিচিত—আলোচনা করুন।

৭.১২ সাধারণ মেয়ে

'পুনশ্চ' কাব্য রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্য। এই পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ কাব্যকে বেড়াভাঙা স্ত্রী স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। সৃষ্টি করেছিলেন এক অভিনব আঙ্গিকের। কাব্যকে জীবননিষ্ঠ করে তুলতে তার ভাষা ও ছন্দকেও তিনি অভিনবত্ব দান করলেন—'অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেকদূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি।' 'পুনশ্চে'র বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখা কবিতাগুলি মনে রাখলে কবির একথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। 'সাধারণ মেয়ে' 'পুনশ্চ' কাব্যের একটি বিখ্যাত কবিতা। গদ্যছন্দের আশ্রয়ে কবি একটি অতি সাধারণ মেয়ের জীবনকথা বর্ণনা করেছেন। যা সাধারণ, যা তুচ্ছ, যা অসুন্দর তাকে রবীন্দ্রনাথ কাব্যবিষয়ের বাইরে রাখারই পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ক্রমে পৃথিবীর পট পরিবর্তন হতে থাকল। বিশ্বযুদ্ধ, রাজনৈতিক হানাহানি, অত্যাচার, অবিচার মাথা চাড়া দিতে লাগল। এ অবস্থায় কবিচিত্তে বন্ধন মোচনের একটু জরুরি তাগিদ এসে পড়ল। 'পুনশ্চ' এই নতুন জীবন দর্শন নিয়ে দেখা দিল। নিপাট গদ্যে সাধারণ জীবনের কাহিনি নিয়ে লেখা হল কবিতা। এই প্রসঙ্গে 'সাধারণ মেয়ে' কবিতাটি স্মরণীয়।

'সাধারণ মেয়ে' কবিতার সাধারণ মেয়ে মালতী অতি সাধারণ—তার না আছে রূপের জৌলুস, না আছে আভিজাত্যের অহংকার। থাকার মধ্যে আছে তার অসামান্য দুটি ডাগর চোখ। যখন তার বয়স অল্প ছিল, তখন একজনের মন ছুঁয়েছিল তাঁর কাঁচা বয়সের মায়া। তার জীবনের এই রোমান্টিক প্রেমকাহিনিকে বাস্তবের রঙে রাঙিয়ে কবি গদ্যছন্দের আশ্রয়ে অসামান্য মহিমা দিয়েছেন। বাংলাদেশে তার মতো এমন অনেক সাধারণ ঘরের মেয়ে আছে যারা পুরুষের স্তুতিতে খুশি হয়ে আত্মসমর্পণ করে বসে পুরুষের কাছে, বিকিয়ে যায় সামান্য দামে। তারপর প্রত্যাখ্যাতা হয়ে চোখের জলে দিনযাপন করে।

সেই সাধারণ মেয়ে মালতী শরৎচন্দ্রের 'বাসিফুলের মালা' গল্পটি পড়ে নায়িকার জলে উৎসাহিত হয়ে অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের কাছে কাতর আবেদন জানিয়েছে তাকে নিয়ে আর একটি গল্প লেখার জন্য। শুধু অনুরোধ নয়, সে শরৎচন্দ্রকে পরামর্শও দিয়েছ কেমন করে সেই সাধারণ মেয়েকে অসাধারণ মহিমায় উজ্জ্বল করে তুলতে হবে। গল্পের শুরুতে তার জীবনের দুঃখের বর্ণনা থাকবে—নরেশ নামের এক যুবকের সঙ্গে যে মালতীর প্রেমের সূচনা হয়েছিল বাংলাদেশে, তার করুণ পরিসমাপ্তি ঘটে বিলাত প্রবাসী নরেশের প্রত্যাখ্যানে। বিলেতে গিয়ে নরেশ আবিষ্কার করে সেখানকার বুদ্ধিশালিনী, রূপবতী, বিত্তমান মহিলাদের। তাদের মধ্য থেকেই লিজা নামের মেয়েটির সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক সংবাদপত্র মারফত মালতী জানতে পারে—সে তার সামান্য বুদ্ধি দিয়েই বুঝতে পারে তার কপাল পুড়েছে। নরেশের চিঠিতে লিজির যে অসামান্য প্রশংসার কথা আছে তা পড়ে মালতী বুঝতে পেরেছে একটা অদৃশ্য খোঁচা আছে তার প্রতি, তা থেকেই সে তার পরাজয়ের কথা বুঝে নিয়েছে। জীবনে হেরে যাওয়া এই মেয়েটি দরদি শিল্পী শরৎ বাবুর লেখা গল্পে জয়ের মালাটি জিতে নিতে চায়।

প্রাচীন কালের কবিরা ত্যাগের মধ্য দিয়ে দুঃখের মহিমা প্রদর্শন করে তাদের নায়িকাদের জয়ী করেছেন। যেমন কালিদাসের শকুন্তলার কাহিনিতে লক্ষ করা যায়। বিধাতা কৃপণ বলে সাধারণ মেয়েদের সৃষ্টিতে বেশি সময়টুকুও দেন না। তাই মেয়েটি বিধাতার কাছে নয়, মানুষের দরবারে নালিশ জানায় সকল উপেক্ষিতা সাধারণ নারী হয়ে। লেখকের বলিষ্ঠ লেখনী স্পর্শে সে যেন অসামান্যা ও সম্পূর্ণা হয়ে উঠতে পারে, তার স্বপ্ন যেন কবির কল্পনার স্পর্শে সফল হয়ে ওঠে। নরেশ যেন সাতবছর ধরে অকৃতকার্য হয়ে আটকে থাকে—আর মালতী ইতিমধ্যে এম. এ. পাশ করুক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, লেখকের একটা কলমের আঁচড়ে সে যেন গণিতে প্রথম হয়। শুধু এখানে থামলেই চলবে না, কথা সাহিত্যিকের সাহিত্য সম্রাট নামের সার্থকতা প্রমাণ করতে হবে। মালতীকে সর্বগুণে গুণান্বিত করে বিদেশে জ্ঞানী, গুণী, কবি, শিল্পী, রাজা-রাজড়াদের আসরে বিদুষী রূপে

প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। মালতীর সম্মানে যেন একটা সভা ডাকা হয়, যে সভায় নরেশের সামনে মুষলধারে বর্ষিত হবে চাটুবাক্য। তাহলেই সার্থক হবে মালতীর স্বপ্ন। তারপরে ! তারপরে 'নটে শাকটি মুড়োল/স্বপ্ন আমার ফুরোল।/হায়রে সামান্য মেয়ে,/হায়রে বিধারাতর শক্তির অপব্যয়'।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট এই সাধারণ মেয়ে কোনো অংশেই সাধারণ নয়, সে অসাধারণ এবং অসামান্যা। সাধারণ মেয়ের প্রতি কবি তাঁর অন্তরের গভীর সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন এবং সেই সঙ্গে দরদি শিল্পী শরৎচন্দ্রের প্রতি অগ্রজ কবির সস্নেহ শ্রদ্ধা বর্ষিত হয়েছে।

৭.১২.১ অনুশীলনী

১। 'পুনশ্চ' কাব্যের 'সাধারণ মেয়ে' কবিতায় কবির যে নতুন জীবন দর্শন প্রকাশ পেয়েছে তা দেখান।

২। 'সাধারণ মেয়ে' কবিতাটির ভাববস্তু বিশ্লেষণ করে দেখান যে গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেকগূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব।

৭.১৩ বাঁশিওয়ালা

'শ্যামলী' কাব্যের অন্যতম কবিতা 'বাঁশিওয়ালা'। 'শ্যামলী' ও পুনশ্চের মতোই গদ্যছন্দে এবং একই ভাবধারায় রচিত কবিতার সমষ্টি। 'শ্যামলী' নামটির সঙ্গে মাটি-মায়ের একটা যোগসূত্র অনুভূত হয়। বাংলাদেশের মাটির প্রতি কবির মমতা গভীর এবং আত্মিক। সেই শ্যামল মাটি থেকেই 'শ্যামলী'র উদ্ভব। 'শ্যামলী'তে বিভিন্ন ভাবধারার কবিতা স্থান পেয়েছে তার মধ্য 'বাঁশিওয়ালা' কবিতাটি একটি প্রেমমূলক কবিতা এবং রোমান্টিক প্রেম কবিতার নিদর্শনবাহী। কবি এখানে পরিণত মনস্ক সেই পরিণত হাতে ছাপ এখানে স্পষ্ট অর্থাৎ প্রেমের চিরন্তন রহস্য নানা ভাব-কল্পনার আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কবিতাটিতে মর্তলোক থেকে অমর্তলোকে যাত্রার কথাই বলা হয়েছে।

দশটি স্তবকে বিন্যস্ত 'বাঁশিওয়ালা' কবিতার সাধারণ মেয়ে বাঁশিওয়ালার বাঁশির সুরে নিজের মধ্যে নতুনকে আবিষ্কার করতে চায়, শুনতে চায় তার নতুন নাম। তাই সে বাঁশিওয়ালাকে চিঠি লিখেছে।

সে লিখেছে—বাংলাদেশের সাধারণ মেয়ে সে, সৃষ্টিকর্তা তাকে গড়তে পুরো সময় দেননি, তাই সে আধাআধি হয়ে আছে। তার অন্তরে বাইরে মিল হয়নি, 'মিল হয়নি ব্যথায় আর বুদ্ধিতে/মিল হয়নি শক্তিতে আর ইচ্ছায়'। সে এক অর্থে অবহেলার সামগ্রী। এই মেয়েকে তিনি চলতি কালের মতো করে গড়ে তোলেননি, কাল স্রোতের অপর পার বালুডাঙায় ফেলে রেখেছেন। সেখান থেকে দূরের জগৎটা তার কাছে ঝাপসা লাগে, তার মন অধীর হয়ে ওঠে অধরাকে ধরবার আকাঙ্ক্ষায়। দু'হাত বাড়িয়ে দেয় কিন্তু কোনো কিছুরই নাগাল পায় না সে।

গতানুগতিক জীবনযাপন কালে মেয়েটির আর বেলা কাটে না, সে জীবন জোয়ারের গতির দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। তার সামনে দিয়ে ভেসে যায় মুক্তি পারের খেয়া, ভেসে যায় ধনপতি সদাগরের ডিঙা, চলতি বেলার আলো-ছায়ার লীলা দেখতে দেখতে বেজে ওঠে বাঁশি, সেই বাঁশির সুরে ভরা আছে জীবনের স্বপ্ন, সেই স্বপ্নই তার মরা জীবন-নদীতে প্রাণের বেগ সৃষ্টি করে। অবসন্ন জীবনে প্রাণের স্পন্দন শুনতে পায় সে।

বাঁশিওয়ালার বাঁশিতে কি সুর বাজে সে জানে না, কিন্তু সে সুর তার মনে জাগায় ব্যথা। তাই সে ভাবে বুঝি এই পঞ্চমরাগে ফিরে আসে দক্ষিণ হাওয়ার নব যৌবনের ভাটিয়ালি। এই সুর শুনতে শুনতে নিজেকে তার মনে হয় পাহাড় তলির এক ঝিরঝিরে নদী, তার বুকে ঘনিয়ে উঠছে বাদল রাত্রি। সে নদী স্থাবর জীবনের বাধা অতিক্রম করে স্রোতের ঘূর্ণি-মাতনের মতো এগিয়ে চলে।

'বাঁশিওয়ালার' বাঁশির সুর এই মেয়েটির রক্তে নিয়ে আসে ঝড়ের ডাক, বন্যার ডাক, আগুনের ডাক, এমনকী পাঁজরের উপরে আছাড় খাওয়া মরণের ডাক পর্যন্ত, আনে উদাসী হাওয়ার যাক। তার ডাকে ঘরের বন্ধন তুচ্ছ হয়ে যায়, অপূর্ণ ছোটে পূর্ণতার অভিমুখে। তার অঙ্গো অঙ্গো পাক খেয়ে যায় কালবৈশাখীর ঘূর্ণিঝড়।

এই শ্যামল মেয়েটি, যাকে ভগবান গড়েছেন অপূর্ব করে, যানা দেননি আকাশে ওড়বার মতো, বাঁশিওয়ালার বাঁশির সুর তার প্রাণে স্বপ্ন জাগিয়েছে, তাই ঝোড়ো আকাশে উড়ো প্রামের পাগলামি জেগেছে তার মনে। সংসারে সে কাজ করে শান্ত হয়ে, সবার কাছে তাই সে ভালো। সবাই জানে তার ইচ্ছার কোনো জোর নেই, লোভ নেই, নিষেধের বাধাকে দুরন্ত বেলায় কাত করে ফেলে এমন ক্ষমতাও নেই তার, ভালোবাসতে জানে না কঠিন ভাবে, শুধু জানে কাঁদতে আর অপরের পায়ে মাথা কুটতে।

কিন্তু বাঁশিওয়ালার বাঁশি শুনে এই সাধারণ মেয়েই অসাধারণ শক্তির অধিকারী হয়ে ওঠে। আপন গরিমায় সে তার মাথা উঁচু করে চলে। এই নারীর ভিতরে এক বিদ্রোহিণী সত্তা জাগ্রত হয়, কুয়াশায় ঢাকা ছোঁড়া পর্দা সরিয়ে তার জীবনে নতুন সূর্যোদয় হয়। সে জীবনে তার যা কিছু বারণ না মানা আগ্রহ আগুনের ডানা মেলে দেয়। অর্থাৎ তার খাঁচায় বন্ধ এতদিনকার জীবনটা অজানা শূন্য পথে চলতে থাকে—'প্রথম-ক্ষুধায়-অস্থির গরুড়ের মতো'। এই বিদ্রোহিণী নারীর কাছে ভীরুতা আজ ধিক্কৃত হয়, ধিক্কৃত হয় পুরুষের কাপুরুষতা।

বাঁশিওয়ালা এই মেয়েটিকে হয়তো দেখতে চেয়েছে, কিন্তু কোথায়, কখন, কীভাবে তার সঙ্গো দেখা হবে সে কথা তার জানা নেই, এমনকী তাকে সে চিনবে কেমন করে তাও সে জানে না। শুধু জানে তার ছায়া রূপটি গোপনে গেছে অপরের দৃষ্টি এড়িয়ে অভিসারের পথে। সেই অজানাকে কত বসন্তেও সে পরিয়েছে ছন্দের মালা, যার ফুল শুকোবে না কোনোদিন।

ঘরোয়া নির্জীব একটা সামান্য মেয়েকে বাঁশিওয়ালার ডাক ঘরের অন্ধকার কোণ থেকে বার করে আনল অবগুণ্ঠনহীন করে। তাকে মুক্তি দিল প্রেমের অমৃতলোকে যেমন করে নতুন ছন্দ গান হয়ে উঠেছিল বাল্মীকির কণ্ঠে, চমকে দিয়েছিল তাঁকে, ঠিক তেমনি ভাবে বাঁশিওয়ালাও সাধারণ এই ঘরকুনো মেয়েটিকে দেখে চমকে উঠবে। সেই সাধারণ মেয়েটি নামবে না তার গানের আসন থেকে, সে তোমাকে লিখবে চিঠি, রাগিণীর আবছায়ায় বসে—কিন্তু বাঁশিওয়ালা জানবে না তার ঠিকানা। কবিতার একেবারে অন্তিমে এসে সে বাঁশিওয়ালাকে সম্বোধন করে প্রেমের গভীরতাকে সংগোপনে রাখার মানসে সে তাদের অসাক্ষাৎকে বাঁশির সুরের দূরত্বে দূরে রেখে দিতে চাইল। বাঁশির সুর দূর থেকে ভেসে আসে বলেই তার প্রতি মানুষের যা কিছু আকর্ষণ, প্রেমও অনেকটা তাই, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রেম কখনোই মিলনে নয়, প্রতীক্ষাতেই সার্থক হতে চায়। 'বাঁশিওয়ালা' একটি অসাধারণ নিপাট প্রেমের কবিতা, তথা প্রেম-প্রতীক্ষার কবিতা। বাংলাদেশের সাধারণ নারী যখন সংসারের জালে বন্দি তখন বাঁশির সুর তাকে সেখান থেকে মুক্তির দিশা দিয়েছে। তাই মেয়েটি বাঁশিওয়ালার প্রেমে পাগল হয়েছে। এই প্রেমকেই সে সংগোপনে তার হৃদয়ে রেখে দিতে চায়, পাছে মিলনে তা শেষ না হয়ে যায়—তাই তার কণ্ঠে করুণ মিনতি—

'ওগো বাঁশিওয়ালা
সে থাক্ তোমার বাঁশির সুরের দূরত্বে।'

৭.১৩.১ অনুশীলনী

১। 'বাঁশিওয়ালা' কবিতাটিতে গল্পরসের সঙ্গো কাব্যরস কীভাবে মিলেছে তা দেখান।

২। 'বাঁশিওয়ালা' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ নারীমুক্তির যে ইঙ্গিত দিয়েছেন তা পরিস্ফুট করুন।

৭.১৪ 'দেখিলাম অবসন্ন চেতনার গোধূলি বেলায়'

রবীন্দ্র কাব্যধারায় 'প্রান্তিক'-এর এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। মৃত্যুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের দুর্লভ সৌভাগ্য কবিকে অনুপ্রাণিত করেছে এই কাব্য রচনায়। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন—এই অকস্মাৎ হতচৈতন্য লোক হইতে প্রত্যাবর্তনকে কবি নবজীনব লাভের সহিত তুলনা করিয়াছেন, মন হইতেছে অধ্যাত্মলোকের নবতম রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইতেছে। মৃত্যুযবনিকার তোরণ হইতে অজানার যেটুকু আভাস পাইয়াছিলেন বলিয়া অনুভব করিতেছেন, তাহাই ভাষার মধ্য দিয়া প্রকাশের চেষ্টা করিলেন নূতন কবিতায়, যেগুলি পরে 'প্রান্তিক'-এর অন্তর্গত হইয়াছে।' [রবীন্দ্র জীবনী ৪র্থ খণ্ড]। বস্তুত ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে কবি সাময়িকভাবে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন এবং সৌভাগ্যবশত তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। ফলে সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ধরা পড়েছে এখানে। 'প্রান্তিক'-এ মৃত্যু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই প্রত্যক্ষ ধারণার গভীর প্রকাশ আছে। 'দেখিলাম অবসন্ন চেতনার গোধূলি বেলায়' কবিতাটি 'প্রান্তিকের' ৯ নম্বর কবিতা।

'দেখিলাম অবসন্ন চেতনার গোধূলি বেলায়' কবিতাটি ঔপনিষদিক আত্মোপলব্ধির গভীর থেকে লেখা। জীবন রঙ্গামঞ্চে কবি এতদিন যে পরিচয়ে পরিচিত ছিলেন, মৃত্যুদূতের স্পর্শে আজ তা তাঁর কাছে নিরর্থক বলে মনে হচ্ছে। বাইরের যা কিছু প্রসাধন সব ভেসে গেছে, আপনার পূর্ণতা উপলব্ধির জন্য কবিআত্মা উন্মুখ। আসন্ন জীবন-চেতনার গোধূলি বেলায় কবি দেখলেন, কাল সমুদ্রের স্রোতে তাঁর দেহখানি ভেসে যাচ্ছে, বিচিত্র বেদনা নিয়ে তাঁর অনুভূতিগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে, বিচিত্র চিত্র রঞ্জিত যে আচ্ছাদনের অন্তরালে এতদিন তিনি আপন পরিচয় ভুলে ছিলেন, সেই আজন্মের স্মৃতিও আজ ক্ষীণ হয়ে আসছে, এমনকী জন্মগ্রহণের পর যে বাঁশিটি জননী তাঁকে দিয়েছিলেন, আজ সেই বাঁশিটিকেও মিলিয়ে যেতে দেখলেন কবি। তিনি ক্রমে নিজেকেই দূরে ম্লান হয়ে যেতে দেখলেন, দেখলেন পরিচিত জগৎটাকেও মিলিয়ে যেতে। সন্ধ্যা আরতির ধ্বনি আর শোনা যায় না, ঘরে ঘরে দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়, দীপশিখা ঢাকা পড়ে যায়, নৌকা বাঁধা পড়ে ঘাটে। পারাপার বন্ধ হয়ে যায়—সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি কবির চেতনা লোক থেকে ক্রমে দূরে সরে যায়—চারিদিকে মহাস্তব্ধতা, মহাশূনতা বিরাজ করে। নিজের দেহটি ছায়া হয়ে, অন্তহীন অন্ধকারে বিলীন হয়ে যায়। কবি নিঃসঙ্গ একাকী হয়ে প্রার্থনা জানান—'হে পূষন্, তোমার রশ্মিজাল সংবরণ করেছ, এবার তোমার কল্যাণতম রূপটি প্রকাশ করো, এবার যেন দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক'।

এই জ্যোতির্ময় পুরুষকে দেখবার ইচ্ছা শেষ জীবনে কবির বাসনায় পরিণত হয়েছে। প্রান্তিক থেকেই কবির দার্শনিক সত্তার প্রকাশ লক্ষ করা গেল।

'প্রান্তিক' কাব্যের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এর মিতায়তন। মাত্র আঠারোটি ছোট ছোট কবিতার সংকলন এই কাব্য গ্রন্থটি। তবে কবিতাগুলির মধ্যে একটা নিবিড় যোগ লক্ষ কার যায়। সবগুলিকে এক সঙ্গে পড়লে মনে হবে যেন একটি অখণ্ড কবিতা। কবি যেন নিদারুণ সেই মৃত্যুর অভিজ্ঞতা এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলে মুক্তির আনন্দ লাভ করেছেন। প্রান্তিকের কবিতার ভাবনা মৃত্যু, তার সুর মৃত্যু—এই মৃত্যুভাবনা পূর্বের মৃত্যুভাবনা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রমথ বিশীর ভাষায়—"ইহাদের সর্বাঙ্গে জীবন ও মৃত্যু 'ডেডলেটার আপিস' এর শীল মোহর মুদ্রিত।" [রবীন্দ্র সরণী]

৭.১৪.১ অনুশীলনী

১। 'দেখিলাম অবসন্ন চেতনার গোধূলি বেলায়' কবিতাটি কোন সময়ে লেখা হয়েছে ? কোন্ কাব্যের কবিতা এটি। কবিতাটি বিশ্লেষণ করে কবির সেই সময়ের মনোভাবের পরিচয় দিন।

২। 'প্রান্তকে'র কাব্যের প্রেক্ষাপটে আলোচ্য কবিতাটির মূলভাব ব্যক্ত করুন।

৩। 'দেখিলাম অবসন্ন চেতনার গোধূলি বেলায়' কবিতাটিতে কবির মৃত্যু চেতনার যে পরিচয় আছে তা প্রকাশ করুন।

৭.১৫ তোমার সৃষ্টির পথ রেখে আকীর্ণ করি

'শেষলেখা' কাব্যের ১৫ সংখ্যক কবিতা এটি। 'শেষলেখা' কাব্যের প্রকাশ ১৩৪৮ সালে ভাদ্র মাসে। কবির তিরোভাব ঘটে ১৩৪৮-এর ২২শে শ্রাবণ। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যের নামকরণ করে যেতে পারেননি। এমনকি এই কাব্যের অনেকগুলি কবিতা আছে যেগুলি কবি শয্যাশায়ী অবস্থায় মুখে মুখে রচনা করেছেন। তথাপি এ কাব্যের কবিতা অনেক বেশি সংহত, অনেক বেশি দার্শনিক মনন ঋদ্ধ। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও এ কাব্যে শুধু মৃত্যু চিন্তা নয়, জীবনও যে তাঁর কাছে কত সত্য, সৃষ্টি যে কত সত্যতর সে বিষয়ে ভাবনা-চিন্তার স্থান পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র সমালোচক শুদ্ধসত্ত্ব বসু তাঁর 'রবীন্দ্র-কাব্যের গোধূলী পর্যায় (২)' গ্রন্থে যে কথা লিখেছেন তা স্মর্তব্য—"এখানে অসীম লোকে যাত্রার ব্যাকুলতা যেমন আছে, তেমনি গতিশীল বিশ্বে আত্মার অবিনশ্বরতার স্বীকৃতি, মানব মহিমার জয়গানও আছে। আবার স্মৃতিমূলক সংবেদনও ধরা পড়েছে, সাময়িক ব্যাপারের প্রতিও মনোযোগ রয়েছে, দুঃখের কঠিন সাধনায় আত্মস্বরূপ উপলব্ধির প্রয়াস যেমন আছে, তেমনি প্রকৃতির স্বরূপকে বোঝার চেষ্টাও বাণীরূপ লাভ করেছে"।

'শেষলেখা' কাব্যের এই কবিতাটি রবীন্দ্র-কবিজীবনের সর্বশেষ রচনা। মৃত্যুর মাত্র ৮ দিন আগে ৩০শে জুলাই ১৯৪১-এ কবিতাটি রচনা শুরু করেন এবং শেষ হয় মৃত্যুর দেড়ঘণ্টা পূর্বে। ঔপনিষদিক কবি রবীন্দ্রনাথের জীবনের পরম উপলব্ধি, তাঁর ব্যক্তিজীবনের ও কবিজীবনের সর্বশেষ কথাটির তথা পরম জিজ্ঞাসার উত্তর আছে এ কবিতায়। এই কারণেই কবিতাটির মূল্য অপরিসীম।

কবি এতকাল প্রকৃতির ছলনাময়ী রূপের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন, প্রকৃতির মায়াময় রূপের কাছেই ধরা দিয়েছিলেন। আর তাই অজস্র সৃষ্টিতে নিজেকে সার্থক করে তুলেছিলেন। কিন্তু প্রকৃতির সেই 'মায়া' কে তখন তাঁর কাছে মায়া বলে মনে হয়নি। কিন্তু আজ জীবনের এই উপান্ত পটে এসে কবি প্রকৃতির ছলনাময়ী রূপের সাক্ষাৎ লাভ করেছেন তথা তার মায়া সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। কারণ, তিনি বুঝেছেন মায়ার এই কুহক যে ধরতে পারে, সে অনায়াসে তার ছলনাজাল অতিক্রম করতে পারে। তাইতো কবি লিখলেন—'সত্যেরে সে পায় আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।'

প্রকৃতির এই যে মায়ার জাল তা অতিক্রম করতে সেই আমাদের পথ দেখায়—

'তোমার জ্যোতিষ্ক তারে যে পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ
সে যে চিরস্থায়ী সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে চির সমুজ্জ্বল'।

এই পথ বাইরে কুটিল হলেও ভিতরে কিন্তু সে ঋজু—তার গৌরবই এইখানে। লোকসমাজে সে নিজে বিড়ম্বিত বলে প্রতিভাত হলেও এই সত্যদ্রষ্টা আপন অন্তরে যাকে পায় সেই তার প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া পরম পুরস্কার। এই শেষ পুরস্কারকে সে তার আপন ভাণ্ডারে সঞ্চয় করে। প্রকৃতির এই ছলনাকে যিনি ধরতে পারেন তিনিই লাভ করেন 'শান্তির অক্ষয় অধিকার'।

বিজ্ঞানীরাও অনুরূপ কথা বলেছেন, কিন্তু অন্যভাবে বলেছেন। তাঁরা মনে করেন, জড় ও শক্তি নিয়ে যে বহির্জগৎ, যাকে আমরা প্রত্যক্ষ করি তা হচ্ছে বিশ্বের স্থূল স্বরূপ। এই কারণেই বিশ্বকে বলা হয় মায়াময়। জল ও শক্তি তার বহিরাবরণ দিয়ে ঢেকে রেখেছে এই বিশ্বের মূল স্বরূপকে। আর সূক্ষ্ম ও বিশাল জগৎ রয়েছে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির সীমা ছাড়িয়ে। বিজ্ঞানীরা এই জগৎকে জানেন যন্ত্রের সাহায্যে, কবি জানতে পারেন তাঁর কল্পনার আশ্রয়ে।

ব্রহ্মকে লাভ করলেও মায়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় নেই। সর্বত্র তার ছলনা জাল পাতা আছে। তাই অন্তরের আলোয় ব্রহ্মকে দর্শন করতে পারলে তবেই পরম শান্তি লাভ সম্ভব। ব্রহ্মকে লাভ করতে হলে মায়ার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হয় এবং ব্রহ্মভাবে ভাবিত হতে হয়। অন্তিমকালে কবি ব্রহ্মাতিরিক্ত সব কিছুকেই মায়িক বলে মনে করেছেন। এমনকী প্রকৃতির সৌন্দর্যও, যা এতদিন কবি নিবিষ্ট চিত্তে উপভোগ করেছেন তাও তার কাছে মায়ার ছলনা বলেই অনুভূত হয়েছে। এই মায়ার ছলনার হাত থেকে কবি মুক্তি লাভ করে শান্তির অক্ষয় অধিকার লাভ করতে চলেছেন—কবিতার শেষ তিনটি পঙ্‌ক্তিতে শান্তির অক্ষয় অধিকার লাভের উপায়ের কথা বলেই কবি ক্ষান্ত হয়েছেন। এই পরম উপলব্ধির বাণীই শেষ কবিতার মূল প্রতিবাদ্য বিষয়। ব্রহ্মের মায়া থেকে মুক্তি লাভ করে ব্রহ্মভাবে ভাবিত হয়ে কবি তাঁর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেছেন এই কবিতায়। এই কারণে কবিতাটির গুরুত্ব অপরিসীম।

৭.১৫.১ অনুশীলনী

১। 'শেষলেখা' কাব্যের ১৫ সংখ্যক কবিতাটিতে কবির যে দার্শনিক ভাবনার পরিচয় আছে তা লিপিবদ্ধ করুন।

২। 'শেষলেখা' কাব্যের ১৫ সংখ্যক কবিতাটি কবির সর্বশেষ রচনা—মৃত্যুর পূর্বে লেখা ও কবিতায় কবি কীভাবে 'শান্তির অক্ষয় অধিকার' লাভ করেছেন আলোচনা করুন।

৩। 'শেষলেখা' কাব্যের 'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি' কবিতাটি রবীন্দ্র-কবিজীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে—আলোচনা করুন।

৭.১৬ গ্রন্থপঞ্জি

১। রবীন্দ্র জীবনী (৪র্থ খণ্ড)— প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়

২। 'রবীন্দ্রসৃষ্টি সমীক্ষা'—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। 'রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমা'—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

৪। 'রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ'—প্রমথনাথ বিশী/রবীন্দ্র সরণী—প্রমথনাথ বিশী

৫। 'রবীন্দ্রকাব্যের গোধূলি পর্যায়'—শুদ্ধসত্ত্ব বসু

৬। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড (আনন্দ)—সুকুমার সেন

৭। রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা—নীহাররঞ্জন রায়

একক ৮ ❐ মানকুমারী বৃত্ত

গঠন

৮.১ মানকুমারী বসুর কবিতা
৮.২ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ঃ "কবরই-ই-নূরজাহান"
৮.২.১ উৎস ও ইতিহাস
৮.২.২ কাব্য প্রেরণা
৮.২.৩ কবিতা বিশ্লেষণ
৮.২.৪ কাব্যগঠন : ভাষা ও ছন্দ
৮.৩ নজরুল ইসলামের কবিতা : বিদ্রোহী
৮.৩.১ বিদ্রোহী রচনার পশ্চাৎপট
৮.৩.২ কবিতা বিশ্লেষণ : ভাববস্তু
৮.৩.৩ রোমান্টিক আবেগ উচ্ছ্বাস
৮.৩.৪ বায়রন ও উইট ম্যানের সঙ্গে তুলনা
৮.৩.৫ দেশবিদেশের পুরাণ ব্যবহার
৮.৩.৬ উপসংহার
৮.৪ মোহিতলাল মজুমদারের কবিতা : কালাপাহাড়
৮.৪.১ রবীন্দ্রবিরোধিতার সূচনা
৮.৪.২ মোহিতলালের কবিতায় রবীন্দ্রবিদ্রোহ
৮.৪.৩ কালাপাহাড় কবিতায় বিদ্রোহী মনোভাবের পরিচয়
৮.৪.৪ কবিতা বিশ্লেষণ
৮.৪.৫ কবিতার গঠন বিশ্লেষণ
৮.৪.৬ বস্তু প্রাণতা ও কল্পনা প্রাণতার সমন্বয়
৮.৫ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতা : ঘুমের ঘোরে
৮.৫.১ কবিতা—বিশ্লেষণ
৮.৫.২ যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে জন ডানের সাদৃশ্য
৮.৫.৩ কবিতার প্রত্যেকটি ঝোঁকের বক্তব্য ও ভঙ্গি বিশ্লেষণ
৮.৫.৪ উপসংহার ঃ যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদের বৈশিষ্ট্য
৮.৬ অনুশীলনী
৮.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৮.১ মানকুমারী বসুর কবিতা

মানকুমারী বসু ঊনিশ শতকে ঊনিশ শতকের খ্যাতনাম্নী মহিলাকবি ছিলেন। ইনি মাইকেল মধূসূদন দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী। ইনি দীর্ঘজীবনের অধিকারিনী (১৮৬৩-১৯৪৩) ; কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের শোকতাপে যৌবনেই

চরম নিঃসঙ্গতা পেয়েছিলেন ও চিরদিনের একাকিনীর জীবনবরণে বাধ্য হয়েছিলেন। এঁর কবিতাবলীতে স্বভাবতই ফুটে উঠেছে এক বেদনা ও বিষাদের সুর, যার মূল অনেকটাই ব্যক্তিজীবনের মধ্যে নিহিত ছিল। পাশাপাশি ছিল উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া কবিপ্রতিভা, মহিলাকবির স্বভাবই অন্তর্মুখিনতার সঙ্গে লিরিক কবিতার রোমান্টিক কবিতার বিষাদচেতন মিলে এঁর কাব্যকবিতাকে এক বিশিষ্ট আস্বাদ দিয়েছে।

ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধকে আধুনিক বাংলা লিরিকের জন্মলগ্ন বলতে পারি। ইংরেজি সাহিত্য ও সভ্যতার প্রভাবে এই সময় বাঙালি মানসে অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্ম হয়। একদিকে ছিল আশাপূরণের বিপুল প্রত্যাশা অন্যদিকে বাসনাবৈকল্যের ব্যর্থতাবোধ ও তীব্র ক্রন্দন। মাইকেল মধূসূদন দত্তের 'আত্মবিলাপ' কবিতায় এর বিখ্যাত উদাহরণ আছে—

মুকুতাফলের লোভে, ডুবে রে অতল জলে
যতনে ধীবর,
শতমুক্তাধিক আয়ু কালসিন্ধু জলতলে
ফেলিস, পামর।
ফিরে দিবে হারাধন, কে তোরে, অবোধ মন,
হায় রে, ভুলিবি কত আশার কুহকজালে ?

যুগের পথিকৃৎ রোমান্টিক কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী এই বিষণ্ণ আত্মবাদকেই প্রকাশ করেছেন নিম্নলিখিত ভাষায়—

প্রাণে সহেনা না সহেনাক আর !
জীবনকুসুমলতা কোথারে আমার !
কোথা সে ত্রিদিব জ্যোতি,
কোথা সে অমরাবতী,
ফুরালো স্বপনখেলা সকলি আঁধার !

মানকুমারী বসু-র' 'একা' স্বরূপে অন্তর্মুখী গীতিকবিতা, তার সুরটি রোমান্টিক বিষাদের। সেই বিষাদকে পরিপুষ্ট করেছেন জীবনের বাস্তব দুঃখযন্ত্রণা। 'একা' কবির ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কবিতাগ্রন্থের অন্তর্গত। তারো আগে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'বঙ্গাসুন্দরী', 'নিসর্গসন্দর্শন', 'গোবিন্দচন্দ্র দাসের 'প্রসূন' প্রভৃতি বই এর ভিতর দিয়ে বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতার সুরটি স্বপ্রতিষ্ঠ হয়।

গীতিকবিতায় কবির ব্যক্তিপুরুষই প্রকাশিত হয়ে থাকে। এই কবিতা "আত্মবাবনামূলক, মানবমনের একান্ত অনুভূতির বাহক।" ভাবাবেগ ও প্রকাশ দুইই গীতিকবিতার পক্ষে প্রয়োজনীয়। আবেগ ও ভাষার আন্তরিকতা গীতিকবিতার পক্ষে জরুরি। সেখানে থাকবে একধরনের নমনীয়তা ও কোমলতা। পাশ্চাত্য কাব্যের সঙ্গে সাক্ষাত পরিচয় থেকে বাংলা সাহিত্যে এই কবিতার উদগতি।

M.H. Abrams 'A Glossary of Literary Terms' এ লিরিক বা গীতিকবিতার সংজ্ঞা দিয়েছেন— "a lyric is any fairly short poem, consisting of the utterence by a single speaker, who expresses a state of mind or a process of perception, thought and feeling" গীতিকবিতা অবয়বে হ্রস্ব, এখানে

কবির বিশেষ মনোভঙ্গি ও অনুভূতিই প্রকাশিত হয়ে থাকে। মানকুমারী বসুর একা কবিতায় আত্মঅনুভূতির সরল প্রকাশ ও নির্মাণই রয়েছে।

মানকুমারী বসু-র 'একা' কবিতায় রয়েছে স্বপ্নভঙ্গের বেদনা ও ব্যক্তিগত বিচ্ছেদবোধ। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'আত্মবিলাপ', বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সহে না আর প্রাণে', গোবিন্দচন্দ্র দাসের 'কোথায় যাই', মানকুমারী বসুর সাধ, একা, হতাশে, এই কি জীবন ? কামিনী রায়ের 'দিন চলে যায়', অক্ষয়কুমার বড়ালের হৃদয়শঙ্খ ইত্যাদি কবিতাকে বিষাদমূলক গীতিকবিতা বলেই চিহ্নিত করা যায়। বিষাদ ছাড়া একালে প্রেম দেশপ্রেম-গার্হস্থ্যজীবন-প্রকৃতি-তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়েও গীতিকবিতা লেখা হয়েছিল।

"গতশতকের বিষাদকবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য-মহিলা কবিদের কবিতার বিষণ্ণ সুর। তাহাই মহিলা কবিদের রচনার প্রধান সুর। গতশতেকের মহিলারচিত কাব্য প্রায় গোটাটাই উৎসারিত হইয়াছে, কোনো শোকবিধুর সান্ধ্য উপত্যকা হইতে। মহিলা কবিদের ব্যক্তিজীবনের ব্যর্থতাই ইহার মূল। জীবনের শোকতাপ ইহাদের কবিতায় একটা অকপট আন্তরকিতা দান করিয়াছে। রূপকর্মে ও কাব্যপ্রসাধনে দক্ষ না হওয়া সত্ত্বেও আন্তরিকতার জোরেই হৃদয়াবেগকে ইহারা সফলতার স্তরে উত্তীর্ণ করিয়াছেন।" (ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, ভূমিকা—ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন ।) সমালোচকের এই মন্তব্যের আলোকে মানকুমারী বসুর 'একা' কবিতাটির যথার্থ নিরূপণ করা যায়। এ কবিতায় একদিকে রয়েছে রোমান্টিক কবিদ্বয়ের স্বাভাবিক বেদনার সুর অন্যদিকে রয়েছে ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখের অভিঘাত। নিঃসঙ্গতা শুধু কাব্যিক নয় বাস্তবও।

'একা' কবিতায় যে কবিকে আমরা দেখছি তিনি রূপকর্মে ও কাব্যপ্রসাধনে কিছুটা ঢিলেঢালা। এই প্রবণতাটা ঊনিশ শতকের অপ্রধান বা গৌণ গীতিকবিদের প্রায় সকলরেই ছিল। অতএব 'একা' কবিতার প্রথম স্তরকে যে, বিস্তৃতি পাচ্ছি তার মূল্য প্রকাশনৈপুণ্যের জন্য নয় বরং আন্তরিকতার জন্য। মানকুমারী বক্তব্য কিছুটা সাদামাটা, ভাষাও কিন্তু সব মিলিয়ে একটা অসহায় বিষণ্ণ ব্যথিত আবেদন পাঠকের মন স্পর্শ করে। মানবজীবনকে তিনি ট্র্যাজেডি বলেই মনে করতেন। এই কবির বাণী নিরাভরণ হলেও সরল। উদাহরণ দিচ্ছি 'সাধ' কবিতার প্রথম স্তবক থেকে—

মানবজীবন ছাই বড় বিষাদের
দুটো কথা না কহিতে,
দুটি বার না চাহিতে।
আপনি পোহায়ে যায় যামিনী সাধের,
মানবজীবন ছাই বড় বিষাদের।

জীবনের অর্থহীনতা কবির কাছে শুধু দার্শনিক তত্ত্ব হিসেবে নয়, বাস্তব তথ্য হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করেছে। 'একা' কবিতার শুরু কবিমানসের মূল বিষণ্ণতার সুর ও রিক্ততার অনুভব দিয়েই শুরু হয়েছে। কবির একাকিত্বের মূলে রোমান্টিক কবিসুলভ জীবনবিষাদের পাশপাশি যুক্ত হয়েছে ব্যক্তিগত জীবনের ট্র্যাজেডি। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ প্রকাশিত "সাহিত্যপাঠকচ্চরিতমালা"-র অন্তর্গত 'মানকুমারী বসু' নামক পুস্তিকাটি পড়লে কবির কবিতায় তাঁর জীবনউপাদান কীভাবে প্রাধান্যবিস্তার করেছে জানা যায়। নবযৌবনাই বৈধব্যবেদনা আক্রান্ত মহিলা কবি তাঁর কবিতার প্রথম স্তবকেই নিজের বিধিবঞ্চিত ভাগ্য ও নিঃসঙ্গতার অশ্রুময় উল্লেখ করেছেন—

একা আমি, চিরদিন একা
সে কেন দু'দিন দিল দেখা ?
আঁধারে ছিলাম ভালো

কেন বা জ্বলিল আলো ?
আঁধার বাড়ায় যথা বিজলীর রেখা !
ভুলে ভুলে ভালোবাসা
ভুলে ভুলে সে দুরাশা
ভুলে মুছিল না শুধু কপালের লেখা ?

কিন্তু মানকুমারী বসুর বিষাদচেতনা তাঁকে উত্তরণের পথ দেখিয়েছে, তাঁর লেখিকাজীবনের মূল দর্শন তিনি এই নিঃসঙ্গ বিষাদ ও রিক্ত বিড়ম্বনার কাছ থেকেই শিখেছেন। স্মৃতিকেই তিনি অমূল্য সম্পদ বলে আঁকড়ে ধরেছেন। স্মৃতিই হয়েছে তাঁর কবিতার বিষয় এবং জীবনের মূলতত্ত্ব সুখদুঃখের ক্রমাবর্তন এই মহিলাকবি জীবনবেদনার কাছ থেকেই শিখেছেন—

একা আমি চিরদিন একা,
তুব সে দু'দিন দিল দেখা।

নিঃসঙ্গ দীর্ঘজীবন তিনি নীরবে বরণ করেই নিয়েছেন, কারণ তিনি জানেন অন্তর্হিতের তপস্যা করে জীবন কাটানোই তাঁর ললাটলিপি এবং এভাবেই তিনি ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছেন এক সুখদুঃখ মন্থনকারিণী জীবনসাধিকা—

তারি লাগি বসুন্ধরা
হাসিভরা কান্নাভরা
জীবনের মূলতত্ত্ব তারি কাছে শেখা

—এখানে কবি বাস্তববিষাদকে শূন্য তিক্ততার হাত থেকে উদ্ধার করে নিখিল বেদনার সঙ্গে যুক্ত করে জীবনের সেই মূলতত্ত্ব সংলগ্ন করে শিখলেন উত্তরণ। এভাবেই ব্যক্তিগতকে বিস্তারে নিয়ে এলেন। এই বিস্তার অবশ্যই আত্মগত থেকে বিশ্বগতে উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়া।

কবি বুঝেছেন জীবনের গান তাঁকে একাই রচনা করে যেতে হবে। যুগলের জীবনস্রোত এ জন্মে তাঁর পাওয়া হ'ল না।

একা আমি এ অবনীতলে
কেহ নাহি 'আপনার' বলে,
একাই গাহিব গীতি
একাই ঢালিব প্রীতি
একাই ডুবিয়া যাব নয়নের জলে

তার ট্র্যাজেডি এই, যে সঙ্গী চলে গেছে তাকে তিনি ভুলতে পারেন না। বস্তুত বিচ্ছেদই হয়ে উঠল তাঁর কাব্যের বিষয়। 'একা' কবিতায় এই ব্যক্তিত বিচ্ছেদের সুর মানুষের নিয়তি চিরন্তন বিচ্ছেদের বোধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গীতিকবিতার জন্ম দিয়েছে। এ কবিতার রোমান্টিকতার মূল উৎসও এখানে।

সে কেন পরাণে আসে
সে কেন মরমে ভাসে
কেন ছোটে তারি ঢেউ মরমের তলে !

এই ব্যক্তিগত বেদনাগাথা বাঙ্ময় ও আন্তরিক। কিন্তু এখান থেকেই তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন, চেষ্টা করলেন সুখদুঃখ নিরপেক্ষভাবে বেদনার সৃষ্টিলোকে প্রবেশ করার।

একা কবিতায় ঊনিশশতকের এক প্রতিভাবান মহিলা কবি তাঁর বেদনাবঞ্চিত ভাগ্যকে, তাঁর সংসার ট্রাজেডিকে কাব্যে প্রকাশ করেছেন। বসন্ত-বর্ষা-শীত এসেছে ও গিয়েছে কিন্তু তারা দিতে পারেনি অন্তরঙ্গ সখ্য। একার ভুবনে ফুলের ফুটে ওঠা ও কোকিলের ডাক ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে। পৃথিবীতে একা আসা ও একা যাওয়াই নিয়তি। স্নেহ মমতার কাঙালিনী হয়েও যে রমণী কবি কিছুই পান নি, তিনি জানেন তিনি একদিন চলে যাবেন। সেদিন তাঁর চিরনৈঃসঙ্গ্য ঘুচবে। ভাগ্যের কাছে তাঁর শুধু এই অভিযোগ—প্রিয় তার আপন হয়েছিল তবু সুখস্বপ্ন কেন অকালেই ভেঙে গেল।

এই জীবনবেদনা, দুঃখের সঙ্গে সংগ্রামের কাহিনি মানকুমারী 'হতাশে' কবিতাতেও আছে। একটা দার্শনিক সত্যে তিনি উপনীত হয়েছেন।

আমাদের যাহা যায় জনমের তরে
আসে নাকো কখনো ফিরিয়া।

কখনো অভিমানে মনে হয়েছে জন্মভূমির গ্রামনদী কপোতাক্ষী নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সব জ্বালা জুড়ান। কিন্তু মানকুমারী বসু তবু শেষপর্যন্ত বাঙালি মানসে ঊনিশশতকের মহিলাকবি হয়ে, বিখ্যাত সাগরদাঁড়ি-জাত মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী এই পরিচয় নিয়েই বেঁচে রইলেন।

৮.২ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা : কবর-ই-নূরজাহান

ভূমিকা ঃ কবর-ই-নূরজাহান সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত প্রায় ৬ পাতার একটি দীর্ঘ কবিতা, স্বরবৃত্ত-দলবৃত্ত ছন্দে রচিত। ইতিহাস থেকে উপাদান ও সংকেত নিয়ে লেখা এই বিখ্যাত রোমান্টিক কবিতাটি কবির 'অভ্র-আবীর' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। 'অভ্র-আবীর' প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালে। লাহোরের শহরতলীতে নূরজাহানের সমাধি দেখে কবির মনে ভাবোদয় হয়েছিল। এই কবিতায় সেই ভাবের স্বাক্ষর আছে।

৮.২.১ উৎস ও ইতিহাস

নূরজাহান-এর বাস্তব জীবনকাহিনিকে কবি এখানে ভাষা দিয়ে বরণ করেছেন। মুঘলযুগের ইতিহাসপাঠে এই কাহিনি জানা যায়। ভিনসেন্ট স্মিথ রচিত ইতিহাসগ্রন্থ 'An Advanced History of India' ও Cambridge History of India ইত্যাদি থেকে পাঠক সব প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারেন। নূরজাহান অর্থ জগতের আলো। হুমায়ুন-পুত্র যুবরাজ সেলিম মেহেরুন্নিসা নামক কুমারীর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। বাদশাহের যেহেতু এ বিয়েতে মত ছিল না, মেহেরুন্নিসাকে সুদূর বর্ধমানের জায়গীরদার শের আফগানের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সেলিম তাঁর মানসীর কথা ভুলতে পারেননি। তিনি যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন জাহাঙ্গীর তাঁর অনুগত কুতুবকে বর্ধমানে পাঠালেন। কুতুব অবশ্য শের আফগানের সঙ্গেই মারা পড়েছিল সংঘর্ষে। যাহোক মেহেরুন্নিসাকে দিল্লি পাঠানো হ'ল। পরবর্তী অধ্যায় সবারই জানা। তাঁর নতুন নাম হয় নূরজাহান অর্থাৎ জগতের আলো। এই অসাধারণ রূপসী ও বুদ্ধিমতী নারী জাহাঙ্গীরের যথার্থ জীবনসঙ্গিনী হলেন এবং রাজকার্যে তাঁকে সহায়তা করতেন।

৮.২.২ কাব্যপ্রেরণা

কবর-ই নূরজাহান কবিতায় ইতিহাসের কাঠামোর উপর কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ভাষা ও কল্পনার রক্তমাংসলাবণ্য সঞ্চার করেছেন। অতীত ইতিহাস রোমান্টিক কবিদের কাছে প্রিয় বিষয়। কারণ রোমান্টিক

কবিরা কল্পনাকেই শ্রেষ্ঠ শক্তি বলে মানেন এবং ইতিহাসকে কবিতার বিষয় করলে সেখানে যথেষ্ট কল্পনাক্রীড়ার অবকাশ মেলে। বস্তুত আলোচ্য কবিতায় কবি নূরজাহানের জীবন ইতিহাসকে আত্মগত কল্পনা দিয়ে মণ্ডিত করে তাঁর ব্যক্তিগত ভাবনার আধারে আবার নতুন করে পরিবেশন করলেন। অধিকন্তু এ কবিতায় বাড়তি পাওনা ভ্রমণরস কারণ পশ্চিমভারত ভ্রমণে গিয়ে কবি কবিতার প্রেরণাস্বরূপ এই দুর্লভ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তখন তিনি দাঁড়িয়েছিলেন নূরজাহানের সমাধিক্ষেত্রে।

'আজ তোমারে দেখতে এলাম জগৎ-আলো নূরজাহান'—এই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তিটি দিয়েই কবিতাটির শুরু। কবি ঐতিহাসিক রমণীকে 'মরুভূমির গোলাপফুল' ও 'ইরাণ দেশের শকুন্তলা' এই দুটি অভিধা বা বিশেষণ দিয়েছেন। ইরাণ নূরজাহানের মাতৃভূমি অন্যদিকে সেলিম তাঁর প্রেমে পড়েছিলেন যেমন দুষ্মন্ত পড়েছিলেন শকুন্তলার প্রেমে। ইতিহাসচেতনার প্রকাশ আছে কবি যখন বলছেন সম্রাজ্ঞীর কবরে অন্ধকারে জোনাকির নড়াচড়া অথবা যখন বলছেন বিশ্বজয়ী জাহাঙ্গীরের পৃথিবী আজ নীরব। ইতিহাস চেতনার অর্থ সময়ের অমোঘতা সম্বন্ধে বোধ—রূপযৌবন ধনমানশক্তিদম্ভ কিছুই থাকে না—মৃত্যু একদিন সবকিছু গ্রাস করে। অন্যদিকে কবি নূরজাহানের রূপপ্রশস্তি করেছেন—"জাগ তুমি জাহান-নূরী আলোয় ভর দিক আবার', 'রতির মূরতিতে জাগ, অঙ্গ লভুক অনঙ্গ' ইত্যাদিতে উচ্চারণে সে কথা। বঙ্গীয় কবি এখানে যে রূপপিপাসা ও মর্ত-সৌন্দর্যের পথে ভ্রমণ করছেন তার এক পূর্ব পথিকৃৎ হচ্ছেন ওমর খৈয়াম—রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়ামের কবি।

রূপতৃষিত, রূপকে সর্বইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভবে আগ্রহী কবিতুল্য Sensuos বা রূপকামনামত্ত সেলিমের আবাস পাচ্ছি এ কবিতায়। 'রূপের আদর জানত সেলিম, রূপদেবতায় মানত সে', অথবা

রক্তসাগর সাঁৎরে এসে দখল পেল পদ্মটির
রূপের পাগল, রূপের মাতাল রূপের কবি জাহাঙ্গীর।

উদ্ধৃতিটি প্রথম পঙ্‌ক্তি শেরআফগান হত্যাবৃত্তান্তের ইঙ্গিত। বাদশাহের হুকুমে টাঁকশালে মোহরে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে নূরজাহানের নামও লেখা হয়েছিল।

সেলিম বাদশাহ হয়েও মেহেরুন্নিসাকে ভুলতে পারেননি—'বাদশাজাদা বাদশা হ'ল তোমায় তবু ভুলবনা'। প্রেম ও যুদ্ধে কিছুই অন্যায় নয় অতএব নারী লুণ্ঠিত হ'ল। বর্ধমানে পাশাপাশি শেরআফগান ও কুতুব-এর সমাধিতে ইতিহাস রক্তসাক্ষী হয়ে রইল। ক্রমে ক্রমে অবহেলার হারেম থেকে নিজ ব্যক্তিত্বগুণে নূরজাহানের স্থান হ'ল বাদশাহের খাস মহলে। ভারতবর্ষ-শাসনে নেপথ্যে সম্রাজ্ঞীর ভূমিকাই প্রধান হয়ে উঠল। কারণ সেলিমের প্রেমিকসত্তা প্রেয়সীর কাছে যথার্থই নতজানু। কিন্তু এ হেন শাহনশাহও আজ মৃত্যুর হাতে পরাজিত।

৮.২.৩ কবিতা-বিশ্লেষণ

কবর-ই-নূরজাহান-এ ইতিহাসবাস্তব ও কল্পনা মিশিয়ে নূরজাহানের যে চিত্র কবি আমাদের উপহার দিয়েছেন তা অবশ্যই মর্মস্পর্শী। মরুকন্যা মেহেরুন্নিশা ছিলেন অতিসাধারণ ঘরের মেয়ে। তাঁর উত্থান সত্যিই অদ্ভুত। ক্রমে ক্রমে তিনি হ'লেন রূপেগুণে মোহিনী। নৃত্যগীতে, কবিতা রচনায়, তীরছোঁড়া ঘোড়ায় চড়ায় হলেন নিপুণ—

বাদশাজাদা দেখল তোমায়—দেখল প্রথম নওরোজে,
খুশী দিলের খুসরোজে তার জীবনমরণ দুই বোঝে
খালি হঠাৎ ঘোমটা তোমার সরম-রাঙা মুখখানি
এঁকে গেল যুবার বুকে রূপবানী গো রূপবাণী।

—এই হ'ল প্রথম প্রেমের ইতিহাস। নিয়নিত তাঁকে শেরআফগানের বিবি করেছিল, কিন্তু কালক্রমে তিনিই হলেন ইতিহাসের নায়িকা অথবা চালিকা শক্তি। ধীরে ধীরে জাহাঙ্গীরের উপর তিনি বিশাল প্রভাব বিস্তার করলেন। মাত্র দুটি পংক্তিতে এই নারীর ব্যক্তিত্ব কবি সুন্দর ফুটিয়েছেন

তুমি গো সাম্রাজ্যলক্ষ্মী কর্মে সদা উৎসাহী ;
জাহাঙ্গীরের পাঞ্জা নিয়ে করলে নারী বাদশাহী

নূরজাহানে সাধ্বীরূপটিও পাচ্ছি শাহাজাদা খুরম-এর প্ররোচনায় সেনাপতি মহব্বৎ খাঁ-র নজরবন্দী বাদশাহের উদ্ধার কাহিনিতে—

বন্দীস্বামীর মোচনহেতু হ'লে এবার বন্দিনী
মহাব্বতের মুঠা শিথিল করলে ইরাণ-নন্দিনী,

'তোড়ে তোমার ঐরাবত ঐ মহাব্বৎ খাঁ যায় ভেসে'—বর্ণনা হিসেবে অনবদ্য।

কবর-ই-নূরজাহান শেষ পর্যন্ত ইতিহাস-দলিলকে অতিক্রম করে মানবিক দলিল হয়ে উঠেছে এবং শেষ দুটি স্তবকে সে গূঢ়স্বাক্ষর রয়েছে। কবির নিজস্ব ভাবব্যাখ্যাই এর মূলে এবং এভাবেই কবিতাটি সমকালীন আবেদনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এই আবেদন অবশ্যই একটি চিরকালীন বার্তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কাঁটাবন আজ ঘিরেছে রূপের রাণির সমাধিকে।

জীর্ণ তোমার সমাধি আজ, মীনার বাহার যায় ঝরি,
আজকে তুমি নিরাভরণ চিরদিনের সুন্দরী।

সাধারণ ঘরের মাটির কাছাকাছি একলা মেয়ে আজ পুনশ্চ একলা। 'আজকে তোমার বুকে পাথর, মাথায় পাথর, পাথর পায়'। আজ জাহাঙ্গীরের কবর য-উজ্জ্বল, কিন্তু নূরজাহানের কবর অবহেলিত।

সমাধির শিয়ারে একটি করুণ ফারসি শ্লোক আছে, সেই শ্লোকটির কাব্যানুবাদ শুধু কবি করেন নি, সে শ্লোকটিকে কবিতার মর্মকথা হিসেবে রেখেছেন—

গরীবগোরে দীপ জ্বেল না ফুল দিয়ো না কেউ ভুলে
শ্যামা পোকার না পোড়ে পাখ, দাগা না পায় বুলবুলে

মাটির মেয়ে এভাবেই নম্র বিনতিতে মাটির কোলে ফিরে এলেন। জন্মমৃত্যুর মাঝখানে রইল শুধু রণরক্তসফলতার সফেন তরঙ্গ। "মোগলযুগের তিলোত্তমা—চিরযুগের সুন্দরী"-কে কবি ব্যতিতের দৃষ্টিতেই দেখলেন।

৮.২.৪ কাব্যগঠন : ভাষা ও ছন্দ

পরিশেষে বক্তব্য এ কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার বৈশিষ্ট্যসমূহ পূর্ণ আকারেই রয়েছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্যে পাঠকেরা ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র লিখিত 'সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা ও কাব্যরূপ' বইটি দেখতে পারেন। কবির আত্মভাবনার আলোকে স্নাত বলে এ কবিতা গীতিকবিতা, তাঁর কল্পনা ও অন্তর্দৃষ্টির গুণে এ কবিতা রোমান্টিক কবিতা। স্বরবৃত্ত-কলাবৃত্ত-ছড়ার ছন্দ-শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ যে নামেই এ কবিতার ছন্দকে ডাকা যাক 'ছন্দসরস্বতী' কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নির্মাণ দক্ষতার পরিচয় এখানে রয়েছে—

	১/১১ ১	১/১ ১ ১	১/১ ১ ১	১/১ ১
৪ + ৪ + ৪ +৩	বিস্মরণী	লতার বনে	ঘুমাও মাটির	বন্ধনে
	১ / ১ ১ ১	১ / ১ ১ ১	১ / ১ ১ ১	১ / ১ ১
৪ + ৪ + ৪ +৩	গোরী ! তোমার	গোরের মাটি	রূপের গোপী	চন্দনএ
	১ / ১ ১ ১	১ / ১ ১ ১	১ /১ ১ ১	১ / ১
৪ + ৪ + ৪ +৩	সোহাগী ! তোর	দেহের মাটি	স্বামী সোহাগী	সিঁদূর গো
	১ / ১ ১ ১	১ / ১ ১ ১	১ ১ ১ ১	/ ১ ১ ১
৪ + ৪ + ৪ +৩	জীর্ণ তোমার	শ্রীহীন কবর	বিশ্বনারীর	শ্রীদূর্গ

ভাষার নৈপুণ্য ছন্দের নৈপুণ্য দুই-ই বেশ বোঝা যাচ্ছে। দলবৃত্তে হসন্ত শব্দের গুরুত্ব থাকে। এ কবিতায় হসন্ত শব্দের ভালো ব্যবহার আছে। অন্যদিকে তদ্ভব তৎসম প্রভৃতি শব্দের পাশাপাশি আরবি-ফারসি শব্দের চমৎকার মিশ্রণও কবি ঘটিয়েছেন। জাহান-নূরী, মোহর, সুলতানা, জরীন গুল, খুসরোজ, বাদী, খাসমহল, পাঞ্জা, ঝাণ্ডা, কিস্মিমাৎ, মীনা, গরীবগোর, বুলবুল, চেরাগ—এই ধরনের শব্দ ব্যবহার প্রাসঙ্গিকভাবেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

'ধী-শ্রী ছটার ছত্র মাথায় ছত্রবতী সুলতানা' অনুপ্রাসের উদাহরণ। শব্দালঙ্কার ছাড়া অর্থালঙ্কারেরও সার্থক ব্যবহার আছে। যেমন—'তোড়ে তোমার ঐরাবত ঐ মহাব্বৎ খাঁ যায় ভেসে'—অতিশয়োক্তি। এ কবিতায় শেষপর্যন্ত তথ্য, আঙ্গিক, স্তবকনির্মাণ—মোট ১১টি স্তবক, মিলব্যবহার-পরপর পঙ্‌ক্তিতে মিত্রাক্ষর—সব ছাপিয়ে শেষ পর্যন্ত বড় হয়ে উঠেছে কবিতার সরসতা। কবি নূরজাহানের একটা চমৎকার জীবন্ত মূর্তি মৃত্যুলোক থেকে উদ্ধার করে এনে পাঠকদের উপহার দিয়েছেন—

বাদশার উপর বাদশা হলেন বাদশা হলেন তোমান বশ,
অফুরান যে স্ফূর্তি তোমার, অগাধ তোমার মনের রস।

দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিটিতেই সব কথা বলা হয়ে গিয়েছে।

"বিশের শতকের প্রথম পঁচিশ বছরের মধ্যে রবীন্দ্রভাবের বহুচিহ্নময় বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে গীতিকবিতাই ছিলো প্রধান আকর্ষণ। সত্যেন্দ্রনাথের সাধনার বিষয় ছিলো প্রধানতঃ এই গীতিকবিতা" (সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ : ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র)। কবর-ই-নূরজাহান গীতিকবিতা হিসেবে এর অন্তর্লীন কাহিনিসংকেত অবশ্যই উৎকর্ষের দাবি করতে পারে।

৮.৩ নজরুল ইসলামের কবিতা : বিদ্রোহী

ভূমিকা : নজরুল প্রতিভার বৈশিষ্ট্য : নজরুলের ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি বাংলা সাহিত্যের একটি বিখ্যাত কবিতা, 'অগ্নিবীণা' কাব্যের অন্তর্গত, ১৩২৮ সালের মাঘমাসে কলকাতায় রচিত। নজরুলের কবিতার মূল সুর এখানে সুন্দরভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে : গীতিকবিতার যে সর্বোচ্চ স্তর আবেগের যে চরম চূড়া ভাষার যে মহৎ ঐশ্বর্য কবিতাটি স্পর্শ করেছে তার সঙ্গে একমাত্র তুলনা হতে পারে কবির লেখা 'আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে' ও 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতাদ্বয়ের। বিদ্রোহী কবিতা পড়লে বোঝা যায় ভাবের দিকে রবীন্দ্রউত্তর বাংলা কাব্যে তিনি এক নতুনত্ব নিয়ে এসেছেন ; ছন্দে ভাষায় তাঁর মধ্যে রবীন্দ্রনাথেরই উত্তরাধিকার বর্তেছে, কিন্তু ভাবে তিনি স্বতন্ত্র। শব্দব্যবহার, ছন্দচেতনা ইত্যাদিতে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁকে অল্পস্বল্প প্রভাবিত করেন ; রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই তাঁর প্রিয় কবি কিন্তু কাব্যপথে নজরুলের বিচরণ ভিন্ন মার্গে। তাঁকে অবশ্য আমরা এক

পরবর্তী রোমান্টিক বলেই চিহ্নিত করতে পারি ; সোচ্চার আত্মঘোষণা ও আত্মবাদ এবং কিছুটা 'হাঁকডাকচীৎকার' অথবা কোলাহল-মুখরতার কারণে Byron ও Whitman-এর সঙ্গে তাঁর তুলনা দেয়া যায়। এক কথায় তিনি দুর্ধর্ষ জীবনপিপাসা ও জীবনআবেগের কবি। রোমান্টিকদের কুলগুরু রুশো বলেছেন "Man is born free, bt everywhere he is in chains" (মূল ফরাসি উক্তির ইংরেজি অনুবাদ)—মানুষ মুক্ত হয়ে জন্মেছে কিন্তু সে সর্বত্র শৃঙ্খালিত। আর নজরুলও যেন এই কথাটি জোরালোভাবে বলতে চেয়েছেন—তাঁর সমগ্র কবিতায় রয়েছে একটা শিকলভাঙার সাধনা, একটা বন্ধনমুক্তির তপস্যা। রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক কবিতার মধ্যবর্তী স্তরটি অবশ্যই তাঁর কবিতায় দেখা যায়।

৮.৩.১ 'বিদ্রোহী' রচনার পশ্চাৎপট

মুজফফর আহমগ রচিত 'কাজি নজরুল ইসলাম—স্মৃতিকথা" (প্রকাশক ন্যাশনাল বুক এজেন্সী) কবির সেরা জীবনী, অন্যদিকে তাঁর কাব্যকবিতা নিয়ে সেরা আলোচনা করেছেন বাংলাদেশের অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম তাঁর বইটিতে। বিদ্রোহী কবিতার পূর্বাপর রচনার ইতিহাস মুজফফর আহমেদ লিপিবদ্ধ করেছেন। বিদ্রোহী কবিতাটি নজরুল ইসলাম লিখেছেন ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সময়ে বড়দিনের ছুটির সময়ে। কবি মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে এইসময় তাঁর যোগাযোগ ছিল। পরে অবশ্য উভয়ের সম্পর্ক ভেঙে যায়, নজরুল মোহিতলালের গুরুগিরির আওতা থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। যাহোক 'বিদ্রোহী' নজরুল লিখেছিলেন কমরেড মুজফফর আহমদ-এর ৩/৪সি তালতলা লেনের ভাড়াবাড়িতে। একতলায় নজরুলও তাঁর সঙ্গেই সেখানে একসাথে থাকতেন। 'সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুয়ে এসে আমি বসেছি, এমন সময় নজরুল বলল, সে একটি কবিতা লিখেছে। পুরো কবিতাটি সে তখন আমায় পড়ে শোনাল। "বিদ্রোহী" কবিতার আমিই প্রথম শ্রোতা'—স্মৃতিকথা থেকে এই তথ্য জানা যায়। 'বিদ্রোহী' প্রথম ছাপা হয় সাপ্তাহিকী 'বিজলী'তে। 'বিদ্রোহী' রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা পেয়েছিল। কবিতাটি প্রকাশমাত্র অত্যন্ত জনপ্রিয় হয় এবং নজরুলের কবিখ্যাতি এক লাফে বেড়ে যায়। মোহিতলাল অবশ্য মনে করেছিলেন তাঁর "আমি" বলে পদ্য লেখাটির 'ভাব চুরি' করে নজরুল তাঁর কবিতাটি লেখেন। কথাটা অবশ্য সত্যি নয়। নজরুল 'আমি' থেকে তার লেখার idea টা হয়তো পেতে পারেন। 'আমি' থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি—"আমি বিরাট...আমি ক্ষুদ্র...আমি সুন্দর...আমি ভীষণ...আমি মধুর...আমি ম্যাডনাবক্ষে নিমীলিত নয়ন স্তনন্ধয় শিশু...আমি আনন্দ...আমি রহস্যময়, আমি দুর্জ্ঞেয়...আমি মৃৎপঞ্জল...আমি সৃষ্টিগ্রন্থের প্রহেলিকা...আমি দুর্বল অসহায়...আমি মূর্খ, আমি নির্বোধ...আমি উন্মাদ"—ইত্যাদি।

আর নজরুল লিখেছিলেন—

আমি চিরদুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস,
মহাপ্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস,
আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বী !
আমি দুর্বার
আমি ভেঙে করি সব চুরমার !
আমি অনিয়ম, উচ্ছৃঙ্খল
আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়মকানুন শৃঙ্খল।

বস্তুত 'বিদ্রোহী'কে নজরুলের কবিআত্মের, তাঁর নিজস্ব 'আমি'-র জয়পতাকা বলা যায়। কিন্তু একথা বলা যায় না তিনি মোহিতলালের নকল করেছেন। কবিতার ideaটা হয়তো মোহিতলালের 'আমি' পড়ে তাঁর মাথায় আসতে পারে সাহিত্যে এমন ব্যাপারই স্বাভাবিক ও সবসময় ঘটে।

৮.৩.২ কবিতা বিশ্লেষণ : ভাববস্তু

বিদ্রোহীতে রোমান্টিকের উচ্ছৃঙ্খল আত্মঘোষণা শিল্পের শাসনে বাঁধা পড়েছে। প্রথম পঙ্‌ক্তিদুটির সূচনা থেকেই কবিতাটি পাঠকের মন কেড়ে নেয়। এ কবিতা যেন এক আত্মপ্রেমিকের মায়াদর্পণ, এক নার্সিসাসের আত্মজীবনী।

আমার উচ্চশির দেখে হিমাদ্রিচূড়া মাথা নত করে। আমি বিশ্ববিধাতার বিস্ময়, আমার ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে ওঠেন, সেখানে জয়জয়শ্রীর রাজটীকা। আমি নিয়ম মানি না, আমি টর্পেডো ও মাইন-এর মতো ধ্বংসাত্মক, আমি ধূর্জটি, আমার চুলে বৈশাখী ঝড়, আমি বিদ্রোহী, আমি সবকিছু চূর্ণ করি ঘূর্ণিরূপে। 'আমি নৃত্যপাগল ছন্দ', 'আমি মুক্ত জীবনানন্দ', 'আমি হাম্বীর, আমি ছায়ানট, আমি হিন্দোল' ; 'আমি চল চঞ্চল' ; আমি মন যখন যা চায় তাই করি ; আমি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ি, 'আমি উন্মাদ' ; আমি মহামারি, আমি পৃথিবীর ভীতি, আমি সংহার, আমি উন্নঅধীর—এ ভাবেই কবি নজরুল বিদ্রোহী কবিতায় আত্মবীজমন্ত্র সোচ্চারে জপ করেছেন।

৮.৩.৩ রোমান্টিক আবেগ উচ্ছ্বাস

শব্দপ্রয়োগ তৎসম-দেশী-বিদেশী-ধ্বন্যাত্মক শব্দের মিশ্রণে তিনি কৃতিত্ব দেখান, বাংলা শব্দের সঙ্গে সহজাত প্রতিভায় আরবি ফারসি মিশিয়ে নতুন কাব্যবাণীর জন্ম দেন। পথিকৃৎ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। উদাহরণ দিচ্ছি—

আমি চিরদুরন্ত দুর্মদ
আমি দুর্দম, মম প্রাণের পেয়ালা হর্দম হ্যায় হর্দম ভরপুর মদ।

কবি একই সাথে হোমশিখা ও সাগ্নিক, যজ্ঞ ও যজ্ঞপুরোহিত ; সৃষ্টি ও ধ্বংস ; তিনি নীলকণ্ঠ বিষপানে, শিরজটায় জাহ্নবীকে তিনিই জটায় ধারণ করেন। নজরুল মিথোলজি বা পুরাকাহিনি থেকে সাবলীলভাবে উপমা তুলনা প্রভৃতি সংগ্রহ করেন। 'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণতূর্য'—অবশ্যই মনজয় করা উচ্চারণ। এখানে কবির সংগ্রামী ভূমিকার ইঙ্গিত।

বিদ্রোহী কবিতায় কবি 'কবিসত্তার স্বাধীনতাকেই ঘোষণা করেছেন। এখানে ইংরেজ কবি Lord Byron আমেরিকান কবি Walt Whitman প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে।

আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ।

—আত্মপূজারির এই দর্পিত বাক্য শুধু উচ্চারণ হিসাবেই চমৎকার নয়, শব্দের সাবলীল ব্যবহারেও প্রেরণার অনিবার্য জয়যাত্রাকে দেখিয়েছে। রোমান্টিক আবেগ উচ্ছ্বাসের এক তুমুল দর্পিত ব্যবহারই এখানে দেখা যাচ্ছে। 'আমি'-র মহাশক্তি সম্বন্ধে সচেতনতাই 'বিদ্রোহী' কবিতার মূল সৌন্দর্য, পদে পদে বিস্তক আবর্ত রচনা করেই কবি ভাবসিদ্ধির পথে এগোচ্ছেন। শব্দগত Contrast বা বৈপরীত্ব এ কবিতার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য—'আমি প্রাণখোলা হাসি উল্লাস—আমি সৃষ্টি বৈরী মহাত্রাস,' 'আমি কভু প্রশান্ত—কভু অশান্ত দারুণ স্বেচ্ছাচারী' ইত্যাদি অজস্র পঙ্‌ক্তি ও শব্দব্যবহার মনে পড়ে। ego বা অহং এর এমন নিরঙ্কুশ জয়যাত্রা নীটশে-বিরচিত Thus spake Zarasthustra গ্রন্থে কিছু দেখেছি।

নজরুল প্রেমের কবি, তিনি চারু সুকুমার হৃদয়ানুভূতির কবি, কোমল মনোরম হার্দ্য শব্দমালার কবি, কবিতায় অপূর্ব মদালস বিলাসবিভ্রময় মায়াবী প্রতিবেশ রচনা করতে পারেন। সেখানে মাধুর্যের হাত ধরে এসে দীপ্তি, লাবণ্যের হাত ধরে তেজ। নিম্নে উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিগুলিতে তার প্রমাণ রয়েছে—

আমি অভিমানী চিরক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা, ব্যথা সুনিবিড়,
চিত চুম্বন-চোর-কম্পন আমি থর-থর-থর প্রথম পরশ কুমারীর,
আমি গোপনপ্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল করে দেখা অনুখন,
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তার কাঁকন চুড়ির কনকন!

বোঝা যায় গীতিকবিতার সৌন্দর্য নির্মাণক্ষমতা কবির আয়ত্তে ছিল, জীবনের রুদ্রভীষণ বিস্ফোরক দিকগুলির যেমন তিনি সাগ্রহী রূপকার তেমনি আবার জীবনের মধুর কোমল সুললিত দিকগুলিও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। 'বিদ্রোহী' তথা সমগ্র নজরুলকাব্যে এই রুদ্র ও মধুরের বিপরীত সমাবেশ আছে।

'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি এই যে কবিত্বের অলৌকিক চূড়া স্পর্শ করেছেন তার একমাত্র তুলনা দোলনচাঁপা কাব্যের 'আজ সৃষ্টিসুখের উল্লাসে' কবিতাটি এবং তুলনা রয়েছে তাঁর গানগুলিতে সেগুলি আমরা যখন কবিতারূপে পড়ি।

আজি সৃষ্টিসুখের উল্লাসে
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগবগিয়ে খুন হাসে
আজ সৃষ্টিসুখের উল্লাসে

—এ উদ্ধৃতি পূর্বোক্ত কবিতাটি থেকে।

৮.৩.৪ বায়রন ও হুইটম্যানের সঙ্গে তুলনা

নজরুল ইসলাম প্রসঙ্গে সমালোচকেরা বায়রন ও ওয়াল্টহুইটম্যানের নামে করেছেন। Lord Byron লিখেছিলেন

Hereditary Bondsmen! Know ye not
Who would be free themselves must strike the blow?
(Childe Harold's Pilgrimage)

মুক্ত হতে গেলে আঘাত হানতে হয়, বংশানুক্রমিক ক্রীতদাসত্ব যারা করে একথা তাদের অজানা। এবং পুনশ্চ

I have not loved the world, nor the world me;
I have not flattered its rank beneath, nor bow'd
To its idolatries a patient knee

আমি পৃথিবীকে ভালোবাসিনি, এবং পৃথিবীও আমকে ভালোবাসেনি। আমি তোষামোদ করিনি, নতজানুও হইনি।

বায়রনের কবিভাবনার পাশাপাশি স্থাপন করা যায় নজরুলের কবিভাবনাকে। বিদ্রোহী কবিতায় পুরোনো নিয়ম কানুনকে ভেঙে ফেলার প্ররোচনা আছে—"আমি ভেঙে করি চুরমার', "আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল" ইত্যাদি কথায় সেই ইঙ্গিত। আর নিজের বিশ্ববিদ্রোহী খরদীপ্ত স্বাতন্ত্রের জয়গান রয়েছে, "আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্ণিশ" বা "আমি চির-বিদ্রোহী বীর / আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চিরউন্নত শির।" প্রভৃতি উচ্চারণে।

ওয়াল্ট হুইটম্যান ছিলেন এক সতেজ জীবনতৃষ্ণা ও মানবতার কবি। এই মানবতার সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে আত্মবাদ। 'I celebrate myself, and sing myself' —আমি নিজেকে নিয়ে উৎসব করি, নিজেকে নিয়েই গান গাই অথবা 'And nothing, not God, is greater to one than one's self is'—কোনো কিছুই, এমনকী ঈশ্বর পর্যন্ত একজন মানুষের আত্ম বা ব্যক্তিগত সত্তার চেয়ে বড় নয়—Leaves of Grass কাব্যের এইসব বাণী বহু পাঠকেরই পরিচিত। বিদ্রোহী কবিতাটির স্তরে স্তরে ভাঁজে ভাঁজে রয়েছে এই ব্যক্তিগত সত্তার

বন্দনা, মানুষের individuality বা মুক্ত ব্যক্তিত্বের জয়গান। গীতিকবিতার, বিংশশতকের কবিতার এই এক প্রধান লক্ষণ। হুইটম্যানের পাশাপাশি এক নিঃশ্বাসে পাঠ করা যায় নজরুলের বিদ্রোহী কবিতার কোনো কোনো পঙ্‌ক্তি অথবা অংশ। 'আমি মহাবিশ্বের মহাকাশ কাড়ি/...উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি বিশ্ব বিধাতৃর', 'আমি বিশ্বতোরনে বৈজয়ন্তী, মানববিজয় কেতন' ইত্যাদি নজরুলীয় পঙ্‌ক্তিগুলি অবশ্যই মনে পড়বে এ প্রসঙ্গে।

৮.৩.৫ দেশবিদেশের পুরাণব্যবহার

বিদ্রোহী কবিতার একটি বৈশিষ্ট্য এখানে কবি দেশবিদেশের মিথোলজি বা পুরাণ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে ব্যবহার করেছেন। ধূর্জটি কামদগ্নি, ইন্দ্রাণী, গঙ্গোত্রী, দুর্বাশা, বিশ্বামিত্র, উচ্চৈঃশ্রবা, বাসুকি, বিষ্ণু, চণ্ডী, শ্যাম, পরশুরাম ইত্যাদি এসেছে সংস্কৃত পুরাণ থেকে। আবার বোরবাক, দোজখ, জিব্রাইল, ইস্রাফিল ইত্যাদি এসেছে আরবি পুরাণ থেকে। বোররাজ স্বর্গের পক্ষীরাজ, দোজখ নরক, জিব্রাইল প্রভৃতি দেবদূত। আবার কবি যখন বলেন—'আমি অর্ফিসাসের বাঁশরী' তখন তিনি greek Mythology-র Orpheus-এর কথা বলেন যিনি ছিলেন সঙ্গীতযন্ত্রবাদক, মৃত্যুলোকে গিয়েছিলেন স্ত্রী ইউরিডিকে-কে ফিরিয়ে আনবেন বলে।

৮.৩.৬ উপসংহার

বিদ্রোহী কবিতাটি শেষ স্তবকদুটিতে একটি অনন্ত climax এ পৌঁছেছে।

আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দেবো পদচিহ্ন
আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন

এই অসাধারণ উচ্চারণে রেনেসাঁসের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মুক্তিসাধক যত বিদ্রোহী বিপ্লবী মানুষের মর্মকথা আছে। এই মানুষ Iconoclast বা দেবদ্রোহী, প্রথাবিরোধী, সর্বদা স্রোতের বিরুদ্ধে ও প্রতিবাদী চরিত্র। এই মানুষ সক্রেটিস, শেলী, আলেকজান্ডার, নেপোলিয়ান, রুশো বা নীটশের মন জন্ম বিদ্রোহী জন্মবিপ্লবী। আর একটু আগেই নজরুল বিদ্রোহী কবিতায় তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উচ্চারণটি সমাপ্ত করলেন—

মহা বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোলে আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবেনা—
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত।

এখানে humanist কবির মানবতাবাদ বা বিদ্রোহী কবিতার মূল সৌন্দর্য আবেগমথিত ভাষায় প্রকাশিত। এখানে আমরা সর্বহারার কবিকে পেলাম। কাব্যের এই সমুচ্চ চূড়া কবি আরো একবার স্পর্শ করেছিলেন তাঁর 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার'এ। রোমান্টিক কবি তাঁর মানবতাবাদের কারণেই কল্পনার আকাশে ডানা মেলেও মাটির পৃথিবীতে শিকড়সংসক্ত থাকতে পারেন। 'বিদ্রোহী' কবিতায় নজরুল এই চিরন্তন সত্যকে আরও একবার প্রমাণিত করলেন। শেলীর 'পশ্চিমী ঝড়ের' মতোই তিনি হয়ে উঠলেন নতুনের পথিকৃৎ।

৮.৪ মোহিতলাল মজুমদারের কবিতা : কালাপাহাড়

ভূমিকা : কালাপাহাড় মোহিতলাল মজুমদারের 'বিস্মরণী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। মোহিতলালের জন্ম ১৮৮৮ সালে, তাঁর পিতা ছিলেন কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের জ্ঞাতিভ্রাতা। বি.এ. পাশ করে তিনি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ. ও আইন পড়তে শুরু করলেও সে কাজ অসাপ্ত রাখতে

হয়েছিল। অধ্যাপক ডঃ সুশীলকুমার দে-র সঙ্গে ছাত্রজীবনে কবির বন্ধুত্ব হয়। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি.লিট সুশীলকুমার পরে মোহিতলালকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অধ্যাপক করে নিয়ে যান। পরবর্তীকালে তিনি সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত শনিবারের চিঠির সাহিত্যিকগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। 'স্বপনপসারী', 'বিস্মরণী', 'স্মরগরল' ও 'হেমন্তগোধূলি' তাঁর কাব্যগ্রন্থ এবং কবি শ্রীমধুসূদন, সাহিত্যবিতান, আধুনিক বাংলা সাহিত্য, বঙ্কিমবরণ, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, বাংলা কবিতার ছন্দ, শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র, রবিপ্রদক্ষিণ ইত্যাদি তাঁর সমালোচনাগ্রন্থ। কবি হিসেবে বাংলা সাহিত্যে মোহিতলালের স্থানটি সুনির্দিষ্ট অন্যদিকে বাংলাসমালোচনা সাহিত্যের তিনি একজন আদি পথিকৃৎ। ইংরেজি সাহিত্যে ও ইংরেজি সমালোচনাসাহিত্যে পারঙ্গম মোহিতলাল কবি অধ্যাপক ম্যাথু আর্নল্ড, সমালোচক মিডলটন মারি প্রভৃতির ভক্ত ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে সমালোচনাকে তিনি সৃষ্টিধর্মী আর্টের পর্যায়ে নিয়ে যান ও তাকে উৎকর্ষে ইংরেজি সমালোচনার সঙ্গে একাসনে বসানোর পক্ষে উপযুক্ত করে তোলেন। মোহিতলালের কবিতাকে বুঝতে গেলে তাঁর কবিতা সম্পর্কিত আলোচনাগুলিও পড়তে হবে কারণ সাহিত্যতত্ত্ব সৌন্দর্যতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে।

৮.৪.১ রবীন্দ্রবিরোধিতার সূচনা

কবি হিসেবে বাংলাসাহিত্যে মোহিতলালের ঐতিহাসিক অবস্থান 'কল্লোলযুগে'র লেখক অচিন্তকুমার সেনগুপ্ত থেকে শুরু করে 'কবিতার বিচিত্র কথা'র গ্রন্থের লেখক অধ্যাপক ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র সকলেই লক্ষ্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তখন প্রবল পরাক্রান্ত ও প্রভাববিস্তারী কবি। সেই সময়টাকে বলতে পারি রবীন্দ্রবরণ ও রবীন্দ্রবিরোধের যুগান্ত। একদিকে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রভৃতি কবিরা রবীন্দ্রভক্ত রূপে পরিচিত পেয়েছেন—রবীন্দ্রনাথের উচ্চ রোমান্টিকতাকে এঁরা সকলেই গ্রহণ করে স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তরলীকরণ করে এরা পরিবেশন করছিলেন। ফলে এরা নতুন পথের সন্ধান দিতে পারছিলেন না। এঁদের বিপরীতে ছিলেন জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রভৃতি আধুনিক কবিরা। এঁরা উদ্‌গত হয়েছিলেন রোমান্টিক কবিতা তথা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিত্রয়ের অবস্থান এই দুই দলের মধ্যে যোজক বা buffer হিসেবে। আধুনিক কবিরা ভাবে ভাষায় ছন্দে নতুনত্ব আনলেন—তাঁদের আদর্শ হলেন রবীন্দ্রনাথ নন, এলিয়ট প্রভৃতির মতো বিদেশী কবিরা। মোহিতলাল প্রভৃতি বর্ণিত কবিত্রয় রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নতুনভাবের সন্ধানে ব্রতী হলেন যদিও ভাষা ও ছন্দে এখন এঁরা রোমান্টিক পথেই বিচরণ করেছেন। তবু এঁরাই বাংলা কবিতায় নিরবচ্ছিন্ন রবীন্দ্রপ্রভাবের বিরুদ্ধে প্রথম সাহিত্যিক বিদ্রোহী।

৮.৪.২ মোহিতলালের কবিতায় রবীন্দ্রবিদ্রোহ

মোহিতলালের রবীন্দ্রবিদ্রোহ 'মোহমুদ্‌গর'-এর একটি অবিস্মরণীয় স্তবকে রয়েছে—

ঊর্ধ্বমুখে ধেয়াইয়া রজোহীন রজনীর মল্লিকামাধবী
নেহারিয়া নীহারিকা ছবি—
কল্পনার দ্রাক্ষাবনে মধু চুষি নীরক্ত অধরে
উমহাসি দুগ্ধধারা ধরিত্রীর পূর্ণ পয়োধরে
বুভুক্ষু মানব লাগি রচি ইন্দ্রজাল
আপনা বঞ্চিত কবি চির ইহকাল
কতদিন ভুলাইবে মতর্জনে বিলাইয়া মোহন আসব
হে কবি-বাসব ?

'কবি বাসব' বলাবাহুল্য কবি-ইন্দ্র রবীন্দ্র। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি শুধুই এক কল্পনার ইন্দ্রধনুরঞ্জিত জগৎ সৃষ্টি করেছেন, বাস্তবজগতে এর কোনো মূল নেই। এ অভিযোগ অবশ্য ধোপে টেঁকে না কিন্তু মূল কথাটা এই যে মোহিতলাল-নজরুল-যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মত কবিরা কাব্যে হয়ে উঠলেন এক নতুন পথের দিশারী এবং আধুনিক কবিতার নবভাবনার পূর্বাভাস এঁদের কবিতায় অল্পস্বল্প ফুটে উঠেছে।

৮.৪.৩ 'কালাপাহাড়' কবিতায় বিদ্রোহী মনোভাবের পরিচয়

মোহিতলাল মজুমদারের 'কালাপাহাড়' কবিতাটির আলোচনাপ্রসঙ্গে এ সব কথা মনে রাখা জরুরি কারণ 'কালাপাহাড়'কে মূর্তিবিধ্বংসী বা Iconoclast রূপে কবি প্রায় প্রতীকী অর্থেই ব্যবহার করেছেন—তিনি নিজে কবিতার ভাবরাজ্যে পুরাতন মূর্তিবিধ্বংসী রূপেই আবির্ভূত হতে চেয়েছিলেন। এখানে তাঁর সঙ্গে তুলনীয় 'বিদ্রোহী' কবিতার নজরুল ইসলাম। ইংরেজ রোমান্টিক কবি Shelley কে বলা হয়েছে Iconoclast বা মূর্তি-ধ্বংসী বিদ্রোহীরূপে। তিনি এক millenium বা নতুন মানবপৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিলেন—পুরাতন প্রথামাত্রিক সমাজকে ধ্বংস ও বিদীর্ণ করে এক নতুন মানববিশ্বের উদয় অভ্যুদয় হবে, সেখানে সব মানুষের সমান অধিকার থাকবে এই ছিল তাঁর কবিস্বপ্ন। মোহিতলাল, কালাপাহাড়ের ইতিহাস-সংকেতে এক নতুন মানবসমাজ ও পৃথিবীর উত্থানের আভাস দেখিয়েছেন—

শুনিছনা ওই দিকে দিকে কাঁদে রক্তপিশাচ প্রেতের দল!
শবভুক সব নিশাচর করে জগৎ জুড়িয়া কী কোলাহল!
দূর মশালের তপ্তনিশাসে ঘামিয়া উঠিছে গগনশিলা!
ধরণীর বুক থরথরি কাঁপে—এ কী তাণ্ডব নৃত্যলীলা।
এতদিন পরে উদিল কি আজ সুরাসুরজয়ী যুগাবতার?
মানুষের পাপ করিতে মোচন, দেবতারে হানি ভীমপ্রহার,
কালাপাহাড়!

অতএব 'কালাপাহাড়' হচ্ছে নতুন মুক্ত সমাজপ্রতিষ্ঠার এক catalyst বা অনুঘটক। সেখানে দেবতার নামে যথেচ্ছ অনাচার থাকবে না, মানুষের উপর অত্যাচার থাকবেনা ইত্যাদি। পাঠকের স্মরণে আসতে পারে শেলির Ode to the West Wind কবিতার অমর পঙ্‌ক্তিরাজি—

Drive my dead thoughts
Over the Universe to quicken a new birth

পশ্চিমের আগত হে ঝড়, তুমি আমার মৃত চিন্তাকে ঝরাপাতার মতো উড়িয়ে দিয়ে এক নতুন পৃথিবীর আগমনকে ত্বরান্বিত করো।

৮.৪.৪ কবিতা বিশ্লেষণ

বিস্মরণী কাব্যগ্রন্থের সূচনায় অধ্যাপক শ্রীসুশীলকুমার দে, ডি-লিট (লন্ডন), পি. আর. এস-কৃত যে 'কাব্যআলোচনা' আছে সেখানে 'কালাপাহাড়' কবিতাটির অর্থের দিকদর্শনী আলোচনা আছে। অধ্যাপক সুশীলকুমার বলেছেন, এইরূপ অনেক কবিতায় এই রূপমুগ্ধ আর্টিস্ট চেষ্টা করেছেন শুদ্ধ একটা ছবি আঁকতে—সেই ছবির মধ্যে ভাবটি ধীরে ধীরে দীপ্ত হয়ে আপনি ফুটে উঠেছে। তাঁর বাঁধন, মৃতপ্রিয়া, ঘুঘুরডাক, কন্যা শরৎ ও কালাপাহাড় এই শ্রেণির রচনা। এই সকল কবিতায় তাঁর উদ্দেশ্য একটি অবস্থা, একটি mood বা একটি atmosphere এর আলেখ্যসৃষ্টি। ইতিহাসবর্ণিত কালাপাহাড়কে উপলক্ষ্য করে কবি শুধু march of

the iconoclast এর একটা ছবি আঁকতে চেষ্টা করেছেন। মানুষের জীবনে, সমাজে ও ধর্মে স্তূপাকার আবর্জনার মতো, যে সব প্রাণশক্তিবিরোধী অনাচার ও কুসংস্কার যাকে বেকন idol বা অসত্যের প্রতীক বিগ্রহ বলেছেন—

আদি হতে যত বেদনা জমেছে বঞ্চনাহত ব্যর্থশ্বাস—

সেই সমস্ত পুঞ্জীভূত অসত্য ও অপমান এই বিগ্রহধ্বংসী কালপুরুষের মতো নির্মম, অসত্যদেবতার চিরন্তন শত্রুর করালদণ্ডের আঘাতে চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে—

ভেঙ্গো ফেল মঠ মন্দিরচূড়া, দারুশিলা কর নিমজ্জন!
বলি উপাচার ধূপদীপারতি রসাতলে দাও বিসর্জন।
নাই ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছ যবন, নাই ভগবান—ভক্ত নাই,
যুগে যুগে শুধু মানুষ আছে রে! মানুষের বুকে রক্ত চাই!

যা ভঙ্গুর তা ঝটিকার মুখে ভেঙে যাচ্ছে, কিন্তু প্রলয়ের সঙ্গো সঙ্গো এই অপূর্ব ধ্বংসলীলার মধ্যে নবসৃষ্টির আয়োজনও রয়েছে—

ব্রাহ্মণযুবা যবনে মিলেছে, পবন মিলেছে বহ্নিসাথে!
এ কোন বিধাতা বজ্র ধরেছে নবসৃষ্টির প্রলয়রাতে!
মরুর মর্ম বিদারি বহিছে সুধার উৎস পিপাসাহরা!
কল্লোলে তার বন্যার রোল! কূল ভেঙ্গো বুঝি ভাসায় ধরা!
ওরে ভয় নাই! মুকুটে তাহার নবারুণছটা, ময়ুখহার!
কালনিশিথিনী লুকায় বসলে। সব দিল তাই নাম তাহার
—কালাপাহাড়।

ইতিকথার এইরূপ নূতন imagintive interpretation-এর চেষ্টা তাঁর 'নূরজাহান ও জাহাঙ্গীর' কবিতাতেও দেখা যায়।

বলাবাহুল্য মোহিতলাল ইতিহাস থেকে myth বা গল্প নিয়ে তাকে আধুনিক ভাবব্যাখ্যারূপে ব্যবহার করেছেন। কালাপাহাড় ইতিহাস যাকে মন্দির ধ্বংসকারী অত্যাচারী যবনরূপেই চিহ্নিত করেছে কবি তাকেই নতুন সমাজব্যবস্থা বা new social order-এর হোতা বা উদ্গাতারূপে দেখতে চেয়েছেন। বাংলার তুর্কী ইতিহাসে আছে এক হিন্দু যুবাই যবন হয়ে তার বিধ্বংসী কার্যকলাপের জন্য "কালাপাহাড়" আখ্যা পেয়েছিলেন। এ কাহিনির মধ্যে কতটা সত্যি কতটা মিথ্যা তা অবশ্য নিরূপিত হয়নি।

৮.৪.৫ কবিতার গঠন বিশ্লেষণ

কবি হিসাবে মোহিতলাল কল্পনাবিলাসী। আনন্দের পাশাপাশি বিষাদ তাঁর কবিতার একটা মূল সুর। ছন্দ ও ভাষার অপূর্বতা তাঁর কবিতায়। তিনি 'কল্পনাবিলাসী', 'ভাবপ্রাণ idealist'। তাঁর আদর্শবাদ তাঁকে subjective বা ব্যক্তিনিষ্ঠ ভাববাদের সঙ্গো objective বস্তুবাদকে মেলাতে সাহায্য করে। মধুসূদন ও বঙ্কিমসমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি রোমান্টিকতাকে সম্পূর্ণ বর্জন না করেও classicism বা বস্তুনিষ্ঠ কল্পনার ও শব্দের ভাস্কর্যময় সংগঠনের প্রতি সমর্থন দেখিয়েছেন। কালাপাহাড়ে ভাষা ও ছন্দের এই ভাস্কর্যময় সংগঠন কিছু আছে। কবিতাটি যাণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত বা কলাবৃত্তে রচিত। ১২টি স্তবকে বিভক্ত। মিলবিন্যাস a a b b c c c, প্রতি স্তবকে ৭ পঙ্‌ক্তি। কালাপাহাড় শব্দটি ধূয়ারূপে সপ্তম পংক্তিতে সর্বত্র ব্যবহৃত, ওই পংক্তিতে শুধু এই একটি শব্দ রয়েছে। অন্যদিকে refrain বা ধ্রুবপদের ভঙ্গিতে স্তবক থেকে স্তবকান্তরে কোনো কোনো পঙ্‌ক্তি পুনরাবৃত্ত—যেমন ১ম ও ২য় স্তবকে "এতদিন পরে উদল কি আজ সুরাসুরজয়ী যুগাবতার?" ৮ম ও ১০ম পংক্তিতে 'ভয়ঙ্করের ভুল ভেঙে যায়! বাজায় দামামা, কাড়া-নাকাড়' ইত্যাদি।

৮.৪.৬ বস্তুপ্রাণতা ও কল্পনাপ্রাণতার সমন্বয়

'কালাপাহাড়ে' রয়েছে কবিমনের বস্তুপ্রাণতা বা objectivity-র সঙ্গে কল্পনাপ্রবণতা বা Subjectivity-র মিলন। ইতিহাসের তথ্যবস্তুর সার্থক রূপায়ণ এখানে। আবেগের সঙ্গে রয়েছে সংযম, lyric বা গীতিময়তার সঙ্গে মিশেছে dramatic বা নাটকীয়তা।

ডঃ সুশীল কুমার দে যথার্থই বলেছেন, মোহিতলাল ছন্দকৌশল ও শব্দমন্ত্রে অসাধারণ সিদ্ধিলাভ করেছেন। 'নিরর্থক বাক্যাড়ত্বের বা কথা অসদ্ব্যবহার তাঁর অজ্ঞাত এবং শব্দের ঝঙ্কার বা ধ্বনি সম্বন্ধে তাঁর কান অভ্রান্ত। স্তবকনির্মাণে তিনি নিপুণ—এখানে তাঁর ক্লাসিক কবিসুলভ গঠননৈপুণ্য প্রকট। সুশীলকুমার যথার্থই বলেছেন, "রোমান্টিকভাবে অনুপ্রাণিত হলেও, নিখুঁত কারিগরি হিসাবে মোহিতলালের কবিতাগুলি ক্লাসিক আর্টের উৎকৃষ্ট "রোমান্টিকভাবে অনুপ্রাণিত হলেও, নিখুঁত কারিগরি হিসাবে মোহিতলালের কবিতাগুলি ক্লাসিক আর্টের উৎকৃষ্ট উদাহরণ বলা যায়। Concrete details বা খুঁটিনাটির দিকে তাঁর বিশেষ লক্ষ আছে বলেই শব্দচয়নের গাঢ়তা ও গৌরবে তাঁর কবিতার ভাবকল্পনা শাণোল্লিখিত হীরকখণ্ডের মতো পরিপূর্ণ উজ্জ্বলতালাভ করেছে। বিদেশী কবিদের মধ্যে Landor ও Tennyson এর দেশী কবিদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ সেন ও অক্ষয় বড়ালের প্রভাবই তাঁর কবিতায় বেশি দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত কবির কাছ থেকে তাঁক শিক্ষা হয়েছে—শিল্পসৌন্দর্য, বিন্যাসনৈপুণ্য ও নির্মাণকৌশল।" সুইনবার্ন প্রভৃতি প্রিরাকেলাইট কবিদের সঙ্গেও মোহিতলাল প্রতিতুলিত হতে পারেন তাঁর কবিতার sensuousness বা ইন্দ্রিয়জ সংবেদনার কারণে। তাঁর সমালোচনার ভাষাতেই বলি, তিনি যেন "পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ" জ্বালিয়ে রূপসৌন্দর্যের আরতি করেছিলেন।

কালাপাহাড় কবিতায় একদিকে রয়েছে ভাষাব্যবহার-এর বিদ্যুতীচ্ছটা—

বাজে দুন্দুভি, তামার দামামা—বাজে কী ভীষণ কাড়ানাকাড়!
অগ্নিপতাকা উড়িছে ঈশানে—ফুলিছে তাহাতে উল্কাহার!
অসির ফলকে অশনি ঝলকে—গলে যায় এত ত্রিশূলচূড়া!
ভৈরব রবে মূর্ছিত ধরা, আকাশের ছাদ হয় বা গুঁড়া!

এ কবিতায় অন্যদিকে রয়েছে ভাবের দিক থেকে নব্য মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠা

ভেঙ্গে ফেল মঠ-মন্দির-চূড়া দারুশিলা কর বিসর্জন
বলি-উপাচার ধূপ দীপারতি রসাতলে দাও বিসর্জন!
নাই ব্রাহ্মণ, ম্লেচ্ছ-যবন, নাই ভগবান-ভক্ত নাই,
যুগে যুগে শুধু মানুষ আছে রে! মানুষের বুকে রক্ত চাই।

—শেষ পঙ্‌ক্তিটিতেই সব কথা বলা হয়ে গেছে।

সাহিত্যবিতান গ্রন্থের 'সাহিত্যবিচার' প্রবন্ধে মোহিতলাল বলেছেন "এইজন্যই কাব্যসৃষ্টিতে Subjectivity বা মন্ময়তা অপেক্ষা Objectivity বা তন্ময়তাই কবিকল্পনার উৎকর্ষ প্রমাণিত করে।" মোহিতলালের 'পান্থ', 'মোহমুদগর', 'কালাপাহাড়' ইত্যাদি কবিতায় Subjectivity ও objectivity-র চমৎকার মিলন আমরা দেখছি, ব্যক্তি আমিকে কিছুটা পরিশোধন করে বস্তুগতভাবেই পরিবেশনের প্রয়াস লক্ষিত হচ্ছে।

৮.৫ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতা : ঘুমের ঘোরে

ভূমিকা : যতীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য : কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বিরচিত বিখ্যাত 'ঘুমের ঘোরে' কবিতাটি তাঁর মরীচিকা (১৩১৭-১৩২৯) নামক কাব্যগ্রন্থে অন্তর্গত। এই দীর্ঘ কবিতাটি মোট সাতটি 'ঝোঁকে'

অর্থাৎ অংশ বা খণ্ডে রচিত। এই কবিতায় সমগ্র যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাব্যের যেন সারাৎসার রক্ষিত আছে, কবির কবিতার ভাবসৌন্দর্য ও জীবনদর্শন চমৎকারভাবেই এখানে ফুটে উঠেছে। কবি ঘুমের ভিতর মগ্ন হয়ে কোনো রোমান্টিক স্বপ্নের গভীরে ডুবে যাননি, বরং স্তরে স্তরে বাস্তবতার উন্মোচন করেছেন। এই বাস্তবতা অনেকসময়েই তিক্ত এবং নির্মম। রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 'ঘুমের ঘোরে' এবং লোহার ব্যথা, দুঃখবাদী, ভাড়াটিয়া বাড়ি, খেজুরবাগান, মৎস্যশিকার, কেতকী, হাটে, বেদিনী, কচিডাব ইত্যাদি কবিতায় যথেষ্টই আছে। ভাবের দিক থেকে যুগের সবচেয়ে প্রভাবশালী কবি রবীন্দ্রনাথের থেকে ভিন্ন পথে যাওয়ার প্রয়াস ও রবীন্দ্রবিদ্রোহ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতায় যথেষ্টই ছিল। ছন্দ ও আঙ্গিকে তিনি অবশ্য পূর্ববর্তী রোমান্টিক কবিতার ঐতিহ্যের বাইরে যাওয়ার খুব একটা চেষ্টা করেননি, তবে লক্ষ্য করা যায় তাঁর প্রায় অধিকাংশ কবিতাতেই ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এভাবেই কবি ছন্দে পূর্ববর্তী কবিতার অতিউৎসাহ ও বৈচিত্র্য বর্জন করে একটা স্বেচ্ছাকৃত একঘেয়েমি বা একসুরা বিবর্ণতার চর্চা করেছেন। এভাবেই কবি তাঁর নিজস্ব mood বা মেজাজ আবিষ্কারে এবং বিশ্বজোড়া নিরাশাবাদের স্বরূপ উন্মোচনে ব্রতী হয়েছেন।

৮.৫.১ কবিতা বিশ্লেষণ

'ঘুমের ঘোরে' কবিতার প্রথম ঝোঁক বা প্রথম অংশের

এসো গো বন্ধু আবার আজিকে বেড়েছে বুকের ব্যথা
তোমায় আমায় হয়ে যাক দুটো কাটাছাঁটা সোজা কথা

এই দুটি পঙ্‌ক্তি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এর মধ্যে রয়েছে ব্যঙ্গ, পরিহাস, নাস্তিকতা, রোমান্টিসিজম-বিরুদ্ধতা, বিদ্রোহ, প্রতিবাদ, মননশীলতা ও বুদ্ধিবাদ এবং নিপুণ আত্মবিশ্লেষণ। সমস্ত কবিতার বক্তব্যেরই চমৎকার মুখবন্ধ এখানে রচিত হয়েছে। 'বন্ধু' নামক সম্বোধনের উদ্দিষ্ট হতে পারেন কবির দৃষ্টিতে দেখা এই জড় জগতের আপাত অদৃশ্য অধিপতি এক নিষ্ঠুর নিরপেক্ষ হৃদয়াহীন ঈশ্বর, আবার এই 'বন্ধু' সম্বোধনের মধ্যে আভাস রয়েছে রোমান্টিক কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথের—এক মধুরতাবাদী আনন্দের উপাসক পরিপূর্ণ কল্পনাবাদী যাঁর বিরুদ্ধে দুঃখবাদী কবির অভিযোগ-প্রতিবাদের কণ্ঠ উত্থিত। অবশ্য এই এককের বিদ্রোহকেও আমরা এক ধরনের অধঃপতিত বিপথগামী রোমান্টিসিজম বলে চিহ্নিত করতে পারি।

সৃষ্টি চমৎকার।
ঠোকাঠুকি নাই, গতিবিকানে বাঁধা আছে চারিধার।

—আস্তিক্যবাদীরা ঈশ্বরসৃষ্ট জগৎকে মসৃণ সামঞ্জস্যময় বলেই ভাবতে চায়। কিন্তু ভুক্তভোগী কবিকথক জানেন মোদ্দা বাস্তবটা এই যে ঘোড়ার লোহার নালের আঘাতে পথ চলতে যখন পা খোঁড়া হয়ে যায় ও সেই খোঁড়া পা গাড্ডায় পড়ে সেখানে উচ্ছসিত ভক্তকথিত 'ঠাকুরের করুণা' খুব একটা পাওয়া যায় না।

এই নিরপেক্ষ নির্মম বিশ্বঘূর্ণনের দ্রষ্টা ঈশ্বরের কাছে কবি বিস্মৃতির চির ঘুমঘোর কামনা করেন। অসঙ্গতি এই যে আমরা তাঁকেই ডাকি এবং এভাবেই 'যন্ত্রণা পাই, সান্ত্বনা চাই—আপনাদের দিই কাঁকে। সুতরাং আলোচ্য কবিতায় মানব অস্তিত্বের ট্র্যাজেডিটুকু কবি হাড়ে হাড়েই বুঝেছেন।

কবি অনুভব করেছেন আমাদের সুখদুঃখ আমাদের অর্থাৎ পৃথিবীর মানুষদেরই নিজস্ব সৃষ্টি। ঈশ্বর দারুমূর্তি জগন্নাথ, কারুকাছে কোনো কৈফিয়ত চান না। ঈশ্বরের ত্রুটির প্রতি ব্যঙ্গ দু'টি বিখ্যাত পঙ্‌ক্তিতে নিক্ষিপ্ত

তুমি শালগ্রাম শিলা
শোওয়া-বসা যার সকলি সমান, তারে নিয়ে রাসলীলা।

মানুষের inadequacy বা অপর্যাপ্ততাও তিনি লক্ষ করেছেন ; প্রেম, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে আমরা অনেক রোমান্টিক স্বপ্ন রচনা করেছি আদর্শবাদ বুনন করেছি কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় সত্য বড়োই নির্মম ও কঠোর। অতএব কবির আত্মবীক্ষণ

মরণে কে হবে সাথী,
প্রেম ও ধর্ম জাগিতে পারে না বারোটার বেশী রাতি।

অসীম জড়ের ভিতর আমাদের চেতনাশক্তি ঘুমের ভিতর স্বপ্নের মতো বিরাজ করে। এই চেতনার অতি উপস্থিতির ফলেই কবি দুঃখবাদের পথযাত্রী। জড়জগতে ঈশ্বর সকল শক্তি সংহত করে মহাজড়রূপে অবস্থানকারী। "সেই মহাঘুমে সাঁতারি বেড়াই মোরা স্বপনের ফেনা', আমাদের জীবন ক্ষণস্থায়ী তবু আমরা প্রেমে পিপাসায় দায়বদ্ধ। যাকে আমরা শৃঙ্খলা বলে গর্ব করি তা আসলে স্বপ্নের মতো উপরে উপরে গোঁজামিল দিয়ে মেলানো। অতএব কবির উদ্ধত আত্মঘোষণা—

প্রেম বলে কিছু নাই
চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই।

'ঘুমের ঘোরে' কবিতার প্রথম অংশেই কবি তার মূল বক্তব্য পেশ করেছেন। পরবর্তী অংশগুলিতে সেই বক্তব্যের ক্রমবিস্তার রয়েছে। ঈশ্বর যে দুঃখী মানুষের কোনো কাজে আসেন না সেটাও কবি বেশ লক্ষ্য করেছেন—

বন্ধু প্রণাম হই—
শীতের বাতাসে জমে যায় দেহ—ছেঁড়া কাঁথাখানা কই ?

অধিকন্তু এই 'প্রথম ঝোঁকেই রয়েছে বিখ্যাত রবীন্দ্রবিদ্রোহ স্বয়ং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'কল্লোলযুগ' গ্রন্থে যার উল্লেখ করেছেন—

কেন ভাই রবি, বিরক্ত করো ? তুমি দেখি সব-ওঁচা,
কিরণঝাঁটার হিরণকাঠিতে কেন চোখে মারো খোঁচা।
জানি তুমি ভালো ছেলে
ঘড়িটি তোমার কাঁটায় কাঁটায় ঠিক যায় বিনা তেলে।
তব জয় জয় চারিদিকে হয়, আলোক পাইল লোক,
শুধাই তোমায়—কী আলো পেয়েছে জন্মান্ধের চোখ ?
চেরাপুঞ্জির থেকে
একখানি মেঘ ধার দিতে পারো গোবি-সাহারার বুকে ?

শেষদুটি পঙ্‌ক্তি বাংলা সাহিত্যে প্রবাদপ্রতিম হয়ে গেছে। 'রবি' হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। কল্পনার অপূর্ব জগৎ তিনি নির্মাণ করেছেন ; কিন্তু চেরাপুঞ্জির মেঘসমৃদ্ধির রাজ্য থেকে বাস্তবের দুঃখতৃষ্ণার গোবিসাহারার মরুভূমি জগতে তৃষ্ণাহর বারিবর্ষী একটুকরো মেঘ আনবার ক্ষমতাও তাঁর নেই। রোমান্টিক কবির কবিতা কল্পনা দিয়ে তৈরি রঙিন মায়াবুদবুদ যেন। মানুষের ভাগ্য পরিত্যক্ত কাটা লাট্টুর মতো ; ঈশ্বরপ্রেরিত দূত ধর্মপ্রবক্তারাও মানুষের দুঃখশেষের হদিশ দিতে পারেন না।

৮.৫.২ যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে জন ডানের সাদৃশ্য

সমালোচকেরা কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের সঙ্গে সপ্তদশ শতকের ইংরেজ মেটাফিজিক্যাল কবিগোষ্ঠী বিশেষত তাঁদের প্রধানতম জন ডান এর কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। John Donne বলেছেন—"Poor intricate soule! Riddling, perplexed, labyrinthical soule." বেচারা মানুষের আত্মা সে হতভম্ব ভ্যাবাচাকা, গোলকধাঁধায় ঘুরে করা। পুনশ্চ "He that lies boyling on a Gridiron in others eies, lies in his own conceit upon a Bed of Pleasure." —মানুষ আত্মছলনা করে—সে ভাবে সে সুখের বিছানায় শুয়ে, সবাই দেখে আসলে সে তপ্ত কটাহে সেদ্ধ হচ্ছে। একটি কবিতায় Donne আরো বলেছেন—

Tis true, 'tis day; what though it be?
Or wilt thou therefore rise tromme?
Why should we rise, because 'tis light?
Did we lie downe, because twas night?
(Breake of day)

দিনরাত্রি হয় মনুষ্য-নিরপেক্ষভাবেই। আলো হয়েছে বলেই যে আমরা উঠে পড়ব তাতো নয়। তাতে রাত্রি হয়েছে বলেই যে আমরা শুয়ে পড়ি সেটাও অসত্য।

T. S. Eliot তার "The Metaphysical Poets" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন আধুনিক কবিতার পূর্বাভাস যেটা ফিজিক্যাল কবিতায় ছিল—বুদ্ধিবাদ, বিষম মোচড়ে আহরিত তুলনা বা Juxtaposition ইত্যাদির মধ্যেই এ ব্যাপারটা ছিল। লক্ষ্য করি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'ঘুমের ঘোর' তথা কাব্যকবিতাবলিতেও আধুনিক বাংলা কবিতার পূর্ববর্তী ধাপ দেখা যাচ্ছে। রবীন্দ্রবিদ্রোহ, নতুন ভাবের অন্বেষণ, বুদ্ধিবাদ, নানা বিপরীত তুলনা, সংশয়-ব্যঙ্গ-বিতর্ক ইত্যাদি ব্যাপারে এই ইঙ্গিত। আবার জন-এর পূর্বউদ্ধৃত চারপঙ্‌ক্তি যেখানে দিনের শুরু ও সূর্যোদয় বর্ণিত পাঠক লক্ষ করুন তার সঙ্গে 'কেন ভাই রবি বিকস্ত করো' ইত্যাদি বক্তব্যের সমান্তরালতা বা কিঞ্চিত মিল রয়েছে।

৮.৫.৩ কবিতার প্রত্যেকটির ঝোঁকের বক্তব্য ও ভঙ্গি-বিশ্লেষণ

'ঘুমের ঘোরে' কবিতাটির বক্তব্য কবি স্তরে স্তরে স্তবকে স্তরকে সাতটি অংশে অপূর্ব সুন্দররূপে বিস্তার করেছেন। সুখ ও দুঃখ জীবনে দুটোই শ্লেষ বা ঠাট্টা। স্রষ্টার পাষাণমুখে তাকাই বা না তাকাই আমাদের সুখদুঃখও একদিন ধুলা হয়ে যাবে। উপায়হীনকে অদৃষ্টের সঙ্গে চুক্তি করেই বেঁচে থাকতে হয়। পাষাণ দিয়ে একবার দেবতা গড়া হলে সে নিজে আর পাষাণে নির্ঝর করুণাধারা ঢালে না। দেবতার অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে কবির উক্তিটি চমকপ্রদ, শব্দযোজনাও লক্ষ্য করবার মতো।

চিতার বহ্নি যত বিধবার সিঁথার সিঁদূর চেটে
বিশ্বম্ভর হে গণেশবর, যোয় তোমারি পেটে।

মিল ব্যবহারের এ বক্রোক্তি বা বাকচমৎকৃতির উদাহরণ পাচ্ছি দুটি অতুলনা পঙ্‌ক্তিতে—

ঝিমঝিম নিশ্চিন্ত
নাকের ডগায় মশাটা মশাই আস্তে উড়িয়ে দিন তো।

রসিক পাঠক 'নিশ্চিন্ত'-র সঙ্গে 'দিন-তো' মিলের মুন্সিয়ানা লক্ষ্য করুন। আর বক্তব্যে ঝাঁচকচকে হালফ্যাশানী ব্যাপারটাও দেখুন। বোঝা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা কবিতার বাঁকবদল আবার আসন্নপ্রায়।

তৃতীয় ঝোঁকে দুঃখবাদ ও বস্তুবাদের পাশাপাশি রোমান্টিক ভাবনার Contrast বা প্রতিতুলনা সাজানো হয়েছে। কবি কাব্যিকতার পথে যাচ্ছেন, কাব্যকে ভাঙবেন বলেই। একে আমরা বলতে পারি pseudo-romanticism বা ছদ্মরোমান্টিকতা।

আমার প্রাসাদে জ্বালাও লক্ষ নক্ষত্রের বাতি
রাহুকে বলো সে গিলুক সূর্যে না কাটে যেন এ রাতি।
বজ্রে বাঁকায়ে মেঘের মুকুট পরাও প্রিয়ার শিরে,
কণ্ঠের হার রচো গো তাহার তড়িতের তার ছিঁড়ে।
পুরাও প্রিয়ার আশ,
রামধনু দিয়ে জোৎস্না ধুনিয়ে রচো তার রাঙা বাস।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এখানে দেখালেন রবীন্দ্রীয় ঢঙে রোমান্টিক অতিশয়োক্তি রচনা করাও তিনিও কম যান না, তবুও তিনি সচেতনভাবে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতির মতো নির্বিচার রোমান্টিক পথে হাঁটলেন না। তরলিত বা diluted রোমান্টিসিজম তার জন্য নয়, তিনি কবিতায় খুঁজছেন নতুন বক্তব্য। আনন্দবাদের পুরোনো অনুকরণের বাড়াবাড়ির ফ্যাকাশে সময়ে তিনি এনে ধরলেন টাটকা মোড়কে মোড়া নতুন কবিতার সতেজ সংবাদ।

"The features of the metaphysical style are wellknown : analytic and self-conscious, colloquial in tone, dramatic in emphasis. It is also notorious for wild imagery, hyperhole, scrpulous intellectual construction, elaborate and ingenious working out of tropes." (Introduction : The Major Metaphysical poets (An anathology of Poems ed. by Edward Honing and Oscar Williams)। মেটাফিজিক্যাল কবিতার স্টাইল সুপরিচিত—বিশ্লেষণধর্মী ও আত্মসচেতন, কথ্যবাগভঙ্গির প্রতি পক্ষপাত, নাটকীয়তা এ কবিতায়। অধিকন্তু এ কবিতা ধাক্কা দেয় এর বন্য চিত্রকল্পের জন্য, আতিশয্যময় উক্তির জন্য, শব্দব্যবহারে ব্যঙ্গাত্মক প্রবণতার ঝোঁকের জন্য। বলা বাহুল্য এই বৈশিষ্ট্যগুলি "ঘুমের ঘোরে" কবিতায় যথেষ্টই আছে।

চতুর্থ ঝোঁকে—

হায় রে ভ্রান্ত কবি।
নয়নের আলো ম্লান হয়ে এল আঁকিতে মিছার ছবি।

সারা জীবন এ কোন অলক্ষ্য লক্ষ্মীর আরাধনা, জগৎ ভরিয়া দিয়ে যাও হৃদিরক্তের আলপনা ? এবং পঙ্‌ক্তিতে রবীন্দ্রনাথ ও রোমান্টিক ঐতিহ্যের প্রতি আক্রমণ। 'হৃদিরক্তের আলপনা' রোমান্টিক কবিগুরু শেলীর 'I fall upon the thorns of life, I bleed' কে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

অসীমেরে তুমি বাঁধিবে সীমায় অচেনারে লবে চিনে,
নূতন নূতন কথার ছলনে মরণে লইবে জিনে !
দুঃখেরে তুমি দেবেনা আমল, ভাবি দেবতার দান,
জীবনের এই কোলাহলে তুমি শোনাবে গভীর গান !
এ সবই রঙীন কথার বিম্ব, মিথ্যা আশায় ফাঁপা
গভীর নিঠুর সত্যের নূর দিনে দিনে পড়ে চাপা !
কে গাবে নূতন গীতা—
কে ঘুচাবে এই সুখ-সন্ন্যাস—গেরুয়ার বিলাসিতা ?

—এখানেও উদ্দিষ্ট রবীন্দ্রনা। শেষ দুটি পঙ্‌ক্তিতে মেটাফিজিক্যাল কবিতাসুলভ ব্যঙ্গের প্রতি ঝোঁক—সন্ন্যাসীসংঘের প্রতি বিদ্রুপ।

পঞ্চম ঝোঁকের শুরুটা নাটকীয়—'তোমাতে আমাতে বহুদিন হতে হয়নি কো কোনো কথা। গত বসন্তে গলা ভেজাতে যে চুমুক দিয়েছিলেন আজও তার নেশার ঘোর কাটেনি। অধিকন্তু ড্রেনে পড়ে যাওয়ার পর নিজের ভাঙা পাঁজরে নিজেই একটা ভেড়ার হাড় জুড়ে কবি বিষম বিপত্তি ঘটিয়েছেন—

উপরে মিলেছে বেমালুম হয়ে সিঙানো চামড়াপটি,
ভিতরে কিন্তু নর-ভেড়া-হাড়ে দিনরাত খটাখটি !

এখানে পাচ্ছি মেটাফিজিক্যাল কবিতাসুলভ কথ্যবাগভঙ্গীর প্রতি পক্ষপাত এবং 'hyperbola' বা 'exaggerated statement' অর্থাৎ আতিশয্যময় বক্তব্যের প্রবণতা এবং তার ফলে উৎপন্ন আত্মব্যঙ্গের আমেজ। অধিকন্তু রয়েছে বন্য চিত্রকল্প বা 'Wild imagery 'নর-ভেড়া-হাড়' বিষমবস্তুর সমাহার তাও লক্ষণীয়।

জীবনরহস্যের তল নেই। যন্ত্রণা যত বাড়ে ততই চিরপ্রহরী প্রাণবন্ধুকে মনে পড়ে। 'অসীমের কারাগার' ইত্যাদি কাব্যাংশ রবীন্দ্রকাব্যের ভগ্নাংশ স্মরণে আনে। বোঝা যাচ্ছে কবি এ কবিতায় বন্ধু বলে যাকে সম্বোধন করছেন, ঘুরে ঘুরে একই ধুঁয়া বা refrain এ বারবার ফিরে আসছেন, তার সঙ্গে নিজের একটা 'love-hate' বা একই সঙ্গে ভালোবাসা-ঘৃণার সম্পর্ক রয়েছে।

কিন্তু আমি যে মেপেছি বন্ধু, লোহার প্রাণের তাপ,
চৌদিকে তার ছড়ানো দেখেছি ফুলকির অভিশাপ।

শুধু নির্যাতিতের পক্ষসমর্থন নয়, চিত্রকল্প ও বক্তব্যের নতুনত্বও আছে। ইঞ্জিনিয়ার যন্ত্রবিদ কবির উপযুক্তই এই বাগব্যবহার।

ষষ্ঠ ঝোঁকে পাচ্ছি সেই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তিগুলি যেখানে রোমান্টিক কল্পনাবিলাসী কবিতার প্রতি তাঁর বিদ্রোহ ও কবিতায় নতুন ভাবনা আনবার অঙ্গীকার পাচ্ছি—

কল্পনা, তুমি শ্রান্ত হয়েছ, ঘন বহে দেখি শ্বাস,
বারোমাস খেটে লক্ষ কবির একঘেয়ে ফরমাস।
সেই উপবন, মলয় পবন, সেই ফুলে ফুলে অলি,
প্রণয়ের বাঁশি, বিরহের ফাঁসি, হাসা কাঁদা গলাগলি।
... ...
ঢেলে সাজো ঢেলে সাজো
সকল দুঃখ সূক্ষ্ম হউক, যত সাদা কব কালো !

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর "কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়" গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

জীবনসমস্যা, কবিমননের অন্তর্দ্বন্দ্ব, বাস্তব ও কল্পনার চিরন্তন বিরোধিতা ও সমন্বয় খুঁজবার তাড়না ইত্যাদি সবই 'ঘুমের ঘোরে' কবিতার বিশিষ্ট সম্পদ। সপ্তম ঝোঁকে রয়েছে রহস্যময় 'বন্ধু'-র সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছোনোর চেষ্টা। কবি সিদ্ধান্ত নিলেন এই নতুন ঈশ্বর আনন্দ নয় দুঃখেরই ফেরিওলা—

আনন্দ নহ নহ,
দিচ্ছ দুঃখ নিচ্ছ দুঃখ—দুঃখেরি ফেরি বহ!

কবির শেষতম উক্তি তাই মূল্যবান জীবনসমস্যার সমাধানে পৌঁছোনোর এই এক হৃদয়গ্রাহী চেষ্টা—'অশ্রু পরশি অগত্যা আজ করিলাম আধাসন্ধি'। তবে স্বভাবের দোষ তো দেখা যায় না, বিদায়সম্ভাষণে অভ্যাসিক খোঁচাটা মারতে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ভোলেননি—

প্রণাম প্রণাম ভাই
শত ঝঞ্ঝাটে তোমা হেন যেন অঘোরে ঘুমাতে পাই॥

৮.৫.৪ উপসংহার : যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদের বৈশিষ্ট্য

মোহিতলাল মজুমদারের দুঃখবাদ দার্শনিক শোপেন হাওয়ারকে মনে করিয়ে দিয়েছে। যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ জন ডন প্রভৃতি বুদ্ধিবাদীদের মনে করিয়ে দেয়। জীবনের নিষ্ঠুর অসঙ্গতি বা amomaly-র উপলব্ধি থেকেই এই দুঃখবাদের জন্ম। এই পৃথিবীতে দুঃখী ও ভোগীর পাশাপাশি অবস্থান। আধুনিক কালের কবি ডারউইন ইত্যাদির Theory of Evolution বা বিবর্তনবাদ বা 'survival of the fittest'—যোগ্যতমের ঊর্ধ্বতন ইত্যাদি তত্ত্ব ভালোভাবেই অবগত আছেন বোঝা যায়।

স্বয়ং মোহিতলাল মজুমদার তাঁর 'সাহিত্যবিতান' নামক গ্রন্থের 'কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত' নামক নিবন্ধে এই কবি সম্বন্ধে একটি দিগদর্শনী আলোচনা করেছেন। "কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যের সেই রসকল্পনার দুঃসাধ্য অনুকরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহার ফলে বাস্তবকে অস্বীকার করিয়া, অতি উচ্চ ভাবকল্পনার অভিমানে—মানবহৃদয়ের যে সত্য, দেহ সংস্কারের যে অতিজাগ্রৎ অনুভূতি—তাহার প্রতি মিথ্যাচারণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়াছিল।" যতীন্দ্রকাব্যে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নয়, কিন্তু সেই মিথ্যাচারণের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ রয়েছে।

৮.৬ অনুশীলনী

(ক) মানকুমারী-বৃত্ত

১। "একা" কবিতাটি বিশ্লেষণ করে উনিশ শতকের মহিলা কবিদের বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে দিন।

২। "ঘুমের ঘোরে" কবিতাটি বিশ্লেষণ করে কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের জীবনদর্শন—দুঃখবাদ ও বুদ্ধিবাদ নিয়ে আলোচনা করুন।

৩। মোহিতলাল মজুমদারের 'কালাপাহাড়' অবলম্বন করে কবির জীবনচেতনা ও কাব্যচেতনার পরিচয় দিন।

৪। নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতার বক্তব্য বিশ্লেষণ করে এ কবিতায় প্রকাশিত বলিষ্ঠ মানসবতাবাদের পরিচয় দিন।

৫। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'কবর-ই-নূরজাহান' কবিতাটি বিশ্লেষণ করে তাঁর কবিপ্রতিভার পরিচয় দিন।

৬। রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা কবিতায় নজরুল-মোহিতলাল-যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের বিশেষ অবস্থান নিয়ে পাঠ্যকবিতা অবলম্বনে আলোচনা করুন।

(খ) জীবনানন্দ-বৃত্ত

১। পাঠ্যকবিতা অবলম্বনে আধুনিক কবিতার শিল্পতত্ত্ব বুঝিয়ে দিন।

২। 'জল দাও' কবিতাটি বিশ্লেষণ করে সমাজচেতনা ও কাব্যচেতনার পরিচয় দিন।

৩। 'বোধ' কবিতাটি বিশ্লেষণ করে জীবনানন্দের কবিসত্তায় এই বোধের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করুন।

৪। 'বোধ' কবিতার ভাব ও আঙ্গিক নিয়ে একটি নিবন্ধ লিখুন।

৫। **'শাশ্বতী'** কবিতাটি কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বিরচিত একটি অনবদ্য প্রেমের কবিতা ও অপরূপ লিরিক—আলোচনা করে বুঝিয়ে দিন।

৬। 'হে মহাজীবন' বিশ্লেষণ করে এখানে প্রকাশিত কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের মানবতাবাদ, সমাজচেতনা ও আপাত রোমান্টিক বিরোধিতার স্বরূপ বুঝিয়ে দিন।

৭। 'ইতিহাস' কবিতায় অমিয় চক্রবর্তীর বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করুন। এখানে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় আধুনিকতার শিল্পতত্ত্ব কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে?

৮। 'নিসর্গের বুকে' কবিতাটি বিশ্লেষণ করে কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রে কবিসত্তার পরিচয় দিন।

৮.৭ গ্রন্থপঞ্জি

(ক) বনলতা সেন-বৃত্ত

দীপ্তি ত্রিপাঠী : আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়

বুদ্ধদেব বসু : কালের পুতুল

বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদিত) : আধুনিক বাংলা কবিতা

মঞ্জুভাষ মিত্র : আধুনিক বাংলা কবিতায় ইয়োরোপীয় প্রভাব

মঞ্জুভাষ মিত্র : আধুনিক বাংলা কবিতা

(খ) মানকুমারী বসু বৃত্ত

ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র : সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ

মোহিতলাল মজুমদার : বিস্মরণী

সাহিত্যবিতান

আধুনিক বাংলা সাহিত্য

মজফফর আহমেদ : নজরুল ইসলাম

রফিকুল ইসলাম : নজরুলের জীবন ও সাহিত্য

ডঃ শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় ও

ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : ঊনিশ শতকের বাংলা গীতিকবিতা

একক ৯ ❐ জীবনানন্দ-বৃত্ত

গঠন

৯.১ আধুনিক কবিতার সূচনা

৯.২ আধুনিকতার দর্শন

৯.৩ দুর্বোধ্যতার সমস্যা

৯.৪ বাংলা আধুনিক কবিতার সূত্রপাত

৯.৫ অসুন্দর ও আধুনিক কবিতা

৯.৬ আধুনিক কবিতার আঙ্গিক

৯.৭ বিশ শতকের বাংলা কবিতা : নানা আন্দোলন ও মতবাদ

৯.৮ জীবনানন্দ দাশ

৯.৯ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

৯.১০ অমিয় চক্রবর্তী

৯.১১ প্রেমেন্দ্র মিত্র

৯.১২ বুদ্ধদেব বসু

৯.১৩ বিষ্ণু দে

৯.১৪ উপসংহার

৯.৮.১ কবিতা বিশ্লেষণ-বোধ

৯.৮.২ বোধ-এর নানা অনুষঙ্গ

৯.৮.৩ বোধ-সৃষ্টির প্রেরণা

৯.৮.৪ বোধ ও মানসিক ক্লান্তি

৯.৮.৫ বোধ : সাধারণ মানুষের থেকে বিচ্ছিন্নতা

৯.৮.৬ উপংসহার

৯.৯.১ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা : শাশ্বতী

৯.৯.২ ‘শাশ্বতী’ কবিতায় বিগত প্রেমের স্মৃতি

৯.৯.৩ হাইনে ও সুধীন্দ্রনাথ

৯.৯.৪ ‘শাশ্বতী’-র প্রেম চেতনা কামনাতত্ত্ব

৯.৯.৫ সুধীন্দ্রনাথের নিজস্ব জীবন ইতিহাস ও ‘শাশ্বতী’

৯.৯.৬ লিবিডো ও স্মৃতি বেদনার যুগলবন্দী

৯.৯.৭ উপসংহার

৯.১০.১ অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা—ইতিহাস
৯.১০.২ কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী ও রচনাধারা
৯.১০.৩ কবির মৌলিক সৃষ্টিভঙ্গি
৯.১০.৫ অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় বিজ্ঞানের ভূমিকা
৯.১০.৬ ভাব ও আঙ্গিকের নতুনত্ব
৯.১০.৭ ইতিহাস : ছন্দ্র বিন্যাস
৯.১২.১ বুদ্ধদেব বসুর কবিতা—শেষের রাত্রি
৯.১২.২ কবিজীবনী ও কাব্য বৈশিষ্ট্য
৯.১২.৩ গীতিকবতার বৈশিষ্ট্য
৯.১২.৪ গীতিকবিতা হিসাবে শেষের রাত্রি
৯.১২.৫ কবিতায় শরীরী আবেদন
৯.১২.৬ চুলের চিত্রকল্প
৯.১২.৭ রোমান্টিক আবেগ ও শেষের রাত্রি
৯.১২.৮ আধুনিক কবিতার শিল্পতত্ত্ব ও শেষের রাত্রি
৯.১৩.১ বিষ্ণু দে-র কবিতা—জল দাও
৯.১৩.২ বিষ্ণু-দের কবিতায় মার্কসবাদী দর্শন
৯.১৩.৩ বিষ্ণু মুসলিম দাঙ্গার পটভূমি ও বিষ্ণু দে
৯.১৩.৪ ইতিহাসবোধ ও প্রেমাচেতনা
৯.১৩.৫ কবিতার শব্দ-চিত্রকল্প-ছন্দ
৯.১৩.৭ উপসংহার
৯.১৫ সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা : হে জীবন
৯.১৫.১ চাঁদের প্রসঙ্গ ও আবাহমান কবিতা
৯.১৫.২ ‘হে মহাজীবন’—এ চাঁদের চিত্রকল্প
৯.১৫.৩ সুকান্তের কবিতায় সমাজ ভাবনা
৯.১৫.৪ হে মহাজীবন : প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ
৯.১৫.৫ সমাজতান্ত্রিক কবিতার ইতিহাস
৯.১৫.৬ উপসংহার
৯.১৬ গ্রন্থপঞ্জি

৯.১ উদ্দেশ্য

আধুনিক কবিতার একটি সংজ্ঞা তৈরি করে নেয়া জরুরি এবং এজন্য আধুনিক কবিতার বিভিন্ন লক্ষণ ও উপাদানের বিশ্লেষণ প্রয়োজন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ফরাসি কবি শার্ল বোদলেয়ার রচিত ফ্ল্যর দ্যু মাল (Les Fleurs du Mal) 'ক্লেদজ কুসুম' কাব্যটিকে আধুনিক কবিতার প্রথম উৎস ও উদাহরণ বলা যায়। আধুনিক কবিতার মৌলিক লক্ষণগুলি প্রথমে এই কাব্যে তীব্রতার সঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে দেখা গেল। সাহিত্যে আধুনিকতা বিশ শতকে প্রসার লাভ করে। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং ১৯৩৯-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। আধুনিক কবিত দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে পূর্ণ বিকশিত হয়ে ওঠে। আধুনিক কবিতার ইতিহাস পর্যালোচনায় বিংশ শতকের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক অবস্থান এবং সাহিত্যিক-দার্শনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে।

৯.২ আধুনিকতার দর্শন

সভ্যতার মুখোশের অন্তরালে লুকিয়ে আছে যে দানবিক বর্বরতা মহাযুদ্ধের ভিতর দিয়ে তার নগ্ন নিষ্ঠুর প্রকাশ এযাবৎ মানুষের ভালোত্বে বিশ্বাসী লেখকদের সাহিত্যভাবনাকে বিচলিত করল। ১৯০৫ সালে প্রবর্তিত আইনস্টানের Theory of Relativity বা আপেক্ষিকবাদ ও কোয়ান্টাম থিয়োরী, ১৮৫৭ সালে প্রকাশিত ডারুইনের The Origin of the species, ১৯০০ সালে প্রকাশিত ফ্রয়েডের The Interpretation of Dreams ও ১৯০৫ সালে প্রকাশিত Three contributions to the theory of sex এবং কার্ল মার্ক্সের 'কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো' ও Das Kapital (১৮৬৭ প্রথম খণ্ড)—আধুনিক আন্দোলনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। আইনস্টাইনের তত্ত্ব মানুষের বস্তুগত জ্ঞানকে আঘাত করল, দেখালো অ্যাটম বা পরমাণু পূর্বনির্দিষ্ট নিয়মে কাজ করে না। ডারুইন দেখালেন মানুষ আসলে প্রাণী—উচ্চতর প্রাণীমাত্র। সভ্য মানুষের বর্তমান ভূমিকা সম্বন্ধে সংশয়ের শুরু মানুষের এইসব আবিষ্কারকে ত্বরান্বিত করে। Theory of Evolution বা বিবর্তনবাদ উনিশ শতকীয় রোমান্টিক মতবাদকে আঘাত হানল, দেখা গেল মানুষ মহান ও দেবতার সৃষ্টি নয়—সে জন্তুরই সমপর্যায়ভুক্ত এবং পরিবেশ ও বংশধারার উৎপন্ন জাতকমাত্র। সে শক্তিমান নয় আসলে অসহায়। এই সাহিত্যতত্ত্ব Naturalism ফ্লবেয়ার-এর উপন্যাস মাদাম বোভারী প্রভৃতিতে প্রকাশিত। ফ্রয়েড মানুষের মনকে ত্রিস্তরে ভাগ করলেন—ego বা অহং, super-ego বা নিয়ন্ত্রক এবং id বা অবচেতনা। মানুষ যখন তার মনের স্বাভাবিক প্রবণতাগুলোকে জোর করে অবচেতনার স্তরে নিক্ষেপ করে অর্থাৎ অবদমন করে তখনই নিউরোসিস বা উদ্বায়ু মানসিক রীতির জন্ম। আধুনিক কবিতা মানুষের নিউরোসিস-কে এক দুর্জ্ঞেয় আত্মিক অসুস্থতার স্তরে উন্নীত করে দেখিয়েছে। অন্যদিকে ফ্রয়েডের Introductory lectures or Pshychoanalysis বা মনোসমীক্ষণের বিখ্যাত বক্তৃতাবলীতে free association বা অবাধ ভাবানুষঙ্গারীতি প্রকাশ পেল যা পরে কবিতায় সুররিয়েলিজম ও উপন্যাসে Stream of Consciousness বা চেতনাপ্রবাহরীতির প্রধান অবলম্বন হল। সে সম্বন্ধে পরে বলছি।

ফ্রয়েডের বৈপ্লবিক আবিষ্কার মানুষের আত্ম-অনুসন্ধান ও আত্মবিশ্লেষণের উপর জোর দিল এবং এ পথেই সাহিত্যে Subjicitivity বা আত্মমুখিনতার উদয় সাবলীল হয়ে উঠল। ফ্রয়েড যৌনতার উপর জোর দিলেন এবং যৌতনা থেকেই যে শিল্পের উদ্গতি এটাও দেখালেন। এক কথায় প্রথম ফ্রয়েড দেখালেন সুন্দর ও অসুন্দর পাশাপাশি নিরপেক্ষভাবে অবস্থান করতে পারে, অনুভূত হল দিনের সঙ্গে রাত্রি এবং আলোর সঙ্গে অন্ধকার এক অমোঘ যুগলবন্ধনে আবদ্ধ। অতঃপর বোদলেয়ারের মতো করিয়া দেখালেন পাপ কোনো পাপ নয় বরং

তা হয়ে উঠতে পারে পুণ্যের চেয়েও দামি, কারণ এ পথেই কবিতার জন্ম হয়ে থাকে। অন্যদিকে কার্ল মার্ক্স রচনা করলেন সমাজ-বিপ্লবের তত্ত্ব। রাশিয়ার সাম্যবাদী বিপ্লব এই তত্ত্বকে রূপায়িত করল। সুতরাং বিংশশতকে সর্বত্রই দেখা দিল পূর্ববর্তী সামাজিক রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধারণাবলীর পরিবর্তন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের যে শোচনীয় বিপর্যয় ঘটে তার ফলে এই পরিবর্তনের প্রাবল্য ঘটে। বলশেভিক বিপ্লব সমাজ সুস্থিতির এই উত্থান-পতনের ঢেউকেই প্রতীকিত করেছিল।

দার্শনিক ফ্রীডরীশ নীটশে যখন 'Thus Spake Zarathustra' গ্রন্থে বললেন, মানুষকে অবশ্যই তার নিজস্ব মূল্যগুলি অর্জন করতে হবে তখন তিনি আধুনিকের আত্মবাদকেই তুলে ধরলেন। ফরাসি চিত্রকর পিকাসো যখন 'আভিন-র মেয়েরা' ছবিটি এঁকে কিউবিজমের মূলধারণা বিচূর্ণীকরণকে প্রকাশ করলেন তখন তা শুধু আত্মের টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে সংকেতিত করল না, একই সঙ্গে Realism বা বাস্তবতার সুকঠোর আবেষ্টন থেকে মুক্তির মাধ্যমে শিল্পীর আত্মগত (Subjective) কল্পনাকে সুলভ যুক্তিবাদের হাত থেকে অব্যাহতির পথ দেখালো। দার্শনিক ইম্যানুয়েল কান্ট তাঁর Critique of Judgement গ্রন্থে বললেন, দু' ধরনের সৌন্দর্য আছে, মুক্ত সৌন্দর্য এবং নির্ভরশীল সৌন্দর্য। প্রথম ধরনের সৌন্দর্য আত্মনির্ভর এবং মুক্ত, সেখানে পূর্ব আরোপিত কোনো শর্ত নেই। আধুনিকতার শিল্পতত্ত্বে এই মুক্ত বা শুদ্ধ সৌন্দর্যের ধারণা কার্যকরী হয়েছে। জ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে বস্তুজ্ঞানের পরিবর্তে আত্মজ্ঞানই গুরুত্বপূর্ণ এবং আত্মজ্ঞান বোধিজাত—Joseph Chiary তাঁর The Aesthetics of Modernism গ্রন্থে ঐ কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন।

দার্শনিক হেগেল তাঁর দর্শনে সৌন্দর্য ও সত্যকে অভিন্ন বলে ঘোষণা করেছিলেন যা রোমান্টিকদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। আধুনিকেরা এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে গেলেন যেহেতু তাঁরা অসুন্দরের ভিতর থেকেও সৌন্দর্য নিষ্কাশন করেছিলেন। সোরেন কীয়ের্কগার্ড প্রবর্তিত এবং জাঁ পল সার্ত্র অনুশীলিত Existentialism বা অস্তিত্ববাদের মূলকথা হল মানুষ আত্মরচিত, নিজস্ব আত্মবেস্টিত। কীয়ের্কগার্ড বলেছিলেন, শূন্যতা বা যন্ত্রণার বিষয়বস্তু ক্রমশ শরীরী হয়ে উঠল। এই নেতি ও শূন্যতার আরাধনা আধুনিক কবিতার প্রধান লক্ষণ হয়ে উঠল। কাফকার উপন্যাস, জীবনানন্দ দাশের কবিতা এই নেতি, শূন্যতা ও বিষণ্ণতাতেই প্রতিষ্ঠিত। সৌন্দর্যতত্ত্ববাদী বেনেদিত্তো ক্রোচে তাঁর Aesthetics গ্রান্থে ও নানা নিবন্ধে বলেছেন লিরিক নয় নিন্দ্রর্চারে আবেগকে ঢেলে দেয়া, লিরিক হচ্ছে অহং বা আত্মের স্বকৃত বস্তুগত বর্ণনা প্রকাশ। টি এস এলিয়ট, যাঁকে কেউ কেউ বিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ আধুনিক কবি বলেন, তিনি তাঁর একটি বিখ্যাত উক্তিতে এই কথাই অন্যভাবে বলেছিলেন "Poetry is not turning loose of emotion, but an escape from emotion ; it is not the expression of personality, but an escape from personality" (দ্রষ্টব্য এলিয়টের Selected Essays গ্রন্থে সংকলিত 'Tradition and Individual talent' নামক নিবন্ধ।) এজন্যই দেখি আধুনিক কবি তীব্র আত্মগত ভাবকে অসাধারণ নিরাসক্তি বা নৈর্ব্যক্তিকতার দ্বারা পরিশোধিত করে প্রকাশ করেন—ভাষার সচেতন অনুশীলনে ও পরিশ্রমী প্রকাশে এর একটা বহিঃপ্রকাশ এবং এজন্যই বলা যায় আধুনিক কবিতা যেন ক্লাসিসিজম ও রোমান্টিজিসমের মিলন-স্থল—এখানে রোমান্টিকের আত্মবাদ ক্ল্যাসিসিস্টের বস্তুবাদ দ্বারা শুদ্ধ হয়ে প্রকাশিত। সেরা উদাহরণ অবশ্যই টি এস এলিয়টের কবিতা, আমাদের দেশে জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে প্রভৃতির কবিতা। আবেগকে সংযত সংহতভাবে প্রকাশই মূলকথা, উচ্ছ্বাসে ভেসে যাওয়া অনভিপ্রেত।

আমাদের এই অস্তিত্বের প্রতি ঘৃণা, মৃত্যুর বেদনাবোধ, ক্লান্তি ও অস্থিরতা, আত্মবীক্ষণ, শূন্যতার সংক্রাম, বিষণ্ণতা, এক আশ্চর্য স্ববিরোধ—এ সমস্তই বিংশ শতকের কবিতার উপাদান এবং আধুনিক কবিতার সংজ্ঞা তৈরি করতে গেলে এদের ভূমিকা সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা অর্জন করতে হবে। বিমূর্ততা (abstractness),

অসংলগ্নতা (absurdity), বৈপ্লবিক নূতন ধারণা অভিঘাত আধুনিক কবিতার শিল্পতত্ত্বে বহুলভাবে অনুভূত। কিন্তু বিংশ শতকের কবে কবি আছেন যাঁরা এই শিল্পতত্ত্বকে খুব একটা গ্রহণ করেননি। অতএব স্টিফেন স্পেন্ডার তাঁর 'The Struggle of the Modern' গ্রান্থে বিংশ শতকের কবিতার দুটি ধারা দেখেছেন "moder" ও "Contemporary", আধুনিক ও সমকালীন। যাঁরা আধুনিক কবিতার নিয়ম সচেতনভাবে মেনেছেন তাঁরাই আধুনিক, সমকালীনতা এর কোনো সম্পূর্ণ লক্ষণ নয় এবং আধুনিক কাব্য আন্দোলনের মূল ঊনিশ শতকে বিস্তৃত। এডগার অ্যালান পো এবং শার্ল বোদলেয়ার প্রভৃতির ভিতর দিয়ে আধুনিক কবিতার শুরু এবং এঁরা কেউই বিংশ শতকের কবি নন।

৯.৩ দুর্বোধ্যতার সমস্যা

আধুনিক কবিতা মূলত দুর্বোধ্য এবং তা 'esoteric' অর্থাৎ মুষ্টিমেয়-র উপভোগের বিষয়। কবির আত্মচেতনার মধ্যেই এর রহস্য নিহিত। আধুনিক কবিতা চরমভাবে Subjective আত্মগত। বহির্জগৎ নয়, বহির্জগৎকে অন্তর্জগৎ কীভাবে আবিষ্কার করে সেই হচ্ছে মূল চিন্তা। কবি লেখক নির্মোহভাবে আত্মের গভীরে নিজের ব্যক্তিত্বের গভীরে অবতরণ করেছেন, নানা পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন নিজের কামনা, বিদ্রোহ, রোগ, নেশার প্রধান উপাদানগুলি নিয়ে। এই জন্য আমরা দেখি আধুনিক কবিতায় ব্যক্তিগত সংকেত বা 'personal myth'—রচনার প্রাধান্য, আধুনিক কবিতার দুর্বোধ্যতার কারণও এখানে। অতি প্রতিভাবান শিল্পীর এক ব্যক্তিগত ইতিহাস এখানে পাচ্ছি। ফলত এই আধুনিক কবিতার দুর্বোধ্যতার কারণও এখানে। অতি প্রতিভাবন শিল্পীর এক ব্যক্তিগত ইতিহাস এখানে পাচ্ছি। ফলত এই আধুনিক কবি অতি সচেতন সাধনায় সংখ্যাতীত স্থূল মানুষের থেকে দূরে থাকে, মানুষের সংসারে সে পদে পদে বিড়ম্বিত ও ব্যর্থ, বাস্তব কর্মে সে সম্পূর্ণ অসমর্থ কিন্তু শিল্পের জগৎএ স্বরাট সার্ভভৌম—সেখানে তার জয় বহুদূর পর্যন্ত অনুভূত। সে যেমন সমাজ ও স্বাভাবিক মানুষদের ও তাদের স্বাভাবিক রীতিনীতিকে অসহ্যভাবে ঘৃণা করে, তেমনি সমাজ ও স্বাভাবিক মানুষদের ও তাদের স্বাভাবিক রীতিনীতিকে অসহ্যভাবে ঘৃণা করে, তেমনি সমাজ ও স্বাভাবিক মানুষেরাও তার উপর নির্মমভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। কবিশিল্পী তাই সমাজ ও স্বাভাবিক মানুষ কর্তৃক নির্যাতিত, ধিকৃত, পরিত্যক্ত। তার কামনা যেমন দানবিক, দুঃখও তেমনি দেবতার মতো আকাশে মাথা তোলে। একেই বলা হয়েছে আধুনিক কবিতা ও সাহিত্যের বিখ্যাত 'alienation' বা শিল্পীর সমাজবিবিক্তির তত্ত্ব। "The poet or the artist, even more than the worker, is totally alienated from the society, which has little awareness of spiritual values"—Joseph Chiari : Aesthetics of Modernism। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতাবোধের উদাহরণ দিচ্ছি জীবনানন্দ দাশের কবিতা থেকে :

অনেক অনেক দিন
অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মত মিশে থেকে
হঠাৎ ভোরের আলো-র মূর্খ উচ্ছ্বাসে নিজেকে পৃথিবীর জীব বলে
বুঝতে পেরেছি আবার ;
ভয় পেয়েছি
পেয়েছি দুর্নিবার অসীম বেদনা ;
দেখেছি রক্তিম আকাশে সূর্য জেগে উঠে
মানুষিক সৈনিক সেজে পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য
আমাকে নির্দেশ দিয়েছে ;

আমার সমস্ত হৃদয় ঘৃণায়-বেদনায়-আক্রোশে ভরে গিয়েছে ;
সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী যেন কোটি কোটি শূয়োরের
আর্তনাদে উৎসব শুরু করেছে।
হায় উৎসব !
হৃদয়ের অবিরল অন্ধকারের ভিতর সূর্যকে ডুবিয়ে ফেলে
আবার ঘুমোতে চেয়েছি আমি,
অন্ধকারের স্তনের ভিতর—যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মত মিশে
থাকতে চেয়েছি।
কোনোদিন মানুষ ছিলাম না আমি।
হে নর, রে নারী,
তোমাদের পৃথিবীকে চিনিনি কোনোদিন'

(অন্ধকার : বনলতা সেন)

৯.৪ বাংলা আধুনিক কবিতার সূত্রপাত

ইউরোপে উনিশ শতক বা তার আগে থেকেই ধীরে ধীরে আধুনিকতার উদ্‌গতি হচ্ছিল, বাংলা কবিতায়ও বিশ শতকে আধুনিকতার এসে গেল। জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রমুখ কবি বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতা আন্দোলনের প্রবর্তন করলেন। 'কালের পুতুল', 'সাহিত্যচর্চা' প্রভৃতি গ্রন্থে বুদ্ধদেব বসু আধুনিকতার পক্ষ সমর্থনে এবং আধুনিক বাঙালি কবিদের বিষয়ে মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন। আধুনিকতার নন্দনতত্ত্ব আধুনিক কবিতার ভিতর পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত। বোদলেয়ারের ফ্ল্যর-দ্য মাল বা ক্লেদজ কুসুম (১৮৫৭), এলিয়টের ওয়েস্টল্যান্ড (১৯২২), রিলকের ডুয়িনো এলিজি (১৯১২-২৩) আধুনিক কবিতার জয়স্তম্ভ বলে চিহ্নিত হতে পারে। আমাদের দেশে রবীন্দ্রউত্তর কবিসঙ্ঘের মধ্যে জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেন (১৯৫২ পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্কারণ), অমিয় চক্রবর্তীর পারাপার (১৯৬০), সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অর্কেস্ট্রা (১৯৩৫), বুদ্ধদেব বসুর বন্দীর বন্দনা (১৯৩০), বিষ্ণু দের-উর্বশী ও আর্টেমিস (১৯৩২), প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথমা (১৯৩২), সমর সেনের কয়েকটি কবিতা (১৯৩৭) প্রভৃতি বইগুলি কবিতার ক্ষেত্রে আধুনিকতার শিল্পতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করল। বুদ্ধদেব বসুর কবিতা পত্রিকা (১৩৪২) ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পরিচয় পত্রিকা এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল।

এক কথায় আধুনিকতার সংজ্ঞা দেয়া কিছু দুরূহ। দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী সময়ে রবীন্দ্রপরবর্তী বাঙালি কবিরা কেউ কেউ কবিতায় যে বিশেষ ভঙ্গি আনলেন তাকে আধুনিকতা বলতে পারি। এই আধুনিকতা বিংশ শতকীয় কবিতার বিশিষ্ট চরিত্রলক্ষণ। আধুনিকতার মধ্যে রয়েছে বিমূর্ততা ও সচেতন কৃত্রিমতার অনুশীলন যা একে পরিচিত বাস্তবের গণ্ডির বাইরে নিয়ে যাচ্ছে, ভাষার চেনা প্রক্রিয়াগুলো ও প্রথামাত্রিক আঙ্গিককে এ ভেঙে ফেলছে। বুদ্ধিদীপ্ত সূক্ষ্মতার প্রাচুর্য, স্বেচ্ছা আরোপিত মুদ্রাদোষ, তীব্র অন্তর্মুখিনতা, কবিতার নির্মাণের আত্মঘোষণা, সংশয় ইত্যাদিকে অনেকসময়েই এই কবিতার সংজ্ঞা তৈরি করতে গিয়ে সাধারণ ভিত্তিমূল বলে স্মরণ করা হয়েছে।

৯.৫ অসুন্দর ও আধুনিক কবিতা

বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ কবিরা রবীন্দ্র ঐতিহ্য তথা রোমান্টিক ঐতিহ্যকে বিদীর্ণ করেই লেখা শুরু করেছিলেন, কিন্তু রোমান্টিক কবিতার বিচূর্ণ ভগ্নাবশেষ জীবনানন্দ প্রভৃতি সব কবিরই মধ্যে আবিষ্কার করা যায়। আলোচিত কবিসঙ্ঘ সৌন্দর্যকেই একমাত্র সত্য বলে জেনেছিলেন। সৌন্দর্যের প্রতি এই আত্যন্তিক আসক্তি এডগার অ্যালান পো এবং বোদলেয়ার প্রথম দেখিয়েছিলেন, এর একটি শিকড় গেছে Art for arts sake-এর প্রবক্তা গোতিয়ে প্রভৃতির মানসভূমিতে। বোদলেয়ার বীভৎসা ও কুৎসিত, এমনকী পঙ্গুতার ভিতরও সৌন্দর্য আবিষ্কার করলেন। এ জন্যই "distortion" বা বিকৃতিকে বলা হয়েছে শিল্পের প্রধান ধর্ম। একে এক কথায় বলতে পারি কুৎসিতের নন্দনতত্ত্ব। এর বিখ্যাত উদাহরণ বোদলেয়ারের কবিতা। উদ্ধৃত করছি 'Hymne A La Beaute' কবিতাটি—

সৌন্দর্যের প্রতি স্তোত্র
হে সৌন্দর্য, স্বর্গ অথবা নরক, তুমি এসে কোনখান থেকে ?
তোমার চাহনি থেকে নারকীয় এবং স্বর্গীয়
ঝরে পড়ে মিশ্রধারা মন্দ ও শুভের
সেইজন্য মানুষের কাছে তুমি মদের থেকেও বেশি প্রিয়
সূর্যাস্ত ও ঊষাকাল তোমার চোখের ভিতর হয়েছে সুন্দর
ঝড়ের মতন তুমি সুগন্ধ ছড়িয়েছ আকাশে বাতাসে
তোমার চুম্বন যেন বিরল পাত্রের থেকে পাওয়া প্রেম উদ্দীপনী সুরা
বালকবৃন্দকে সম্মোহিত সাহসের দিকে টানে, বীরদের নিচে নিয়ে আসে
এসেছ হে কোথা থেকে ? সে কোন গোলক কিম্বা কালো সাগরের থেকে
উদাসীন হাত দিয়ে আনন্দ এবং দুঃখ ছড়িয়ে দেবার জন্য চারপাশে
নিয়তি কুকুর যেন পায়ে তোমার পিছনে নতশির চলে আসে
সর্ববস্তু এখানে শাসন কর তুমি, অনুতাপ করনা কখনো
মৃতদের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাও তুমি ঘৃণাদৃষ্টি হেনে
আতঙ্ক এমত নয় তোমার মণিরে-র মধ্যে সেরা থেকে যাবে
হত্যা তোমার সে প্রিয়তম ক্রীড়া অলঙ্কার নাচে
গর্বান্ধ তোমার বুকে কামনার্তভাবে
মথ পতঙ্গের মত তোমার ও চারদিকে ঘূর্ণমান আগুন শিখায়
ক্ষণিত, সশব্দ পুড়ে যেতে যেতে চীৎকার করে ওঠে, দৈবনিয়তি আমার হায়।
কম্পিত প্রেমিক তার অবৈধ প্রিয়ার বুকে ঝুঁকেছে আকুল বেদনায়,
সে আসলে মৃত্যুআসন্ন মানুষ ভালোবসছে তার সমাধিকে
স্বর্গ কিম্বা নরকের থেকে ? প্রশ্ন জেগে ওঠে তাই

অকৌশলী হে দানব সীমাহীন যন্ত্রণা ছড়াও
তোমার চাহনি হাসি ছড়িয়েছে আমার উপর সঘন
এক অনন্তকে যাকে ভালোবেসিছি বৃথাই।
শয়তান না ঈশ্বরের থেকে ? পবিত্র অথবা পাপময় ?
প্রশ্নেরা নিরস্ত হোক। নরক চোখের পরীরানী হে আমার
হে ছন্দ, সুগন্ধ, আলো—সময়কে তুমি মায়া করেছে
তার অলসতা থেকে সেরে উঠবার জন্য, পৃথিবীকে অসুখের থেকে

(অনুবাদ : মঞ্জুভাষ মিত্র)

কুৎসিতের ভিতর থেকে সৌন্দর্যকে নিষ্কাশন করে আনার এই প্রক্রিয়া জীবনানন্দ দাশের কবিতায় অজস্রবার দেখা গেছে। সমর্থনে তুলছি 'বোধ' কবিতার অন্তিম পঙ্‌ক্তিগুলি

এই বোধ—শুধু এই স্বাদ
পায় সে কী অগাধ—অগাধ— !
পৃথিবীর পথ ছেড়ে আকাশের নক্ষত্রের পথ
চায় না সে ?—করেছে শপথ
দেখিবে সে মানুষের মুখ ?
দেখিবে কালোশিরার অসুখ
কানে সেই বধিরতা আছে,
সেই কুঁজ—গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে
নষ্ট শশা—পচা চালকুমড়ার ছাঁচে,
যে সব হৃদয়ে ফলিয়াছে
সেইসব।

(বোধ : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

মানুষের অসুখের কবির অসুখের যে তালিকা এখানে তা কুৎসিতের থেকেই চয়ন করা এবং শেষে কবিতার সঙ্গো উপনীত, বোদলেয়ার যেমন বলতে পেরেছিলেন হে সৌন্দর্য তুমি স্বর্গ থেকে এলে না নগর থেকে এলে এটা কোনো বড় কথা নয়, শয়তান না ভগবান, পাপ না পুণ্য কোনটা তোমার উৎস এটাও কোনো প্রশ্ন নয়—মূল কথা এই যে তুমি আমার মধ্যে অনন্তের বার্তা জাজিয়ে তুলছ।

স্বরচিত শিল্পের অনুশাসন মেনে কবিতাকে আর বক্তৃতাগন্ধী করে তোলা হল না বরং হৃদয়ের অস্বস্তি, মানসিক অসুস্থতা, বিষণ্ণতা, ক্ষয়ের বোধ, বিচূর্ণিত আত্মের দর্পণ ও তলানি মানুষের অসহায়তা, স্বপ্নের সর্বগ্রাসী সত্য ও স্বগতোক্তির আকারে আত্মকথনকে কবিতার বিষয়বস্তু করে তোলা হল। প্রাসঙ্গিকভাবে মনে পড়ছে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'নরক' কবিতাটি—

পণ্ডশ্রম, নাহি মিলে সাড়া
শূন্যতার কারা।
অগোচর অবরোধে ঘিরে মোর আর্ত মিনতিরে,
যতই পলাতে চাই অভেদ্য তিমিরে
মাথা ঠুকে রক্তপঙ্কে পড়ি,
অগ্রজের মৃতদেহ যায় গড়াগড়ি
ক্রিমিভোগ্য দুর্গন্ধে যেখানে,
চলে যেথা সরীসৃপ, স্বেদস্রাবী বক্র বিষধর
পঙ্কিল মণ্ডুক আর মূষিক তস্কর,
বজ্রনখ পেচক, বাদুড়।।
বমনবিধুর
আমার অনাত্ম্যদেহ পড়ে আছে মৃন্ময় নরকে।
মৌন নিরালোকে
ভুঞ্চে তারে খুশি মতো গৃধু নিশাচর।
দুস্তর, দুস্তর জানি, শাস্তি মোর দুঃসহ দুস্তর।
মনে হয় তাই
আত্মরক্ষা হাস্যকর, সুসংকল্প মৌখিক বড়াই,
জীবনের সারকথা পিশাচর উপজীব্য হওয়া,
নির্বিকারে নির্বিবাদে যাওয়া
শবের সংসর্গ আর শিবার সদ্ভাব।
মানসীর দিব্য আবির্ভাব
যে শুধু সম্ভব স্বপ্নে, জাগরণে আমরা একাকী ;
তাহার বিখ্যাত রাখি,
সে নহে মঙ্গালসূত্র, সে কেবল কুটিল নাগপাশ ;
খলময় তাহার উচ্ছ্বাস
বোনে শুধু উর্ণাজাল অসতর্ক মক্ষিকার পথে

(নরক : ক্রন্দসী)

১৯৩৩-রচিত এই অসাধারণ কবিতাটি ; কবি নিজস্ব নরককে আবিশ্ব প্রসারিত হতে দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন মানুষের মর্মে মর্মে সংক্রমিত নরকের কীট—এ মানুষ চলেছে এক বিশ্বযুদ্ধ থেকে আরেক বিশ্বযুদ্ধের দিকে এ মানুষ কুরে কুরে খাচ্ছে কীটের মতন নিজেই নিজের দেহ মন উপাধি অস্তিত্বকে। এভাবেই সৌন্দর্যের অতৃপ্ত বাসনায় ধাবমান কবিকুল নিজেদের এক অসুস্থ অস্বভাবী কামনার কাজে বন্দি করলেন।

বিংশ শতকের কবিতায় সুন্দরের পাশাপাশি কুৎসিত কাব্যের বিষয় করা হল, দুই এ মিলে এক অপরিমেয় সঙ্গতি ও সৌন্দর্যের দিকে ইঙ্গিত করা হল। একেই বলা যায় মাংসের সঙ্গে আত্মার, নরকের সঙ্গে স্বর্গের, শয়তানের সঙ্গে ঈশ্বরের সঙ্ঘের সমন্বিত রূপ। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় সুন্দর ও কুৎসিতের সহঅবস্থানের এবং পরিণাম রমণীয় সমন্বয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া আর
পোড়া বাড়িটার
ঐ ভাঙা দরজাটা
মেলাবেন।
পাগল ঝাপটে দেবে না গায়েতে কাঁটা।
অকাল আগুনে তৃষ্ণার মাঠ ফাটা
মারীকুকুরের জিভ দিয়ে খেত চাটা—
বন্যার দল, তবু ঝলে জল,
প্রলয়-কাঁদনে ভাসে ধরাতল—
মেলাবেন।

৯.৬ আধুনিক কবিতার আঙ্গিক

ভাবের পাশাপাশি আঙ্গিককেও বিপ্লব দেখা গেল। কবিতার ভাষাকে বক্তৃতার উচ্চকণ্ঠ আড়ষ্টের থেকে মুক্ত করে প্রায় স্বগতোক্তির যত নিম্নকণ্ঠ আন্তরিক করে তোলা হল, আতিশয্যবর্জিত তার ভাষাকে গদ্যের কাছাকাছি মুখের ভাষার কাছাকাছি নিয়ে আসার প্রবণতা দেখা গেল এবং কবিরা সুন্দর ও মসৃণ কাব্যিক শব্দের পাশাপাশি কুৎসিত রূঢ় কর্কশ শব্দের ব্যবহার অনায়াসে করতে লাগলেন ; এভাবেই এক নূতন আভাসময় বহুস্তর কবিভাষার উৎপত্তি হল। উদাহরণ দিচ্ছি জীবনানন্দ দাশের কবিতা থেকে

শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপর মাথা পেতে
অলস গেঁয়োর মতো এইখানে কার্তিকের খেতে ;
মাছের ঘাসের গন্ধ বুকে তার—চোখে তার শিশিরের ঘ্রাণ ;
তাহার আস্বাদ পেয়ে অবসাদে পেকে ওঠে ধান,
দেহের স্বাদের কথা কয় ;
বিকালের আলো এসে (হয়তো বা) নষ্ট করে দেবে তার সাধের সময়

(অবসরের গান : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

এবং

আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লাই—নুয়ে আছে নদীর এপারে
বিয়োবার দেরি নাই—রূপ ঝরে পড়ে তার
শীত এসে নষ্ট করে দিয়ে যাবে তারে ;

আজো তবু ফুরায়নি বৎসরের নতুন বয়স,
মাঠে মাঠে ঝড়ে পড়ে কাঁচা রোদ—ভাঁড়ারের রস।
মাছির গানের মতো অনেক অলস শব্দ হয়
সকাল বেলায় রৌদ্রে ; কুঁড়েমির আজিকে সময়।

(ঐ)

'গেঁয়ো', 'বিয়োবার', 'কাঁচা', 'ভাঁড়ারের', 'মাছির' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার লক্ষ্য করার মতো ; পূর্ববর্তী রোমান্টিক কবিদের প্রিয় 'ঘাসের', 'শিশিরের', 'সুন্দরীরে', 'গানের' প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে প্রথম ধরনের শব্দগুলির সমন্বয়ে এক নূতন আভাসময় কবিভাষা তৈরি হল।

কবিতার ভাষাকে শুধু অনায়াস সহজ গদ্যের কাছাকাছি করে তোলা হল না, জীবনানন্দ দাশের মতো বুদ্ধদেব বসুর মতো কবিরা অনেকসময় গদ্যকেই তাঁদের কবিতার প্রকাশ মাধ্যম করে তুললেন।

কী ভালো আমার লাগলো আজ এই সকালবেলায়
কেমন করে বলি।
কী নির্মল নীল এই আকাশ, কী অসহ্য সুন্দর,
যেন গুণীর কণ্ঠের অবাধ উন্মুক্ত তান
দিগন্ত থেকে দিগন্তে

(চিল্কার সকাল : বুদ্ধদেব বসু)

গভীর হাওয়ার রাত ছিল কাল—অসংখ্য নক্ষত্রের রাত,
... ...
যে নক্ষত্রেরা আকাশের বুকে হাজার হাজার বছর আগে মরে গিয়েছে
তারাও কাল জানালার ভিতর দিয়ে অসংখ্য মৃত আকাশ সঙ্গে করে এনেছে ;
যে রূপসীদের আমি এশিরিয়ায়, মিশরে, বিদিশায় মরে যেতে দেখেছি
কাল তারা অতিদূরে আকাশের সীমানার কুয়াশায় কুয়াশায় দীর্ঘ বর্শা হাতে
করে কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে যেন—
মৃত্যুকে দলিত করার জন্য ?
জীবনের গভীর জয় প্রকাশ করার জন্য ?
প্রেমের ভয়াবহ গভীর স্তম্ভ তুলবার জন্য ?

(হাওয়ার রাত : বনলতা সেন)

সমর সেনের মতো কবি তো আগাগোড়া গদ্যছন্দেই কবিতা লিখে গেলেন, পদ্যছন্দের আশ্রয় নেয়ার কোনো প্রয়োজন বোধ করলেন না। বিচিত্র ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষার কারণেই এটা হয়েছে। ডিলান টমাসের মতো কবি যেমন পদ্যছন্দে লিখলেও আজীবন মিল ব্যবহার করলেন না। যাহোক সমর সেন গদ্যভাষাকে কবিতাভাষা করে তুললেন খুব স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে। উদাহরণ হিসেবে তাঁর 'একটি মেয়ে' কবিতাটি সম্পূর্ণ তুলে দিচ্ছি :

আমাদের স্তিমিত চোখের সামনে
আজ তোমার আবির্ভাব হ'ল
স্বপ্নের মতো চোখ, সুন্দর শুভ্র বুক,
রক্তিম ঠোঁট যেন শরীরের প্রথম প্রেম,
আর সমস্ত দেহে কামনার নির্ভীক আভাস ;
আমাদের কলুষিত দেহে
আমাদের দুর্বল ভীরু অন্তরে
সে উজ্জ্বল বাসনা যেন তীক্ষ্ণ প্রহার।

কবিতার এই আঁটোসাঁটো হ্রস্ব অবয়বটিও সমর সেনের নিজস্ব উদ্ভাবন। 'বিরহ', 'মেঘদূত', 'স্মৃতি', 'তুমি যেখানেই যাও'—ইত্যাদি অনেক কবিতাই এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে।

এডগার অ্যালান পো কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন—Preface to the raven and other Poems, The Philosophy of Composition. The Rational of Verse, The Poetic Principle—এখানে কবিতার যে শিল্পতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে তা বোদলেয়ার, এলিয়ট, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতি আ-বিশ্ব বহু কবিরই অনুসরণযোগ্য ও পথপ্রদর্শক বলে মনে হয়েছিল। সংকেত বা Symbol হয়ে উঠল কবিতার মেরুদণ্ড। চিত্রকল্প বা Image-ই গাঢ় হয়ে সংকেতে পরিণত হয়। তুলনাই মূল ভিত্তি। অন্যদিকে কবিতায় সঞ্চারিত হল সাঙ্গীতিক গুণ যার মানে অনির্দিষ্ট আভাসময়তা ও বহুস্তর অর্থের সম্ভাবনা। এভাবেই কবিতা হয়ে উঠল দুর্বোধ্য অথবা মন্ত্রপূত। কবি হবেন উচ্ছ্বাসবিহীন ও বুদ্ধিনির্ভর অর্থাৎ সুলভ কাব্যিকতাকে তিনি বর্জন করবেন। সৌন্দর্যের সঙ্গে থাকবে বিষণ্ণতার ছোঁয়া। আকস্মিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির মিলিত যোগফল যে প্রেরণা তা হল রোমান্টিক কবির উপাস্য, কিন্তু রোমান্টিকতা-উত্তর কবি শ্রমকে কবিতার পক্ষে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় উপাদান মনে করেন। অর্থাৎ ভার নির্বাচন থেকে শব্দপ্রয়োগ সব ব্যাপারেই কবি থাকবেন অত্যন্ত সতর্ক। কবিতায় প্রেরণাকে বর্জন করে পরিশ্রমের এই ব্যবহারের উদাহরণ দিচ্ছি টি. এস. এলিয়টের কবিতা থেকে—

What are the roots that clutch, What branches grow
Out of this story rubbish? Son of man,
You cannot say, or guess, for yu know only]
A heap of broken images, where sun beats
And the dead tree gives no shelter, the cricket no relief
And the dry stone no sound of water
(I. The Burial of the Dead : The Waste land 1922)

এখানে যে ভাঙা চিত্রকল্পের স্তূপ পাচ্ছি যা নগরজীবনের মরুতুল্য বন্ধ্যাত্বকে প্রতীকিত করছে, তার নির্মাণে প্রেরণা অপেক্ষা পরিশ্রম, আবেগের স্থূল অতিরেক অপেক্ষা বুদ্ধি পরিশীলিত সংযম অনেক বেশি কার্যকর হয়েছে।

একই প্রক্রিয়া রয়েছে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায়

আমার কথা কী শুনতে পাও না তুমি ?
কেন মুখ গুঁজে আছে তবে মিছে ছলে ?
কোথায় লুকোবে ? ধূ ধূ করে মরুভূমি ;
ক্ষয়ে ক্ষয়ে ছায়া সরে গেছে পদতলে।
... ...
ফাটা ডিমে আর তা দিয়ে কী ফল পাবে ?
মনস্তাপেও লাগবে না এতে জোড়া।
অখিল ক্ষুধায় শেষে কী নিজেকে খাবে ?
কেবল শূন্যে চলবে না আগাগোড়া।

(উটপাখি : অর্কেস্ট্রা)

শাহরিক চিত্রকল্প বোঝা যাচ্ছে, রবীন্দ্রউত্তর বাংলা কবিতার এক প্রধান উপজীব্য নগরজীবনের বীরগাথার রূপায়ণে—মানবসভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতা ও তাঁর বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামের সাহসিকতার রূপায়ণে—সচেতন বুদ্ধিদীপ্ত শ্রমই কার্যকরী হয়েছে।

একইভাবে মনে পড়ছে বিষ্ণু দে-র কবিতা।

জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার
হৃদয়ে আমার চড়া।
চোরাবালি আমি দূরদিগন্তে ডাকি
কোথায় ঘোড়সওয়ার ?
দীপ্ত বিশ্ববিজয়ী ! বর্শা তোলো।
কেন ভয় ? কেন বীরের ভরসা ভোলো ?
চোরাবালি আমি দূরদিগন্তে ডাকি ?
হৃদয়ে আমার চড়া ?
অঙ্গে রাখি না কারোই অঙ্গীকার ?
চাঁদের আলোয় চাঁচর বালির চড়া।
এখানে কখনো বাসর হয়নি গড়া ?
মৃগতৃষ্ণিকা দূরদিগন্তে ডাকি ?
আত্মহুতি কী চিরকাল থাকে বাকি ?

(ঘোড়সওয়ার : চোরাবালি)

বিষ্ণু দে-ও তাঁর কবিতায় প্রেরণার বদলে পরিশ্রমকেই শিরোধার্য করেছিলেন। ঘোড়সওয়ার কবিতায় বন্ধ্যা যুগের যে চিত্রকল্প তিনি এঁকেছেন ও মুক্তির স্বপ্ন নির্মাণ করেছেন ঘোড়সওয়ারের আত্মপ্রতীক পুরুষপ্রতীক রচনা করে সেখানে আবেগের জলাভূমির চেয়ে ঝকঝকে মনন ও বুদ্ধির উত্তরণই চোখে পড়ে।

এডগার অ্যালান পো-র কবিতা ও প্রবন্ধে আত্মনির্যাতন, বিষাদ ও শূন্যতা সবিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। আধুনিক কবিতার আত্মার স্বরূপ এখানে বেশ ভালোভাবেই বোঝা যাচ্ছে। সৌন্দর্য-ধ্বনি-সুগন্ধের উপর যে জোর দিয়েছিলেন পরে সাংকেতকদের রচনায় তা ফুলেফেল বিকশিত হয়েছে। বোদলেয়ারের Correspondence : Correspondances কবিতায় বর্ণিত বিখ্যাত তত্ত্বই হল কবিতার বর্ণ, ধ্বনি, ঘ্রাণ, স্বাদ, স্পর্শ প্রভৃতি প্রাধান্য বিস্তার করবে এবং চক্ষুবর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক পরস্পর স্থান পরিবর্তন করবে অর্থৎ তখন চোখ দিয়ে শোনা যেতে পারে, কান দিয়ে দেখা যেতে পারে ইত্যাদি। এজন্য র‍্যাঁবো বলেছিলেন, "আমি আবিষ্কার করেছি স্বরবর্ণের রঙ।" জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কবিতাটি সিম্বলিজম—সাংকেতিকতার একটি জয়মালা বলা যেতে পারে। বিষাদ শূন্যতা ক্লান্তি বর্ণ ধ্বনি ঘ্রাণ স্পর্শ স্বাদের সমারোহ সেখানে, সর্বোপরি রয়েছে শুদ্ধ সৌন্দর্যকে শরীরী ও অশরীরীর সংযোগ স্থলে স্থাপন করে গড়ে তোলার প্রয়াস। কবিতাটি উদ্ধৃত করছি—

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে ;
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মলয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি ; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি ; আরো দূরে অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে ;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।
চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবন্তীর কারুকার্য ; অতি দূর সমুদ্রের পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘারে দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি দ্বীপের ভিতর
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে ; বলেছে সে 'এতদিন কোথায় ছিলেন ?'
পাখীর নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।
সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে, ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল ;
পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল ;
সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুলায় এ জীবনের সব লেনদেন,
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

(বনলতা সেন : বনলতা সেন)

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এডগার অ্যালন পো-র 'Helen' নামক কবিতাটির প্রভাব বনলতা সেন-এ আছে। এই কবিতাটি উপস্থাপিত করছি।

Helen thy beauty is to me
Like those Nicean barks of yore
That gently, O'er a perfumed Sea,
The weary way-worn wanderer bore
To his own native shore.
Oh desperate seas long wont to roam,
Thy hyacinth hair, thy classic face,
Thy Naiad airs have brought me home
To the glory that was Grece
To the grandeur that was Rome.
Lo! in you brilliant window-niche
How statute-like I see thee stand,
The agate lamp within thy hand!
Ah, Psyche, from the regions which
Are Holy land!

পো-র কবিতাটি অসাধারণ। অন্যদিকে জীবনানন্দের কবিতাটি যে নূতন মাত্রা ও বহুস্তর আভাসময়তা লাভ করেছে তা পাঠক ও শ্রোতা লক্ষ্য করবেন।

বোদলেয়ারের কাছে সৌন্দর্যের সঙ্গে সর্বদা জড়িয়ে আছে অদ্ভুতের ভাব। "...It is this strangeness that gives beauty its specific character. (Curiosites asthetics : Chales Baudelaire : Art in Paris)"। বীভৎস, ভীতিপ্রদ, পঙ্গু এবং দুঃখ ছন্দতানে যুক্ত হয়ে কবিতার বিষয় হয়েছে। যে স্থূল বস্তুজগৎ আমাদের কাছে চাক্ষুষভাবে প্রতীয়মান হয় তা বর্জিত হয়েছে, বস্তুকে অতিক্রম করে এবং তার নির্যাসরূপে যে অতিবস্তু রয়েছে তার দিকে কবিরা নজর দিয়েছেন। অতিবাস্তবের এই জগতে পদে পদে রহস্য ও অনুপাত এসে আলিঙ্গান করে, শয়তান হয়ে ওঠে সৌন্দর্য উৎস, স্মৃতিশব্দগন্ধস্পর্শের সুদূর অস্পষ্টতা, নারীর চুলের সুগন্ধ সবই কল্পনাকে উদ্রিক্ত করে। জীবনানন্দের 'নগ্ন নির্জন হাত', 'বনলতা সেন' কবিতায় সৌন্দর্যের সঙ্গে অদ্ভুত ও অজানা সহবাস, অনুতাপ ও পাপের আবাস, ভালোবাস ও যৌনতা এবং অতিবাস্তবের প্রায় অতিপ্রাকৃত মুখশ্রী আবিষ্কারের প্রয়াস দেখছি :

ফাল্গুনের অন্ধকার নিয়ে আসে সেই সমুদ্রপারের কাহিনী
অপরূপ খিলান ও গম্বুজের বেদনাময় রেখা,
লুপ্ত নাসপাতির গন্ধ,
অজস্র হরিণ ও সিংহের ছালের ধূসর পাণ্ডুলিপি,
রামধনু রঙের কাঁচের জানালা,
ময়ুরের পেখমের মত রঙিণ পর্দায় পর্দায়

কক্ষ ও কক্ষান্তর থেকে আরো দূর কক্ষ কক্ষান্তরের
ক্ষণিক আভাস—
আয়ুহীন স্তব্ধতা ও বিস্ময়।
পর্দায় গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ,
রক্তিম গেলাসে তরমজ মদ।
তোমার নগ্ন নির্জন হাত
তোমার নগ্ন নির্জন হাত।

ক্লীন্থ ব্রুকস্ তাঁর Modern Poetry and the Tradition নামক বিখ্যাত গ্রন্থে একটি চমৎকার কথা বলেছেন—"Victorian poetry was, as we have seen, a poetry of sharp exclusion. What was required in our own time was a poetry based upon a principal of inclusion." পূর্ববতী কবিতা ছিল বর্জনের কবিতা, একালের কবিতা গ্রহণের কবিতা। কথাটির মানে পূর্ববর্তী কবিরা অনেক কিছুকেই কবিতা থেকে বাদ দিতেন, এখানকার কবিদের মূলনীতি এতদিন কবিতায় যারা অপাঙক্তেয় ছিল তাদের গ্রহণ করা। বক্তব্যের সমর্থনে জীবনানন্দ দাশ থেকে বিষ্ণু দে, সমর সেন থেকে নীরন্দ্রেনাথ চক্রবর্তী অনেকেরই নাম করা যায়। বিষ্ণু দে-র 'অন্বিষ্ট' বা 'সন্দীপের চর' এর মত কাব্য ভালো উদাহরণ।

হয়তো বা নিরুপায়
হয়তো বা বিচ্ছিন্নের যন্ত্রণাই বর্তমানে ইতিহাস
বালিচড়া মরা নদী জলহীন পায়ে পারাপার
অথচ বৈশাখী হাওয়া বাংলার সমুদ্রের
আমের মুকুলে ফল
রাশি রাশি বেলমল্লিকায়
বাগানে বিহ্বল আজ কালেরই বাগান
তবু লুব্ধ রুদ্রের মাঘের
পাতাঝরা পাতা ঝরানোর ক্ষোভের রাগের
তবু সেই বাঁচার মরার চরম যন্ত্রণা চলে
আমাদের দিনের শিকড়ে রাত্রির পল্লবে
যদি বা হতুম ফুল, বইতুম দক্ষিণের হাওয়া
রইতুম নিস্পলক রূপান্তরে দ্রুত নিত্য চাঁদ
কিন্তু আমরা যে পৃথিবীর আমরা মানুষ
আমাদেরই অতীতের স্রোতে গড়ি ভবিষ্যৎ
একুলে ওকুলে আমাদেরই বর্তমানে
কিছুটা উদ্বৃত্ত সত্ত্বে—বৃষ্টি কিম্বা আর্তেসীয় জলে।

(জল দাও ; অন্বিষ্ট ; ১৯৪৬-৪৭)

স্পষ্ট বোঝা যায় শুধু কবিতার ভাষা নয়, ভাবনাও পালটে যাচ্ছে এবং কবিতা সমদর্শী সবিতার মতোই হয়ে উঠেছে সর্বত্রচারী।

বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'কালের পুতুল' গ্রন্থে রবীন্দ্রউত্তর কয়েকজন প্রধান বাহালি কবির উপর দিগদর্শনী আলোচনা করেছেন। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় বুদ্ধদেব লক্ষ্য করেছেন চিত্র রচনার অজস্রতা। চিত্র অর্থাৎ চিত্রকল্প। এইসব ছবিগুলি শুধু দৃশ্যের নয়, বর্ণ এবং স্পর্শেরও। কলাকৌশলের ক্ষেত্রে জীবনানন্দ আবহমানের অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে নূতনভাবে বাজিয়েছেন। নামশব্দ ও বিদেশি শব্দের ব্যবহার তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব। "তাঁর মনোলোক যেন একটি ধূসর কোমল পরিমণ্ডল, সেখানে যাকে বাস্তব বলি তার আভাসমাত্র নেই।" জীবনানন্দ দাশ : বনলাত সেন' নামক প্রবন্ধে লেখক বলতে চাইছেন জীবনানন্দ বাস্তবকে হুবহু নিতেন না। অর্থাৎ তিনি ছিলেন সুররিয়েলিজম বা অতি বাস্তব/পরাবাস্তবের কবি। দেশজ অর্থাৎ মৌখিকভাষার ব্যবহার এবং কবিভাষার মৌলিকতা আধুনিকতার ভিতরে ভিতরে ক্রিয়াশীল। আধুনিকতার শিল্পতত্ত্ব গদ্যপদ্যের ব্যবহারগত সীমারেখা বিচূর্ণ করে। প্রচলিত কাব্যরীতি ভেঙে নতুন রূপ ও রীতিরচনা যে আধুনিকতার যাত্রাপথে থাকে তা উক্ত হয়েছে 'কালের পুতুল'-এর 'সমর সেন : কয়েকটি কবিতা' নিবন্ধে। এক অভিনব গদ্যছন্দ এই কবির কবিতায়। ভাববলয়ে একদিকে অন্তরের অসুস্থতাবোধ অন্যদিকে নগরজীবনের বিক্ষোভ ও ক্লান্তি। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে-র ঝোঁক মিতব্যয়ী শব্দপ্রয়োগের দিকে (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : ক্রন্দশি)। নিষ্ঠুর আত্মপরীক্ষা ও নৈর্ব্যক্তিকতা ছিল সুধীন্দ্রনাথের উপজীব্য। কবিতায় তিনি কথাকে সাবধানে সাজান গদ্যশিল্পীর ধাঁচে। প্রবল তীব্র আত্মকেন্দ্রিকতা ও সমাজ এবং নীতিধর্মের প্রতি অবহেলায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মহিমা উদ্‌গত। অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যে ছন্দে ও শব্দযোজনায় কলাকৌশলের মৌলিক সাহস চোখে পড়ে। ভাষা ও ছন্দের পরীক্ষানিরীক্ষা প্রকট। ছবি এসেছে চিত্রকল্প ও প্রতীকে পরিণত করে। কবি নিরন্তর ভ্রাম্যমাণ, যেহেতু এই ছিন্নমূল অনিকেত মনোভঙ্গি আধুনিক কবিতার শিল্পতত্ত্বকে আলিঙ্গান করে আছে।" ...বাসা ভেঙে গেছে মানুষের, বুদ্ধিজীবী মাত্রেই উদ্বাস্তু" ; (অমিয় চক্রবর্তীর পালাবদল')। তাঁর কবিতা বাংলা ফ্রী-ভার্স প্রভৃতির উদাহরণ স্থল অর্থাৎ গদ্যপদ্যের সংমিশ্রণ।

শুধু বুদ্ধদেব বসুর 'কালের পুতুল' নয় রবীন্দ্রউত্তর বাংলা কবিতাকে বুঝতে গেলে জীবনানন্দ দাশের 'কবিতার কথা', সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'স্বগত', বিষ্ণু দে-র 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ', অমিয় চক্রবর্তীর Modern Tendencies in English Literature, এই গ্রন্থগুলিও পঠিতব্য। 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' (সাহিত্যচর্চা) নিবন্ধে বুদ্ধদেব বসু খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন কেন রবীন্দ্রউত্তর বাঙালি আধুনিক কবিরা রবীন্দ্রনাথ থেকে ভিন্নপথে যেতে হবে প্রথম থেকেই সচেতনভাবে ভেবেছেন। তিনি বলেছেন রবীন্দ্রঅনুসারী কবিসমাজ বাংলা কবিতাকে রোমান্টিকতার তরল সংস্করণে পরিণত করেছিলেন তাঁদের ক্রমাগত অনুকরণ অনুসরণের দ্বারা। কবিতায় নূতন কথা বলার প্রয়োজন হয়েছিল এবং নূতন আঙ্গিকে। তাঁরা নিজেরা এ কাজ করেছেন। জীবনানন্দ দাশ 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা' (১৩৪৮) (কবিতার কথা) নিবন্ধে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 'কাব্যের মুক্তি' অথবা 'সূর্যাবর্ত' নিবন্ধে, বিষ্ণু দে 'বাংলা সাহিত্যে প্রগতি' নামক রচনাকর্মে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই কথা বলেছেন। নূতন পথ খোঁজার কাজে বোদলেয়ার—মালার্মে—ইয়েটস—এলিয়ট কবিতার কাছ থেকে যে তাঁরা আদর্শ পেয়েছেন এ কথাও স্বীকার করেছেন। অন্যদিকে এইসব কবি লেখনীতে রাবীন্দ্রিক ভঙ্গিমা বর্জন করলেও, প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাবে রবীন্দ্রভক্ত ছিলেন। তাঁরা জানতেন উত্তরাধিকারী হিসেবে যে বাংলা ভাষাকে তাঁরা পেলেন এবং যে বাংলা ছন্দকে, তা একান্তভাবে রবীন্দ্রনাথের সাধনাতেই আবদ্ধ হয়েছে। এই ভাষার উপরেই তাঁরা প্রত্যেকে তাঁদের নিজস্ব ব্যক্তিত্বের ছাপ ফেলতে চাইলেন এবং এই ছন্দকে কেন্দ্র করেই তাঁরা মুক্ত ছন্দের দিকে যাত্রা করলেন। অন্যদিকে নজরুল ইসলাম—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং মোহিতলাল মজুমদার এইজন্য স্মরণীয় হয়ে

থাকবেন যে প্রথম রবীন্দ্র-বিদ্রোহী তাঁরাই এবং ভাষা ও ছন্দে রোমান্টিক পথে গমন করলেও ভাবের দিকে তাঁরা চেষ্টা করেছেন অব্যবহিত পূর্ববর্তী রবীন্দ্রীয় রোমান্টিক ঐতিহ্যকে বিদীর্ণ করে নূতন কবিতা লেখার।

৯.৭ বিশ শতকের বাংলা কবিতা : নানা আন্দোলন ও মতবাদ

রবীন্দ্রউত্তর বাংলা কবিতার চারিত্র্যধর্ম নির্ণীত হল—সে কবিতা বিশ শতকের কবিতা এবং আধুনিক কবিত। ফরাসি সাহিত্যে আমরা প্রথমে সিম্বলিজম ও পরে সুররিয়েলিজম পেয়েছিলাম, ইংরেজি সাহিত্যে ইমেজিসম, জার্মান সাহিত্যে এক্সপ্রেশনিজম ইত্যাদি দেখা গেছে। বলা বাহুল্য এ সবই আধুনিক কবিতার স্তরভেদ। বিংশ শতাব্দীর বাংলা কবিতাকে বুঝতে গেলে এইসব কাব্য অন্দোলনকে জানা প্রয়োজন। বিদেশের মাটিতে এদের উদ্‌গম হলেও ক্রমশ সারা বিশ্ব কবিতায় এরা ছড়িয়ে পড়ে এবং সাহিত্য যে মূলত বিশ্বসাহিত্য এই তত্ত্বটিকে বুঝিয়ে দেয়। জীবনানন্দ দাশকে সিম্বলিস্ট, সুররিয়েলিস্ট ও ইমেজিস্ট, সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে ইমেজিস্ট, সিম্বলিস্ট ও সুররিয়েলিস্ট, বুদ্ধদেব বসুকে ইমেজিস্ট ও সিম্বলিস্ট, অমিয় চক্রবর্তীকে ইমেজিস্ট, বিষ্ণু দে-কে ইমেজিস্ট ও সিম্বলিস্ট, প্রেমেন্দ্র মিত্রকে ইমেজিস্ট, সমর সেনকে ইমেজিস্ট—এইভাবে চিহ্নিত করা যায়। এও মনে রাখতে হবে এই সব কাব্য আন্দোলন একটির সঙ্গে আর একটি গভীরভাবে যুক্ত। চিত্রকল্প প্রায়ই গভীর হয়ে প্রতীকে পরিণত হয়েছে, সিম্বলিজমের স্বপ্ন থেকে জমে হয়েছে সুররিয়েলিজমের অবচেতনার।

ফরাসি সিম্বলিস্ট বা সংকেতবাদী কবিতা আন্দোলন বিশ্বকবিতাকে কাব্যে প্রভাবিত করেছে। বোদলেয়ারই আদি গুরু এবং মালার্মে, র‍্যাবোঁ, ইয়েটস, এলিয়ট আমাদের দেশে জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনুগামী। "সংকেত শব্দের অর্থ অদৃশ্য জগতের দৃশ্যগ্রাহ্য চিত্রকল্প।" বোদলেয়ারের মতে প্রতিটি রঙ, ধ্বনি, গন্ধ, ঘৃণা প্রেম প্রভৃতি বৃত্তি, প্রতিটি দৃশ্যগ্রাহ্য বস্তুপ্রতিমা—ধরা যাক একটি জাহাজ অথবা একটি শব, সব কিছুই যুক্ত হয়ে আছে কোনো না কোনো ভাবে তুলনার জগতে একটি প্রতিক বা সংকেতের সঙ্গে। কল্পনাশক্তির প্রয়োগেই এই তুলনাকে আবিষ্কার করা যায়। সিম্বল বা সংকেত মূলত ইমেজ বা চিত্রকল্প যার মধ্যে রয়েছে সম্মোহনী শক্তি। অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যের দিকেই এর ঝোঁক যদিও তাকে মেলে ইন্দ্রিয়ের মধ্যবর্তিতায়, র‍্যাবোঁর ভাষায় ইন্দ্রিয়সমূহের সচেতন বিপর্যয়ের দ্বারা। বিভিন্ন শিল্পে, সঙ্গীতভাস্কর্য চিত্রকবিতা ইত্যাদিতে যোগ আছে এবং সুন্দর ও কুৎসিতে, ভালো ও মন্দে কোনো বিভাজন নেই। রেনে ওয়েলকে যেমন বলেছিলেন কবিতা বোদলেয়ারের ভাষ্যে হয়ে উঠল "an aesthetic of the ugly" কুৎসিতের নন্দনতত্ত্ব/সৌন্দর্যতত্ত্ব। বস্তুর আত্মাকে উদ্ভাসনের জন্য সিম্বল বা প্রতীকই একমাত্র উপায়। জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেন, শ্যামলী, ক্যাম্পে, পাখীরা, গোধূলি, সন্ধির নৃত্য, হাঁস, বিড়াল, শেয়ালেরা, ঘাস ; সুধীন্দ্রনাথ দত্তের হৈমন্তী, উঠপাখী, নরক, কুকুট, বাক্য, শর্বরী, ভ্রষ্টতরী ; বিষ্ণু দে-র ঘোড়সওয়ার, ক্রেসিডা, পদধ্বনি ইত্যাদি কবিতার সিম্বলিজমের আলোকে সুন্দর ব্যাখ্যা সম্ভব।

ইমেজিসম বা চিত্রকল্পবাদ গড়ে উঠেছে ইমেজ বা চিত্রকল্পকে ঘিরে। উদ্‌গাতা এজরা পাউন্ড, প্রয়োগকর্তা এলিয়ট। চিত্রকল্পের পাউন্ডকৃত বিখ্যাত সংজ্ঞা "An 'image' is that which presents and intellectual and emotional complex in instant of time" চিত্রকল্প কে বুদ্ধি ও আবেগের মিলিত অবস্থান মৌহর্তিক উদ্ভাসনে তুলে ধরে। চিত্রকল্পবাদ মোরান্টিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেই উদ্‌গত। সেজন্যে এলিয়ট তাঁর 'বোদলেয়ার' প্রবন্ধে বোদলেয়ারকে রোমান্টিসিজমের 'antithesis' বা প্রতিস্বর্ধী বলেই বিশেষিত করেছেন। আর পাউন্ড নিজেও কবিতার জন্য কিছু নিয়মাবলী বেঁধে দিয়েছিলেন—যেমন অপ্রয়োজনীয় কোনো শব্দের ব্যবহার চলবে না ইত্যাদি। যা হোক এই নতুন কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য এ ছন্দে শব্দে মৌখিক ভঙ্গিকে গ্রহণ করেছে। রয়েছে ব্যঙ্গ ও আত্মব্যঙ্গা যা ঘটেছে মননশীলতার প্রাধান্যের ফলেই। এর প্রধান লক্ষণ Allusion বা উল্লিখনের ব্যবহার—কবিতায়

সচেতনভাবে কবির পাঠচিহ্ন রেখে দেয়া। সেজন্যেই Edmund Wilson তাঁর 'Axel's Castle' নামক আধুনিক কবিতার গুরুত্বপূর্ণ ভাষ্যে 'T. S. Eliot' নিবন্ধে বলেছিলেন—"Eliot and Pound have, in fact, founded a school of poetry which depends on literary quotation and reference to an unprecedented degree." ইমেজিস্ট কবিতায় অধিকন্তু থাকে চিত্রকল্পের মাধ্যমে নগরজীবনের উপস্থাপন। বোদলেয়ার লাফর্গ ও র‍্যাবোঁর প্যারিস, এলিয়টের লন্ডল, জীবনানন্দ ও বিষ্ণু দে—এবং সমর সেনের কলকাতা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যেতে পারে। গোড়া Waste land এ ; জীবনানন্দের রাত্রি, পথ হাঁটা, ফুটপাথে, বিভিন্ন কোরাস, লঘু মুহূর্ত, উত্তরসাময়িকী প্রভৃতি কবিতায় ; বিষ্ণু দে-র জন্মাষ্টমী, অন্বিষ্ট, জল দাও ইত্যাদি রচনাবলীতে ; সমর সেনের একটি রাত্রের সুর, তিনটি কবিতা, নাগরিকা, দুঃস্বপ্ন, উর্বশী, মহুয়ার দেশ, স্বর্গ হতে বিদায়, নাগরিক, ঘরে বাইরে ইত্যাদি রচনাবলীতে নগরজীবনের চিত্রকল্প উজ্জ্বল বিস্তার পেয়েছে।

বিংশ শতকের কবিতা যে তৃতীয় প্রধান কাব্য আন্দোলনের মাধ্যমে বিস্তৃতি লাভ করেছে তার নাম সুররিয়েলিজম বা অবচেতনাবাদ, এর মূলে রয়েছে ফ্রয়েডের 'সাইকোঅ্যানালিসিস' বা মনঃসমীক্ষণের তত্ত্ব। এর উদ্‌গতি দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী ফ্রান্সে। গিওম আপলিনেয়ার প্রথম Superrealism অতিবাস্তববাদ শব্দটি ব্যবহার করলেন। সংজ্ঞা দিয়েছেন আঁদ্রে ব্রেতোঁ তাঁর 'সুররিয়েলিস্ট ম্যানিফেস্টো'তে। সুররিয়েলিজম হচ্ছে শুদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ততা যার সাহায্যে ভাবনাক্রিয়াকে মৌখিক বা লিখিতভাবে অবাধে প্রকাশ করা যায়। বুদ্ধির সর্বনিয়ন্ত্রণযুক্ত এই প্রকাশ, সুররিয়েলিজম স্বপ্নের সার্বভৌম শক্তিতে বিশ্বাসী। সুররিয়েলিজমে একদিকে যুক্ত ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতি যেমন এসেছে ফ্রয়েডের মাধ্যমে, তেমনি পূর্বধারণার বর্জনের বৈপ্লবিক সংকল্প এসেছে কার্ল মার্ক্স থেকে। তাই ফ্রয়েড ও মার্ক্স এই দুজনকে বলা হয়েছে সুররিয়েলিজমের দুই মহাগুরু।

লুই আরাগঁ, পল এলুয়ার, গারথিয়া ফেদেরিকো লোরকার প্রভৃতির কবিতা, আমাদের দেশে জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে প্রভৃতির কবিতা সুররিয়েলিজমের ভালো উদাহরণ। জীবনানন্দ দাশের অবসরের গান, নগ্ন নির্জন হাত, আট বছর আগের একদিন, বোধ, হাওয়ার রাত, হরিণেরা, শিকার, ক্যাম্পে, অন্ধকার প্রভৃতিতে সমগ্র 'রূপসী বাংলায়', সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'নরক'-এর মতো কবিতায়, বিষ্ণু দে-র 'ঘোড়সওয়ার', ক্রেসিডা, পদধ্বনি ইত্যাদি কবিতায় সুররিয়েলিজমের ডানার বিস্তার দেখা যায়।

আধুনিক কবিতার উৎসে কোনো কোনো উপাদান কার্যকরী হয়েছে এবং কোনো কোনো কাব্য আন্দোলনের আশ্রয়ে এর স্ফুরণ হয়েছে সে কথা বললাম। রবীন্দ্রউত্তর বাংলা কবিতা, বিংশ শতকের বাংলা কবিতা অথবা আধুনিক বাংলা কবিতায় এইসব উপাদান এবং কাব্য আন্দোলন কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে যুগস্রষ্টা মূল কবিদের কবিতা থেকে উদাহরণ সহযোগে সে কথাও কিছু বললাম। এবার কয়েকজন ব্যক্তিকবি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলছি।

৯.৮ জীবনানন্দ দাশ

প্রথমেই জীবনানন্দ দাশ সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা যাক। রবীন্দ্রনাথের পর ভাবনা ও ভাষায় তিনি অসাধারণ মৌলিকতর পরিচয় দিয়েছেন, প্রকৃতি, প্রেম ও অবচেতনা তাঁর কবিতার প্রধান বিষয়—পারিপার্শ্বিকে এসেছে গ্রামজীবন ও নগরজীবন। ভাষা ব্যবহারে তিনি সহজ সরল, যে নিজস্ব কবিভাষা তিনি তৈরি করে নিয়েছে তার মধ্যে কৃত্রিম প্রসাধনও বড় কম নেই। এইখানেই জীবনানন্দের ভাষা ব্যবহারের আশ্চর্য সুন্দর বৈপরীত্য—একদিকে গ্রাম প্রকৃতির রাখালিয়া জীবনশ্যামলিয়া তাঁর কবিতায়, অন্যদিকে নগরজীবনের বীরগাথার উপযোগী সয-রচিত কৃত্রিমতা ও প্রসাধন, বুদ্ধির দীপ্তি ও বাখপ্রখরতা। প্রথমেই উদাহরণ দিচ্ছি রূপসী বাংলার 'সেইদিন এই মাঠ স্তব্ধ হবে নাকো জানি' থেকে আনুপূর্বিকভাবে।

সেই দিন এই মাঠ স্তব্ধ হবে নাকো জানি—
এই নদী নক্ষত্রের তলে
সেদিনো স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে !
আমি চলে যাব বলে
চালতা ফুল কি আর ভিজিবে না শিশিরের জলে
নরম গন্ধের ঢেউ-এ ?
লক্ষ্মীপেঁচা গান গাবে নাকি তার লক্ষ্মীটির তরে ?
সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে !
চারদিকে শান্তবাতি—ভিজে গন্ধ—মৃদু কলরব,
খেয়ানৌকাগুলি এসে লেগেছে চরের খুব কাছে ;
পৃথিবীর এইসব গল্প বেঁচে রবে চিরকাল ;
এশিরিয়া ধূলো আজ—বেবিলন ছাই হয়ে আছে।

বিষয় ও বক্তব্য এর আগে রোমান্টিকদের কবিতায় বহুভাবে এসে গেছে, কিন্তু এখানে পুরোটাই একটু নূতনভাবে বলা, একটু নূতন ভাষায় লেখা। সেই মৃত্যু চেতনা, প্রকৃতির সজলস্নিগ্ধ রূপ, প্রকৃতির সৌন্দর্যসত্তা ছেড়ে কবিসাধকের অন্তর্ধান, ইতিহাসচেতনা অর্থাৎ মানুষের জীবনের ছোট ছোট সুখদুঃখ দৈনন্দিনতার রূপালি চিত্রকল্প চিরদিন বেঁচে থাকবে কিন্তু দিগ্বিজয়ীদের ঈর্ষা হিংসাশক্তির আড়ম্বর একদিন শেষ হবে এই বোধ—সবই রয়েছে কিন্তু রোমান্টিকদের মতো করে নয় আধুনিকদের মতো করেই আগাগোড়া এই উপস্থাপনা। জীবনানন্দের প্রিয় চিত্রকল্পগুলি নক্ষত্র-শিশির-লক্ষ্মীপেঁচা-নবম গন্ধ-সবই এই কবিতায় বাড়তি আবেদন এনেছে।

ধূসর পাণ্ডুলিপি ও তার সমকালে রচিত রূপসী বাংলার সনেটগুলি জীবনানন্দের বাসভূমি বরিশাল অঞ্চল তার জল-জঙ্গাল-প্রাণী-পতঙ্গ নিয়ে অবিনশ্বর হয়ে আছে। সারা বিশ্বকাব্যসাহিত্যে যদি স্বদেশ প্রেমের উদাহরণ হিসেবে কাব্যনাম সংকলিত হয় তাহলে 'রূপসী বাংলা'র নাম সেখানে অবশ্যই থাকবে। জন্মভূমির মাটি মানুষ ভেষজ প্রকৃতির ইন্দ্রিয়সৌন্দর্যময় রূপরসগন্ধস্পর্শঘন চক্ষুকর্ণনাসিকাজিহ্বাত্বকের উৎসবময় এমন চিত্রকল্প ও প্রতীক সহজে ভোলা যায় না। ছবিগুলি যেন চোখ বুজে চোখের সামনে দেখতে হয় অথবা তাদের দেখা যায় এমন তাদের প্রাণশক্তি। কাঁঠাল পাতা ভোরের বাতাসে জলে যায়, মেয়েলি সকরুণ হাত সন্ধ্যার পুকুর থেকে হাঁসকে ডেকে নেয় (তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও) ; 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ/খুঁজিতে যাই না আর' (বাংলার মুখ আমি) ; বেহুলা ইন্দ্রের সভায় নাচে তখন বাংলার নদী মাঠ ভাঁট ফুল ঘুঙুরের মতো তার পায়ে বেজে উঠে ক্রন্দন ছড়ায় (ঐ) ; কবি কোনোদিন রূপহীন প্রবাসের পথে বাংলার মুখ ভুলে খাঁচার ভিতর নষ্ট শুকের মতো জীবন কাটাননি। (যেদিন সরিয়া যাব তোমাদের কাছ থেকে) ; জ্যোৎস্নায় ইতিহাস স্মৃতির ভাঙা ইটস্তূপে অশ্বারোহী অশরীরী ভূস্বামী রায় রায়ানের নাম ধরে কে যেন ডেকে যায় বাতাসে (পৃথিবী রয়েছে ব্যস্ত) ; ধানসিঁড়ি নদীর তীরে এই বাংলায় কবি একদিন ফিরে আসবেন শঙ্খচিল, শালিখ, ভোরের কাক অথবা কিশোরীর হাঁস হয়ে (আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়) ; যেদিন মৃত্যু আসবে বাসমতী চালে ভেজা তাপ শাদা হাতখানি চিরকালের কিশোরী যেন কবির বুকে রাখে (যদি আমি ঝরে যাই একদিন কার্তিকেরঃ ;—এমনি বহু সুন্দর অসামান্য প্রকৃতি ও আকাঙ্ক্ষার সংকেত ও চিত্রকল্প ছড়িয়ে আছে রূপসী বাংলার কবিতাবলীর পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে। Form বা আঙ্গিকের দিকে এই সব সনেটে সাধারণত

পেত্রার্কীয় সনেটের রীতিই অনুসৃত হয়েছে। অর্থাৎ অষ্টক বা octave এবং ষটক বা Sestet বিভাজন ও abba abba এবং cdecde বা cdeded মিলের রীতি রয়েছে। ষটকের মিলের রীতিতে জীবনানন্দ অনেক সময় কবির স্বাধীনতা নিয়েছেন।

এডগার অ্যালান পো তাঁর 'The Philosophy of Composition' নিবন্ধে বলেছেন, সৌন্দর্যই কবিতার বৈধ এলাকা এবং কবিতার বিভিন্ন সুরের মধ্যে বিষাদই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। "Beauty is the soul legitimate province of the Poem" এবং 'Melancholy is thus the most legitimate of all the ooetical tones'—এই কথাগুলি জীবনানন্দ দাশের কবিতা সম্বন্ধে খুবই প্রযোজ্য।

ফিরে এসো সমুদ্রের ধারে,
ফিরে এসো প্রান্তরের পথে,
যেইখানে ট্রেন এসে থামে
আম নিম ঝাউয়ের জগতে
ফিরে এসো ; একদিন নীল ডিম করেছে বুনন ;
আজো তারা শিশিরে নীরব ;
পাখির ঝর্না হয়ে কবে
আমারে করিবে অনুভব।

(ফিরে এসো : 'মহাপৃথিবী')

অথবা

এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে—জানি না সে এইখানে
শুয়ে আছে কিনা
অনেক হয়েছে শোয়া ;—তারপর একদিন চলে গেছে
কোন দূর মেঘে।
অন্ধকার শেষ হলে যেই স্তর জেগে ওঠে আলোর আবেগে ;
সরোজিনী চলে গেল অতদূর ? সিঁড়ি ছাড়া—পাখিদের
মতো পাখা বিনা ?

(সপ্তক : 'সাতটি তারার তিমির')

এসব কবিতায় সৌন্দর্য ও বিষণ্ণতা প্রেম ও প্রকৃতির সমাশ্রয়ে এক অনবদ্য নূতন কণ্ঠস্বর পেয়েছে।

জীবনানন্দ দাশের কবিতাগত আঙ্গিকের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য Refrain বা ধ্রুবপদ। এই Refrain বা ধুয়াকে পো কবিতার একটি মনোরম বৈশিষ্ট্য বলেই নির্দেশ করেছেন। একই পঙ্‌ক্তি বারবার ব্যবহৃত হয়ে এক সম্মোহনময় মায়াবী পরিবেশ সৃষ্টি করে, ধ্বনির সূক্ষ্মতাই শুধু বোঝা যায় না, ভাবের মধ্যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে এক ধরনের ক্লান্ত একঘেয়েমির সুর নিয়ে আসা হয় যা কবির স্বেচ্ছাকৃত।

সিংহ অরণ্যকে পাবে না আর
সিংহ অরণ্যকে পাবে না আর
সিংহ অরণ্যকে পাবে না আর

অথবা

সে আগুন জ্বলে যায় দহে না কো কিছু
সে আগুন জ্বলে যায় দহে না কো কিছু
সে আগুন জ্বলে যায় দহে না কো কিছু

('একটি কবিতা)

এমনই সব মন্ত্রের মতো মায়াঘন ও সাংকেতিক পঙ্‌ক্তিসমূহ মনে পড়ছে।

জীবনানন্দ প্রকৃতির মধ্যে শুশ্রূষা, শান্তি, ধ্যান ও রহস্য খুঁজেছেন, প্রেমের মধ্যে খুঁজেছেন নীড় ও আশ্রয়, স্বপ্ন ও আত্মগতের উদ্যান। কিন্তু উভয়তই আনুষঙ্গিকভাবে জড়িয়ে আছে Morbidity অর্থাৎ ক্ষয় ও বিষণ্ণতা, অপসরণ ও অনুতাপ, বিকৃতি ও আত্মহননের উপাদান। দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী সময়ে জাত কবিতার এইগুলি হল পূর্ব পূর্ব কবিতার থেকে ভিন্ন ধরনের অথবা কিছু বাড়তি বৈশিষ্ট্য। পাঠক জীবনানন্দের 'হায় চিল' পড়ে দেখুন তাহলে একথার তাৎপর্য পারবেন।

হায় চিল সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর উড়ে উড়ে কেঁদো নাকো ধানসিড়ি নদীটির পাশে
তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে!
পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে ;
আবার তাহারে কেন ডেকে আন? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে
বেদনা জাগাতে ভালোবাসে।
হায় চিল, সোনালি ডানার চিল এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর উড়ে উড়ে কেঁদো নাকো ধানসিড়ি নদীটির পাশে

(হায় চিল : 'বনলতা সেন')

—এ কবিতাটির মূলভিত্তি জীবনানন্দেরই প্রিয় কবি উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস-এর একটি কবিতা 'He Reproves the Curlew'

O curlew, cry no more in the air,
Or only to the water in west;
Because your crying brings to my mind
Passion-dim eyes and long heavy hair
That was shaken over my breast;
There is enough evil in the crying of the wind.

কার্লিউ এক ধরনের জলচর পাখি ; প্রেমের কবিতার পাশে অভ্রান্ত বেদনার বলয় দেখতে পাচ্ছি এবং বঙ্গীয় কবির কবিতাটির ভিন্নতর মৌলিক আবেদন লক্ষণীয়। যাহোক রবীন্দ্রউত্তর বাংলা কবিতা শিল্পলোকের উপাদান নিয়ে নতুন শিল্পলোক নির্মাণে সতত আগ্রহী। কবিকে বহুপাঠঅভিজ্ঞ হতে হবে, ইমেজিস্টদেরই এ নির্দেশ।

জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় ব্যাপকভাবে অক্ষরবৃত্ত বা মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দকেই ব্যবহার করেছিলেন কারণ এই ছন্দের অসল একঘেরে সুর তাঁর কবিতার মেজাজের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে খাপ খেয়ে গিয়েছিল, অধিকন্তু

কবিতার ভাষাকে গদ্যের ভাষার মুখের, কাছাকাছি আনার ব্যাপারে এ ছন্দের দ্বিতীয় কোনো জুড়ি নেই। আমি জীবনানন্দীয় কবিতার এই অক্ষরবৃত্ত আশ্রিত মৌলিক ভঙ্গির উদাহরণ দিচ্ছি 'বনলতা সেন' কাব্যের 'অঘ্রাণ প্রান্তরে' কবিতা থেকে—

'জানি আমি তোমার দু চোখ আজ আমাকে খোঁজে না
আর পৃথিবীর পরে—'
বলে চুপে থামলাম, কেবলই অশ্বত্থপাতা পড়ে আছে ঘাসের ভিতরে
শুকনো মিয়োনো ছেঁড়া ; —অঘ্রাণ এসেছে আজ পৃথিবীর বনে ;
সে সবের ঢের আগে আমাদের দুজনের মনে
হেমন্ত এসেছে তবু ; বললে সে, 'ঘাসের ওপরে সব বিছানো পাতার
মুখে এই নিস্তব্ধতা কেমন যে—সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার
ছড়িয়ে পড়েছে জলে'—

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যের 'বোধ' বা 'মহাপৃথিবী' কাব্যের 'আট বছর আগের একদিন'-এর সম্যক উপলব্ধিতে পাঠভিত্তিক আলোচনা—'textual Survey' জরুরি। 'বোধ' হচ্ছে কবির 'আত্মজীবনী', 'বোধ' হচ্ছে কবিপ্রতিভা যার অঙ্কুশ আহত কবির সমগ্র সত্তা। "আলো অন্ধকারে যাই—মাথার ভিতরে / স্বপ্ন নয়—কোন এক বোধ কাজ করে ! / স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়—ভালোবাসা নয়,/হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়।"—এই 'বোধ'কে বুঝতে হলে কবিতা রচনার মূল প্রক্রিয়াকে বুঝতে হবে। 'বোধ'-কে নামান্তরে 'ডেমন', 'মিউজ', 'এপিফ্যানি', 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' সবই বলা যায়। 'আট বছর আগের একদিন'কে নির্মোহ বৈজ্ঞানিকভাবে আত্মবিশ্লেষণের, আত্মঅবতারণের, আত্মের অবক্ষয়ের ও আধুনিক কবিদের প্রিয় সত্তার বিচূর্ণীকরণ বা স্কিজোফ্রেনিয়ার ভয়াবহ ভারাতুর সৃষ্টি বলা যায়। এখানে ওই যে বলা হয়েছে 'জানি তবু জানি / নারীর হৃদয়-প্রেম-শিশু-গৃহ-নয় সবখানি ; / অর্থ নয়, কীর্তি নয়, স্বচ্ছলতা নয়—/ আরো এক বিপন্ন বিস্ময় / আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে / খেলা করে / আমাদের ক্লান্ত করে / ক্লান্ত-ক্লান্ত করে' ;-এর মূল ব্যাখ্যা 'বোধ' কবিতাতেই রয়েছে। 'রক্তের অন্তর্গত বিপন্ন বিস্ময়' নামান্তরে 'বোধ', নামান্তরে প্রতিভাবহনের আশীর্বাদ অথবা অভিশাপ।

জীবনানন্দ দাশের কবিতা অবচেতনাময়, চিত্ররূপময় এইসব অভিধায় অভিহিত হয়েছে। চিত্ররূপের চমৎকার উদাহরণ 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটি। সেখানে পেঁচা, ইঁদুর ইত্যাদির চিত্রকল্পে জীবনের প্রাচীন কুহকই প্রকাশিত হয়েছে।

আমরা বেসেছি যারা অন্ধকারে দীর্ঘ শীতরাত্রিটিরে ভালো
খড়ের চালের 'পরে শুনিয়াছি মুগ্ধ রাতে ডানার সঞ্চার ;
পুরোনো পেঁচার ঘ্রাণ,—অন্ধকারে আবার সে কোথায় হারালো !
বুঝেছি শীতের রাত অপরূপ,—মাঠে মাঠে ডানা ভাসাবার
গভীর আহ্লাদে ভরা ; অশ্বত্থের ডালে ডালে ডাকিয়াছে বক ;
আমরা বুছেঝি যারা জীবনের এইসব নিভৃত কুহক
... ...
দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,

ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গোরা রূপ হয়ে ঝরেছে দুবেলা
নির্জন মাছের চোখে—পুকুরের পাড়ে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ লয়ে গেছে তারে ;

(মৃত্যুর আগে : 'ধূসর পাণ্ডুলিপি')

৯.৯ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (জন্ম ১৯০১) বুদ্ধিদীপ্ত নৈর্ব্যক্তিকতার কবি। সংকেত, চিত্রকল্প, অবচেতনা, অস্তিত্বের ভার, অবক্ষয়, নিঃসঙ্গতার বেদনা, নগরজীবনের ধূসর চেতনাপ্রবাহ এসবই তাঁর কবিতার গুণগত বিশিষ্টতা। মালার্মে ও এলিয়ট দুজনেই তাঁর আদর্শ। তীব্র ব্যক্তিগতের নৈর্ব্যক্তিক প্রকাশ অর্থাৎ লিরিকের ভিতর ক্লাসিসিজমের বস্তুগত নিরপেক্ষতা বা objectivity-র অবতারণা—এই ধাঁচটি সুধীন্দ্রনাথ এলিয়ট-এর কবিতায় দেখেছিলেন। অক্ষরবৃত্ত বা মিশ্র কলাবৃত্ত তিনি বহুলভাবে ব্যবহার করেন ; পাশাপাশি মাত্রাবৃত্ত বা কলাবৃত্তেও তিনি স্বচ্ছন্দ। বিখ্যাত 'উটপাখী' ও 'শাশ্বতী' যথামাত্রিক মাত্রাবৃত্তেই রচিত। অর্কেস্ট্রীয় বৈচিত্র্যের মধ্যে শিল্পের যে পরম হার্মনি বা ঐক্য তিনি খুঁজেছেন—তার নেপথ্যে ছিল বিটোফেন প্রভৃতির সংগীত—সেখানে তিনি অক্ষরবৃত্তের পাশাপাশি ৫, ৬ এমনকি ৭ মাত্রা মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ প্রভৃতি ব্যবহার করেন। 'মৃত্যু', কেবল মৃত্যুই ধ্রুব সখা/যাতনা, শুধুই যাতনা সূচির সাথী।' 'একলা আমি ধ্বংসাবশেষ কালের পরে—সামনে মরু অস্থিসমাকুল।' 'শান্তি-শান্তি—শান্তি চারিধারে!/কেবল অন্তর মোর ক্ষুব্ধ হাহাকারে'—এই সব উচ্চারণে রবীন্দ্রউত্তর বাংলা কবিতায় অবক্ষয় ও অস্থিরতার অনুধ্যানের পরিচয় মেলে। শেষ পঙ্‌ক্তি দুটি প্রিয় এলিয়টকে স্মরণ করায় ; এলিয়ট ও "Shantih, Shantih, Shantih" এই উপনিষদ বাক্য দিয়ে তাঁর 'Waste Land' শেষ করেছিলেন। 'অর্কেস্ট্রা' একটি দীর্ঘ কবিতা—প্রেমের কবিতা—নির্যাতিত আত্মের অস্তিত্বের শূন্যতাবোধেরও একটি ভালো দলিল।

'অর্কেস্ট্রা' কাব্যের 'শাশ্বতী' মধুর প্রেমের কবিতা। শ্রেষ্ঠ একশোটি বাংলা প্রেমের কবিতার সংকলন হলে 'শাশ্বতী'কে সেখানে রাখা যেতে পারে। প্রেমের অপসরণ, খেদ ও বেদনা, স্মৃতিবিলাস ও রতিবিলাপ সবই এখানে প্রেমের কবিতাকে, মিলনের মনস্তত্ত্বকে নেতির দিক থেকে নির্মাণ করেছে। রোমান্টিক ঐতিহ্যের বহু ধ্বংসাবশেষ বা অবলেশ এ কবিতায় বিকীর্ণ, আঙ্গিক ও চেতনায় এ কবিতা আধুনিক, কাব্যপিপাসুর মনে এর ভাষা-শ্রীময় মসৃণ নির্ভার পঙ্‌ক্তিসমূহের অনুরণন চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হয়ে যায়

স্বপ্নালু নেশা নীল তার আঁখিসম ;
সে-রোমরাজির কোমলতা ঘাসে ঘাসে ;
পুনরাবৃত্ত রসনায় প্রিয়তম ;
কিন্তু সে আজ আর কারে ভালোবাসে।
স্মৃতিপিপীলিকা তাই পুঞ্জিত করে
অমার রন্ধ্রে মৃত মাধুরীর কণা ;
সে ভুলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে
আমি ভুলিব না, আমি কভু ভুলিব না।।

দেহের পরাজয়, কিন্তু আত্মার জয়ই এখানে প্রধান বর্ণিত বিষয়। রবীন্দ্রঐতিহ্য ভেঙেই কবিতার নূতন উত্তরাধিকার এখানে।

'উটপাখী'ও একই যণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তের আঙ্গিকে রচিত, সুধীন্দ্রনাথের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। এ কবিতা বিংশশতকীয় আধুনিকতার এক সুন্দরতম দলিল, মানব সভ্যতার মরুভূমির বলশালীর চিত্রকল্প অথবা প্রতীকের উৎসবতী ভাবভূমি। 'The Metaphysical Poets' ('Selected Essay') নামক নিবন্ধে বোদলেয়ার-এর সঙ্গে ফরাসি নাট্যকার রেসিন-এর তুলনা দিয়ে এলিয়ট লিখেছেন—'the greatest two masters of diction are also the greatest two psychologist, the most curious explorers of the soul'। 'উটপাখী' কবিতায় সুধীন্দ্রনাথকে আমরা দেখেছি এক মহান মনস্তাত্ত্বিক রূপে, আত্মার স্বরূপ সন্ধানে কৌতূহলী অভিযাত্রীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম একজন রূপে। আধুনিক কবিতায় মানুষের আত্মার এই স্বরূপ সন্ধান আত্মের গভীরে অবতরণের তীব্র সংবাদ নিয়েই এসেছে। 'উটপাখী'—এই প্রতীক চয়নে কবি তাঁর বহুমুখী আগ্রহও বুদ্ধিবাদকেই প্রকাশ করেছেন। চিত্রকল্পের Contrast বা বৈপরীত্যও এ কবিতায় কম নেই।

আমার কথা কি শুনতে পাও না তুমি ?
কেন মুখ গুঁজে আছে তবে মিছে ছলে ?
কোথায় লুকাবে ? ধূ ধূ করে মরুভূমি ;
ক্ষয়ে ক্ষয়ে ছায়া মরে গেছে পদতলে।
আজ দিগন্তে মরীচিকাও, যে নেই ;
নির্বাক নীল, নির্মম মহাকাশ।

এবং পুনশ্চ

ফাটা ডিমে আর তা দিয়ে কী ফল পাবে ?
মনস্তাপেও লাগবে না ওতো জোড়া।
অখিল ক্ষুধায় শেষে কি নিজেকে খাবে ?
কেবল শূন্যে চলবে না আগাগোড়া।

এই 'উটপাখী' কবি আত্মেরই প্রতীক, তাকে কবির আত্মেরই গভীরে খুঁজতে হবে। মরুভূমি নগরপ্রতীক ও সভ্যতা প্রতীক। মরুদ্বীপ বা মরূদ্যানকে আর্ট ও শিল্পের অবিনাশী প্রতীক বলা যায়। আর্টকে অবলম্বন করেই অবিনাশী আত্ম সর্বত্রগামী ক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচাতে চাইছে। কিন্তু এজন্য তাকে তীব্র আত্মধ্বংস ও আত্মরতির ভিতর দিয়ে যেতে হবে। বালিতে মুখ গোঁজার মতো পলায়নী মনোবৃত্তি ও ফাটা ডিমে তা দেওয়ার মতো বাসনা বৈকল্য ওই আত্মধ্বংস ও রতিরই চিত্রকল্প।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের আর একটি প্রবাদপ্রতিম কবিতা "নরক" ('ক্রন্দসী') সাংকেতিভাবে ধাঁচে গড়া, অন্ধকার, বারাঙ্গনাতুল্য রাত, কুৎসিতের অদ্ভুত প্রেতমূর্তি, ক্রিমিসেবতি শবদেহ, ক্ষয়স্তূপ, বিষধর সর্প, পেচক, বাদুড় ইত্যাদির চিত্রকল্প, বমন বিধুর বাস্তব দেহের নরকভোগের ছবি—নির্যাতিত আত্ম বা 'Tourtured self'-এর শুদ্ধ আভাস, শব-শিবা-পিশাচ ও মলের সমবায় এ কবিতায় প্রায় বোদলেয়রীয় আবহ সৃষ্টি করেছে। যন্ত্রণাই হয়ে উঠেছে একমাত্র জীবনসত্য, প্রেয়সীও হয়ে উঠেছে অমাআক্রান্ত ভয়সংকেত। দুটি বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী মানুষের জীবনসংকট ও আত্মের শূন্যতাবোধকেই এ কবিতায় কুৎসিতের নন্দনতত্ত্বে রূপায়িত করা হয়েছে। 'মানুষের মর্মে মর্মে করিছে বিরাজ / সংক্রমিত মড়কের কীট'—সভ্যতার সংকটেরই এক ভিন্ন ভাষা আশ্রিত এই ভাষ্য। এই নরক দান্তের নরকের সমান্তরাল বিংশ শতকীয় সভ্যতা ও নগরজীবনের প্রেতভূমি—অনিকেত ছিন্নমূল সংশয়বিদীর্ণ মানুষ সেখানে ঝরাপাতার মতো কাদায় মাড়িয়ে যাওয়া প্রেতের মতো এখানে ওখানে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

আর একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা 'সংবর্ত' আগাগোড়া ইমেজিস্ট কবিতার ছাঁচে ঢালা। 'গ্যেটে, হোল্টর্লিন, রিলকে, টমাস মান-এর উপন্যাস" উল্লিখনের দৃষ্টান্ত "মৃত স্পেন" ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিতে মহাযুদ্ধপট। অন্য একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা "নাম" ('অর্কেস্ট্রা') মূলত প্রেমের কবিতা।

'অভাবে তোমার / অসহ্য অধুনা মোর, ভবিষ্যৎ বন্ধ অন্ধকার / কাম্য শুধু স্থবির মরণ'

কিংবা

"তবু চায়, পরাণ মোর" তোমারেই চায়
তবু আজ প্রেতপূর্ণ ঘরে
অদম্য উদ্বেগ মোর অব্যক্তেরে অমর্যাদা করে ;
অনন্ত ক্ষতির সংজ্ঞা জপে তব ভারাক্রান্ত নাম
নাম—শুধু নাম—শুধু নাম॥

এসব পঙ্‌ক্তি কাব্যপ্রিয় মানুষদের কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরবার মতো।

৯.১০ অমিয় চক্রবর্তী

অমিয় চক্রবর্তী (জন্ম ১৯০১) রবীন্দ্রউত্তর আর একজন বিশিষ্ট কবি। সুধীন্দ্রের মতো তিনিও রবীন্দ্র সাহচর্য লাভ করেছিলেন। তাঁর 'সংগতি', 'বৃষ্টি', 'বড়োবাবুর কাছে নিবেদন', 'পিঁপড়ে', 'বৃষ্টি', 'চিরদিন', 'বিনিময়', 'য়ুনিভার্সিটি ড্রাইভ', 'ওক্লাহোমা', 'মাটি', 'শিল্প', 'উৎসব', 'যুগের পথ', 'অ্যান আর্বার', 'রাত্রি', 'দ্বীপান্তরে' ইত্যাদি কবিতা লিরিকের নিটোলতা লাভ করেছে। তিনি মানবতাবাদী, জীবনের ইতিবাচক পরিণামে বিশ্বাসী, এক উদার সার্বভৌম বিশ্ব অধিপতির প্রতি আস্থাবান, দার্শনিক চেতনায় আরূঢ় ; অন্যদিকে তিনি আবার বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর ছিন্নমূল মানুষের ভূমিকা নিয়ে নিরন্তর বহির্বিশ্বে ভ্রাম্যমান, চিত্রকল্প বা Image কে কবিতার অন্তঃসার বলে মানেন, কবিতার ভাষাকে মৌখিক ভাষার গদ্যভাষার সমীপবর্তী করে তোলনে, এলিয়ট-রিলকে অথবা আরও পূর্বতন হপকিন্স-এর প্রতি তাঁর কবিধর্মের সখ্যতা। যুদ্ধোত্তর আধুনিক বিশ্বে কবির ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি সচেতন। 'Moern Tendencies in English Literature' নামক নিজেল লেখা বই-এর ভূমিকায় এজন্যই তিনি লিখেছিলেন "The cataclysm of civilisation during periods of war, and the continuing tragedies of our age have made the poets consious of their function in a social system with which their thoughts and action are inevitably allied"। স্পষ্টত অনুভূত হয় যুদ্ধখণ্ডিত মহাপৃথিবীতে মানুষের আত্ম-অনুসন্ধানই আধুনিকতার ভূমিকা স্বরূপ এবং আধুনিক শিল্পতত্ত্বের ধারকবাহক।

'শঙ্করাভরণ' ('মাটির দেয়াল') কবিতায় প্রায় এজরা পাউন্ড-এর ধাঁচে ইমেজিজমের চিত্রকল্পবাদের প্রতিফলন তিনি ঘটিয়েছেন—"ফেলো ছায়া / ফেলো রঙ কবিতার কাঁচে" অথবা "কথা রাঙা / ঝোড়ো সূর্যের কায়া'—সংক্ষিপ্ত তথাপি তাৎপর্যপূর্ণ উচ্চারণ। পাউন্ড বলেছিলেন 'Make it new' অমিয় চক্রবর্তী ট্রেনের ধাবমান জানালা দিয়ে দেখা জীবনের চলচ্ছবি যখন ভাষায় ধরছেন তখন ভাষা ও ছবির নূতনায়ন কথাটি ভুলে যাননি। 'ধানের মড়াই, কলাগাছ, পুকুর, খিড়কিপথ ঘাসে ছাওয়া' চিরদিনের চেনা ছবি কিন্তু যখন পড়ি

শত শতাব্দীর
তরু বনশ্রী
নির্জশ মনশ্রী

তখন বুঝতে পারি আধুনিক কবির অবস্থান ঠিক কোনখানে। এই কবি রোমান্টিকতার প্রত্যাখ্যানে নয় বরং তার সঙ্গে মকীরণেই বিশ্বাসী।

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় ছবি কবিতা হয়ে ওঠে। উদাসীন নিরাসক্তি, দার্শনিক নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি, প্রেমের রক্তিম ও মৃত্যুর গেরুয়া ছবিগুলোকে যেন মৃদুভাবে চুম্বন করে চলে যায়। তাই দেখি ওড্রদেশে মালতীপাটপুরের স্টেশনে গ্রামের বুকে নিঃঝুম দুপুরে ট্রেন থামে। কলিঙ্গা মেয়ে কাঁখে শিশু, গায়ে হলুদমাখা দাঁড়িয়ে থাকে ('উৎকল') প্রেমিকার বদলে, ক্ষতিপূরণরূপে পাওয়া যাচ্ছে স্বচ্ছ পুকুর, আলোয়ভরা বলে, ফুল নোয়ানো ছায়াডাল, বেগুনি মেঘের উড়ন্ত পাল ('বিনিময়') ফাল্গুন বিকালে বৃষ্টি নামে, 'কল্পিত নগরশীর্ষে বাড়ির জটিল বোবারেখা' দেখা যায় ('বৃষ্টি') ; মাটির বুকে ছোটো পিঁপড়ে ঘুরে বেড়ায় ('পিঁপড়ে'), মধুতালে উত্তাল নৃত্যুনীল ক্যাস্টানেটে স্পন্দিত ধ্বনি বেজে ওঠে ('এস্পান্যোল'), দুপুরের লম্বা ট্রেন চলেছে অ্যান আর্বারে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পথে ('অ্যান আর্বার'), দ্বীপ গ্রেনাডিনে সিন্ধুতীরে এক নারকেল গাছ মানসীর সবুজ চুলের ঢেউএর উপমা আনে ('দ্বীপান্তরে')।

এলিয়ট দান্তে প্রসঙ্গে তাঁর বিস্তৃত ইমেজারি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, "Such figures are not merely antiquated device-rhetorical devices, but serious and practical means of making the spiritual visible" (Dante : 'Selected Essays") উপমা নয় নিছক কবিতার কলাকৌশল, তা আত্মিককে দৃশ্যগোচর করার এক আভ্যন্তর প্রক্রিয়া যার ভূমিকা গভীর গভীরতর। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা প্রসঙ্গে এই কথাটি বারবার মনে পড়ে যায়। কবির উপমা আমাদের কাছে সৌন্দর্য জগতের গভীর সংবাদ বহন করে আনে, যদিও তাদের শুরুর শিকড় বহির্জগতের আলোছায়ায় রঙিন ফেনায় ফেনায় ভেসে ক্রমাগত ঝিকিমিকি করতেই থাকে। উদাহরণ দিচ্ছি—'চিরদিন' ('পারাপার') কবিতাটি থেকে—

আমি যেন বলি, আর তুমি যেন শোনো
জীবনে-জীবনে তার শেষ নেই কোনো
দিনের কাহিনী কত, রাত চন্দ্রাবলী
মেঘ হয়, আলো হয়, কথা যাই বলি।
ঘাস ফোটে, ধান ওঠে, তারা জ্বলা রাতে
গ্রাম থেকে পাড়ি ভাঙে নদীর আঘাতে
দুঃখের আবর্তে নৌকা ডোবে, ঝড় নামে
নূতন প্রাণের বার্তা জাগে গ্রামে-গ্রামে ;
নীলান্ত আকাশে শেষ পাইনি কখনো—
আমি যেন বলি আর, তুমি যেন শোনো॥

এই প্রেমের কবিতায় জীবনের চয়ন করা চিত্রকল্পগুলি শেষপর্যন্ত সৃষ্টির রহস্যপ্রতীকে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

অমিয় চক্রবর্তী উত্তর-জীবন কেটেছিল প্রবাসে, তিনি আমেরিকার নিউ ইয়র্ক স্টেট ইউনিভার্সিটি প্রভৃতিতে অধ্যাপনাসূত্রে যুক্ত ছিলেন, বাংলা কবিতার ভূগোলকে তিনি সম্প্রসারিত করেছেন। বিদেশের ছবি স্বদেশের ছবির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, ক্রমাগত প্রমাণিত হয়েছে বিশ্ব মূলত এক। পাশাপাশি আলবার্ট সোয়াইটজার প্রভৃতির স্তুতিতে তিনি মানবতাবাদী। ভাবের দিকে তাঁর সঙ্গে অধিকন্তু মিল আছে ইম্প্রেসনিস্ট শিল্পীদের। মোনে,

রেনোয়া, পিসারো, সিজলি, সেজানে, দেগা, মানে প্রভৃতি ফরাসি শিল্পীরা তাঁদের তুলিতে ধরতে চেয়েছিলেন আলোছায়ার অনুকম্পন ও এই পরিবর্তিত পৃথিবীর মুখশ্রীকে। এই ইম্প্রেসনিস্ট চিত্র-আন্দোলনের ছায়া পড়েছে আধুনিক কবিতায় ; "...the movement which brought about a renewal not only of vision, but of the whole of modern sensibility." 'A Dictionary of Modern Painign' : Ed. Carlton Lake and Robert Maillard। অমিয় চক্রবর্তী তাঁর 'ওক্লাহোমা' কবিতায় 'রক্ত ক্রশে বিদ্ধ ক্ষণে গির্জে জ্বলে রাঙা সে তিমিরে' পঙ্‌ক্তিতে যে আলোছায়ার অনুকম্পন এঁকেছেন তা ইম্প্রেসননিস্টদের স্মৃতি আনে। আবার 'উৎসব' নামক কবিতায় যে মৃদু শৈল্পিক ছোঁয়া, কোমল ধ্বনিমন্ত্র, বাহিরে অন্তরে সহনীয় ছায়ার ভীরু সলজ্জ প্রসার কবি এঁকেছেন তাও যেন সেজানে প্রভৃতির চিত্রাবলরি প্রচ্ছদ থেকে ছিঁড়ে নেয়া।

কখনো ভেবেছ ? দূর দেশে
ক্ষুদ্র গ্রামে যেতে-আসতে মহনীয় ছায়া
নেমে আসবে দোকানের কাচে, ফুটপাথে
লুটোবে কান্নার মন্ত্র, বিশ্ববিজয়িনী
বাজবে শঙ্খ, পুষ্পবৃষ্টি ঝরবে গলিতে—
অগণ্য যাত্রীর মধ্যে প্রবাসী একজন
শুনবে স্তব্ধ বিশ্বে তার মৃদু কণ্ঠধ্বনি
এই দিনে॥ (উৎসব : 'পুষ্পিত ইমেজ')

৯.১১ প্রেমেন্দ্রে মিত্র

রবীন্দ্রউত্তর বাঙালি কবিদের অন্যতম প্রেমেন্দ্র মিত্র (জন্ম ১৯০৪) কল্লোলযুগের জনপ্রিয় কবি ও কথাসাহিত্যিক। আধুনিকতার শিল্পতত্ত্বে আলোর পাশাপাশি যে অন্ধকারের ভূমিকা আছে, জীবনকে জানতে হলে শুধু পদ্মফুল নয়, পাঁককেও যে ঘাঁটতে হবে সে কথা তাঁর সহজাত প্রজ্ঞাবলেই জানা ছিল। সাপের ফণা আর পাখিদের ডানা যে একই জীবনকবিতার এপিঠ ওপিঠ সে রকম উপলব্ধি তাঁর ঘটেছিল। একেই বলা যায় রবীন্দ্রউত্তর বাংলা কবিতায় সুন্দর ও কুৎসিতের প্রতি সমভূমিক সৃষ্টি বা কুৎসিতের নন্দনতত্ত্ব 'aesthestics of the ugly' সমালোচকের ভাষায়।

ছন্দে মেলাবে ঘৃণা পিচ্ছিল বিবরের
সরীসৃপের বিষফণা আর পাখিদের নীল মুক্তি
(সাপ : 'আধুনিক বাংলা কবিতা' ; বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত)

প্রেমেন্দ্র মিত্র দীক্ষিত সাম্যবাদী নন, কিন্তু তিনি যে বলিষ্ঠ মানবতাবাদী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর 'আমি কবি যত কামারের' মতো বিখ্যাত কবিতা নাজিম হিকমত প্রভৃতি বৈপ্লবিক কবিদের সঙ্গে তাঁর চকিত সাদৃশ্যের সংবাদ দেয়। 'আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের / মুটে মজুরের /—আমি কবি যত ইতরের !' সতর্ক সাইরেন যেকে যাওয়া বিশ্বযুদ্ধ সময়ের বিনিদ্র রাতে ও উত্তাল দিনে এ কবিতা ন্যট হামসুন-এর 'হাঙ্গার' অথবা অস্ত্রোভস্কি-র 'ইস্পাত' বাঙালির প্রিয় হয়ে উঠেছিল।

জাফরি-কাটানো জানালায় বুঝি
পড়ে জ্যোৎস্নার ছায়া
প্রিয়ার কোলেতে কাঁদে সারঙ্গা
ঘনায় নিশীথ মায়া।
দীপহীন ঘরে আধো নিমীলিত
সে-দুটি আঁখির কোলে
বুঝি দুটি ফোঁটা অশ্রুজলের
মধুর মিনতি দোলে
সে-মিনতি রাখি সময় যে হায় নাই,
বিশ্বকর্মা যেথায় মত্ত কর্মে হাজার করে
সেথা যে চারণ চাই!

(আমি কবি যত কামারের : ওই)

রোমান্টিক ঐতিহ্য ভেঙে ভেঙেই এই এক নবনির্মিতি।

কাক খুব সহজেই কবিতার পাখি হয়ে উঠল এজন্য যে রবীন্দ্রউত্তর বাংলা কবিতায় কাব্যিক ও অকাব্যিক, কোমল ও কর্কশের সহঅবস্থানই বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ালো

খাঁ খাঁ রোদ, নিস্তব্ধ দুপুর ;
আকাশ উপুড় করে ঢেলে-দেওয়া
অসীম শূন্যতা,
পৃথিবীর মাঠে আর মনে—
তারই মাঝে শুনি ডাকে
শুষ্ক কণ্ঠ কাক!

(কাক ডাকে : ওই)

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভাষা ঝকঝকে, কল্পনা সতেজ, তাঁর কোনো কোনো পঙ্‌ক্তি স্থায়ীভাবে মনে গেঁথে যায়। যেমন

নির্জন প্রান্তরে ঘুরে হঠাৎ কখন,
হয়তো পেতেও পারি পাখিদের মন।

(পাখিদের মন : ওই)

প্রেমেন্দ্রের কবিতায় রয়েছে ভূগোলচেতনা, ইতিহাসচেতনা বিজ্ঞানচেতনা। তিনি বাংলা কবিতার সীমা বাড়িয়েছেন। তাঁর 'হে-ইডি হাইডি হাই / ওই আফ্রিকা ডাকে যাই' কিংবা 'হাওয়াই দ্বীপে কখনো যাইনি / ...তবু চিনি ঘাসের ঘাঘরাপরা / ছায়াবরণ তার সুন্তরীদের' (ওই) অথবা 'বনপথে বিভীষিকাবিঘ্ন / আমাদেরও বল্লম তীক্ষ্ণ / ...রমণী ও মরণেতে ভেদ নাই' উচ্চারণের সাবলীলতা ও ঝকঝমে স্মার্টনেসে পাঠকের মনোহরণ করেছেন। এই কবিই আবার 'ফ্যান' কবিতায় পঞ্চাশের মন্বন্তরের সামাজিক দুঃখচিত্র এঁকেছেন। সমাজচেতনা প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার একটি গুণ যা নগরচেতনার সঙ্গেই যুক্ত। তাঁর কবিতা প্রসঙ্গে মার্কিন কবি—Leaves of Grass-এর রচয়িতা ওয়াল্ট হুইটম্যান-এর নাম মনে পড়া স্বাভাবিক। হুইটম্যান ছিলেন অদম্য জীবনপিপাসু,

মানুষের অমর সত্তায় বিশ্বাসী, তাই স্বভাবতই তিনি বাঙালি কবির প্রিয় হয়েছিলেন। আবার তিনি যখন বলেন 'I Sing body electric' আমি জীবন্ত বৈদ্যুতিক শরীরের গান গাই তখন কল্লোলীয় দেহবাদে দীক্ষিত পাপপুণ্যের নিরপেক্ষতায় আস্থাশীল বাঙালি কবির প্রিয় হয়ে ওঠেন।

J. M. Cohen তাঁর 'Poetry of this Age' (1908-1965) গ্রন্থে বলেছেন "Baudelaire, indeed provided a new thrill, which shocked and horrified a Paris.." বোদলেয়ার আনলেন এক নূতন চমক বা গোটা প্যারিসকে জোর ধাক্কা দিল। বুদ্ধদেব বসুও তাঁর বিখ্যাত "বন্দীর বন্দনা' কাব্যের মাধ্যমে বাঙালি পাঠকের মানসে একটা জোরালো অভিঘাত হেনেছিলেন। 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদনা, 'কালের পুতুল'র বিভিন্ন গ্রন্থাবলিতে আধুনিক কবি ও কবিতা সম্বন্ধে দিগদর্শনী আলোচনা, 'আধুনিক বাংলা কবিতা' নামক ক্রান্তিকারী গ্রন্থের সম্পাদনা, বোদলেয়ার-রিলকে ও হ্যেল্ডার্লিন-এর অনুবাদ সর্বোপরি নিজের রচিত অসংখ্য কবিতার মাধ্যমে এই কবি আধুনিক বাংলা কবিতা আন্দোলনে এক জোরালো ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি রবীন্দ্র-দীক্ষিত, পরম মেধাবী, রবীন্দ্রনাথের পর তাঁর মতো শৈল্পিক বাংলা গদ্য আর কেউ লেখেননি ; তিনিই আবার রবীন্দ্রউত্তর বাঙালি কবিদের মধ্যে কেন্দ্রীয় চরিত্র, নেতৃস্থানীয়। তাঁকে যদি আধুনিক বাংলা কবিতার জনক বলা হয়, অত্যুক্তি করা হবে না।

৯.১২ বুদ্ধদেব বসু

বিশ শতকের ইংরেজি কবিতায় পাউন্ড-এর যে অবস্থান, বিংশ শতকের বাংলা কবিতায় বুদ্ধদেব বসুর অনেকটা সেই অবস্থান। পাউন্ট এলিয়টকে আবিষ্কার করেছিলেন, জেমন জয়েস-এর তিনি সাহিত্যিক অভিভাবক ; বুদ্ধদেব বসুও জীবনানন্দ-সুধীন্দ্রনাথ-অমিয় চক্রবর্তী-বিষ্ণু দে-র মতো প্রতিভানদের আবিষ্কার করেছেন, লালন করেছেন, প্রথম মূল্যায়ন করেছেন। সমর সেন প্রভৃতি তো একান্তভাবেই তাঁর সৃষ্টি। পাউন্ড 'A Few Don't' নামক ইস্তেহারে ইমেজিস্ট তথা আধুনিক কবিতার নিয়মাবলি প্রণয়ন করেছেন ; বুদ্ধদেব বসুও 'কবিতা' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে ও তাঁর সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা'-র ভূমিকায় সে কাজটি করেছেন। ওই ঐতিহাসিক ভূমিকায় তাঁর অভিমত 'সামাজিক বিষয়, বিতর্ক, ব্যঙ্গ, মননধর্মিতা, নূতনতর বিষয়ের প্রতি উন্মুখতা যেমন আধুনিক কবিতার লক্ষণ তেমনি এর মধ্যে গীতধর্মিতা, চিত্রকল্পপ্রাধান্য, আবেগপ্রবণতাকেও উপেক্ষা করা যায় না।' তাঁর বিখ্যাত উক্তি "অর্থাৎ, এই আধুনিক কবিতা এমন কোনো পদার্থ নয় যাকে কোনো একটা চিহ্নদ্বারা অবিকলভাবে শনাক্ত করা যায়। একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের, আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি।' তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিমার পরিশীলিত গদ্যে তিনি বলেছেন—'যে সময়ে সুধীন্দ্রনাথ তাঁর নাস্তিকতার নান্দীপাঠ আরম্ভ করলেন, ঠিক সেই সময়েই অমিয় চক্রবর্তীর মুখে বিশ্বাসের নতুন অঙ্গীকার শুনতে পেলাম আমরা—'মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া আর পোড়ো বাড়িটার /ঐ ভাঙা দরজাটা মেলাবেন।' যখন সমর সেনের আপাত রোমান্টিক-বিরোধী কবিতা লুপ্ত রোমান্টিক সৌন্দর্যের জন্য হাহাকারে ভরে উঠেছে, তারই অল্প পরে সুভাষ মুখোপাধ্যায় উচ্চহাসির হাওয়া তুলে সেটাকে উড়িয়ে দিলেন বিষাদেরও অযোগ্য বলে। এমনকী বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্রনাথের নাম অনেকেই যদি একসঙ্গে উচ্চারণ করে থাকেন, আসলে এঁরা কোনো অর্থেই এক জগতের অধিবাসী নন ; 'চোরাবালি'র হালকা ঝকঝকে চালের সঙ্গে 'অর্কেস্ট্রা'র নিবিড় গভীর বাক্যবন্ধের কিছু সাদৃশ্য নেই, আর এ দুজনের ধ্যানধারণায় মৌলিক ব্যবধানও ক্রমশ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে।' 'বন্দীর বন্দানা'কে কেউ কেউ বলেছিলেন বিদ্রোহের কাব্য, কিন্তু 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে রয়েছে বিদ্রোহ নয়, 'স্বপ্নের হাতে আত্মসমর্পণের আকূতি' তাও তিনি লক্ষ করছেন।

'দময়ন্তী' কাব্যের পরিশিষ্টে বুদ্ধদেব বসু ঘোষণা করেছিলেন, কথ্যভাষায় বাক্যরীতি উল্লঙ্ঘিত হবে না ; সাধুভাষার ক্রিয়াপদ চলবে না ; মম যবে, সনে প্রভৃতি কাব্যিক পদ বর্জিত হবে ইত্যাদি। বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় আবেগ ও মননশীলতা সমান মর্যাদা পেয়েছে। নিজেই বলেছেন 'আজীবন শুধু একটি কবিতা লিখেছি, সে কবিতা ভালোবাসার কবিতা।' এই ভালোবাসা কবিতার প্রতি, শিল্পের প্রতি, সাহিত্যের প্রতি, ভাষার প্রতি, গ্রন্থের প্রতি, লেখার প্রতি, নারীর প্রতি। তাঁর কবিতার নমুনা হিসেবে পেশ করিছ 'শেষের রাত্রি' নামক অলৌকিক প্রেমের কবিতার প্রথম স্তবকটি, শেলিতুল্য লিরিক উচ্চতাকে এখানে তিনি আধুনিকতার শিল্পতত্ত্বের আয়নায় প্রতিফলিত করেছেন।

পৃথিবীর শেষ সীমা যেইখানে, চারদিকে খানি আকাশ ফাঁকা,
আকাশের মুখে ঘুরে-ঘুরে যায় হাজার-হাজার তারার চাকা,
যোজনের পর হাজার যোজন বিশাল আঁধারে পৃথিবী ঢাকা।
(তোমারি চুলের মতো ঘন কালো অন্ধকার,
তোমারি আঁখির তারকার মতো অন্ধকার ;
তবু চলে এসো ; মোর হাতে হাত দাও তোমার—
কঙ্কা, শঙ্কা কোরো না।)

৯.১৩ বিষ্ণু দে

বিষ্ণু দে (জন্ম ১৯০৮) সুররিয়েলিজম থেকে যাত্রা শুরু করে মার্কসবাদে পৌঁছেছিলেন। এলিয়ট তাঁর প্রিয় কবি। পল এলুয়ার, লুই আরাগঁ ও গারথিয়া ফেদেরিকো লোরকা তাঁর সমানধর্মা কবি। বিষ্ণু দে-র মতে আধুনিক কবির জীবনসমস্যা শুধু তাঁর ব্যক্তিত্বসংশ্লিষ্ট নয় তা একাধারে আবহমানের ইতিহাসগত সমস্যারও অন্তর্গত। দ্রষ্টব্য 'বাংলা সাহিত্যে প্রগতি : সাহিত্যর ভবিষ্যৎ'। স্বভাবতই বিষ্ণু দে-র কবিতায় ঐতিহ্য ভাবনা পাচ্ছি। অন্যদিকে নগরচিত্র তাঁর কবিতার একটি বিশাল বৈশিষ্ট্য। বিষ্ণু দে-র কবিতা থেকে নগরচিত্রের উদাহরণ দিচ্ছি :

সন্ধ্যার ধোঁয়ার মুষ্টি উঠে আসে সুচতুর
রুদ্ধ করে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস
বাষ্পগন্ধ স্পঞ্জ হাতে।
... ...
লোক যায়
পথে পথে লোকেদের ভিড়,
... .
অগণন ভিড়ক্রান্ত এ শহরে, হে শহর স্বপ্নভারাতুর !
লেক আর খালপার, এসপ্ল্যান্ডে আর চিৎপুর

(জন্মাষ্টমী : 'পূর্বলেখ')

আধুনিক কবিতার একটি কলাকৌশল হল juxtaposition—দুটি বিষম ভাবকে তুলনায় সমাহৃত করা।

এটা জন ডন করেছিলেন, পাউন্ডও করতেন। চিত্রকল্প কখনো কখনো এভাবেই তৈরি হয়। বিষ্ণু দে-র কবিতা থেকে অনুরূপ চিত্রকল্পের উদাহরণ দিচ্ছি!

হে শ্বেতকরবী তুলনা তোমার নেই
চয়নিকা তুমি হাজার মুখের ভিড়ে

('ছত্তিশগড়ী গান')

বিষ্ণু দে বুদ্ধিদীপ্ত কবি, এ ধরনের কবি পড়াশোনা করেই কবিতা লেখেন। পাঠ থেকে স্বচ্ছন্দে উপাদান আহরণ করেন। পদে পদে Alusion বা উল্লিখনের ব্যবহার করেন। এলিয়ট উল্লিখনে আকীর্ণ। বিষ্ণু দে-র কবিতা পড়তে গেলে আমরাও মুহুর্মুহু—ক্রেসিডা, কাসান্ড্রা, আর্টেমিস, উর্বশী, উমা, এলসিনোরে, ভিলানেল, সাফো ইত্যাদি উল্লিখনের সম্মুখীন হই। অর্থাৎ এক কথায় পাঠক হিসেবে আমাদেরও পূর্ব-প্রস্তুতি নিয়ে আসতে হয়।

ক্রেসিডা! তোমার থমকানো চোকে চমকায় বরাভয়।
তোমার বাহুতে অনন্ত-স্মতি ক্রতুকৃতমের শেষ
তোমাতেই করি মত্ত মরণে জয়।

(ক্রেসিডা : 'আধুনিক বাংলা কবিতা')

বলাবাহুল্য হোমার-এর ইলিয়াড থেকে ভারতবর্ষীয় উপনিষদ পর্যন্ত পাঠঅভ্যাস না থাকলে এ কবিতাকে দুর্বোধ্য মনে হতে পারে। 'ক্রেসিডা' মূলত প্রেমের কবিতা, কবিতার আবহ উৎপাদনে বুদ্ধিবাদ উল্লিখনের প্রয়োগে অবশ্যই ফলপ্রসু।

বিষ্ণু দে-র কবিতায় সুররিয়েলিস্ট ধাঁচ আছে। স্বপ্ন, অবচেতনা, স্বতঃস্ফূর্ত লেখনী 'ঘোড়সওয়ার'-এর মতো কবিতায় পূর্ণস্বাক্ষর রেখেছে। ফ্রয়েড বলেছেন স্বপ্নের অর্থ ইচ্ছাপূরণ, 'ঘোড়সওয়ার'-এ তা রয়েছে। কল্পনা যুক্তিবাদকে অতিক্রম করে অগ্রসর হয়েছে, চিন্তাক্রিয়ার ধাপগুলি সচেতনভাবেই মাঝে মধ্যে অদৃশ্য করে দেওয়া হয়েছে। এভাবেই রচিত হয়েছে নূতন কবিতার ভাবশরীর

পাহাড় এখানে হালকা হাওয়ায় বোনে
হিমশিলাপাত ঝঞ্ঝার আশা মনে।
আমার কামনা ছায়ামূর্তির বেশে
পায়ে-পায়ে চলে তোমার শরীর ঘেঁষে
কাঁপে তনুবায়ু কামনায় থরোথরো।
কামনার টানে সংহত গ্লেসিআর।
হালকা হাওয়ায় হৃদয় আমার ধরো,
হে দূর দেশের বিশ্ববিজয়ী ঘোড়সওয়ার!

(ঘোড়সওয়ার : 'আধুনিক বাংলা কবিতা')

'ঘোরসওয়ার' প্রেমের কবিতা এবং সমাজ-চেতনার কবিতা। 'ঘোড়সওয়ার' প্রেমের প্রতীক এবং সমাজ বিপ্লবেরও প্রতীক।

'অন্বিষ্ট, 'সন্দীপের চর', 'সাতভাই চম্পা' প্রভৃতি কাব্য থেকে বিষ্ণু দে দস্তুরমতো সমাজসচেতন কবি হয়ে উঠলেন। "The History of all hitherto existing society is the history of the class struggles."—কার্ল মার্সস-এর কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো-র এই প্রাথমিক বাক্য, সমাজের ইতিহাস শ্রেণিসংঘর্ষের ইতিহাস, বিষ্ণু দে-ও মান্য করেছিলেন। কবির সুখ ও সমাজের সুখ সমার্থক এ তত্ত্বে পল এলুয়ার-এর মতো বিষ্ণু দে-ও বিশ্বাসী হলেন। আবার লুই আরগঁ-র মতো দেশদুঃখ তাঁর সংকীর্তনের বিষয় হয়ে উঠল, এই দুঃখভোগ থেকেই বিপ্লবের উদয়। শুধু জীবনকে বদলানো নয়, জগৎকে বদলানোর জন্যও সাম্যবাদী করিবার আগ্রহী হয়ে উঠলেন। বিষ্ণু দে-ও এঁদেরই অন্যতম। আরাগঁ একটি কবিতায় লিখেছিলেন, তুমি কি আমার বিষণ্ণ স্বপ্ন দেখায় মগ্ন প্রিয়াকে দেখেছ! এই বিষণ্ণতা স্বদেশ বেদনার কারণে। এই স্বপ্ন বিপ্লবের। বিষ্ণু দে-ও তাঁর প্রিয়ার গলায় বিষাদ ও স্বপ্নের যুগল বুননের সোনার মণিহার পরিয়ে দেন :

মরণ মানে শরণ যার, দেহ দূর-পূর্ণিমা।
মরণে হানো পূর্ণতার নীলিম তরবারে,
সঙ্গীহীন রাত্রি পায় যেখানে তার সীমা
সেই অগম আঁধারে হানো রূপালি খরতারে
ভীরু হৃদয়ে ঝলকে ওঠে কৈলাসের দ্যুতি
আত্মহনন হিংসা দেখা ভবিষ্যতে মৃত—
সেখানে শুধু মৈত্রী আর ঐক্য ভরে শ্রুতি।
নীলিমা! তুমি নীলকণ্ঠ উজ্জীবনে বৃত।
প্রতীক হল মরণজয়ী সমাজে পূর্ণিমা!

(কোডা : 'সাত ভাই চম্পা')

৯.১৪ উপসংহার

রবীন্দ্রউত্তর বাংলা কবিতার আলোচনায় সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ প্রভৃতি নামও উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি রয়েছেন বাংলাদেশের কবিরা। লাক্ষণিক বিচারে এঁরাও রবীন্দ্রউত্তর এবং আধুনিক। এঁদের মধ্যে প্রধান হলেন শামসুর রহমান এবং আল মাহমুদ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার ভিতর দিয়ে বাংলা কবিতার আন্দোলন নূতন বাঁক নিল। এই প্রবাহের শ্রেষ্ঠ কবি শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়।

৯.৮ কবিতা বিশ্লেষণ : বোধ

'বোধ' জীবনানন্দের গোড়ার দিকে লেখা একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। 'বোধ', 'অবসরের গান', 'ক্যাম্পে', 'হাওয়ার রাত', 'নগ্ন নির্জন হাত', 'শিকার', 'আট বছর আগের একদিন'—এইসব দীর্ঘ কবিতা বাংলা কাব্যে এক নতুন অসামান্যতা নিয়ে এসেছিল। 'প্রগতি' পত্রিকার ১৯২৯ সালের অগাস্ট সংখ্যায় এই কবিতাটি প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই কবিতাটি তার আপাত দুর্বোধ্যতা ও অর্থহীনতার (absurdity) কারণে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সমালোচকেরা এরা বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

৯.৮.১ 'বোধ'-এর নানা অনুষঙ্গ

'বোধ' শব্দটির সঙ্গে 'বোধি' শব্দটির যোগ আছে। চেতনা, সচেতনতা, অনুপ্রেরণা, আলোকিত প্রত্যয় এমনই নানা অর্থ এই শব্দ দুটির অনুষঙ্গে জড়িয়ে আছে। এই অনুভূতি কোনো প্রেম শান্তি, স্বপ্নের আরামের অনুভূতি নয়। এই বোধ যখন একবার কোনো ব্যক্তিকে আক্রমণ করে, তার ঘাড়ের উপর চেপে বসে, তার হৃদয় ও মনকে অধিগত করে তখন সে আর তার সহমানুষদের মতো থাকে না। সাধারণ মানুষের মতো ব্যবহার সে আর করতে পারে না, তার আচার আচরণ পালটে যায়। যখন সে অন্য মানুষদের মধ্যে থাকে তখনও সে নিজকে একা অনুভব করে।

আলো-অন্ধকারে যাই—মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয় কোন এক বোধ কাজ করে,
স্বপ্ন নয়-শান্তি নয়-ভালোবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোঝ জন্ম-লয়,
আমি তারে পারি না এড়াতে,

এবং

সহজ লোকের মত কে চলিতে পারে !
কে থামিতে পারে এই আলোর আঁধারে
সহজ লোকের মতো ; তাদের মতন ভাষা কথা
কে বলিতে পারে আর ;

৯.৮.২ 'বোধ' সৃষ্টির প্রেরণা

প্রাথমিক এই দুটি উচ্চারণে কবি তাঁর অভিনব অভিজ্ঞতা ও অস্তিত্বের সংকটের কথা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর এই অর্জিত 'বোধের' বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা যায়, একে বলা যায় সৃষ্টির বেদনা, কবির কবিতারচনার প্রাকমুহূর্তের অনুভূতি, এক ভয়াবহ কামনা সুতীব্র পিপাসা সৌন্দর্য রচনার তাগিদে যা শেষপর্যন্ত কবির আত্মকে ছিন্নভিন্ন বিপর্যস্ত করে দেয়, পৌঁছে দেয় এক মৃত্যুর সঙ্গে তুলনীয় প্রতীতিতে। 'বোধ' হচ্ছে কবিপ্রেরণারই নামান্তর অথবা পরিপূরক, এক তীব্র দুর্বোধ্য অসন্তোষের মুহূর্ত বা লগ্নকাল—জীবনের পরিচিত বাস্তবের অর্থ বদলে দেওয়ার কাজে সে সহায়ক। এভাবেই রচিত হয় কবিতার কথাশিল্প। আবার 'বোধ'-কে মনে হতে পারে বর্তমান সময়ের এক অদ্ভুত মনোরোগ, স্নায়বিক বিকার বা উদ্বায়ু চেতনা—শাহরিক যান্ত্রিক সভ্যতায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীমাত্রেই যার শিকার। বলাবাহুল্য 'বোধের' এইসব বিভিন্ন অর্থ পরস্পরযুক্ত। এককথায় বোধ হচ্ছে এক মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা, প্রেরণা থেকে উন্মত্ততার বিভিন্ন পর্যায়ে যার যাতায়াত। কবি আত্মআবিষ্কারের জন্যই এই বোধের সয-লালন প্রয়োজন, বোদলেয়ার, র‍্যাঁবো, জীবনানন্দের মতো কবিরা এভাবেই ভেবেছেন। বোদলেয়ার আলবাট্রস পাখির সঙ্গে কবির তুলনা দিয়েছেন। আলবাট্রস মেঘলোকের সম্রাট কিন্তু যখন জাহাজের নাবিকেরা তাকে ধরে সে পাটাতনে মুখ থুবড়ে চলে, ডানা হেঁচড়ে হেঁচড়ে তার চলা অতীব করুণ। কবিও তেমনই কল্পনার জগতে সার্বভৌম হলেও বাস্তবের জগতে অক্ষম অসহায়। 'বোধ' তাঁকে বাস্তবের কাছ থেকে ছিঁড়ে কল্পনার কাছে নিয়ে যেতে সাহায্য করে, বোধ হচ্ছে কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যবর্তী ধাপ অথবা যোজক, বোধকে বলতে পারি স্বয়ং প্রেরণা অথবা প্রেরণার সহোদরা।

এই বোধ হচ্ছে কবির নিজস্ব নিয়তি তার হাত এড়ানো অসম্ভব। তারই জন্য সাধারণ মানুষের মতো আর তিনি নেই। শরীরের 'স্বাদ জেনে জীবনের বীজ বুনে চাষির মতো ফসলের বীজ বুনে লোকভাষায় কথা বলে তাঁর আর দিন কাটে না। তিনি যেন এক দুরূহ অগ্নির সন্ধান পেয়েছেন। সে আগুন তাঁকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারে।

পথে চলে পারে—পারাপারে
উপেক্ষা করিতে চাই তারে ;
মড়ার খুলির মতো ধ'রে
আছাড় মারিতে চাই, জীবন্ত মাথার মতো ঘোরে
তবু সে মাথার চারিপাশে,
তবু সে চোখের চারিপাশে,
তবু সে বুকের চারিপাশে ;
আমি চলি সাথে সাথে সেও চলে আসে।

—এই অদ্ভুত সুন্দর পঙ্‌ক্তিগুলিতে জীবনানন্দ তাঁর অপূর্ব জীবনসংকটকে তুলে ধরেছেন। আসলে এই 'বোধ' তাঁকে তাড়না করছে সৌন্দর্যরচনার জন্য।

৯.৮.৩ বোধ ও মানসিক ক্লান্তি

কবিশিল্পীর এই অদ্ভুত স্বেচ্ছাআরোপিত উন্মত্ততার কথা পূর্ববর্তী অনেক কবিশিল্পীই বলে গেছেন। বোদলেয়ার Spleen ও Ennui নামক জীবনের দুই অদ্ভুত আদিব্যাধির কথা বলেছেন। স্প্লিন হচ্ছে এক ধরনের শারীরিক বৈকল্য ও তার থেকে জাত বিষাদ, নিরুৎসাহ, খেদ প্রভৃতি। এনুয়ি হচ্ছে মানসিক ক্লান্তি—নির্বেদ, একঘেয়েমি প্রভৃতি। এই দুই ব্যাধি কবির। এই দুই-এ মিলে তৈরি হয়েছে এক ভয়াবহ অবয়বহীন আত্মিক দৈহিক যন্ত্রণা। কবিতার উদ্‌গতিও এই যন্ত্রণার মধ্য থেকে। সৌন্দর্যকে অনুসন্ধানের প্রবল প্রবৃত্তিও এখান থেকেই আসে। বোদলেয়ার-শিষ্য র‍্যাঁবো তাঁর বিখ্যাত পত্রে বলেছেন, অজানাকে জানতে হবে সর্ব ইন্দ্রিয়ের বিপর্যয়সাধন দ্বারা। বোধ হচ্ছে কবির সেই পরীক্ষানিরীক্ষার পরিচয়বহ, তখন তিনি ইচ্ছে করে যেন অবতীর্ণ হয়েছেন এক ভয়াবহ দুরারোগ্য রোগী অথবা পঙ্গুর ভূমিকায়। সেই ভীষণ অক্ষমতার ছবি জীবনানন্দ এঁকেছেন—

সকল লোকের মাঝে বসে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা ?
আমার চোখেই শুধু ধাঁধা ?

৯.৮.৪ বোধ : সাধারণ মানুষের থেকে বিচ্ছিন্নতা

অতঃপর স্বভাবতই কবিকে বরণ করে নিতে হয় এক সমাজবিবিক্তের জীবনধারা। আধুনিক কবিতায় আমরা পাই কথাশিল্পীর এই নিঃসঙ্গতার তত্ত্ব— 'alienation' নামে যাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। কবি যেন অস্বাভাবিক নিজের Manuerism বা মুদ্রাদোষের কারণে ; যে সব সমাজের স্বাভাবিক মানুষ দাম্পত্য-সন্তানউৎপাদন-জীবিকা ইত্যাদিতে ব্যাপ্ত তাদের থেকে তিনি যে আলাদা সেটা বুঝতে পারছেন। একটা অপরাবোধ তাঁর মধ্যে যেন জন্মাচ্ছে। প্রশ্ন জেগেছে তিনি কি অসামাজিক, দায়িত্বহীন অথবা উন্মাদ ?

তাদের হৃদয় আর মাথার মতন
আমার হৃদয় নাকি ? তাহাদের মন
আমার মনের মতন না কি ?
—তবু কেন এমন একাকী ?
তবু আমি এখন একাকী।

'তাদের' অর্থাৎ সহজ সামাজিক মানুষদের।

'কবিতার কথা' গ্রন্থের নামপ্রবন্ধটি জীবনানন্দ একটি বিখ্যাত বাক্য দিয়ে শুরু করেছেন—'সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি', এই প্রবন্ধটিই শেষ হচ্ছে আর একটি স্বল্পপরিচিত কিন্তু অমোঘ উক্তিতে—'তার প্রতিভার কাছে কবিকে বিশ্বস্ত থাকতে হবে।' 'বোধ' কবিতায় কবির সেই নিজস্ব প্রতিভার কাছে বিশ্বস্ত হওয়ার সংবাদ আছে। এ কবিতায় কবির স্বআরোপিত স্বেচ্ছাকৃত যন্ত্রণাবরণের খবর আছে, আছে তার সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার রহস্যময় নেপথ্যের সানুপুঙ্খ বিবরণ এক নিপুণ মনস্তাত্ত্বিকের ভঙ্গিতে।

একদিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে তাদের মতো হয়ে থেকে চাষবাস-মাছধরা ইত্যাদি সাধারণ জীবনকাজের পরিচয় জানার ইচ্ছা, অন্যদিকে বাতাসের মতো অবাধ জীবনলাভ ও নক্ষত্রের তলে ঘুমোনোর মতো অলৌকিক সাধ এ দুই-এর টানাপোড়েনে কবি শেষপর্যন্ত দ্বিতীয়ের দিকে চলে গেলেন। এমনকী নারীর সঙ্গে সম্পর্কেও তিনি দেখলেন ঘৃণাভালোবাসাময় এক সম্পর্কের প্রতিক্ষরণ—

ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
অবহেলা করে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
ঘৃণা করে দেখিয়াছি মেয়েমোনুষেরে ;

এই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তিত্রয়ে জীবনানন্দের কবিতায় কখনো কখনো নারীর সঙ্গে কবির জটিল সম্পর্কের কথা আছে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নারী সবসময় শান্তি ও সান্ত্বনা অথবা নতুন-দেশ আবিষ্কারে প্ররোচিত করে এমন নয়, সে কখনো কখনো নিয়ে আসে হিংসা-প্রতিশোধন-হনন ও আত্মহননের বিবিধ অনুষঙ্গ। 'শব' কবিতায় মৃণালিনী ঘোষালের শব সেই morbidity বা অস্বভাবের কথা বলেছে যেমন ব্রাউনিং তাঁর "Porphyria's Lover" কবিতায় প্রেমিকের হাতে এক প্রেমিকার হত্যা বিবরণ দিয়েছিলেন। নারীপ্রেম ও নারীঘৃণা দুই-ই জীবনানন্দে ছিল, একটি কবিতায় তিনি বলেছেন, নারীর দেহ স্থূল হাতে ক্রমাগত ব্যবহৃত হতে হতে শুয়োরের মাংস হয়ে গেছে।

নক্ষত্রের দোষ

আমার প্রেমের পথে বারবার দিয়ে গেছে বাধা

—কবির এই খেদ তাঁর নির্যাতিত আত্মের কথাই মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু এই নির্যাতিত আত্মই আবার কবিতার উৎসভূমি, 'বোধ'-এর রচয়িতা শিল্পী।

অতএব জীবনানন্দকে লিখতে হল তাঁর অবিস্মরণীয় পঙ্‌ক্তিরাজি—

মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়—প্রেম নয়—কোনো এক বোধ কাজ করে
....

বলি আমি এই হৃদয়েরে
সে কেন জলের মত ঘুরে ঘুরে একা কথা কয় ?

এই একমুখী তীব্রতাতেই কবিতার জন্ম ; বোধ সেই একমুখী তীব্রতার দিকে কোনো কোনো নিয়তি-আদিষ্ট মানুষকে নিয়ে যায়। সে মানুষ আর শান্তি চাইবে না, অন্য মানুষের মুখ দেখবে না, মানুষীর পাশে শুয়ে ঘুমোবে না, শিশুদের জন্মের আয়োজন করবে না।

৯.৮.৫ উপসংহার

এই বোধ, জীবনের এই অগাধ স্বাদ, পৃথিবীর চেনা পথ ছেড়ে নক্ষত্রের অচেনা পথ পরিক্রমার স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত আক্রান্ত মানুষটিকে নারী-পুরুষ-শিশুদের কাছ থেকে প্রাত্যহিকের নিশ্চিন্ত আরামের বৃত্ত থেকে এক ভয়াবহ ব্যাধির কাছে নিয়ে গেল। বোদলেয়ার এই ভয়াবহ ব্যাধির নামকরণ করেছিলেন Spleen ও Ennui—প্লীহা ও নির্বেদ, এডগার অ্যালান পো 'Raven' কবিতায় এই ব্যাধির ঘোরেই বলেছিলেন 'তাকে আর কখনো পাবে না' : 'nevermore'; আর বঙ্গাদেশের কবি তার নাম দিয়েছেন 'বোধ'। যার মস্তিষ্কে বোদের জন্ম হয়েছে সে ব্যাপৃত হয়েছে কুৎসিতের নন্দনতত্ত্ব রচনায়—সুন্দরের পাশে কুৎসিতকে স্থাপন করে আধুনিকতার নতুন সংজ্ঞা রচনায় তার কবিতার কাল কেটে গেছে।

অসাধারণ কিছু অন্তিম পঙ্‌ক্তিতে 'বোধ' কবিতায় সেই সবার সেরা কুৎসিতের বাণীবন্ধন আছে

চোখে কালো শিরার অসুখ,
কানে সেই বধিরতা আছে
যেই কুঁজ—গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে
নষ্ট শশা—পচা চালকুমড়ার ছাঁচে,
যে সব হৃদয়ে ফলিয়াছে
—সেই সব।

বাংলা কবিতায় 'spleen' বা শারীরিক অক্ষমতার এমন বর্ণনা আর নেই। এই পঙ্‌ক্তিগুলি একই সঙ্গে জুগুপ্সা উদ্রেক করে এবং নিয়ে যায় শিল্পের অমর্ত্যলোকে।

বোদলেয়ার-এর কবিতার মতো আমরা 'বোধ' কবিতার কুৎসিতের নন্দনতত্ত্ব দেখি (aesthetic of the ugly) যার অর্থ অসুন্দরের ভিতর থেকে সুন্দর এবং শিল্পকে আকর্ষণ করে নেওয়া।....এই বোধের সম্প্রসারণ পাই 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায়। এই বোধ আছে বলেই প্রেম, বিত্ত সব কিছু থাকা সত্ত্বেও মানুষ আত্মঘআতী হতে চায়।

৯.৯.১ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা : শাশ্বতী

২৭ আগস্ট, ১৯৩১-এ রচিত 'অর্কেস্ট্রা' কাব্যের অন্তর্গত 'শাশ্বতী' কবিতাটি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের একটি সেরা কবিতা, এর বহু পঙ্‌ক্তি কাব্যামোদীর কণ্ঠে কণ্ঠে ফেরে। যন্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তে রচিত এই কবিতাটির আবেগ-শরীর ও শব্দবিন্যাস পরীক্ষা করলে বোঝা যায় প্রেরণা-উদ্বেলিত এক দুর্লভ মুহূর্তের সৃষ্টি এই কবিতাটি ; যদিও ভাবলে অবাক লাগে প্রেরণা নয় পরিশ্রমই এই কবি জীবনের শিরোধার্য বলে মনে করতেন। বুদ্ধদেব বসু পর্যন্ত লক্ষ করেছেন, প্রেরণার বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান পৌনঃপুনিক। 'ইয়োরোপ থেকে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের সবচেয়ে সৃষ্টিশীল পর্যায় আরম্ভ হ'ল, তার অপর সীমা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাত। ১৯৩০ থেকে

১৯৪০, এই দশ বৎসর তাঁর অধিকাংশ প্রধান রচনার জন্মকাল : প্রায় সমগ্র 'অর্কেস্ট্রা', 'ক্রন্দসী' ও 'উত্তরফাল্গুনী' প্রায় সমগ্র 'সংবর্ত', সমগ্র কাব্য ও গদ্য অনুবাদ, 'স্বগত', 'কুলায়' ও 'কালপুরুষে'র প্রবন্ধাবলি—সব এই একটিমাত্র দশকের মধ্যে তিনি পরিসমাপ্ত করেন।' (সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ ; বুদ্ধদেব বসু কৃত ভূমিকা) 'শাশ্বতী' কবিতাটি যার অন্তর্ভুক্ত সেই সময় চক্র এবং সেইসময় উদ্‌গত অন্য রচনাবলির খোঁজ আলোচ্য উদ্ধৃতিটি থেকে পাওয়া যাচ্ছে।

৯.৯.২ 'শাশ্বতী' কবিতায় বিগত প্রেমের স্মৃতি

মার্সেল প্রুস্ত-এর বিখ্যাত উপন্যাসে রয়েছে স্মৃতির প্রগাঢ় আলোড়ন ও রূপমূর্তি রচনা, আর 'শাশ্বতী' কবিতাটিতে রয়েছে অপসৃত প্রেমের চলে যাওয়া পদধ্বনি গোনা—দীর্ঘনিঃশ্বাস ও স্মৃতিভার গেঁথে গেঁথে আকাঙ্ক্ষার এক সুললিত ও বেদনাময় সাঁকো রচনা। পাঠক যখন 'শাশ্বতী' কবিতাটি পড়তে শুরু করে তখনই সে বুঝতে পারে রোমান্টিক কবিতার শেষ যেখানে, সেখান থেকেই এই কবিতাটির যাত্রা শুরু। রোমান্টিকতার আকীর্ণ ধ্বংসাবশেষের ভিতর থেকে টুকরো টুকরো উদ্দীপনা আহণ করেই কবি এ কবিতাটির অবয়ব সাজিয়েছেন, যদিও তাঁর অভীষ্ট যাত্রা আধুনিকতার শিল্পতত্ত্বেরই দিকে।

শ্রান্ত বরষা, অবেলার অবসরে
প্রাঙ্গণে মেলে দিয়েছে শ্যামল কায়া ;
স্বর্ণসুযোগে লুকাচুরি-খেলা করে
গগনে গগনে পলাতক আলোছায়া।
আগত শরৎ অগোচর প্রতিবেশে
হানে মৃদঙ্গা বাতাসে প্রতিধ্বনি ;
মূক প্রতীক্ষা সমাপ্ত অবশেষে
মাঠে, ঘাটে, বাটে আরব্ধ আগমনী।

এখানে প্রায় যেন রবীন্দ্রনাথের 'শরৎ, তোমার আলোর অঞ্জলি' কিম্বা 'আমার নয়নভুলানো এলে'-রই আবহ মনে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু পরে কবিতার পরিসমাপ্তিতে সূক্ষ্মবিচারে প্রতিপন্ন হয় এখানে শরৎপ্রশস্তি নয় বরং বেদনার সমাধিতে ধ্বংসস্তূপে পর্যবসিত শরতের মৃত্যুগাথাই যেন ভিতরে ভিতরে উদ্‌গীত হচ্ছে ; চলে যাওয়া প্রেম, অবসন্ন শরৎ—সব মিলিমিশে এ কবিতায় এক বিষণ্ণ অনুকম্পন জাগিয়ে তুলছে।

মৃদঙ্গা, আগমনী, কৌমুদীজাগর, শেফালিশেজ ইত্যাদি শব্দের ব্যবহারে যে শরৎ ঋতুর সোহাগ ও আনন্দের বার্তা ঘোষিত হচ্ছে অবিলম্বে তারই প্রতিস্পর্ধীরূপে স্থাপিত হয়েছে পশ্চাৎ, মলিন ইত্যাদি নেতিমূলক শব্দব্যূহ। প্রেমিকার অন্তর্ধানে প্রেমিকহৃদয়ের বেদনাবর্ণিনুল অন্ধভূতির এমন এক রক্তাক্ত আলপনা কবি রচনা করতে যাচ্ছেন যেখানে সংকট, অস্তিত্বের ভার, সমাজ বিবিক্তের নৈঃসঙ্গ্য, হতাশের বিদ্রোহ সবই ভিতরে ভিতরে যেন প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকবে।

পশ্চাতে চায় আমারই উদার আঁখি ;
একবেণী হিয়া ছাড়ে না মলিন কাঁথা॥

এই উচ্চারণে এক গভীর প্রেমের ট্র্যাজেডিই সংকেতিত হচ্ছে, প্রচণ্ড পিছুটান ও ধ্বস্তপ্রণয়রে হুতাশ মৃত্যুশয্যা বিশদ হয়ে উঠছে। এ কবিতায় রয়েছে মিলনের পুনর্নির্মাণ, প্রিয়ামিলনের ফ্যানটাসি বা স্বপ্নবার্তাবুনন ; বাইরের

দিক থেকে দেখলে মনে হয় এর অন্তঃসারে রয়েছে এক শেলতীব্র যন্ত্রণার লবণতিক্ত অনুরণন ও তাকে অতিক্রম করে যাওয়ার স্পর্ধা অথবা এক কবিসত্তার শুশ্রূষার তটভূমিতে পৌঁছানোর একান্ত ব্যক্তিগত প্রয়াস।

৯.৯.৩ হাইনে ও সুধীন্দ্রনাথ

'শাশ্বতী' কবিতাটিতে পড়তে গেলে অনিবার্যভাবে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের হাইনে-সংসর্গের কথা মনে পড়ে যায়। জার্মান কবি হাইনরিশ হাইনে-র কবিতায় ব্যর্থ প্রেমের স্মৃতি এক বিক্ষুব্ধ আলোড়ন তুলেছে। অন্যদিকে সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় এক প্রণয়ভঙ্গের বেদনা ও হাহাকার, নিঃসঙ্গতার ভয়াবহ ভার ও স্মৃতির পীড়ন অবিরলভাবে দেখা যায়, বিশেষত ১৯৩০-১৯৪০ এর মধ্যবর্তী কবিতাগুলিতে যা হাইনের সঙ্গে তুলনীয়। হাইনে-র কবিতায় রোমান্টিকতা থাকলেও মূলত তিনি আধুনিকতার এক প্রথম পথনির্মাতা ; নিজেই বলেছেন—'আমার সঙ্গে জার্মান গীতিকবিতার পুরনো রীতির অবসান এবং একই সাথে আধুনিক জার্মান গীতিকবিতার সূচনা' (দ্রষ্টব্য 'The Poetry and Prose of Heinrich Heine;' Ed. by Frederic Ewen)। 'শাশ্বতী' কবিতাটিতে তথা সুধীন্দ্রকাব্যবৃত্তে আমরা দেখি রোমান্টিকতা তথা পুরাতনী গীতিকবিতার ছায়া বিদীর্ণ করে এক দীপ্ত আধুনিকতার উদয় হচ্ছে, কবি রোমান্টিক চূর্ণ উপাদানগুলোকে একেবারে বর্জন করেননি, বরং প্রয়োজনে তাদের নিয়ে কিছু কিছু কাজ করছেন। কিন্তু যেহেতু তিনি আধুনিক কবি ও এক অস্থির বিশ্বযুদ্ধ অতিক্রান্ত ছিন্নমূল সময়ের প্রতিভূ, তার কবিতার ভিতরে ভিতরে নানা সূক্ষ্ম ও বিপরীত ভাবনার তুমুল ঘাতপ্রতিঘাত ভালোবাসা ও ঘৃণা, আশা ও নিরাশা, শান্তি ও অশান্তির অবিরাম দ্বন্দ্ব কার্যকরী ভূমিকা নেয়। নারী এই কবির কাছে একই সাথে সুখ ও দুঃখের উৎসভূমি, বঞ্চনা ও আশীর্বাদের পীঠস্থান।

স্বপ্নালু নিশা নীল তার আঁখিসম
সে রোমরাজির কোমলতা ঘাসে-ঘাসে
পুনরাবৃত্ত রসনায় প্রিয়তম
কিন্তু সে আজ তার কারে ভালোবাসে।

রূপবর্ণনা ও প্রচ্ছন্ন যৌনতার জয়ধ্বনির পাশাপাশি এখানে প্রেম-বঞ্চিত ভাগ্যউপহাসিত কবিআত্মের হাহাকারও বড়ো একটা কম নেই।

অনুষঙ্গের সামীপ্যে পাশাপাশি উল্লেখ করতে পারি হাইনে-র 'Au Oenny' কবিতাটির, স্বয়ং বঙ্গীয় কবি 'স্মৃতিবিষ' নমে যার অনুবাদ করেছিলেন। এখানেও সেই বিখ্যাত ছয়মাত্রার কলাবৃত্তের ব্যবহার, প্রেমের সমাধির ক্ষয়কাতর পারিপার্শ্ব ও ধ্বস্ত অনুভূতির প্রতিনির্মাণ—শুধু এ কবিতায় ঋতুপট শরৎ নয় ফাল্গুন—

সেদিন পহেলা ফাল্গুন : ঘাটে মাঠে
মঙ্গালসখার বিস্মিত অভিযান ;
বালারুণ প্রতিবিম্বিত পাখসাটে
নাচে পতঙ্গা, গায় বিহঙ্গা-গান।
শুধু পেয়েছিল আমাকে মুমূর্ষাতে ;
ক্ষয়ে ক্ষয়ে মিশেছিলুম শয়নে আমি।
সয়েছি তখন যে যাতনা প্রতিরাতে,
তা আমি জানি ও জানে অন্তর্যামী।।

কিন্তু মরল মরা ডালে ফের শীর্ষ।
স্বাস্থ্যে কি আমি অক্ষয়বট তবে ?
তবু গূঢ় ক্ষতে চোয়ায় স্মৃতির বিষ
তাকালে তোমার তরুণ মুখাবয়বে।।

এই অনুবাদ কর্মটির আদি রচনা সেপ্টেম্বর-১৯৩০, পরবর্তীকালে কিঞ্চিৎ পরিমার্জনা করেন। 'শাশ্বতী' রচিত ২৭ অগস্ট, ১৯৩১-এ। সুতরাং দুটি কবিতায় কালবৃত্ত ও ভাববৃত্তের সামীপ্য নজরে পড়ে।

যে প্রেয়সী একদা মন ভুলিয়েছিল, বৃষ্টি ও রাত্রির অনুষঙ্গে যে বহন করে এনেছিল জননান্তর সৌহার্দ্যস্মৃতি যে ছিল একান্ত বাস্তব ও পাওয়ার বৃত্তে শরীরীপ্রতিমাস্বরূপা তার অলৌকিক অন্তর্ধান কবি কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। 'শাশ্বতী' কবিতায় অপসরণের অব্যবহিত মুহূর্তের রক্তাক্ত হৃদয়ক্ষত ও বেদনার বহ্নিজ্বালা পাচ্ছি না, এখানে রয়েছে দূরবর্তী মুহূর্তের ইতিকথা, কবির ব্যক্তিগত শুশ্রূষা প্রয়াস—আত্মের বিচূর্ণিত খণ্ড খণ্ড দর্পণটিকে আবার পরম্পরায় জুড়ে দেয়ার প্রয়াস। একে বলতে পারি প্রেমের পুনর্জাগরণ বা রেনেসাঁ, মৃত্যুর পর বেঁচে ওঠার প্রতিজ্ঞার মতো কিছু দুর্মর আয়োজন।

একটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী ;
একটি নিমেষ দাঁড়ালো সরণী জুড়ে,
থামিলো কালের চির চঞ্চল গতি ;
একটি পণের অমিত প্রগলভতা
মর্ত্যে আনিল ধ্রুবতারকারে ধরে
একটি স্মৃতির মানুষী দুর্বলতা
প্রলয়ের পথ দিল ছেড়ে অকাতরে।।

এই উদ্ধৃতিতে প্রথম পঙ্‌ক্তিদুটির উচ্চারণ বাংলা প্রেমের কবিতায় সর্বশ্রেষ্ঠ উচ্চারণগুলির একটি। ভালোবাসার আন্তর রসায়নকে কবি অবশ্যই মূর্ত করতে পেরেছেন—বস্তুত সেই দুর্লভ মুহূর্তে নশ্বর ও ভঙ্গুর পায় চিরজীবনলাভের প্রতিশ্রুতি ও মর্যাদা, সময় থেকে যায় আর ব্রহ্মকে আলিঙ্গানের আনন্দ পাওয়া যায়। তখন প্রতিজ্ঞা দুরূহ কর্মসাধনে ব্রতী হয়, আকাশের ধ্রুবতারা ঘরের পথনির্দেশক হয়, সময় থেকে যায় আনন্দ অবলেহন করে। বর্তমানে অনুবিদ্ধ প্রেমের ভিতর পূর্ব প্রেম অথবা প্রেমসমূহের স্মৃতি ভর করে তাকে, যুগলের দেহমন এক অবিস্মরণীয় পাতালপথের যাত্রী হয়—কিন্তু সবকিছুই এই আপাতভঙ্গুর আপাতদুর্বল স্মৃতিমেদুর মানুষের সংজ্ঞান ও সংস্কারকে কেন্দ্র করেই অনুষ্ঠিত হয়। সে মুহূর্তে মানুষ যেন দেবতার সঙ্গে অসিযুদ্ধে লিপ্ত, আরোপিত সে অদ্ভুত গৌরবে, দাড়িয়ে আছে সফলতার সিঁড়ির চূড়ায়।

৯.৯.৪ 'শাশ্বতী'র প্রেমচেতনা কামনাতত্ত্ব

'শাশ্বতী' কবিতাটির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে প্রেম এবং এই প্রেমের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সম্ভব। হ্যাটফিল্ড ও বারসেইড প্রেম-ভালোবাসা নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেছেন, এই দুই মহিলা মনস্তাত্ত্বিক গবেষিকা প্রেমের দুটি বিভাজন করেছেন 'passionate love' ও 'companionate love' বাংলা করতে পারি কামনাতপ্ত প্রেম ও

সাথীত্বস্নিগ্ধ প্রেম। "passoionate love involves a complete absorption in another that includes tender sexual feelings and the agony and ecstast of intense emotion. Companionate love is warm, trusting, tolerant affection for another whose life is deeply interwined with one's own". ('Psychology'—Themes and Variations : Wayne Weiten ; 1995)। কামনাতপ্ত প্রেম প্রেমাস্পদের ভিতর যেন ডুবে যায়—যৌন অনুভূতি, বেদনা ও তীব্র আবেগের চরম উত্তেজনা সবই সেখানে ঝড় তোলে। সাথীত্বস্নিগ্ধ প্রেম উষ্ণ, বিশ্বস্ত, সহনশীল—প্রেমাস্পদের জীবনের সঙ্গে তার যোগ সহজ।

সহজেই বুঝতে পারি 'শাশ্বতী'তে যে প্রেম বর্ণিত তাকে কামনাতপ্ত প্রেম বলেই চিহ্নিত করা যায়। 'স্বপ্নালু নিশা নীল তার আঁখি-সম ;/সে রোমরাজির কোমলতা ঘাসে ঘাসে' ;—এখানে রয়েছে যৌনতার প্রতিক্ষরণ পুনরাবৃত্ত রসনায় প্রিয়তম/কিন্তু সে আজ আর কারে ভালোবাসে'।—এখানে রয়েছে বেদনার বিচ্ছুরণ ; 'একটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে/ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী' ;—এখানে পাচ্ছি তীব্র আবেগের চরম উত্তেজনার ভাষাময় প্রকাশ।

এই কামনাতপ্ত প্রেমের উদয় যেমন অলৌকিক তার অন্তর্ধানও তেমনই আকস্মিক। হৃদয়ে চিরক্ষিত এঁকে যে চলে গেল তারই স্তব করে বাকি জীবন যেন চলে যায়।

৯.৯.৫ সুধীন্দ্রনাথের নিজস্ব জীবন ইতিহাস ও 'শাশ্বতী'

অধিকন্তু 'শাশ্বতী'র প্রেমইতিহাসের বাস্তবমূল হচ্ছে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের নিজস্ব জীবনইতিহাস। সুধীন্দ্রনাথ ইউরোপ ভ্রমণে গিয়েছিলেন ১৯২৯-এ। ১৯২৯-এর পূর্ববর্তী কবিতা ও পরবর্তী কবিতার মধ্যে এক বিগাঢ় ব্যবধান আছে। 'তন্বী' যদি প্রাথমিক কাব্যকবিতা হয়, 'অর্কেস্ট্রা'কে আমরা বলতে পারি পরিণত কাব্যকবিতা। ভাবতে ভালো লাগে অভিজ্ঞতার স্বীকরণই এই তুমুল পরিবর্তন ঘটেছে। এখানে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের জীবনীকার অধ্যাপক ড. অমিয় দেবের উক্তি প্রাসঙ্গিক হতে পারে— "On reading these lines, on reading these poems, on reading all Sdhindranath's sbsequent love poetry, one may wonder whether these were pure fabrications or had some real basis. If biography has any function at all in literary appreciation, then this is worth digging. We cannot deny one thing : there was suddenly a change in his poetry. Who was she, the immediate cause of this poem? Where did she meet her? Who was she? I would seem so from a later poem—the last two lines of "Samvarta" ('Cyclone') are evidence enough, let alone the descriptin" ('Sudhindranath Dutta' : Amiya Dev ; Makers of Indian Literature Series, Sahitya Akademi) এইসব কবিতা পড়ে, সুধীন্দ্রনাথের পরবর্তী প্রেমের কবিতাসমূহ পড়ে এ অনুমান প্রসঙ্গাত নয় এদের কিছু বাস্তবমূল আছে। অনুমিত হয় এইসব প্রেমকবিতার উদ্দিষ্টা নারী বিদেশিনী—তিনি জার্মানির কন্যা হতে পারেন। 'সংবর্ত' কাব্যের নাম কবিতার শেষ দুই পঙ্‌ক্তিতে এই বিদেশিনী রমণীর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ১৯৪০-এ লেখা এ কবিতায় কবি ভাবছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘূর্ণিঝড়ে সে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে—'সে এখনও বেঁচে আছে কিনা/তা সুদ্ধ জানি না।' 'এখনও বৃষ্টির দিনে মনে পড়ে তাকে।'—এই অবিস্মরণীয় স্মরণবাক্য দিয়েই কবিতাটির শুরু। 'শাশ্বতী' কবিতাটিও 'সেদিন এমনি ফসল-বিলাসী হাওয়া/মেতেছিলো তার চিকুরের পাকা ধানে', অথবা 'স্বপ্নালু নিশা নীল তার আঁখিসম' ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিতে আমরা এক স্বর্ণকেশী নীলনয়নার সন্ধান পাচ্ছি। অনুমিত হয় তিনি সেই বিদেশিনী জার্মানদুহিতা যিনি জীবনের বসন্তলগ্নে একদিন কবির মন হরণ করেছিলেন। বাঙালি কবি তাঁর নামধান সম্বন্ধে নীরব, কিন্তু 'internal evidence' বা আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য তাঁর অস্তিত্বকে ভীষণভাবে প্রমাণ করে।

৯.৯.৬ লিবিডো ও স্মৃতিবেদনার যুগলবন্দী

'শাশ্বতী' কবিতায় লিবিডো ও স্মৃতির যুগপৎ ঝংকার আছে—যৌনবেদনা ও স্মৃতিবেদনা ক্রমাগত জায়গা বদল করেছে ; ভুলে যাওয়া বসন্ত থেকে হঠাৎ আসা এক নায়িকার বার্তা পাওয়া গেছে। এ কবিতায় stress বা মানসিক চাপের ধারাবিবরণী রয়েছে। যে ভালোবাসা দিয়েছিল, সে চলে গেছে। সে আর ফিরবে না, তাকে আর কখনও পাওয়া যাবে না। সময় তাকে সঙ্গে নিয়েছে পৃথিবীরে বুক থেকে। যুদ্ধ অথবা যুদ্ধের প্রস্তুতি তার প্রতিমাকে সম্ভবত ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল। এমনই সব অন্তর্লীন অবদমিত বেদনা ও বিক্ষোভ এ কবিতায় খনন করলে মেলে। কিন্তু কবিপ্রেমিকের অদ্ভুত জীবনশক্তির, মৃত্যুর তমসা ভেদ করে নতুন করে জেগে ওঠার সঞ্জীবনীবার্তাও এ কবিতার এক দুর্লভ-সম্পদ অথবা প্রাপ্তি। মনোবিদরা এর নাম দিয়েছেন 'Coping Strategy' বা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রামের কৌশল। এভাবেই একটা বিশেষ অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় ; ব্যক্তিজীবনের ঘটনাবলিকে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে এই বোধই বিচলিত জীবনপ্রত্যয়কে ফিরিয়ে আনে অথবা ভারসাম্যে থিতু করে। ইতিমূলক আবেগই উপকারী প্রভাব বিস্তার করে—মনোবিদের এই হচ্ছে মূলকথা।

'শাশ্বতী' কবিতায় দেখি প্রিয়ার অন্তর্ধান অনায়াসে কবির অস্তিত্ববিশ্বকে ভেঙে চুরমার করে দিতে পারত। হয়তো এরকম সে কিছুটা করেও ছিল। কিন্তু কবির বেঁচে ওঠার প্রক্রিয়া আবার তাঁকে মৃত্যুর থেকে, মুমূর্ষার থেকে, জীবনদুয়ারে পৌঁছে দিল, জার্মান কবি হাইনে-র ভাষায় 'কিন্তু ধরল মরা ডালে ফের শীষ'। কবি লুপ্ত ভালোবাসাকে আবার নতুন করে পুনর্নির্মাণ করলেন, প্রেমের অমরাবতীর অধিবাসিনীর উদ্দেশে অর্পণ করলেন প্রশস্তির ডালি, আবেগের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনা শুধু দিলেন না, যৌনতার কীর্তনও কিছু করলেন কবিসুলভ আভাসে ইঙ্গিতে। সর্বোপরি নিরাশার অন্ধকার রন্ধ্রে মৃত প্রেমকে দেখলেন মাধুরীকণিকা রূপে তিলে তিলে সঞ্চিত হতে। স্মৃতির সঙ্গে পিপীলিকার তুলনা তাই সার্থক কারণ স্মৃতি এখানে Catalyst বা অনুঘটকের কাজ করেছে। কবির বলদৃপ্ত আত্মঘোষণা, আমি কখনও এই প্রেম ও এই প্রিয়াকে ভুলে যাব না, অবশ্যই তাঁর স্বরচিত সর্বাত্মক উজ্জীবনের প্রয়াসের সংবাদ আনে—

স্মৃতিপিপীলিকা তাই পুঞ্জিত করে
আমার রন্ধ্রে মৃত মাধুরীর কণা :
সে ভুলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে
আমি ভুলিব না, আমি কভু ভুলিব না

প্রেমের কবিতার এই উচ্চারণ সত্যিই দুর্লভ এবং সুন্দর। শাশ্বতী প্রেমের চিরন্তনী তাই কবিতাটির নামকরণও যথার্থ।

৯.৯.৭ উপসংহার

আনুষঙ্গিক আরও দু-একটি কথা স্মরণীয়। 'শাশ্বতী'তে নতুন প্রেমের আভাস আছে মনে হয়। পূর্ব প্রেমকে সেই হয়তো স্মৃতির অনুষঙ্গে ফিরিয়ে এনেছে। অন্যদিকে এখানে বাস্তব জগৎ লুপ্তরেখা হয়ে গেছে, এ সুতীব্র অতিবাস্তব স্বপ্নজগৎ আবির্ভূত হয়েছে। এ যেন প্রায় বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবসম্মিলনের মতো—বিচ্ছেদের পরও স্বপ্নমিলনের বার্তা রচনা তাকে বাস্তবজগতে দেখতে পাওয়া সত্যরূপে। যদিও সে ছিল ছায়ার মতো মায়ার মতো অস্তিত্বে নয় অনস্তিত্বেও প্রকট। একে মনস্তত্বের ভাষায় বলতে পারি 'Projection'—চিন্তারই বহিঃক্ষেপণ। বৈষ্ণব পদাবলীতে আছে 'আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ/পেখলুঁ পিয়ামুখচন্দা'। আর বঙ্গজ কবি বলছেন—

সন্ধিলগ্ন ফিরেছে সগৌরবে :
অধরা আবার ডাকে সুধাসংকেতে ;
মদমুকুলিত তারই দেহসৌরভে
অনামা কুসুম অজানায় ওঠে মেতে।
ভরা নদী তার আবেগের প্রতিনিধি
অবাধ সাগরে উধাও অগাধ থেকে ;
অমল আকাশে মুকুরিত তার হৃদি
দিব্য শিশিরে তারই স্বেদ অভিষেকে।

বস্তুত এই ফিরে আসা ফিরে পাওয়া চিরবিদায় ও চির না পাওয়ারই প্রতীকী বয়ন—সেই প্রতীকের সিঁড়িতে পা রেখেই 'শাশ্বতী'র অবস্থান।

৯.১০.১ অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা : ইতিহাস

অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রউত্তর যুগের একজন প্রধান কবি। আধুনিক বাংলা কবিতায় বিষয় ও আঙ্গিকে তিনি নতুন সম্ভাবনার আকাশকে মুক্ত করে দিয়েছেন। এই কবি ছিলেন শান্তি ও মানবতার স্বপক্ষে এক মহান যোদ্ধা ; একই সঙ্গে তিনি খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও সুপণ্ডিত। উত্তর জীবন আমেরিকায় কাটানো এই মানুষটি যথার্থ অর্থেই আন্তর্জাতিক। রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে প্রথম জীবনে তিনি এসেছিলেন। মহাত্মা গান্ধি তাঁর জীবনে দ্বিতীয় প্রভাব। কবির পূর্বপুরুষ ছিলেন পাবনার জমিদার। তাঁর পিতা দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন গৌরীপুরের রাজার অধীনে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। মায়ের নাম অনিন্দিতা। কবির জন্ম শ্রীরামপুরে ১০ এপ্রিল, ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে। অমিয় চক্রবর্তী নবীন বয়সে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে। ১৯২৬-এ তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সচিব। পরের বছর তিনি ডেনমার্কের মেয়ে ক্রিস্টেন সিগার্ড-কে বিয়ে করেন শান্তিনিকেতনে, কবিগুরু তাঁর নতুন নামকরণ করেন হৈমন্তী।

৯.১০.২ কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী ও রচনাধারা

ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য, ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে গভীর জ্ঞান তাঁক ইংল্যান্ডে প্রেরণ করে অধ্যাপকরূপে। অক্সফোর্ড-এ ছিলেন, পরে আমেরিকা হল তাঁর কর্মক্ষেত্র। প্রিন্সটন, ইয়েল, মিচিগান, কলম্বিয়া, নিউইয়র্ক, বস্টন প্রভৃতি জগৎবিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি অধ্যাপনা করেন। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে তিনি গিয়েছিলেন রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতসংস্কৃতির নেতারূপে ; মানবহিতৈষী আলাবার্ট সোয়াইটজার-এর প্রতি ভালোবাসা তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল নিরক্ষবৃত্তের দেশ আফ্রিকায়, ল্যাম্বারেন নামক স্থানে। এক নিরন্তর ভ্রাম্যমান ও মননশীল জীবনের ফাঁকে কবি রচনা করেছিলেন তাঁর কবিতাবলি—'পারাপার' (১৩৬০), 'পালাবদল' (১৩৬২), 'ঘরে ফেরার দিন' (১৩৬৮) ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে অনেক অসাধারণ কবিতা তিনি বাংলা কবিতার পাঠককে উপহার দিয়েছেন। 'লাল মনসা', 'ওহায়ো', 'ওক্লাহোমা' 'কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি', 'সান্তা বার্বারা', '১৬০৪ য়ুনির্ভার্সিটি ড্রাইভ', 'চিরদিন', 'পিঁপড়ে', 'বৃষ্টি'—'পারাপার' 'চার্লস নদীর ধারে', 'বে-স্টেট রোডে', 'ঈষ্ট রিভার', 'রাত্রি', 'ইতিহাস'—('পালাবদল') ; 'সান্তা মারিয়া দ্বীপে', 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' ; 'আন্তর্জাতিক' —('ঘরে ফেরার দিন') ইত্যাদি কবিতাবলিতে পাচ্ছি এক বিশ্বপথিক ও বঙ্গভূমির প্রেমিক প্রিয় কবিকে। জীবনের গোধূলিলগ্নে কবি সস্ত্রীক প্রিয় শান্তিনিকেতনে নিজের বাড়ি 'রাস্কা'য় ফিরে আসেন। সেখানে ১৯৮৬ সালে তাঁর মৃত্যু।

৯.১০.৩ কবির মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি

অমিয় চক্রবর্তী বুদ্ধদেব বসু-র 'কবিতা' পত্রিকায় লিখতেন। বুদ্ধদেব যখন তাঁর ক্রান্তিকারী কবিতা-সংকলন 'আধুনিক বাংলা কবিতা' প্রকাশ করলেন কাব্যামোদী পাঠক বিখ্যাত 'সঙ্গতি', 'চিরদিন', 'ওক্লাহোমা' প্রভৃতি কবিতার স্বাদ পেয়ে বিস্মিত হলেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে-র পাশপাশি এখানে এমন একজন কবিকে পাওয়া গেল—বাংলা কবিতার সৌন্দর্য রবীন্দ্রনাথের পর নতুন করে বুঝতে গেলে যাঁকে অবশ্য বুঝতে হবে। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা নিয়ে প্রথম দিগ্‌দর্শনী আলোচনা কবিদের বন্ধু ও কবিতার জহুরি বুদ্ধদেব বসুই করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত 'কালের পুতুল' গ্রন্থে সংকলিত "অমিয় চক্রবর্তীর পালা-বদল" প্রভৃতি নিবন্ধ প্রাসঙ্গিকভাবে অবশ্যই পাঠযোগ্য।

বুদ্ধদেব বসু 'পালাবদল' কাব্যে কবিতার 'নূতনতর ধরন' লক্ষ করেছিলেন এবং এখানে তিনি বিশেষভাবে ইতিহাস কবিতাটির উল্লেখ করেছিলেন। এই কবিতাটি তাঁর শুধু উৎকৃষ্ট মনে হয়নি, এখানে তিনি পেয়েছেন 'আমেরিকান কবিতার বিস্ময়' একাধিক অর্থে। তাঁর মন্তব্য আনুপূর্বিক উদ্ধৃত করছি—"আমেরিকার একটি গ্রাম কী করে শহরে রূপান্তরিত হ'লো, দু'পৃষ্ঠার মধ্যে তারই ইতিহাস। ছন্দে লেখা, কিন্তু গদ্যের মতো পড়া যায়। শুধু বিষয়টাই মার্কিন নয়, রচনার রীতিটাও কোনো মার্কিন কবির অনুরূপ—কোথাও কোথাও রবার্ট ফ্রস্টকে মনে পড়ে। কবিতার মধ্যে যে ঘটনাটা ঘটলো তার জন্য কোনো অভিযোগ বা আক্ষেপ নেই, লেখক একটিও মন্তব্য করেন নি, শুধু একটি পরিচ্ছন্ন বিবরণ দিয়ে গেছেন। ঠিক এই জাতের কবিতা অমিয় চক্রবর্তী আগে আর লেখেননি, বাংলাভাষায় আর কেউ লিখেছেন বলেও আমার মনে পড়ছে না। এই ধরনটি তাঁর পরবর্তী রচনার মধ্যে যদি ফিরে আসতে থাকে, তাহলে আমরা বলতে পারবো যে বাংলা কবিতার জন্য নতুন একটি প্রদেশ তিনি জয় করলেন।"

৯.১০.৪ ইতিহাস : আধুনিকতা

'ইতিহাস'-এর মতো কবিতা পড়লে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার কোন ভাবে ও আঙ্গিকে আধুনিক সহজেই বোঝা যায়। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর "Modern Tendencies in English Literature" বইটিতে স্বয়ং এই যুগের পুরোধা কবি আধুনিক কবিতার গুণাবলি নিয়ে হার্দ্য আলোচনা করেছেন। ইয়েটস, এলিয়ট, স্পেন্ডার, অডেন, ল্যুইস প্রভৃতি কবিদের আলোচনা তিনি করেছেন এবং যুদ্ধউত্তর ইংরেজি কবিতার স্বরূপ নির্ণয়ে এভাবেই এগিয়েছেন। তাঁর মতে প্রকৃত কবিতায় থাকবে জীবনের গতি এবং মনের ধর্ম। কবিতার ভিতর দিয়ে অভিজ্ঞতার গভীরতর উন্মোচন হয়ে থাকে। এখানে মানুষের বিবেক উপস্থাপিত এবং রয়েছে মানবতাবিধ্বংসী শক্তিমসূহের প্রতি প্রতিবাদ। এ পদ্য নয়, এ আপাত অভ্যাসিক লালিত্যের বিরুদ্ধে। বর্তমান সময়ে সমাজের মানসিক সুস্থিতি বিচলিত হয়েছে এবং আধুনিক কবিরা ওইসব অসংগতিকে প্রকাশ করে দেখিয়েছেন ও তাদের সমাধানের উপায় নির্দেশ করেছেন। বলা বাহুল্য 'ইতিহাস' কবিতায় মানুষের জীবনের সংকটকে সময়েরই পরিপ্রেক্ষিতে আভাসিত করা হয়েছে। গ্রাম ভেঙে নগর গড়ে উঠছে, মানুষের লোভ কারখানা ঘরের ক্রমপ্রসারে উদ্যত মুঠি তুলছে এমন সব ছবি আমরা পাচ্ছি—

'দুটো মস্ত কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাকা গেটে। জেল এর মতন বাড়ী থাকে কারখানা-প্রভু স্মিথ, ষ্টেটে-ডলার কুবের-শ্রেষ্ঠ, কারখানা নানাখানে, কথা বলতে অন্য দৃষ্টি/চোখে ঘোরে/টাক-মাথা, আপিসের যম, গ্রামের কিছুতে নেই, শিকাগোতে গাড়ি/নিজেই হাঁকিয়ে যায়, কিছুদিন থেকে ঘন/ঘন ট্রাকে ভরে/কী-সব জিনিস সব পাঠায় কোথায়।'

অতএব 'ইতিহাস কবিতার এইসব পঙ্‌ক্তি অবশ্যই প্রাসঙ্গিক। "Poetry today, is actively engaged in giving values to the gift of civilisation. It is also exposing the unrealities of "progress" which thrives on the destruction of the human spirit"—('Modern Tendencies in English Literature')— অমিয় চক্রবর্তীর এই উক্তি মূল্যবান এবং তাঁর কবিতার জীবনদর্শনকে সংক্ষিপ্ত নিগূঢ় বাক্যে বলছে। কবিতা ক্রমাগত উদ্ধার করছে সভ্যতার দানের মূল্য, প্রগতির অবাস্তবতা প্রকটা করছে কারণ প্রগতি অনেক সময়েই মানুষের আত্মার সপ্রাণ আনন্দকে নষ্ট করে দিচ্ছে। 'ইতিহাস' কবিতার উপসংহারে এই জীবনসংকটের সংবাদ আছে—

খবর এনেছে কাল নতুন প্রকাণ্ড বাঁধ হবে
এই দিকে, সিসি-আইসিস দুটো নদী বেঁধে। দূরে কোন
জায়গায় তবে
ইট বাঁধা বহু গ্রাম একত্র শহরে গেঁথে, কোনোমতে
থাকবে বহুলোক। এই গ্রাম
তাহলে উঠে যাবে।।

লক্ষ করি যন্ত্রসভ্যতার উত্থানে গ্রামপ্রকৃতির অবসান ঘটেছে এটা শুধু টমাস হার্ডির মতো রোমান্টিক ঔপন্যাসিকেরাই বিষয়বস্তু করেননি, অমিয় চক্রবর্তীর মতো কবিরাও করেছেন।

৯.১০.৫ অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় বিজ্ঞানের ভূমিকা

'অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার আর একটি বৈশিষ্ট্য তিনি বহু বিষম সুরকে এক সংগতিতে বাধার চেষ্টা করেন। সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশত 'Amiya Chakrabarty' নামক মনোগ্রাফের লেখিকা সুমিতা চক্রবর্তী যথার্থই বলেছেন 'Amiya has never denied the significance of Science and its positive values in the modern times'—কবি অমিয় চক্রবর্তী আধুনিক কালে বিজ্ঞানের গুরুত্ব ও তার ইতিমূলক ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি নিজেই বলেছেন, মানুষই প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র যন্ত্র বানাতে শিখেছে, ফলে সে যন্ত্রকে প্রায় একরকম দেবতার আসনে বসিয়েছে বলা যায়। এজন্য আজকের কবিতায় নব নব বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি কবিদের কাছে প্রশস্তি পাচ্ছে—কবিতার বিষয় হয়ে উঠেছে। আমরা পাচ্ছি যন্ত্রের উপর লেখা নতুন কবিতা। বিখ্যাত উদাহরণ স্টিফেন স্পেন্ডার-এর লেখা "The North Express"। বঙ্গীয় কবির কবিতাতেও যন্ত্রের চিত্রকল্প প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে 'ইতিহাস' কবিতায়—

চিনি-দানি থেকে
দু-চামচে চিনি নিয়ে কফি খায়, রোগা যুবা, রেস্তরাঁয়
দেয়াল-কাগজ হলদে, পেরেকের বহু দাগ, ডেকে
ওঠে সিমেন্ট (না সোডিয়াম) কারখানা সাইরেন জোরে
কাঁপিয়ে উপত্যকা—গ্রামের প্রধান নির্ভর ঐ ফ্যাক্টরি ; ঘোরে
ঠাণ্ডা দুপুরে চিল,

কারখানার এই বর্ণিত চিত্র এখানে কবিতার মোজেইক-এ একটা জায়গা করে নিয়েছে।

৯.১০.৬ ভাব ও আঙ্গিকের নতুনত্ব

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার ভাব ও আঙ্গিক দু-এক কথায় বুদ্ধদেব বসু সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁর 'কালের পুতুল' গ্রন্থে। "এই সহজ, অতি সহজ বাক্যচ্ছটার বিরুদ্ধেই আধুনিক কবির উদ্যোগে।...অকারণ বাক্যভার আর নেই, নিজেকে অতিক্রম করে পারিপার্শ্বিক জগৎকে দেখবার চেষ্টা আজ সুস্পষ্ট। ছন্দে তরলতার চেয়ে দৃঢ়তাই বেশি, মিষ্টি টুংটাং-এর বদলে গূঢ় ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির দিকে ঝোঁক পড়েছে।...এই লক্ষণগুলি সবই অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় বর্তমানষ কিছুটা চড়া মাত্রাতেই বর্তমান। কলাকৌশলের দিক থেকে তাঁর কাব্য দুঃসাহসিক।" ('অমিয় চক্রবর্তী : খসড়া')। বস্তুত রবীন্দ্র-অনুকারী কবিদের অতি তরল রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে অমিয় চক্রবর্তীর মতো কবিরা বাংলা কবিতায় বিদ্রোহ করে নিয়ে এলেন কবিতার নতুন সুর।

'ইতিহাস' কবিতায় কবিতার এই নতুন ভাষা ও আঙ্গিক দেখছি। কবিতার ভাষা হয়ে উঠল মুখের ভাষা ও গদ্যের ভাষার কাছাকাছি ; নিম্নকণ্ঠ হার্দ্য উচ্চারণে গদ্যপদ্যের বিভাজন প্রায় ঘুচে যেতে বসলো। ইতিহাস কবিতার শুরুটা পড়লেই পাঠক ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন—

নেবুরঙা শার্টপরা একটি মানুষ এসেছিলো
ঢালু মাটি মস্ত গাছ পেরিয়ে, নদীর ধার দিয়ে
ঘোড়া চড়ে ;

অত্যন্ত সরল নিরাভরণ উক্তি, এর তাপ ভিতরে রয়েছে।

'ইতিহাস' কবিতাটির আর একটি বৈশিষ্ট্য গ্রামজীবনের সৌন্দর্য এখানে নস্টালজিয়া বা স্মৃতিমেদুরতা আক্রান্ত।

কী মনে লাগলো তার, ফিরে গিয়ে
নির্জন চড়াইয়ে এলো আরো দু-জনার সঙ্গে, বসে
গাছতলে খানিকক্ষণ তিনজন (স্ত্রী আর গাঁয়ের খুড়ো হবে)
থলি খুলে রুটি সবজি খেলো,
... ...
ঠুকঠাক দিনে দিনে কাঠ কাটা, বাড়ি তোলা ভালোবেসেছিলো
ওরা এই জায়গা।

সুতরাং এ কবিতায় শুধু গ্রামধ্বংসের ইতিহাসই নেই, গ্রামপত্তনের ইতিহাসও আছে। কবির কাছে দুটোই জরুরি। ওইসব পাত্রপাত্রী জীবনযাপন করে চলে গেছে, সিমেট্রিতে সমাধিফলকে তাদের নাম লেখা আছে। সে নামও জলের রেখায় মুছে যাওয়ার পথে। দোকানপশরা উঠেছে, নতুন মানুষেরা এসেছে, কাঠবেড়ালির আনাগোনার ব্যস্ত শব্দ—এই সব নিয়ে রচিত নিপুণ আবহ। এই আবহ অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার সম্পদ।

কবিতার দ্বিতীয় অংশে আন্তর্জাতিকতার সংস্পর্শে লেগেছে। প্রথম অংশের নেভাডা, ক্যারিবিয়ান প্রভৃতি উল্লিখনের পর এবার পেলাম পোল, ইতালিয়ান, উক্রেন, বল্টিমোর, শিকাগো ইত্যাদি উল্লিখন। পাচ্ছি সিসি ও আইরিস দুটি স্থাননদীর নাম। আধুনিক কবি ছিন্নমূল, বহির্বিশ্বে ভ্রমণকারী, বিশ্বনাগরিক এবং 'ইতিহাস'-কবিতায় ভৌগোলিক চিত্রকল্প এই আন্তর্জাতিকতাতেই এসে থেমেছে।

সাধারণ মানুষের জীবনের সুখদুঃখ হাসিঅশ্রুর ছবিও কবি দু-একটি রেখায় তুলে ধরেছেন। 'মেরুন-রঙের জামা ঐ যে মেয়েটি যায়, মুখে সুখ নেই' অথবা পাচ্ছি আনা বলে দশবছরের একটি প্রাণবন্ত মেয়ের কথা। তার মাতামহী শয্যাশায়ী

'আনা,
ঘড়িতে দিয়েছো দম ?" ঘড়িটা আসলে মৃত, ভুলেছে সময়, নানা
ধুকধুক পেরিয়ে আজকে, মধ্যে মধ্যে তবু চলে।'

সময় চলে যাচ্ছে, জীবন ফুরিয়ে যাচ্ছে চলচ্চিত্রের মতো ছবি দ্রুত বদলিয়ে যাচ্ছে, পৃথিবীর অসুখী মানুষেরা দেশহারা নির্বাসনে ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ছে, গ্রাম উঠে যাচ্ছে, ইটে বাঁধা শহর গড়ে উঠছে সে সব জায়গায়—মানুষের এইসব ইতিহাসই আলোচ্য কবিতায় বিবৃত।

'ইতিহাস' কবিতার ছন্দ, উপমা ইত্যাদি আঙ্গিকের দিকেও নজর দেওয়া প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে দামি কথা বলেছেন বুদ্ধদেব বসু—"কলাকৌশলের দিকে তিনি অনেকদূর অগ্রসর ; সেদিকে পথের সন্ধান তিনি পেয়েছেন আধুনিক ইংরেজ কবিদের কাব্য থেকে, সমকালীন বাঙালী কবিরাও হয়তো কিছু সাহায্য করেছেন। ভাঙা পয়ারই তাঁর সবচেয়ে প্রিয়, পদ্যের সঙ্গে গদ্যের মিশ্রণ করে তিনি আনন্দ পান ; যখন তিনি গদ্যে কবিতা লেখেন, সে গদ্য পদ্যের ধ্বনিকে দখল করতে সচেষ্ট হয়।" (অমিয় চক্রবর্তী ; খসড়া' ; 'কালের পুতুল')।

৯.১০.৭ ইতিহাস : ছন্দবিন্যাস

'ইতিহাস' কবিতার ছন্দ লক্ষ করলে দেখা যায় অক্ষরবৃত্ত বা মিশ্রকলাবৃত্তে কবিতাটি লেখা, উচ্চারণ প্রায় যেন গদ্যের দিকে যাচ্ছে। মিলের ব্যবহার আছে কিন্তু তা খুব Casual বা অনায়াস এলানো ভঙ্গিতে—

+ ১০	পোল (ইতালিয়ানের/সংখ্যা পাঁচ) ভাঙা ইংরেজিতে
৮ + ৬ + ৬	তর্ক করে/এর্কত্র তিনজনে,/ওরাই এখানে/বেশী সংখ্যায়
৬ + ৬	উক্রেনের দুর্বৎসরে/যুদ্ধের আগেই/সিধে বলটিমোরে,
+ ৬	তারপর ঘুরে-ঘুরে/এলো সাতজন।

মাত্রা বিন্যাস অক্ষরবৃত্তের ঢঙে অর্থাৎ স্বরান্ত অক্ষর, এক মাত্রা, হসন্ত অক্ষর যুক্তাক্ষরের আশ্রয়ে থাকলে, এক মাত্রা, বিছিয়ে লিখলে দুমাত্রা। কিন্তু 'একত্র' তিনমাত্রা না হয়ে মাত্রাবৃত্ত কলাবৃত্তের নিয়েছে চারমাত্রা হয়েছে, বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ। এভাবেই ছন্দ হয়ে উঠেছে Vers libre বা মুক্ত ছন্দ। ছন্দ নিয়ে এই পরীক্ষানিরীক্ষাটি আধুনিক কবিতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। 'ইতিহাস' কবিতায় মিল আছে, তবে মিলের ব্যাপারে ধারাবাহিকতা নেই, অনেক সময় মিল থাকছে না। আসলে মিল দেওয়ার জন্য বাড়তি চেষ্টাকে বর্জন করা হয়েছে। পূর্ববর্তী রোমান্টিক কবিতায় এই ব্যাপারটা অনেক সময় কবিতাকে গদ্যের কাছে নিয়ে গেছে। কবিতার ১ অংশে 'ব'সে'/ঘ'ষে, পাড়া/খাড়া/, তীর/কাঠবেড়ালির—এইসব মিল আছে। মিল সবসময়েই যে পরপর তা নয়। কবিতার ২ অংশে থেকে/ডেকে, জোরে/ঘোরে, যাবে/পাবে, গেটে/ষ্টেটে ইত্যাদি মিল আছে। কিন্তু এক ধরনের ধ্বনিগত মৃদুতাই এসব মিলকে আশ্রয় করে আছে। মিল যে আছে যেন বোঝাই যায় না। অর্থাৎ গদ্য পদ্যের বিভাজনটা প্রায় যেন মিটেই যাচ্ছে। ভার্স লিব্‌র্ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"This last can be defined as verse in which neither syllable nor metrical rules obtain, and only rhythm matters. Though rhythm may persist..." ('Prinecton Encyclopedia of Poetry and Poetics') —এই ছন্দের গাণিতিক নিয়ম অক্ষর গণনা ইত্যাদির চেয়ে রিদম বা তালই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যদিও মিল থাকতে পারে। তা 'ইতিহাস' কবিতার ছন্দে এ জাতীয় ছাপ রয়েছে বোঝা যায়।

অমিয় চক্রবর্তীর উপরে চিত্রকল্পবাদী পাউন্ড ও এলিয়ট, স্প্রাং রিদমের কবি হপকিন্স, মার্কিন কবি রবার্ট ফ্রস্ট ইত্যাদির প্রভাব রয়েছে।

৯.১২.১ বুদ্ধদেব বসুর কবিতা : শেষের রাত্রি

বুদ্ধদেব বসুর-র "শেষের রাত্রি" কবিতাটিকে বাংলা কবিতায় এ পর্যন্ত যত লিরিক বা গীতিকবিতা লেখা হয়েছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতাসমূহের একটি বলে চিহ্নিত করা যায়। এ কবিতা এক দৈবপ্রেরিত মায়াবী মুহূর্তের দান ; হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বসিত ঊর্ধ্বযাত্রা, সৃজনের আনন্দে তরি ভাসিয়ে সৌন্দর্যের উপকূলে পৌঁছানোর চেষ্টা। ভাষার রেশমমসৃণ সাবলীলতা সবকিছু মিলে মিশে পাঠকমনে জাগিয়ে তোলে একটি সত্যিকারের ভালো কবিতা পড়ার আনন্দ। 'শেষের রাত্রি'-কে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে গেলে গীতিকবিতার শিল্পতত্ত্বকে জানতে হবে। কিন্তু তারও আগে কবির জীবন ও কাব্যজীবন সম্বন্ধে আমরা একটি দুটি কথা বলে নিচ্ছি।

৯.১২.২ কবিজীবনী ও কাব্যবৈশিষ্ট্য

বুদ্ধদেব বসু যথার্থই নব্যভারতের সাহিত্যস্রষ্টাদের একজন। খ্যাতিমান কবি ও অধ্যাপক অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত "Buddhadeva Bose" নামক স্বল্পায়তন বইটিতে যথার্থই বলেছেন—"Buddhadeva built up his own reputation during his life-time. He did not have to wait for it like Jivanananda Das, for whose reputation (along with that of some other eminent fellow-writers of his generation) to Buddhadeva strove equally. This reputation has not suffered after his death. On the contrary, he is honoured today, among the practising writers and uninitiated readers alike. The select literary circle he tried to create is growing and gradually coming to dominate the scene. In this sense he is one among the makers of literature who have come to stay not only in our history of literature but also in our literary history." বুদ্ধদেব বসু তাঁর জীবনকালেই লেখক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। জীবনানন্দ দাশ থেকে শুরু করে সমকালীন আরও অনেক কবিলেখকের প্রথম দিগদর্শনী আলোচনা তিনিই করেছিলেন, ভাবলে অবাক লাগে। খ্যাতি তাঁর মৃত্যুর পরও কমে যায়নি। বাংলাসাহিত্যের লেখক ও পাঠকদের কাছে আজও তিনি সমাদৃত। যে সাহিত্য-সম্প্রদায় তিনি তৈরি করেছিলেন, যে সাহিত্যরুচির তিনি নির্মাতা, আজ সেই পরম্পরা ও রুচিই বাংলা সাহিত্যে প্রাধান্য বিস্তার করেছে—এ কথা বলা যায়।

বুদ্ধদেব বসুর জন্ম ৩০ নভেম্বর, ১৯০৮। তিনি মেধাবী ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ., প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। পরবর্তীকালে তিনি কলকাতায় ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক, পরিণত বয়সে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক ও কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব, আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়েও যান। এই সময়েই তিনি কবিতা-ভবনের বাসিন্দা, 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদক, কাব্য আন্দোলনের স্রষ্টা, কবিতা-গল্প-উপন্যাস-নিবন্ধের সিদ্ধহস্ত লেখক—এককথায় রবীন্দ্রউত্তর বাংলা সাহিত্যের আকাশে এক শুভগ্রহ অথবা উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। তাঁর বাংলা কবিতায় পালাবদল আনার এক যুগান্তকারী কবিতার বই 'বন্দীর বন্দনা' প্রকাশিত হয় ১৯৩০ সালে। 'কঙ্কাবতী' কাব্যগ্রন্থ পাচ্ছি আরও সাত বছর পর ১৯৩৭-এ যদিও এর কবিতাগুলো ত্রিশের দশকের প্রথমভাগ জুড়েই রচিত হয়েছিল। কঙ্কাবতী প্রসঙ্গ এখানে গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু 'শেষের রাত্রি' কবিতাটি এই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত—অবিস্মরণীয় কঙ্কা-র উদ্দেশ্যে নিবেদিত আরও কবিতা এ কাব্যে আছে।

৯.১২.৩ গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য

বস্তুত 'শেষের রাত্রি' পড়তে পড়তে মনে হয় তারা যেন এক ঘনীভূত লিরিক জোয়ারে ভেসে যায়। প্রেমের কবিতায় আবেগের এমন স্তরে স্তরে স্তবকে বিকশিত হওয়ার সংবাদ বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ঝুলন, নজরুলের 'সৃষ্টিসুখের উল্লাসে', বিষ্ণু দে-র' ঘোড়সওয়ার' ইত্যাদিতে আমরা দেখতে পেয়েছি। একটি প্রথম শ্রেণির গীতিকবিতা হিসেবে বুদ্ধদেব বসু-র 'শেষের রাত্রি'কে উপস্থাপিত করতে গেলে প্রথম অবশ্য গীতিকবিতার শিল্পতত্ত্ব সম্বন্ধে অতিসংক্ষেপে আলোচনা সেরে নেওয়া প্রয়োজন। গীতিকবিতার উদয় সভ্যতার আদিযুগে, মানবহৃদয়ের গভীরতম আবেগবাণী হিসেবে। তখন সেই প্র-গীতিকবিতা ও সংগীত ছিল প্রায় সমার্থক, কারণ সেই গীতিকবিতা প্রায়শই গাওয়া হত। পরে গীতিকবিতার সাংগীতিক গুণকে স্বীকার করার পরে, এরকম কবিতা যে সবসময় গানের জন্যই রচিত হচ্ছে সেকথা বলা গেল না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গীতিকবিতার ক্রমবিকাশ ঘটল এবং রোমান কবি কাতুল্লাস থেকে শুরু করে ইংরেজ কবি শেক্সপিয়ার, রোমান্টিক কবি ওয়ার্ডর্সওয়ার্থ, শেলি, কিটস থেকে শুরু করে আধুনিক কবি পো অথবা হাইনে, বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে জীবনানন্দ অথবা বুদ্ধদেব বসু পর্যন্ত সকলেই গীতিকবি রূপে পরিচিতি লাভ করলেন। স্বভাবতই যুগ থেকে যুগান্তরে কবি থেকে কবিতে গীতিকবিতার সূক্ষ্ম রূপান্তর ঘটতে থাকল।

পো-র বিখ্যাত সংজ্ঞা গীতিকবিতাকে অবশ্যই সংক্ষিপ্ত হতে হবে। আয়তনের সংক্ষিপ্ততা, ছন্দের সুষমা, আত্মমুখীনতা, আবেগের তাপ, সৌন্দর্যউপভোগ ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনা, ইমেজ ও তুলনার সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য গীতিকবিতার মূল গুণাবলি বলে নির্দেশিত হয়। গীতিকবিতার বিখ্যাত সংগীতধর্ম শেষপর্যন্ত শব্দধ্বনি ও ছন্দসৌকর্যকে আঁকড়ে ধরল, অর্থের এক আলোআঁধারি আভাসময়তায় নতুন অবয়ব পেল, গীতিকবি নিজের আত্মের গভীরে ডুব দেবেন—কবিতার এই মর্মকথা রোমান্টিক কবিতা থেকে আধুনিক কবিতার জগতে সমানভাবেই বিকীর্ণ হল। এসব কথা মনে রেখেই জেমস জয়েস গীতিকবিতার সংজ্ঞা দিয়েছিলেন "Lyrical poetry is the form where in the artist presents his image in immediate relation to himself"—গীতিকবিতায় কবিশিল্পী তাঁর চিত্রকল্পগুলিকে নিজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কেই স্থাপিত করেন। এজন্যই হার্বার্ট রিড বলেছিলেন, গীতিকবিতা নিছক আবেগকে প্রকাশ করে না, আবেগময় মানসিক অবস্থারই কল্পনাময় রূপটিকেই ফুটিয়ে তুলতে চায়—"Hence in lyrical poetry what is conveyed is not mere emotion, but the imaginative prehension of emotional state."।

বিংশশতকের গীতিকবিতার সংজ্ঞা এভাবেই দেওয়া যায় "In its modern meaning a lyric is a type of poetry which is mechanically representational of a musical architecture and which is thematically representational of the poet's sensibility as evidenced in a fusion of conception and image." ('Princeton Eneyclopedia of Poetry and Poetics')—গীতিকবিতার একটি সাংগীতিক অবয়ব আছে অর্থাৎ ছন্দের সুনির্দিষ্ট ব্যবহার ইত্যাদি এখানে এবং ভাবের বিষয়ের দিক থেকে কবির অনুভূতি ও স্বরচিত চিত্রকল্পের মিলনমিশ্রণ সে প্রকাশ করছে। আধুনিক কবিতায় কল্পনার বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহারই পরিলক্ষিত হয়। লোরকা, উনগারেত্তি, মনতালে, অডেন, ফ্রস্ট, ওয়ালেশ স্টিভেনস প্রভৃতি কবিরা এ পথেরই যাত্রী হয়েছেন। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'শেষের রাত্রি' কবিতায় গীতিকবিতায় এই বুদ্ধিদীপ্ত পথেরই যাত্রী।

৯.১২.৪ গীতিকবিতা হিসাবে 'শেষের রাত্রি'

একটি উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা হিসেবে 'শেষের রাত্রি' কবিতাটির বিশ্লেষণ অবশ্যই সম্ভব। এ কবিতা আয়তনে আঁটসাট মুক্তানিটোল, ছন্দের অপূর্ব সুষমাসংগতি এ কবিতার আঙ্গিকগত মেরুদণ্ডের মতো বিরাজ করছে।

উত্তপ্ত আবেগ, sensuousness বা ইন্দ্রিয় দিয়ে সৌন্দর্যউপভোগের আকৃতি, ইমেজ বা চিত্রকল্পের বুদ্ধিদীপ্ত উপস্থাপনা ও উদ্ভাসন সবই এ কবিতায় আছে। কিন্তু সবকিছুই কবিতাত্মের সঙ্গে জড়িত মিশ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে কারণ গীতিকবিতার ভাবগত অর্থ সবসময় কবিতাত্মের ক্রমবিকাশকে আলিঙ্গান করেই গড়ে ওঠে। বক্তব্যের সমর্থনে প্রথম স্তবকটি উদ্ধৃত করছি

পৃথিবীর শেষ সীমা যেইখানে, চারদিকে খালি আকাশ ফাঁকা,
আকাশের মুখে ঘুরে-ঘুরে যায় হাজার-হাজার চাঁদের চাকা
যোজনের পর হাজার যোজন বিশাল আঁধারে পৃথিবী ঢাকা।
(তোমারই চুলের মতো ঘন কালো অন্ধকার ;
... ...
তবু চলে এসো ; মোর হাতে হাত দাও তোমার—
কঙ্কা, শঙ্কা কোরো না)

ছন্দের বৈভব বৃন্তের মতো ধারণ করে আছে চিত্রকল্পের গোলাপকে, মিলের ঝংকারের সঙ্গে মিশে গেছে ইন্দ্রিয়াত্মক সৌন্দর্যের নিখুঁত পাপড়ি-বিন্যাস। 'চাঁদের চাকা' যা ঘূর্ণ্যয়মান এবং নায়িকার চুলের মতো ঘন কালো অন্ধকার—এই দুটি প্রধান চিত্রকল্প কবির আত্মস্মৃতির পথ ধরেই এসেছে। প্রেমিক প্রিয়ার পাণিপ্রার্থনা করে, এই হচ্ছে মূলকথা। গীতিকবিতা যে কবিব্যক্তিত্বেরই সৃষ্টিশীলতার বাসরউদযাপন, শিল্পের সঙ্গে সৌন্দর্যের সঙ্গে কবিতাত্মের শাশ্বত বিহার তা আবার সপ্রমাণ হল। আধুনিক লিরিকের বহিরঙ্গে যদি থাকে ছন্দের দোলা ও শব্দের ঝংকার তবে তার অন্তরঙ্গে থাকে ভাবের সাংগীতিক আভাসময়তা তা আলোচ্য কবিতায় বহুলভাবেই রয়েছে।

৯.১২.৫ কবিতায় শরীরী আবেদন

মিলনবিরহ, জীবন ও মৃত্যু, স্মরণ ও বর্তমানের যুগল ঝংকারে রচিত 'শেষের রাত্রি' কবিতার আর একটি বৈশিষ্ট্য এখানে রয়েছে যৌনতার মৃদু সুরভি, শিল্পে আচ্ছাদনে ঢেকেই শারীরিক তৃষ্ণাবিহ্বলতা, মানুষের অন্তর্লীন অমোঘ যৌনতাকে প্রকাশ করা হয়েছে। চতুর্থ স্তবকটি প্রাসঙ্গিকভাবে আনুপূর্বিক উদ্ধার করছি :

অনেক ধূসর স্মরণের ভারে এখানে জীবন ধূসরতম,
ঢালো উজ্জ্বল বিশাল বন্যা তীব্র তোমার কেশের তম,
আদিম রাতের বেণীতে জড়ানো মরণের মতো এ-আঁকাবাঁকা
(ঝড় তুলে দাও জাগাও হাওয়ার ভরা জোয়ার,
পৃথিবী ছাড়ায়ে, সময় মাড়ায়ে যাবো এবার,
তোমার চুলের ঝড়ের আমরা ঘোড়সওয়ার—
কঙ্কা, শঙ্কা কোরো না।)

নারীর উদ্দাম কালোচুলের ঝড়ের ঘোড়সওয়ার তৃষ্ণামগ্ন পুরুষের চিত্রকল্প কবিতাপ্রিয় পাঠকের স্মরণে নিয়ে আসবে ভূমধ্যসাগরীয় আসঙ্গমদিরামাখা প্রিয়কবি লোরকা-র পাঠস্মৃতি—"সেই রাতে আমি সাদা ঘোড়ায় চেপে একটা সেরা রাস্তা দিয়ে গিয়েছিলাম, আমার লাগাম ছিল না রেকাব ছিল না। সে আমাকে যে সব কথা বলেছিল, পুরুষ হিসেবে আমি তা ফিরে বলতে পারবো না। বোঝাপড়ার আলো পেয়ে আমি অত্যন্ত বিজ্ঞ হয়ে গেছি। চুমা ও বালুতে মাখামাখি তাকে আমি নদীর পার থেকে নিয়ে গেছি আরো দূরে। লিলিফুলের তরবারি তখন বাতাসের সঙ্গে সংগ্রামরত ছিল।' (La Casada Intiel : Lorica—'Selected Poems,' translated by J.L. Gili; Penguin) এখানেও পাচ্ছি প্রেমিকের নির্ভীক কামনার আত্মপ্রকাশ ও অশ্বারোহণের চিত্রকল্প।

৯.১২.৬ চুলের চিত্রকল্প

'শেষের রাত্রি' কবিতাটির আর একটি বৈশিষ্ট্য নারীসৌন্দর্যের অন্যতম আধার ও উৎসভূমি রূপে তার মাথার ঘন কালোচুলের প্রশস্তি। শুরুতেই পাচ্ছি—'তোমারি চুলের মতো ঘন কালো অন্ধকার' এমত বাক্যব্যবহার ; তৃতীয় স্তবকে পাচ্ছি 'তোমারি চুলের বন্যার মতো অন্ধকার' ; মূল উদ্দিষ্ট পূর্বউল্লিখিত পঞ্চম স্তবকে নারীর চুলই হচ্ছে কেন্দ্রীয় চিত্রকল্প, কালো চুলের বিশাল বন্যা ও তীব্র কালো অন্ধকার আদিম রাত্রির বেণিতে লগ্ন মৃত্যুকে মনে করিয়ে দিচ্ছে—ভালোবাসা যেন মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করে ধাবমান অজানা বিশাল প্রান্তরে জয়ী হচ্ছে। 'তোমার চুলের ঝড়ের আমরা ঘোড়সওয়ার/কঙ্কা শঙ্কা কোরো না' এই আবেগবাণী লোরকার ঘোড়সওয়ার-এর সঙ্গে তুলনায় স্থাপিত হতে পারে।

প্রেম ও যৌনতার অনুষঙ্গারূপে চুলের চিত্রকল্প এ কবিতার শেষতম স্তবকেও রয়েছে—'তোমারি চুলের মনোহীন তমো আকাশে-আকাশে চলছে উড়ে/আদিম রাতের আঁধারবেণীতে জড়নো মরণপুঞ্জ ফুঁড়ে।' বুদ্ধদেব বসুর প্রিয় ফরাসি কবি, যাঁকে বলা হয়েছে আধুনিকদের মধ্যে প্রথমতম, সেই শার্ল বোদলেয়ার-এর কবিতাতেও রমণীর মণিমুকুটিত শির-আলগ্ন চুলের স্তব রয়েছে। চুল এখানে যৌনতার ভাবানুষঙ্গারূপেই ব্যবহৃত হয়েছে। আমি বিখ্যাত La Chevelure বা 'চুল' নামক কবিতাটি প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপন করছি। তোমার চুলে শ্লথালস এশিয়া, আফ্রিকা ঝলসায়, তোমার গভীরে সুগন্ধ অরণ্য বাসা বেঁধেছে, তোমার গন্ধের সংগীতের উপর পাল তুলে ভেসে চলে আমার ভালোবাসা। এই সেই বন্দর যেখানে আমার আত্মা পান করে রঙ, গন্ধ ও ধ্বনি। রেশমঢেউ-এ এখানে নৌকা ভাসে, এখানে দিব্যভূমির অধিবাস, নিষ্কলুষ আকাশভরা উষ্ণতার অশেষ উদযাপন এইখানে। আমি প্রেমের আবেগে মাতাল আমার মাথা ডুবিয়ে দিয়েছি এই আঁধার সাগরে, তুমি উর্বর অলসতা, সুগন্ধি ছুটির আমন্ত্রণ। তোমার ভিতর নারকেল তেল, কস্তুরী আর আলকাতরার মিশ্র নেশা (Baudelaires-'Selected Poems', Penguin) বলাবাহুল্য বোদলেয়ার-এর এই প্রিয় রমণীর চুলের স্তবগান বুদ্ধদেব বসুর রচিত প্রেয়সী কঙ্কা-র কালোচুলের স্তবগানের পাশে সমান্তরালভাবে স্থাপিত হতেই পারে। এখানে রূপরসগন্ধস্পর্শস্বাদের ইন্দ্রিয়সমূহ যেন পস্পরের সঙ্গে নিরন্তর বার্তা বিনিময় করছে।

৯.১২.৭ রোমান্টিক আবেগ ও 'শেষের রাত্রি'

আগেই বলেছি 'শেষের রাত্রি' পড়তে পড়তে মনে হয় যেখানে রোমান্টিক কবিতার শেষ সেখান থেকে এ কবিতার শুরু, এ কবিতায় যেন শেলি আর বোদলেয়ার, পেত্রার্ক আর হাইনে পাশাপাশি অবস্থান করছেন। শেলি-র 'দ্য ইন্ডিয়ান সেরিনাড'-এর প্রণয়মত্ততা, পেত্রার্ক-এর লরা নামক নারীকে উদ্দেশ্য করে রচিত সনেটসমূহের মহৎ মাধুরী, বোদলেয়ার-এর দেহকামনার আর্তি ও দেহঅতিক্রান্ত শিল্পের সন্ধানএষণা হাইনরিশ হাইনে-র নারীর ভিতর অমৃতের অনুসন্ধান প্রবৃত্তি সবই যেন প্রিয় বাঙালি কবির কবিতাশিল্পে অভ্রান্তভাবে ফুটে উঠেছে। এককথায় এ কবিতা প্রেমের কবিতার মহৎ গুণাবলি ও প্রাণপ্রাচুর্যে পূর্ণ।

এ কবিতায় কবি প্রেমকে মহাবিশ্বে মহাকালে আলোকিত যাত্রায় বিস্ময়ভ্রমণে, আত্মানুভূতির চরম ও পরম কেন্দ্র স্থলে স্থাপন করেছেন। এইবাবে ঘটেছে প্রেমের উত্তরণ বা Sublimation, ফুরিয়ে যাওয়া যার ছিল নিয়তি তারই ভিতর অনন্তের অযুত লাবণ্য ও সম্ভাবনা জেগে উঠেছে। তাই এ কবিতার পৃথিবীর শেষ সীমানা ও শূন্য আকাশ, যোজন যোজন বিস্তৃত অন্ধকার, দিগন্ত থেকে দিগন্ত বিস্তৃত ধরণির ধূসরিমা, অজস্র চাঁদের উতরোল মেদুরতা, প্রেমের সময়ের সময়হীন হয়ে ওঠা, পৃথিবী ছাড়িয়ে সময় মাড়িয়ে মহাসময়ের কক্ষবিন্দুতে নশ্বরের নিক্ষিপ্ত হওয়ার সংবাদ, কোটি সূর্যের জ্যোতির নৃত্য ও কোটি সূর্যের মৃত্যুর বিবর্তন-ইতিহাস, মৃত্যু ও সময়কে বিদীর্ণ করে এক মৃত্যুহীন সত্তা ও সময়ের জাগরণের কথা এক অপূর্ব লিরিক বাতাবরণ লাভ করেছে।

এ কবিতার সর্বাঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে রোমান্টিক কবিতার আলেপন—কিন্তু ওই অমোঘ রোমান্টিকতাকে ধ্বংস ও বিদীর্ণ করেই এ কবিতায় আধুনিকতার উদয়।

৯.১০.৮ আধুনিক কবিতার শিল্পতত্ত্ব ও 'শেষের রাত্রি'

আধুনিক কবিতার শিল্পতত্ত্ব 'শেষের রাত্রি' কবিতায় ভাবনা ও আঙ্গিক দুদিক থেকেই এসেছে। 'চুল' কেন্দ্রীয় চিত্রকল্প বা Imangery হয়েছে—এখানে পাচ্ছি ভাবনার বৈপ্লবিক নতুনত্ব আবার আঙ্গিতগত দিক থেকে দেখি প্রতি স্তবকের শেষ চারটি পঙ্‌ক্তিতে মূলত Refrain বা ধুয়ার ব্যবহার। এই পদ্ধতি আধুনিক কবিতায় পো-প্রভৃতি কবিরা তুমুল সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। উদ্দেশ্য একই বিষয়কে বার বার ক্লান্তিহীন ঘুরে ঘুরে বলে এক ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্রপূত আবেশ রচনা করা ও শব্দের চারুশক্তিতে আস্থাবান হয়ে ওঠা। এডগার অ্যালান পো-র বিখ্যাত 'The Raven' কবিতা থেকে উদাহরণ দিচ্ছি—

It shall clasp a sainted maiden whom the angels name Lenore
Clasp a rare and radiant maiden whom the angels name Lenore
Quoth the Raven, "Nevermore"

কবির আত্মাকে অন্ধকারের দূত বিহঙ্গ বায়স বলেছিল উজ্জ্বল অতুলনীয়া কুমারীকে তুমি কখনও পাবে না আর এই Refrain বা ধ্রুবপদটিই কবিতার বহু স্তবকে ঘুরে ঘুরে এক মন্ত্রময় কুহকের আবেশ তৈরি করেছে। কবিরা এই কৌশলটি শিখেছেন রূপকথা-লোককথার কবিদের কাছ থেকে। বস্তুত বুদ্ধদেব "রূপকথা" শব্দটির ব্যবহার পর্যন্ত করেছেন—

এসেছিলো, যত রূপকথা-রাত ঝরেছে হলদে পাতার মতো,
পাতার মতন পীত স্মৃতিগুলি যেন এলোমেলো প্রেতের মতো,
—রাতের আঁধারে সাপের মতন আঁকাবাঁকা যত কুটিল শাখা।

'প্রেত', 'সাপ' ইত্যাদির অনুপুঙ্খ ব্যবহারে আধুনিক কবিতার বিখ্যাত 'Aesthetics of the ugly' বা কুৎসিতের নন্দনতত্ত্বের আভাস মেলে। অর্থাৎ এখানে সুন্দর ও অসুন্দরের পাশাপাশি সমভূমিক সমাবেশ ঘটানো হয়েছে এবং এই সজোরে সমাহৃত বৈপরীত্যের ভিতর দিয়ে সৌন্দর্য উৎপাদন করা হয়েছে। আরো মনে পড়ে যায় বুদ্ধদেব বসুর নায়িকা-নাম কঙ্কা—কঙ্কাবতী এসেছে রূপকথা-লোককথার নায়িকা নাম থেকেই।

অনেক কবিই নারীনামকে তাঁদের প্রেমকবিতায় মন্ত্রের মতো অনিবার্যতা দিয়েছেন। সিলভিয়া, হেলেন, এলসা ইত্যাদি নামের নায়িকাদের পাই লিওপার্দি, পো, আরাগঁ প্রভৃতি কবিদের কবিতায়। বঙ্গীয় কবির নারী নায়িকার প্রিয় নাম কঙ্কাবতী, কখনো বা সুরঙ্গামা ('নাগরদোলা')।

৯.১৩.১ বিষ্ণু দে-র কবিতা : জল দাও

'অন্বিষ্ট' কাব্যের 'জল দাও' কবিতাটি ১৯৪৬-৪৭-এ রচিত এবং পাঠকের কাছে বিষ্ণু দে-র একটি সেরা কবিতা বলে গণ্য। পূর্ববর্তী 'এলসিনোরে' কবিতাটির অলৌকিক গীতি-আবেদনের ঠিক পরেই এই কবিতাটি তার সংহত গম্ভীর আবেদন নিয়ে আমাদের বোধের দরজায় কড়া নাড়ে। এই দীর্ঘ কবিতা একদিকে 'অনিষ্ট' নামক দীর্ঘ নামককবিতাটির সমগোত্রীয়, অন্যদিকে 'অন্বিষ্ট'-এ যেমন মূল অবলম্বন অক্ষরবৃত্ত-মিশ্র কলাবৃত্তের পাশাপাশি মাত্রাবৃত্ত-কলাবৃত্তের সূক্ষ্ম কারুকাজ দেখা যায়, 'জল দাও'-এ অবশ্য সেই ছন্দবৈচিত্র্য অনুপস্থিত সম্পূর্ণ কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত-মিশ্রকলাবৃত্তের ছন্দআঙ্গিককে অবলম্বন করে দাঁড়িয়ে আছে।

৯.১৩.২ বিষ্ণু-দের কবিতায় মার্কসবাদী দর্শন

বিষ্ণু দে-র কবিতায় মার্কসবাদী দর্শন প্রভাব রয়েছে। সমষ্টির মুক্তিতে কবি প্রথমাবধি আস্থাবান কিন্তু একই সঙ্গে কবিমানসের ভিতর ভিতরে ব্যক্তির মুক্তি ব্যাকুল ছায়াসম্পাত করেছে। তাই বিষ্ণু দে-র সমগ্র কাব্যে বিপ্লব ও প্রেম, ব্যষ্টি ও সমষ্টি, ধ্বংস ও নির্মাণ, সমাজচেতনা এবং অবচেতনা মিলেমিশে এক বিচিত্র মোজেইক অথবা যুগ্মবেণি রচনা করেছে. মূল মার্কসীয় প্রত্যয় ছেকেই 'অন্বিষ্ট'-র যাত্রারম্ভ—"The history of all hitherto existing society is the history of class struggle." —কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর এই প্রাথমিক বাক্যটি মনে পড়ে যায়। শ্রেণিসংগ্রামের আগুনে উত্তাপ পোহাতে চেয়েছেন স্বদেশে ও বিদেশে যেসব কবিরা-সুকান্ত ভট্টাচার্য, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মায়াকোভস্কি, আরাগঁ, এলুয়ার, বেরটোল্ড ব্রেশট, লোরকা, নেরুদা প্রমুখ—বিষ্ণু দে এক হিসেবে তাঁদেরই সংঘভুক্ত। কিন্তু এইসব সাম্যবাদী কবিদের মধ্যে তিনি বিশিষ্ট অর্থে ভাবুক ও রোমান্টিক, তাঁর কবিতায় কঠোরতা অপেক্ষা কোমলতার অনুপাত স্বভাবতই বেশি এবং এই অর্থে ব্রেশট অথবা মায়াকোভস্কির চেয়ে এলুয়ার-এর কিছু নৈকট্যে তিনি, আরাগঁ-লোরকা-নেরুদা-র প্রতিরোধের কবিতাবলিরে চেয়ে, প্রেমের কবিতার সঙ্গে সহমর্মিতায় তাঁর অবস্থান। অতএব 'অন্বিষ্ট'-এ 'আমারও অন্বিষ্ট তাই/অনুর সংহতি' ('অন্বিষ্ট') এই তাত্ত্বিক ও সংগ্রামী উচ্চারণের পর বঙ্গীয় কবি অনায়াসে 'এলসিনোরে' কবিতার—

তুমি যৌবন জীবন মূর্তিমতী
ভাস্বরতনু তুমি আগামীর সতী
তুমি নির্মাণ দূতারার গান

ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিতে গীতিমুখর প্রেমচেতনার ব্যক্তিগত অলকাপুরীতে উপনীত হতে পারেন, অন্তত বিষ্ণু দে-র মধ্যে এই দুটি ভাবপ্রকরণের কোনো বিরোধ অথবা সংঘাত নেই। 'জল দাও' কবিতাতেও বিপ্লব ও প্রেম, সামাজিক অসুস্থতা ও ব্যক্তিগতের তুমুল আশাবাদ অনায়াস সহাবস্থান করে। 'জীবনে মৃত্যুতেদ কিম্বা মৃত্যুতে জীবনে ভগ্ন ব্যর্থ অসহায়/কি যে ভাবে কর্মহীন অর্থহীন অচেনা স্বদেশ' অথবা 'হয়তো বা নিরুপায়/হয়তো বা বিচ্ছিন্নের যন্ত্রণাই, বর্তমানে ইতিহাস/বালিচড়া মরা নদী জলহীন পায়ে পারাপার' প্রভৃতি যে অসুস্থ সময়ের বীক্ষণ বিশ্লেষণ—তা শেষ পর্যন্ত পরিণামরমণীয়তা পায়—

তোমাতেই বাঁচি প্রিয়া
তোমারই ঘাটের গাছে
ফোটাই তোমারই ফুল ঘাটে ঘাটে বাগানে বাগানে

এই তিন পঙ্‌ক্তির প্রাক্‌অন্তিম স্তবকটির ভাবনির্মিতির অসামান্যতায়।

অতএব সহজেই অনুমিত 'জল দাও' কবিতাটি গড়ে উঠেছে দুটি বিপরীতমুখী প্রবণতার দ্বন্দ্ব অথবা টানাপোড়েন এখানে পাশাপাশি মিশে গেছে পাবলো নেরুদা-র কবিভাষা থেকে ধার নিয়ে বলতে পারি 'Syllables of fear and tenderness'—ভয় ও কোমলতার অক্ষরগুলি। নেরুদার অসামান্য কবিতাটি 'Furiasy las penas' : 'Furias and sufferings'-পাঠক যদি পাঠ করেন, 'জল দাও' কবিতাটির সঙ্গে এর একটি তুলনা বা প্রতিসাম্য রচনায় তিনি প্রলুব্ধ হতে পারেন। বিষ্ণু দে-র কবিতায় গ্রীষ্মআবহ এবং দাঙ্গাবিধ্বস্ত ১৯৪৬-৪৭-এর কলকাতা, নেরুদার ১৯৩৪-এ লেখা, কবিতাটিতে পাচ্ছি ধ্বংসবিকীর্ণ স্পেনের নাভিশ্বাস, কাব্যের অক্ষর যথার্থই হয়ে উঠেছে রক্তাক্ত। এখন পৃথিবী কত বদলে গেছে তাই কবিতাও বদলে যাবে, কবি স্বপ্ন দেখছেন এতটুকু কবিতা অথবা ভালোবাসা দিয়ে পৃথিবীর সমুদ্যত ঘৃণা ও মৃত্যুকে জয় করবেন। মানুষের

হাতে মানুষের দমনপীড়ন স্পেনীয় ভাষার এই সাহসী কবির হৃদয়ে ঘনিয়ে এনেছে নির্বাসিতের অসহ্য যন্ত্রণা, অন্ধকার ও বিরক্তির ফুটন্ত জ্বালা "And am I then truly exiled/While a rive of burning water passes in the dark?" এরই বৈপরীত্যে স্থাপিত হয়েছে প্রিয়তমার চিত্রোপমা, গোলাপের বনে ঝড় উঠল 'exactly as the sapphire of lunar avarice/you tremble from your lovely navel up to the roses' —এভাবেই দ্বন্দ্ববিদীর্ণ মানস পৌঁছাতে চেয়েছে বিশ্বাসের উপকূলে। একই সমান্তরাল মানসক্রিয়া বিষ্ণু দে-তে দেখতে পাচ্ছি। দাঙ্গাবিধ্বস্ত দেশজাতিকাল কবিকে মানবতার অবক্ষয়ের বোধে দিশাহারা বিপর্যস্ত করেছে। অবিশ্বাসের এই সমুদ্যত ফণা গ্রীষ্মদহনের নিষ্ঠুর পরিপ্রেক্ষিতে সোচ্চার প্রকট—'হয়তো বা যন্ত্রণাই সার/....অত্যাচারে অনাচারে উদ্ভ্রান্ত উন্মাদ এই বর্তমান।' কিন্তু শেষ সত্য দাঙ্গার খবর নেয়, শেষ সত্য রাত্রির নক্ষত্রে যার তুলনা, প্রকৃতিস্থ অস্তিত্বের একরাশ সাদা বেল ফুল। এই নক্ষত্র ও বেলফুল আসলে প্রেম ও প্রিয়ার প্রতীক—যার অনুধ্যানে কবি খুঁজে ফেরেন প্রার্থিত সমাধান। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, মেশিনগানের সামনে জুঁইফুলের হাসির কথা, জীবনের সেই চিরন্তন জয়শক্তির কথাই বিষ্ণু দে বলছেন কিছু ভিন্নভাবে।

'জল দাও' কবিতাটির শুরুতে ফাল্গুন ও মাঘ বৎসরকাল হিসেবে উল্লেখিত। স্মরণে আসে বিষ্ণু দে-র এক অনন্য গীতিমুখর উচ্চারণ : 'সেদিন আমার বাসা ছিল মাঘ ফাগুনে/বিভোল সে গানে কালের ত্রিতাল কে শোনে' ('হোমরের ষট্‌মাত্রা')। এই বসন্তউল্লেখ যা কবিতাপ্রারম্ভে অবশ্যই ব্যঞ্জনাময়। আলোচ্য কবির কবিতায় সংগীতের স্বর ও শ্রুতি চিত্রের সূক্ষ্ম রংস্তর সাংকেতিক কবিতার শিল্পের বিনিময়কে তত্ত্ব থেকে প্রয়োগে নিয়ে আসে। 'গন্ধের আলাপ', 'পরাগের পাখোয়াজ' প্রভৃতি সাংগীতিক অনুষঙ্গ এক বিশেষ স্বাদুতা এনেছে, এভাবেই কবিতায় সঞ্চারিত হয় সংগীতের ধর্ম এক বিশেষ ধরনের আভাসময়তা যার এক মহোত্তম পরিণতি দেখি অন্যত্র 'জন্মাষ্টমী' কবিতায় বিঠোফেনীয় আকাশে। সুরের মাধ্যমে রূপবৈচিত্র্য যে সংহতি লাভ করে বাকস্রষ্টা বাণীপুরোহিত কবিরা তাই হল অভীষ্ট। অতএব 'বসন্তবাহার' নামক দ্বিতীয় স্তবকের শব্দ ব্যবহার শুধু রাগরাগিণী নাম নয় সেখানে আছে বসন্তপ্রকৃতির বহুমুখী স্পন্দনের একমুখী রূপান্তরের আত্মিক আকাঙ্ক্ষা।

৯.১৩.৩ হিন্দুমুসলিম দাঙ্গার পটভূমি ও বিষ্ণু দে

স্পেনের গৃহযুদ্ধ চিলির কবি পাবলো নেরুদা-কে দুঃখমগ্ন করেছে আর বিষ্ণু দে বিষাদগ্রস্ত হয়েছে ১৯৪৬-৪৭-এর রক্তক্ষয়ী হিন্দুমুসলমান দাঙ্গার কারণে যা কলকাতাকে পরিণত করেছিল নরকে। এইখানে পাই সমাজচেতনার অভিঘাত। বন্ধু কিংবা বইয়ের আশ্রয়ের থাকা মসৃণ মনে হঠাৎ তির্যক বিভাজনরেখা এনে দেয় দাঙ্গার খবর। গ্রীষ্ম-আক্রান্ত কলকাতার দগ্ধ পটভূমি ভরে তুলছে অসংখ্য ঘরছাড়া দেশহারা মানুষ, বিশাল ভারতবর্ষের ভিতর থেকেও তারা অকস্মাৎ বিচ্ছিন্ন শিকড় :

এখানে ওখানে দেখ দেশছাড়া লোক ছায়ায় হাঁপায়
পার্কের ধারে শানে পথে পথে গাড়িবারান্দায়
ভাবে ওরা কি যে ভাবে। ছেড়ে খোঁজে দেশ
এইখানে কেউ বরিশালে কেউ কেউ বা ঢাকায়।

'মৃত্যুতে জীবনে ভগ্ন ব্যর্থ অসহায়' এইসব মানুষ 'কর্মহীন অর্থহীন অচেনা স্বদেশ' অন্বেষণ করে ফেরে। দেশভাগকালীন এই রক্তাক্ত ইতিহাস হোসেন মান্টো, খুশবন্ত সিং প্রমুখের কোনো কোনো গল্পে উপন্যাসে আছে। জীবনানন্দ দাশের '১৯৪৬-৪৭'-এর মতো কবিতায়ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতি কবিমননে নৈরাশ্যের সঞ্চার করছে। জীবনানন্দ সারা দেশজুড়ে দেখেছেন অন্ধকার হতাশা, শেষ পর্যন্ত বিবর্তনের পথে নিখিল মানবের

ঊর্ধ্বগতি দেখে আশ্বস্ত ও আশাবাদে স্থিত হয়েছেন ; অন্যদিকে বিষ্ণু দে নৈরাশ্যের সংকেতরূপে উপস্থাপিত করেছেন গরমে বিনষ্ট দেশ ও সত্তাকে, প্রেমের এমনকী ব্যক্তিগত প্রেমের অনুধ্যানে তিনি সমাধান ও মুক্তি খুঁজেছেন। পাস্তেরনাক সম্বন্ধে যেমন বলা হয়েছে "The theme of love is constant in Pasternak" (J. M. Cohen : 'Poetry of this Age'), তেমনই বলতে পারি প্রেমভাবনা বিষ্ণু দে-র কবিতার এক মুখ্য উপজীব্য। অতএব 'জল দাও' অন্তরঙ্গো প্রেমের কবিতা বলেও গণ্য হতে পারে।

আমি দূরে কখনও বা কাছে পালে পালে কখনও বা হালে
তোমার স্রোতের সহযাত্রী চলি ভোলো তুমি পাছে
তাই চলি সর্বদাই
যদি তুমি ম্লান অবসাদে
ক্লান্ত হও স্রোতস্বিনী অকর্মণ্য দূরের নির্ঝরে
জীয়াই তোমাকে পল্লবিত ছায়া বিছাই হৃদয়ে

কিন্তু জীবনানন্দ অথবা সুধীন্দ্রনাথের মতো কবিরা যেখানে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সরণি দিয়ে যাত্রা করে প্রেমসম্পর্কিত তীব্র আত্মগত ধারণায় উপনীত হন বিষ্ণু দে-র মতো কবি সেখানে সমাজঅভিজ্ঞতার পথে যাত্রা করে এবং গোষ্ঠীচেতনাকে মেনে নিয়ে এসে পৌঁছান প্রেমসম্পর্কিত উত্তরণে এবং এই লব্ধ অভিজ্ঞতাকে আত্মগত বলতে বাধা নেই।

মার্কস-এর সাম্যবাদ বিষ্ণু দে-র কবিতার ভাববস্তুকে সামগ্রিকভাবে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু ফ্রয়েড-এর সাইকো-অ্যানালিসিস বা মনোবিকলনের তত্ত্ব কবির আঙ্গিক নির্বাচন ও চিত্রকল্পকে বৈপ্লবিকভাবে বদলে দিয়েছে, তাঁর সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কিত ধারণাকে দিয়েছে গতিবেগ। জীবনসম্পর্কিত এই নূতন মনোভঙ্গি বিষ্ণু দে-র কাব্যে সুররিয়েলিজমের বিস্তার ঘটিয়েছে। বিশ্বকবিতার দুই বিখ্যাত কবি আরাগঁ এবং এলুয়ার-এর মতো বিষ্ণু দে-র কবিতাও সাম্যবাদ এবং সুররিয়ালিস্ট প্রবর্তনা বা অবচেনাবাদের যৌথ সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। ভাবের মুক্তি, ছন্দের মুক্তি, বুদ্ধিযুক্তির উপর কল্পনাকে প্রতিষ্ঠা, স্বপ্ন এবং স্বতঃস্ফূর্তি এসবই আলোচ্য কাব্যকবিতায় খোঁজা হয়েছে।

১৯৪৩ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধবিদীর্ণ পৃথিবীতে জার্মানির প্যারিস-অবরোধের বিপক্ষে এলুয়ার লিখেছিলেন প্রতিরোধের কবিতা। 'Enterrar y caller' ('Bury and be Silent') কবিতায় কবি শেষ পর্যন্ত জার্মানির অত্যাচারের তীব্র দুঃখমুহূর্তেও তাকিয়েছিলেন এক নূতন ভোরের দিকে। প্রবল দুঃখবিস্তারকেও ঢেকে দেয় এই সমাগত প্রভাত। আশা ও হতাশাকে যুগপৎ ছুঁয়ে এই উদিত মুহূর্ত অমর হয়ে ওঠে। মর্তধুলায় প্রেম ও ঘৃণা, নগ্ন দিবালোকে ভালোবাসা পুড়ে যাচ্ছে, তবু এই পৃথিবীতে কবি শাশ্বত অভিজ্ঞতা হিসেবে আশাকেই বেছে নিচ্ছেন। অনুরূপ ভাবক্রিয়া 'জল দাও' কবিতায় এবং সামগ্রিকভাবে বিষ্ণু দে-র কাব্যে রয়েছে। 'উন্মারে ব্যবসা', 'গৃধ্নু দানবিক সিংহকণ্ঠ', 'হয়তো বা যন্ত্রণাই সার', 'অত্যাচারে উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদ এই বর্তমান' ইত্যাদি উচ্চারণ সময়ের সুস্থিতির অভাবজনিত যে অস্তিত্বের সংকটকে প্রকাশিত করছে, তারই শুশ্রূষার জন্য শেষ পর্যন্ত উদ্‌গীত হয় বিশ্বাসের ইতিমূলক বাণী :

তবু আমি খুঁজিনি বিষাদ
সোনালি চাঁদের এই নীল নির্বিকার আলোর বন্যায়
বরঞ্চ গুণেছি দেশে দেশে লক্ষ্মীমন্ত সচ্ছল সুঠাম

গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে, বিস্তৃত শান্তির বর্ষা

অথবা

একাকার মুহূর্তে তখন চুড়ায়িত ক্ষণে সাম্প্রতিক
অতীত ও আগামীর গান
প্রাত্যহিকে প্রাত্যহিকে
পলিতে উর্বর দিকে দিকে মানসে শরীরে
জীবনে জীবন।

'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' গ্রন্থে সংকলিত 'বাংলা সাহিত্যে প্রগতি' প্রবন্ধে বিষ্ণু দে একটা মূল্যবান কথা বলেছেন, 'আপন সমস্যাকে শুধু নিজের মনে গহ্বর নিষ্ক্রান্ত স্বয়ম্ভু জীব না ভেবে, সে যে ইতিহাসব্যাপী সমস্যারও অংশ এই উপলব্ধির নিয়ত চর্চা লেখকের প্রস্তুতির সহায়'। বলা বাহুল্য ইতিহাসচেতনা এই কবির ভিতরে ভিতরে অন্তঃসার রূপে অবস্থান ঘোষণা করেছে। সাঁ জঁ পার্স অভিনেত্রী মানবসভ্যতার বিপুল অগ্রগমনকে তাঁর 'আনাবাস' কাব্যে ও অন্যত্র লিপিবদ্ধ করেছেন। দৃষ্টিকোণ কিছুটা ভিন্ন হলেও বিষ্ণু দে সময় এবং ইতিহাসের এই অভিযাত্রা এবং যাত্রীমানুষের ক্রমাগত পথিকপরিচয় সম্পর্কে সচেতন এবং এই ঐতিহাসিক ঐতিহ্যসচেতনতা তাঁর কবিতা মহিমান্বিত হয়ে ওঠার একটা কারণ। দেশছাড়া অগণিত মানুষের বিপুল মিছিল যা মহানগরীর পথে রক্তাভ রৌদ্রে বিপন্ন বেপথু তারই ভিতর প্রতিবিম্বিত কালের যাত্রার ধ্বনি।

কারণ দেখেছে সব গোবি মরুভূতে এক যাত্রা কত সহাস পুরুষ
যাত্রী অভিযাত্রী চলে দেখেছে তো তুষারের দেশে জয়মালা
... ...
মানুষের প্রেমে বীর দগ্ধমেরু কিম্বা দীর্ণ মধ্য এশিয়ায়
গমের ধানের ক্ষেত্রে প্রাণের আশ্বিন আনে স্টেপে ও তুন্দ্রায়
বিজয়ী বসতি আনে সচ্ছল বসতি আনে উন্মুখর দেশ

মানুষের বিচ্ছিন্ন শিকড় শেষ পর্যন্ত নবজলের আশ্বাসের স্থিতিশান্তি পাবে এই বোধ কবির ছিল এবং এখানেই নিহিত তাঁর মানবতাবাদ।

৯.১৩.৪ ইতিহাসবোধ ও প্রেমচেতনা

এই ইতিহাসবোধের সঙ্গে যুক্ত করে, ব্যষ্টিকে সমষ্টির সঙ্গে সমীকৃত করে কবি তাঁর ব্যক্তিগত প্রেমচেতনাকে সাধারণ্যে বিশ্বাসবহ করে তুলেছেন। 'The writer softens the character of his egoistic daydreams by altering and distingushing it'—লেখক তাঁক স্বপ্নমাধুরীকে ছদ্মবেশ পরিয়ে প্রকাশ করেন, পাঠকমনের কাছে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য, সাহিত্যসৃষ্টির নেপথ্যে স্থিত এই ফ্রয়েডভাষ্য এখানে প্রয়োগ করতে পারি। কবির প্রেমস্বপ্ন এভাবেই নিখিল বিস্তার পেয়ে অমরত্বের পথে পা বাড়াল। কালের যাত্রায় সামিল যে মানুষ আবহমান, তারই সঙ্গে চুপে চুপে রূপে রূপে যেন মিশে গেছে প্রেমিকার জীবনস্রোত ও বহতা : এই নারী চিরবিপ্লবিনী, মিছিলে প্রতিরোধে সংগ্রামে বিপ্লবে তারই অপরাজেয় দেহপ্রতিমা জনতরঙ্গে ডুবন্তভাসন্ত—

তোমার স্রোতের বুঝি শেষ নেই, জোয়ার ভাঁটায়
এদেশে ওদেশে নিত্য ঊর্মিল কল্লোল
পাড় গড়ে পাড় ভেঙে মিছিলে জাঠায়
বন্যার অজেয় যুদ্ধে কখনও বা ফল্গু বা পল্বলে
কখনও নিভৃতি মৌন বাগানের আত্মস্থ প্রসাদে
বিলাও বেগের আভা

'বিলাও বেগের আভা' এই বাক্যাংশই সবিশেষ মূল্যবান। অধিকন্তু রূপসী প্রিয়ার এই পথচলায় অনিবার্যভাবে কবিপ্রেমিকের, দাবদগ্ধ তৃষিত পুরুষের প্রাণযাত্রা মিশে যায় এবং এখানেই 'জল দাও' কবিতাটির প্রেমের কবিতা হিসেবে মরমী উপসংহার—"আমি দূরে কখনও বা কাছে পালে পালে কখনও বা হালে/তোমার স্রোতের সহযাত্রী চলি ভোলো তুমি পাছে/তাই চলি সর্বদাই" এইসব পঙ্‌ক্তি অথবা অংশ অতএব তাৎপর্যপূর্ণ।

বিষ্ণু দে-কে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে প্রতিরোধের কবি বলে চিহ্নিত করতে পারি এবং ইংল্যাণ্ডে ত্রিশের দশকে যে কবিত্রয় লিখতে শুরু করেন সেই অডেন, ডে ল্যুইস ও লুই ম্যাকনিস-এর সঙ্গে তাঁর অবস্থানগত সামীপ্য লক্ষ্য করা যায়। এঁরা সকলেই তাত্ত্বিক মার্কসবাদ দ্বারা কমবেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন। অডেন বিষ্ণু দে-র মতোই সাহিত্যিক ঐতিহ্য থেকে প্রচুর পরিগ্রহণ করেছিলেন নিজের লেখন-ভঙ্গিমাটিকে অর্জন করে নেয়ার জন্য, হপকিন্স হার্ডি থেকে লোকগাথা লোকগীতির জগতে এমনকী মধ্যযুগে তাঁর সহজ প্রয়াণ এবং তাঁর বিপ্লবের ধারণা যত না বেশি রাজনৈতিক পরিবর্তন চেয়েছে তার চেয়ে বেশি চেয়েছে ব্যক্তিগত হৃদয়-পরিবর্তনকে। It is time for destruction of error—ভুলকে উৎসাহিত করার লগ্নসময় এসেছে, এ উচ্চারণ তাঁর। অডেন যুদ্ধ ও বিপ্লবের তীরে বসে ঢেউ গণনা করেছিলেন, একজন শুদ্ধ ভাবুকের সম্ভবত এই হচ্ছে নিয়তি। তবুও দুঃস্থ সময়ের বেদনা তাঁর কবিতায় প্রতিফলিত হয়ে মানসের গভীরে প্রসারিত যন্ত্রণাবোধকে প্রকাশ করেছে

The stars are dead; the animals will not look
We are left alone with our day; and the time is short and History to be defeated
May say Alas but cannot help or pardon

'Spain 1937 কবিতায় উচ্চারিত এই বিষাদবাগ 'জল দাও' কবিতার দুঃস্থসময়ে প্রকট বঙ্গাকবির বিষাদবাদের সঙ্গে তুলনীয় এবং উভয় ক্ষেত্রেই পলায়নীবাদের আশ্রয় না নিয়ে বরং নগর ও জীবনকে পুনর্লিখিত করে নেয়ার প্রয়াস দেখা গেছে। বিষ্ণু দে-র ক্ষেত্রে এই উত্তরণ এসেছে শিল্পের অনুধ্যানে, ব্যক্তিগত প্রেমের জয়ঘোষণায় ও মানুষের যাত্রীরূপের ঐতিহাসিক অর্থপাঠে। কবিতায় বালাসরস্বতী ও রুক্মিণী দেবীর উল্লিখন শিল্পের শরণ নিয়ে কেন্দ্রবিক্ষিপ্ত সম্বিৎকে আত্মস্থ করার প্রয়াস বলে গণ্য হতে পারে।

যে-কোনো ভালো কবিতার মতোই 'জল দাও' কবিতাটির বহুস্তর অর্থ ও ব্যাখ্যা হতে পারে। পাঠক লক্ষ করুন শেষতম পঙ্‌ক্তিটি 'জল দাও আমার শিকড়ে'। ধীরে ধীরে তিনি অনুভব করবেন তাঁর মন প্রবেশ করছে এলিয়ট-এর 'The Waste Land'-এর দগ্ধদীর্ণ জগতে।

Here is no water but only rock
Rock and no water and sandy road

In a flash of lightning. Then a damp gust
Bringing rain

অথবা,

I sat upon the shore
Fishing, with the arid plain behind me
Shall I at least set mt lands in order?

এইসব কাব্যিক বাক্যাবলির মধ্যে শূন্যতাবোধ ও অস্তিত্বের সংকট, নবজলের আগমনবার্তায় নবজীবনলাভের যে প্রত্যাশা এবং বিপর্যয়কে পরাভূত করার আকাঙ্ক্ষা পরিলক্ষিত হয় তার সঙ্গে 'জল দাও' কবিতার ভাববস্তুর মিল আছে। কিন্তু এলিয়ট-এ যাত্রা শুরু সভ্যতার সংকটের সঙ্গে পরোক্ষ যোগযুক্ত ব্যক্তিগত সংকট থেকে, সেখানে বিষ্ণু দে-র প্রারম্ভবিন্দু সামাজিক ঐতিহাসিক সংকট, এলিয়ট-এ যেখানে বিলীয়মান যৌনতার অপসরণধ্বনি, সেখানে বিষ্ণু দে-র কবিতাটিতে রয়েছে উদিত যৌনতার জীয়ন-বেগ। এলিয়ট-এ সূচনায় গ্রীষ্মদুঃস্বপ্ন 'April is the crullest month', 'summer' গ্রীষ্ম শব্দটির উল্লেখ পাই। বিষ্ণু দে-র প্রথমার্ধে "গরমে বিবর্ণ হল গোলমোরের সাবেক জৌলুষ" এবং "রৌদ্রের কুয়াশা জ্বলে" ইত্যাদি বাক্যাবলিতে গ্রীষ্মদুঃস্বপ্ন প্রকট। এই নাগরিক নরকের রূপায়ণ 'অন্বিষ্ট' নামক বিখ্যাত দীর্ঘ কবিতার ভিতর আরও গভীরভাবে অবস্থান করছে।

৯.১৩.৫ কবিতায় জল-প্রতীকের ব্যবহার

এই অনুসন্ধান করলে দেখা যায় 'জল দাও' কবিতাটির নামকরণে শুধু নয়। ভিতরে ভিতরে অগণন জল-প্রতীক অবস্থান করছে।

কিন্তু আমরা যে পৃথিবীর আমরা মানুষ
আমাদেররই অতীতের স্রোতে গড়ি ভবিষ্যৎ
একূলে ওকূলে আমাদেরই বর্তমানে
কিছুটা উদ্বৃত্ত সত্ত্বেও—বৃষ্টি কিম্বা আর্তেসীয় জলে।

অথবা

আমরা কোপাই গাঁথি বুনি

অথবা

কিম্বা বুঝি মোহনার গান

ইত্যাদি পঙ্‌ক্তি উদাহরণ হিসেবে পেশ করছি। হুগলি-রূপনারায়ণ-দামোদর-কাঁসাই-হলদি-পদ্মা প্রভৃতি নদীনামগুলি অপ্রাসঙ্গিক নয় বরং অর্থবহ। 'সমুদ্রে', 'উর্মিল জোয়ার', 'পলিতে উর্বর', 'স্রোত' প্রভৃতি বাক্যাংশে মুক্তিপ্রতীক যৌনপ্রতকী ছড়িয়ে আছে ; সর্বোপরি 'আসন্নসম্ভবা অন্তর্মুখী জননীর মতো/বৈশাখীর বৃষ্টির আগের স্তব্ধতায় সতর্ক গম্ভীর' এবং 'জল দাও আমার শিকড়ে'র মতো প্রতীকী উচ্চারণ কবিতাটিকে প্রায় 'ওয়েস্টল্যান্ড' সুলভ নবজলে মুক্তির সমাধানের মনোরম প্রার্থিত পথে স্থাপিত করছে।

'দ্য ওয়েস্টল্যান্ড' প্রসঙ্গে সমালোচক মন্তব্য করেছেন—'The experience of agony and its doubt rise out of the physical conditions of this journey through the Wast Land, now the desert

scene of the part I which emphasies the need of water'। মরুভূমি অভিজ্ঞতার বেদনাপ্রতীক, তারই শুশ্রূষা অথবা উপশমের জন্য নবজলের প্রয়োজন। এলিয়ট-এ গ্রেইলকাহিনি, মৎস্যরাজপ্রসঙ্গ, বর্ষচক্র আবর্তন এবং শস্যের মৃত্যু ও উত্থান ; বিষ্ণু দে-কে 'কুরুক্ষেত্র ভীষ্ম' অথবা 'অজ্ঞাতবাসের বীর বৃহন্নলা অর্জুনে'র মতো জীবনের হঠাৎ বন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার প্রতীক খুঁজতে হয়েছে। বেদনানিদানরূপে ধারাজলের সকাম প্রার্থনাতেই স্বাভাবিকভাবে 'জল দাও' কবিতাটির পরিসমাপ্তি, 'ওয়েস্টল্যান্ড'র প্রতিপাদ্যের সঙ্গে কিছু ভারসাম্য অবশ্যই আছে। এলিয়ট বিষ্ণু দে-র অন্যতম কাব্যগুরু এবং এলিয়ট অনুবাদে এই বাঙালি কবি গুরুঋণ পরিশোধে কিছুটা উদ্যোগী হয়েছিলেন।

বিষ্ণু দে-র 'জল দাও' অথবা অন্য দীর্ঘ কবিতা অথবা সুধীন্দ্রনাথ-এলিয়ট প্রভৃতি কবির কবিতা পাঠকালে অর্থ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে একজন সমালোচক কতটা স্বাধীনতা নিতে পারেন প্রশ্ন উঠতে পারে। কবিতার এই অর্থবোধের কোনো স্থির কেন্দ্র নেই, স্বচ্ছন্দ ও মুক্তভাবে নির্মাণ ও বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে একজন সাহিত্য-আলোচক অগ্রসর হতে পারেন। এই তত্ত্ব মেনে নেওয়ার পরও ফুকোর (Foucault) সতর্কবাণী মনে আসে যেসব নিয়ম ও ধারণা অর্থবোধের উৎপত্তি ঘটায়, অর্থ আবিষ্কারের জন্য নিয়োজিত সেইসব সংখ্যাতীত বৈচিত্রী ও নিয়মনীতি-নিয়ন্ত্রিত। অর্থের আরোপ করতে গেলে অন্যান্য কিছু অর্থ খারিজের প্রয়োজনও দেখা দেয়। স্বয়ং দেরিদা (Derrida), যিনি আধুনিক deconstruction সমালোচনাপদ্ধতির এক প্রধান প্রবক্তা এ ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন, "We must therefore try to free ourselves from this language"; অবশ্য ভাষার আলোচ্য আধিপত্য থেকে মুক্তিলাভ বাস্তবে সম্ভব নয়, আমাদের বাধা দিতে অথবা প্রতিহত করতে হয়, যার মানে প্রচলিত প্রথামাত্রিকতাকে বর্জন করে এগানো। 'জল দাও'-র মতো কবিতায় স্বভাবতই নিহিত দুর্বোধ্যতার দেখা পাওয়া অস্বাভাবিক নয়, 'লেবার্নম' বা 'চেলিউসকিন', 'আর্তেসীয়' অথবা 'ক্রতুকৃতম' প্রভৃতি ইংরেজি ও সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারে বিষ্ণু দে-র কবিতায় পদে পদে উল্লিখন Allusion-এর জন্ম হয় এব সতর্ক পাঠককে সাবধানে গ্রন্থিমোচন করে করে অগ্রসর হতে হয়। তিনটি প্রধান অর্থ ভিতরে ভিতরে কাজ করে যাচ্ছে। এক, দাঙ্গাজনিত দুঃস্বপ্ন, দুই, যৌথ উজ্জীবনের সাম্যবাদী স্বপ্ন এবং তিন, ব্যক্তিগত প্রেমস্বপ্ন এবং তিনটি স্বপ্নই যুগপৎ সংশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট।

৯.১৩.৬ কবিতার শব্দ-চিত্রকল্প-ছন্দ

'জল দাও' কবিতাটির আঙ্গিক-শব্দচয়ন, ছন্দ, স্তবকনিমিতি, মিলের ব্যবহার বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় বিষ্ণু দে-র কবিতাশিল্পের অনবদ্য নির্মাণদক্ষতা—যা তাঁকে রবীন্দ্রপরবর্তী ভারতীয় কবিতার এক পুরোধা ব্যক্তিত্বরূপে চিহ্নিত করেছে।

কবি পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে মিল কদাচিৎ ব্যবহার করেছেন, অধিকাংশ স্তবকেই মিলের ব্যবহার নেই, এরই মধ্যে প্রথম স্তবকে মিলের বহুলতা আছে, যদি সে মিল ধ্বনির মৃদুতায় খুব সূক্ষ্ম প্রায় অদৃশ্যভাবে অবস্থান করে। 'মাঘেই,' 'আগে', 'নিয়মে', 'সংযমে', 'বাজে' 'পাখোয়াজে' এই শব্দে মিল স্বতঃস্ফূর্ত সরল ও অনায়াস। কিন্তু পরবর্তী দ্বিতীয় স্তবকে মিল অন্তর্হিত—মিছিলে, অভিযানে, তার, আজ, বিষাদ প্রভৃতি পরপর পঙ্‌ক্তিশেষ শব্দগুলিতে কোনো ধ্বনিসাম্য নেই। এভাবেই কবিতাটি এগিয়ে চলে। একেবারে শেষে আবার মিলের পুনরাবির্ভাব—শেষ থেকে চতুর্থ চার পঙ্‌ক্তিতে abab ধাঁচের মিল দেখি—ভাঁটায়, কল্লোলে, জাঠায়, পল্বলে।

কবিতার ছন্দ আদ্যন্ত অক্ষরবৃত্ত অথবা পয়ারজাতীয়, প্রবোধচন্দ্র সেন যাকে মিশ্র কলাবৃত্ত বলে নির্দেশ করেছেন। একটু উদাহরণ দিচ্ছি—

|| | ||| || || || || || ||

যদি বা হতুম ফুল বইতুম দক্ষিণের হাওয়া

|| || | | || || || || || ||

রইতুম নিষ্পলক রূপান্তরে দ্রুত নিত্য চাঁদ

|| || | || || || | |||

কিন্তু আমরা যে পৃথিবীর আমরা মানুষ

| | | | || || || || ||||

আমাদেরই অতীতের স্রোতে গড়ি ভবিষ্যৎ

ছন্দোমুক্তি বা ছন্দস্বাধীনতা দেখি 'আমাদেরই' শব্দটির 'আমাদেরি' এবংবিধ পাঠ অথবা উচ্চারণে। বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ পাই যেমন 'ও বছরে বর্ষার সজন মিছিলে' ; এখানে 'বর্ষার' তিনমাত্রা না হয়ে চার মাত্রা 'বরষার'। পারিভাষিকভাবে বলা যায়—অক্ষরবৃত্তে মাত্রাবৃত্তের ধর্ম সঞ্চারিত হল অথবা মিশ্রকলাবৃত্তে কলাবৃত্তের। পাশাপাশি বিভিন্ন স্তবকে কলাবৃত্ত-মাত্রাবৃত্ত, মিশ্রকলাবৃত্ত-অক্ষবৃত্ত, দলবৃত্ত-স্বরবৃত্ত প্রভৃতি ব্যবহারে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা বিষ্ণু দে করেছেন—এ ব্যাপারটি তাঁর খুব প্রিয়—বিখ্যাত উদাহরণ 'অন্বিষ্ট' নামক অসামান্য দীর্ঘ কবিতাটি। বিষ্ণু দে-র এজাতীয় সঙ্গো কেউ হয়তো সংস্কৃত চম্পূকাব্যের তুলনা দিতে প্রলুব্ধ হবেন যেখানে থাকে গদ্য-পদ্যের মিশাল। 'জল দাও' কবিতায় অবশ্য আদ্যন্ত মিশ্রকলাবৃত্তের ব্যবহার। স্তবক সংখ্যা মোট কুড়িটি।

৯.১৩.৭ উপসংহার

উপসংহার বলি, বিষ্ণু দে-র কবিতা পড়তে গেলে নূতন এবং সুন্দর লাগে। বাংলা কবিতার ধারায় তিনি এক স্বতন্ত্র পথের পথিক। প্রচুর কবিতা তিনি লিখেছেন, তাঁর কবিতা রাজনৈতিক চেতনার দিগন্তে ছুঁয়ে গেছে—মানুষের সুস্থ জীবনযাত্রা তাঁর কাম্য ছিল এবং সেই জীবন কীভাবে পাওয়া যাবে বা কি রকম হবে সে সম্বন্ধে তিনি ভাবনাচিন্তা করেছেন।

৯.১৫.১ সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা : হে মহাজীবন

সুকান্ত ভট্টাচার্যের ' হে মহাজীবন' কবিতাটি এক অনুপ্রেরিচ মুহূর্তের সৃষ্টি—কবিতার কাছ থেকে কবি বিদায় নিচ্ছেন—কিন্তু অনবদ্য কবিতাতেই উচ্চারণ করছেন সেই বিদায়বাণী এবং এই অদ্ভুত অন্তর্লীন contrast বা বৈপরীত্যের ফলে এক অসাধারণ সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়েছে এই মুক্তানিটোল সাহিত্যকর্মটিতে। মনে হয় এমন কবিতা আগে কেউ কখনও লেখেনি, ভবিষ্যতেও কেউ আর কখনও পৃথিবীতে এসে এমন কবিতা লিখবে না। এ কবিতায় রোমান্টিক কবিতার প্রসিদ্ধ চাঁদের বিদ্রোহ, পূর্ণিমা-চাঁদের মোহময়ী ছলনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। কিন্তু এই কাজটি করতে গিয়ে কবি বাংলা কবিতায় চাঁদের এমন এক অপূর্ব নতুন চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন যা বহুদিন ধরে বহু কাব্যামোদীকে ক্ষুধায় ক্লান্তিতে সংগ্রামে প্রতিরোধে বিদ্রোহে বিপ্লবে পথ দেখাবে।

৯.১৫.১ চাঁদের প্রসঙ্গ ও আবহমান কবিতা

চাঁদ আবহমান কাল থেকে কবিদের প্রিয়তমা, মানুষ তার সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়েছে, কবিরা তার নামে কবিতা রচনা করেছে। কত বিরহী, কত প্রেমিক আকাশে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বিনিদ্র রজনী যাপন করে গেছে।

চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে উছলে পড়ে আলো/ও রজনীগন্ধা তোমার গন্ধসুধা ঢালো' অথবা 'নিবিড় অমা তিথির হতে/বাহির হ'ল জোয়ার স্রোতে/শুক্লরাতে চাঁদের তরণী'—রবীন্দ্রনাথ ; 'The obed maiden/with white fire laden/whom the mortals call the moon' (শেলি)—ডৌল দেবকুমারী শুভ্র আগুনে ভরা, মানুষেরা তাকে চাঁদ বলে—চাঁদের নামে এমন কত উচ্চারণ কবিরা করে গেছেন। চাঁদ নিয়ে কবিতা লিখেছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ('জন্মান্তর') 'আধখানি চাঁদ রূপার কাঠির পরশে' শেকসপিয়র-এর চাঁদ নিয়ে বহুবিধ উচ্চারণ রয়েছে। 'How sweet the moon sleeps upon this banks', ('Merchan of Venice') এপারে কী মধুর চাঁদের আলো ঘুমিয়ে পড়েছে, 'The moon shines bright, in such a night as this' ('Merchant of Venice') এমন রাতে চাঁদের উজ্জ্বল আলো ঝরে পড়ছে। 'The charist maid is prodigal enough/to unmask her beauty to the moon' বেহিসাবি নারী যেমন তার সৌন্দর্য উন্মুক্ত করে চাঁদের কাছে ('Hamlet'); 'It is the very error of the moon;/she comes more near the earth than she was wont, and makes men mad ('Othello') চাঁদ ভুল করে পৃথিবীর কাছে এসেছিল, মানুষেরা তার রূপে পাগল হয়ে গিয়েছে, 'Lady, by yonder blessed moon I fwear/that tips with silver all these fruit-tree tops' ('Romeo and Juliet') নারী ওই উঠেছে ধন্য চাঁদ, ফলগাছের চূড়াগুলো রুপোলি রঙে ছুপিয়ে দিয়েছে ; 'I walk unseen/on the dry smooth-shave green/to behold the wandering moon' (মিলটন 'L Allegro') আমি অদৃশ্য সবুজের বুকে হাঁটব ভ্রাম্যমাণ চাঁদকে দেখার জন্য ; 'So, We'll go no more a roving/So late in the night,/Though the heart be still as loving/And the moon be still as bright' (লর্ড বায়রন : 'So, we will go no more Roving') এখনও হৃদয় ভালোবাসছে, এখনও চাঁদ এত উজ্জ্বল, তবু এমন গভীর রাতে আমরা আর ঘুরে বেড়াব না ; 'And the moon is under seas' (হাউজমান : সাগরতলে চাঁদের খেলা) 'O Moon of my delight who knows no wane/The Moon of Heaven is rising once again' (ফিটজারাল্ড : 'রুবাইৎ-ই-ওমর খৈয়াম') আমার আকাশবাসিনী আনন্দের ক্ষয়হীন চাঁদ আবার উঠছে—আবার যখন উঠবে এই বাগানে সে আমাকে হায় বৃথা খুঁজবে 'Two red roses across the moon' (মরিস) দুটি লাল গোলাপ চাঁদের উপরে ; 'The silver apples of the moon' (ইয়েটস) চাঁদের রুপালি আপেল কে তোলে সময় ফুরোনোর আগে ; আবহমান কাল থেকে চাঁদ নিয়ে এমন কবিরা করে গেছেন।

৯.১৫.২ 'হে মহাজীবন'-এ চাঁদের চিত্রকল্প

সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'হে মহাজীবন' নামক মুক্তানিটোল কবিতায় চিত্রকল্পরূপা চাঁদ সমুদ্রঝিনুকের মতো সমগ্র কবিতার দুর্লভ সৌন্দর্যটিকে বক্ষে ধারণ করে আছে। সুকান্ত রোমান্টিক চাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা তুলবার পরও ওই চাঁদকে বন্দনা করে গেলেন একটু ভিন্নতরভাবে, তাকে করে তুললেন বঞ্চিত সর্বহারা মানুষের সকল না পাওয়া ক্ষুধারপ্রতীক। চাঁদের এমত বিপ্রতীপ ব্যবহারই তাঁকে আধুনিক কবিদের সহযাত্রী করেছে। এলিয়ট যখন বলেন শ্রীমতি পোর্টার ও তাঁর কন্যার উপর চাঁদের আলো পড়েছে তখন তিনি ব্যঙ্গাত্মকভাবেই এ কথা বলেন, মূল লক্ষ্য চাঁদকে উৎসাদন করা ('Sweeny among the Nightingales')। বস্তুত আধুনিক কবিরা চাঁদের সুবিপুল রোমান্টিক ঐতিহ্য মনে রেখেই তাকে সচেতনভাবে বর্জন করতে চেয়েছেন। চাঁদ নিয়ে অহেতুক আবেগ উচ্ছ্বাসে তাঁরা ভেসে যেতে চাননি ; এমনকী যখন জীবনানন্দ দাশ বলেন 'বরফের মত চাঁদ ঢালিছে ফোয়ারা তখন প্রায় একটা নৈর্ব্যক্তিক উচ্চারণের মতোই হয়ে ওঠে এ উচ্চারণ ; চাঁদকে ঘিরে কবির আত্মের আলোড়ন একেবারেই দেখা যায় না।

সুকান্তের কবিতায় চাঁদকে ঘিরে কবি আত্মের আলোড়ন অবশ্যই আছে, কিন্তু কবি চাঁদকে রোমান্টিক উৎস বিদীর্ণ করে সেখান থেকে ছিঁড়ে এনে রিয়েলিজমের কেন্দ্রভূমিতে স্থাপন করতে চেয়েছেন। এক আ-নখশির বাস্তবতা তাঁর কবিতাটির সর্বাঙ্গে রয়েছে।

কবি উচ্চারিত প্রথম চারটি পঙ্‌ক্তি স্মরণে আনা যাক—

হে মহাজীবন, আর এ-কাব্য নয়
এবার কঠিন কঠোর গদ্য আনো
পদ-লালিত্য-ঝংকার মুছে যাক,
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো।

কবিভাবনাই তাঁকে বিপ্লবী কবিদের, সাম্যবাদী কবিদের মধ্যে স্থাপন করেছে, লুই আরাগঁ, পল এলুয়ার, পাবলো নেরুদা, গারথিয়া ফেদেরিকো লোরকা, মায়াকোভস্কি প্রভৃতি বিশ্বশ্রুত বিদ্রোহী কবিদের সঙ্গে তার কবিতার রূপে পার্থক্য থাকলেও স্বরূপে কোনো পার্থক্য নেই।

৯.১৫.৩ সুকান্তের কবিতায় সমাজভাবনা

সুকান্ত রচিত 'ছাড়পত্র', 'আগামী', 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি', 'একটি মোরগের কাহিনী', 'অনুভব', 'রানার', 'হে মহাজীবন' ইত্যাদি 'ছাড়পত্র' কাব্যের কবিতাগুলিকে উৎকৃষ্ট Socialist verse বা সমাজচেতনার কবিতা বলেই চিনে নেওয়া যায়। যে নবীন কবি ১৯৪৬-এ লিখেছিলেন :

বিদ্রোহী আজ বিদ্রোহ চারদিকে
আমি যাই তারি দিনপঞ্জিকা লিখে,
এত বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ
দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ ;
স্বপ্নচূড়ার থেকে নেমে এসো সব
শুনেছ ? শুনছ উদ্দাম কলরব ?
নয়া ইতিহাস লিখছে ধর্মঘট
রক্তে রক্তে আঁকা প্রচ্ছদপট।
প্রত্যহ যারা ঘৃণিত ও পদানত
দেখ আজ তারা সবেগে সমুদ্যত ;
তাদেরই দলের পিছনে আমিও আছি,
তাদেরই মধ্যে আমিও যে মরি-বাঁচি।
তাই তো চলেছি দিনপঞ্জিকা লিখে—
বিদ্রোহ আজ। বিপ্লব চারদিকে॥

(অনুভব ; ১৯৫৬ : 'ছাড়পত্র')

তাঁর জাত সহজেই চিনে নেওয়া যায়। কবি অনুভব করেছেন এ পৃথিবীতে বসে তিনি শুধুই পদাঘাত পেয়েছেন,

শোষণের শিকার হয়েছেন—'এদেশের জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম/অবাক পৃথিবী ! সেলাম, তোমাকে সেলাম !" ('অনুভব' : ১৯৪০) ; যে নবজাতকের মুষ্টিবন্ধ হাত উত্তোলিত, তার কাছে কবির দৃঢ় অঙ্গীকার ' এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি' ('ছাড়পত্র'), তিনি জড় নন, মৃত নন, অন্ধকারের খনিজ নন, তিনি এক জীবন্ত প্রাণ, এক সম্ভাবনার অঙ্কুরিত বীজ ('আগামী') ; যে মোরগ আস্তাকুঁড়ে খুঁটে খুঁটে খেত, স্বপ্ন দেখত প্রাসাদের ভিতর রাশি রাশি খাবারের, সে সত্যিই একদিন ভিতরে চলে গেল 'অবশ্য খাবার খেতে নয়/খাবার হিসেবে" ('একটি মোরগের কাহিনী') ; ডাকহরকরা বা রানারের দুঃখের কথা শহরে ও গ্রামে কেউ জানবে না, তার কথা ঢাকা পড়ে থাকবে কালো রাত্রির খামে ('রানার')—এমনই অনেক উজ্জ্বল সমাজচেতনার কবিতা কবি আমাদের উপহার দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের পর এইখানে সম্পূর্ণ অনন্য সতেজ কবিতার এক মৌলিক কণ্ঠ পাওয়া গেল। মাত্র ২১ বছর বয়সে ক্ষয়রোগে যে কবির অকালমৃত্যু তাঁর বহু কবিতা বহু পঙ্‌ক্তি মহাকালের তরঙ্গ-অভিঘাতে কালোত্তীর্ণ হয়ে বেঁচে আছে বিদ্রোহী ও বিপ্লবীদের কণ্ঠে কণ্ঠে, কাব্যমোদীজনের মনের ভিতর ধ্বনিরণনে। যেমন ধরা যাক 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতার সেই অসাধারণ পঙ্‌ক্তিগুলি, এদের কি সহজে ভোলা যায় ? যে একবার পড়বে জীবনে সে কি আর ভুলতে পারবে ?

আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়,
আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়,
আমার রোমাঞ্চ লাগে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাতে,
আমার বিস্ময় জাগে নিষ্ঠুর শৃঙ্খল দুই হাতে

এত অল্পবয়সে ভাবে ও ছন্দে যে কবি এমন কবিতা লিখেছেন, তাঁর অকালপ্রয়াণে বাংলা কবিতার বিশাল ক্ষতি হয়েছে সন্দেহ নেই।

৯.১৫.৪ 'হে মহাজীবন' : প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ

'হে মহাজীবন' কবিতাটির ভাবনার স্তরে স্তরে পঙ্‌ক্তির ভাঁজে ভাঁজে অতএব রয়েছে এক বিদ্রোহী বিপ্লবী মানবতাবাদী চিরসংগ্রামীর হৃদয়বেদনা ও প্রতিবাদ। ব্যক্তির কবিতা তার সব নিঃসঙ্গ সুতীব্রতা নিয়েও হয়ে উঠছে যেন ব্যষ্টির কবিতা সমাজের বুকের ভাষার কবিতা। জীবন যাচ্ছে মহাজীবনের দিকে, তাই প্রিয়তমা কবিতাকে বিদায় জানিয়ে যোদ্ধা চলেছে মহাসংগ্রামের রণক্ষেত্রে। এই বিদায়বাণীর ভিতরে লুকিয়ে রইল সংক্ষুব্ধ হৃদয়ের কত আকুলতা। গদ্যের হাতুড়ি এনেছে সুতীব্র বৈপরীত্য—কাস্তে হাতুড়ি তারার অনুষঙ্গে নিয়ে আসে পাঠকের মনে এক সাম্যবাদী দর্পণের স্থিরপ্রতিবিম্ব।

ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
পূর্ণিমাচাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

বাংলা কবিতার সবচেয়ে প্রিয় পঙ্‌ক্তিদের মধ্যে এই দুটি—এমন অ্যান্টি-রোমান্টিক অথবা রোমান্টিকের প্রতিস্পর্ধী হয়েও এক চির রোমান্টিকের, চিরদিনের কবি স্বেচ্ছাকৃত আত্মসংবরণকে বাঙ্ময় করে তুলল। মনে পড়ে যায় ফরাসি বিপ্লবের প্রাকমুহূর্তে রানি মারি আঁতোয়ানেৎ বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, প্রজারা রুটি খেতে পায় না তবে কেক খায় না কেন ? ভাত ও কাপড়, মাথার উপর আচ্ছাদন, ভালোবাসার মতো মানুষের সান্নিধ্য—মানুষের বেঁচে থাকার এইসব মৌলিক অধিকার থেকে যে মানুষ বঞ্চিত সমাজব্যবস্থারই পঙ্গুত্বের ফলে কবি এখানে তাঁদেরই একজন। পরম বেদনায়, এ উচ্চারণ আমাদের সত্তায় সম্বিতে কেটে কেটে ক্রন্দনময় তরবারির মতো প্রবেশ করে।

৯.১৫.৫ সমাজতান্ত্রিক কবিতার ইতিহাস

'সোস্যালিজম' বা সমাজতন্ত্র রাজনৈতিক তত্ত্ব হিসেবে গুরুত্বলাভ করেছে। 'Socialist Verse' বা সমাজচেতনামূলক কবিতা ভাষার ক্ষেত্রে 'সোস্যালিজমের জয়কেই সূচিত করেছে 'For socialism has won the battle of linguitic usage if nothing else' (Introduction : 'The Penguin Book of Socialist Verse')। সোস্যালিজমের উদ্দেশ্য মানুষের মুক্তি। কার্ল মার্কসই প্রথম সোস্যালিজমকে একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে স্থাপন করেছিলেন। সোস্যালিস্ট কবিতা যখন শিল্পের চাহিদা পূর্ণ করে তখন সে সাহিত্য হিসেবে মানবতার হাতিয়ার হিসেবে যথার্থই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'হে মহাজীবন' কবিতায় এ জাতীয় ছাপ আছে। খ্যাতিমান মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচক গিওর্গ লুকাচ (Georg Lukacs) আধুনিক কবিতা ও সাহিত্যে মানুষের নিঃসঙ্গতার তত্ত্ব ও আঙ্গিকগত পরীক্ষানিরীক্ষার মাত্রাতিরিক্ত প্রবণতাকে পছন্দ করেননি। তাঁর মতে আধুনিক কবি লেখকরা সমাজতন্ত্র বা সোস্যালিজমকে উপেক্ষা করে সীমাবদ্ধতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু তথাপি লক্ষ্য করা যায় আরাগঁ, এলুয়ার ব্রেশট, নেরুদা, লোরকা, মায়াকোভস্কি অথবা সুকান্ত ভট্টাচার্যের মতো কবিরা আধুনিক কবিতাকে এই সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তাঁরা ভাষাও আঙ্গিকগত প্রয়োগে শুধু আধুনিক নন অধিকন্তু সোস্যালিস্ট ভার্স বা সাম্যবাদী কবিতার পুরোধা। কবিতা হাতিয়ার করেছেন, কবিকে দিয়েছেন মানবতার স্বপক্ষে যোদ্ধার পদবি।

রুশ কবি মায়াকোভস্কি লিখেছিলেন, 'I shake the world with the might of my voice' আমি আমার কণ্ঠস্বরের শক্তিস্পর্ধায় পৃথিবীকে কাঁপাই ('The cloud in trousers') পল এলুয়ার, ফরাসি সাম্যবাদী কবি, লিখছেন 'A small bird walks in the vast regions/Where the sun has wings' ('The same day for all') এক ছোটো পাখি একটা কি এলাকায় হাঁটছে, সেখানে সূর্যের ডানা মেলা। বলাবাহুল্য এই ছোটো পাখি হচ্ছে অগণিত নামহীন সাধারণ মানুষের চিত্রকল্প। পুনশ্চ তিনি লিখছেন, বাগদানের মধুর ঋতুতে, স্বাধীনতা, আমি তোমার নাম লিখি, নগ্ন নির্জনতায়, হে স্বাধীনতা, আমি তোমার নাম লিখি ('Liberty') আর এক অতুলনীয় ফরাসি, স্পেনের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কবি লুই আরাগঁ বলছেন, স্পেনে এক সুর শুনেছিলাম যা হচ্ছে সমুদ্রের মুক্ত কণ্ঠস্বরের মতো—সেদিন নিষিদ্ধ হয়েছিল গান, শব্দেরা ছিল নিষিদ্ধ ('Santa Espina') জার্মান অবরোধের সময় প্রতিরোধের কবি হিসেবে তিনিই লিখছেন—বিশ্ব যেন আজকের এই কারাগারের মতো হয়ে গেছে স্বাধীনতা আমাদের হৃদয়ে যেমন পাখির ডানার ফিসফিসানির তো গুণগুণ করে ফিরছে ('Richard Coeur-de-Lion') । জার্মান কবি বেরটোল্ড ব্রেশট বলছেন—ভাইসব, প্রশ্ন করতে ভয় পেয়োনা ('Praise of Learning'); ক্রীতদাস, কে তোমাকে মুক্ত করবে ? কবি পাবলো নেরুদা বলছেন নামহারা মানুষদের কথা। এরা আবার ফিরে আসবে ফুলের হাজার পাপড়ির মতো, আবার নতুন করে জন্মাবে। ('I wish the wood-culter would wake up')। আর একটি কবিতায় এই কবি বলছেন—অবশেষে আমি মানুষ হলাম বন্ধুরা আমার সঙ্গে সরাইখানায় গান গেয়েছে, যোদ্ধা হাত নিয়ে আত্মরক্ষার সংগ্রামে সবাই পাশাপাশি লিপ্ত ('Freinds on the Road, 1921')। ফেদেরিকো গারথিয়া লোরকা একটি কবিতায় লিখছেন একটি মুক্ত মানুষের বন্দি হওয়ার কথা রাষ্ট্রের অত্যাচারী শাসনযন্ত্রের হাতে। আন্তোনিতো বনের পথ দিয়ে যেতে যেতে লেবু কুড়োচ্ছে ছুঁড়ে দিচ্ছে জলে। যাত্রার অর্ধপথে এলম গাছের নীচে সিভিল গার্ডেরা তাকে গ্রেপ্তার করল। রাত নটায় তাকে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, রক্ষীরা তখন লেমনেড খাচ্ছিল। নটার সময় তার কারাকক্ষে তালা পড়ল, বাইরে আকাশ তখন চকচক করছিল ('The Arrest of Antonito...')।

৯.১৫.৭ উপসংহার

'হে মহাজীবন'-এর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যকে সাম্যমৈত্রী স্বাধীনতার স্বপক্ষে সামিল মানবতার মহান যোদ্ধা উপরিউক্ত বিশ্বের সাম্যবাদী কবিদের মধ্যে স্থাপন করেই দেখতে হবে। যে বঞ্চনার ক্রীতদাস পৃথিবীতে কবির মহাসংকল্প চাঁদ ও কবিতার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার, সেই পৃথিবীর নতুন জন্মের স্বপ্ন দেখার পথেই বিপ্লব একদিন আসবে—এই প্রতীতি লোরকা থেকে সুকান্ত সব কবিই দৃঢ়ভাবে হৃদয়ের মধ্যে বহন করে গেছেন। পৃথিবী সেদিন আর বন্দীশালা থাকবে না। প্রেমিক পথিক আবার বনপথে অলসতার ললিত অন্বেষণে যেতে পারবে, কবিও কপালের ঘাম মুছে গদ্যের হাতুড়িকে একপাশে সরিয়ে রেখে কবিতার চাঁদের দিকে আবার তাকাবে। ওই চাঁদকে মনে হবে রণমঞ্চে পাশাপাশি মুক্তিসংগ্রামে ক্ষুধার সংগ্রামে সামিল। সুখময় ধাম সঙ্গের সঙ্গিনীর মতো, কবিতার মতো।

৯.১৬ গ্রন্থপঞ্জি

Modern Poetry and the Tradition : Cleanth Brooks
The Aesthetics of Modernism : Joseph Chiary
Selected Essays : T.S.Eliot
The Symbolist Movement in literature ; Arthur Symons.
The Collected Poems : T. S. Eliot.
Axel's Castle : Edmud Wilson
New bearings an Englush Poetry : F. R. Leavis
Poetry of the Age : J.M.Colen
জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ ১ম ও ২য় খণ্ড
বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা
কালের পুতুল : বুদ্ধদেব বসু
বছর পঁচিশ : বিষ্ণু দে
আধুনিক বাংলা কবিতা : বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত
কবিতার কথা : জীবনানন্দ দাশ
স্বাগত : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
সাহিত্যের ভবিষ্যৎ : বিষ্ণু দে
আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয় : দীপ্তি ত্রিপাঠী
আধুনিক বাংলা কবিতায় ইয়োরোপীয় প্রভাব : মঞ্জুভাষ মিত্র
আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয় : অশ্রুকুমার সিকদার
জীবনানন্দ সমাজ ও সমকাল : সুস্মিতা চক্রবর্তী
কবিতার কালান্তর : সরোজ বন্দোপাধ্যায়
আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা : বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়

NOTES

NOTES

NOTES